জয় অ্যাডামসনের অগনিত

পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে

কেনিয়ার উত্তর সীমান্ত প্রদেশ। বহু বছর আছি আমরা এখানে। বিশ হাজার কয়েকশো মাইল জুড়ে আধশুকনো কাঁটাঝোপের বিস্তার। কেনিয়া পাহাড় থেকে ইথিওপীয়ার সীমানা অবধি এলাকা।
আফ্রিকার এই অংশে সভ্যতার প্রভাব পড়েনি। অন্য দেশ থেকে কেউ আসেনি এখানে বসতি করতে। এখানকার মাটির যারা মানুষ তারা আজও পিতৃপিতামহের জীবনধারায় বজায় রেখেছে নিজের নিজের জীবন জীবিকা। চারদিকে ছড়িয়ে আছে অরণ্যজীবনের বহুতর বৈচিত্র্য।
এই বিশাল এলাকার প্রধান অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষক আমার স্বামী জর্জ। এই প্রদেশের দখিনা দুয়ারে আমাদের আবাস। ঊনত্রিশ শ্বেতকায় সরকারী কর্মচারীর ছোট্ট উপনগরী ইসিওলোর কাছে।
অনেক কাজ জর্জের। শিকারের আইন মানা হচ্ছে কিনা দেখা; বেআইনী, চোরাগোপ্তা বন্যপ্রাণী শিকার বন্ধ করা; স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর হিংস্র বন্যপ্রাণীর হামলা হলে তা বন্ধ করা। এসব কাজের একটা না একটাতে জর্জকে এই বিশাল এলাকার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত অবধি দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতে হয়, অনেক ঘুরতে হয়। এমন ঘোরাঘুরিকে আমরা বলি, সফারী। সম্ভব হলেই জর্জের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুরি। এমনি করেই এই বন্য প্রকৃতির অবাধ লীলা রঙ্গভূমির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, পড়ার সুযোগ পাই। জীবন এখানে বড় কঠোর, প্রকৃতির নিয়ম তার নিজেরই হাতে।
এ কাহিনীর সূত্রপাত এমনি এক সফারীতে।

মানুষখেকো এক সিংহ বোরা উপজাতির একজনকে মেরে ফেলেছে। খবর এলো জর্জের কাছে—এই মানুষখেকোটা দু'দুটি সঙ্গিনী নিয়ে কাছাকাছি কোনো পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়েছে। কাজেই জর্জের দায়িত্ব এসে গেলো এদের খুঁজে বার করার। এজন্যে বোরাদের বসতির মাঝে এসে ক্যাম্প করেছি—ইসিওলোর উত্তরে, অনেকটা দূরে।
পয়লা ফেব্রুয়ারী, উনিশশো ছাপ্পান্ন। ভোর বেলা। ঘুম ভেঙে দেখি, ক্যাম্পে একা আমি। সঙ্গে আছে শুধু প্যাটি—সাড়ে ছ-বছর বয়সের পাহাড়ী হাইর‍্যাক্স, আমাদের পোষা ছোট্টটি থেকে। ওকে দেখায় যেন কাঠবিড়ালী বা গিনিপিগ। যদিও ওর পা আর দাঁতের ধরনধারণ দেখলে পশুবিজ্ঞানবিদ্‌রা ওকে গণ্ডার

বা হাতীর সঙ্গে এক গোত্রে ফেলবেন। অবশ্য ব্যাপারটাঅনেকটা বিড়ালকে বাঘের মাসী বলা গোছের।

আমার গলায় প্যাটি সোহাগভরে ওর গায়ের নরম লোম জড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে এটা সব থেকে নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা আর সেখান থেকেই চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ক্যাম্পের চারধারটা শুকনো। গ্রানাইট পাথরের খাঁজ বেরিয়ে বেরিয়ে আছে আর গাছপালা ঝোপঝাড় অল্প অল্প ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে। তবুও জন্তু জানোয়ার খুব একটা কম নেই। বরং বেশ আছে বলতে পারা যায়। প্রচুর সংখ্যায় জেরেনাক্, অন্যান্য গেজেল বা গজলা হরিণ ইত্যাদি, অর্থাৎ বলতে গেলে এক কথায়, এমন শুকনো অবস্থায় সারা জীবনকে মানিয়ে নিয়েছে তেমন সব প্রাণী। ক্বচিৎ কদাচিৎ এদের জল খাওয়ার দরকার হয়, আবার তা হয়ও না।

হঠাৎ শুনি গাড়ির শব্দ। এতো তাড়াতাড়ি তো জর্জের ফেরার কথা নয় তবুও ফিরছে নিশ্চয়ই। কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে দেখা দিল আমাদের ল্যাণ্ডরোভার। থামল তাঁবুর কাছে। শুনলাম জর্জ চেঁচাচ্ছে, "জয়! কোথায় গেলে? দেখো কি এনেছি তোমার জন্যে···"

কাঁধের ওপরে প্যাটিকে নিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি; দেখি একটা সিংহের চামড়া। জিজ্ঞাসা করব, শিকার হল কেমন করে, তার আগেই গাড়ির পেছনটা দেখাল জর্জ ইশারায়।

গিয়ে দেখি, ছিট্ ছিট্ লোমের তিনটে ছোট্ট ছোট্ট পুঁটলি—সিংহশিশু তিনটি, যেন সরমে মুখ আড়াল করতে চাইছে। মনে হল মাত্র দিন কয়েকের বাচ্চা; চোখ ফোটেনি, তখনো চোখের ওপর নীল্‌চে স্বচ্ছ পর্দা। হামাগুড়ি দিতে পারছে না, তবুও যেন বুকে হেঁটে নাগালের বাইরেই থাকতে চাইছে। ওদের কোলে তুলে নিলাম, জর্জকে মনে হচ্ছিল বেশ বিপর্যস্ত। গল্পটা বলল ও তখনই।

ভোরের দিকে এ জায়গার লোকেরা এসে জর্জ আর তার সহকর্মী কেন্ এই দু'জনকে নিয়ে যায়। ওরা ঠিক তখনই মানুষখেকোটা কোথায় তার হদিশ পেয়েছিল। সেখানে পথ দেখিয়ে জর্জ আর কেন্‌কে হাজির করল। ভোরের আলো ফুটতেই একটা সিংহী ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে এল আচমকা পাহাড়ের আড়াল থেকে। গুলি করার ইচ্ছে হচ্ছিল না ওদের। কিন্তু একেবারে কাছে এসে পড়েছে সিংহীটা, এমন অবস্থায় পিছু ফেরা বিপজ্জনক। কাজেই জর্জের ইশারায় গুলি করল কেন্। চোট খেয়ে পালাল সিংহীটা। ওরা এগিয়ে এসে দেখলো রক্তের মোটা দাগ ওপর পানে উঠে গেছে। সিংহীর আঘাতটা খুব

জোর হয়ে থাকবে। সাবধানে পা টিপে টিপে ওরা সেই পাহাড়টার মাথার দিকে চলল। শেষ অবধি পৌছল এসে একটা বিরাট চ্যাটালো পাথরের ওপর। জর্জ আশপাশ ভালো করে দেখার জন্যে সেখানে উঠল, আর কেন্ ধারে ধারে ঘুরতে রইলো নীচেটায় : তারপরেই জর্জ দেখল কেন্ পাহাড়ের নীচে উঁকি দিয়ে রাইফেল তুলে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল একটু থেমে। চাপা গর্জন শোনা গেল। সিংহীটাকে দেখা গেল সোজাসুজি কেনের দিকে এগিয়ে যেতে। তখন আবার গুলি ভরার সময় নেই কেনের। জর্জও গুলি করতে পারছে না, কেন না সিংহীটার সঙ্গেই এক সরল রেখায় রয়েছে কেন্। রীতিমত বিপজ্জনক অবস্থা। কেমন যেন বেপরোয়া মনে হল সিংহীটাকে। নেহাৎ কপালজোর, আর একজন রক্ষী সুবিধামত জায়গা থেকে এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে চটপট গুলি করতেই সিংহীটা সরে গেল একপাশে। তখন জর্জ গুলি করে শেষ করল সিংহীটাকে।

ভরযৌবনা এক সিংহী, সবে মা হয়েছে। বাঁটগুলো দুধের ভারে ফুলে আছে। এবারে জর্জ বুঝল কেন পশুরাজ্ঞী এত বেপরোয়া আক্রমণ করেছিল। মায়ের প্রাণ, আগলাতে চাইছিল নিশ্চয় ওর বাচ্চাদের। তাই দু-দুবার তেড়ে এসেছে। শেষ অবধি জানটাও খয়রাত করেছে বুকের মাণিকদের বাঁচাতে গিয়ে। দুঃখ হল জর্জের, প্রথম থেকেই এটা বোঝার সুযোগ পেলে অন্য ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু বাচ্চাগুলো তাহলে এখানেই কোথাও থাকবে নিশ্চয়। তল্লাস করার হুকুম দিল জর্জ। ঠিক তার পরেই পাহাড়ের একটা ফাটল থেকে একটু একটু আওয়াজ ওদের কানে এল। ফাটলটার মধ্যে যতটা হাত যায় ওদের, চালিয়ে দিল। সিংহশিশুর জোর গজরানি আর ফোঁসফোঁসানি শোনা গেল ফাটলটার ভেতর থেকে। ওদের হাত পৌঁছতে পারল না শেষ অবধি। তখন ওরা আশপাশের গাছ থেকে আঁকশির মত ডাল কেটে নিয়ে বাচ্ছাগুলোকে বার করার চেষ্টায় লাগল। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ওরা বার করতে পারল বাচ্চাগুলোকে। দু'তিন সপ্তার বেশি বয়েস হয়নি মনে হল। ওদের গাড়িতে নিয়ে আসা হল। বড় দুটি বেশ গজরাতে আর লালা ফেলতে শুরু করল। সব থেকে ছোটটা যেন এতে কোন আপত্তি নেই এমনি ভাব দেখিয়ে বেশ নিশ্চিন্তেই রইল গাড়ির মধ্যে।

এবার বাচ্ছা তিনটিকে কোলে নিয়ে বেসামাল না হয়ে উপায় কি আমার!

প্যাটির কোন্ ভাগীদার এসে গেলে মোটেই বরদাস্ত করে না ও। কিন্তু দেখে অবাক হলাম প্যাটিও বাচ্চাগুলোর মধ্যেই এল ঠাঁই নিতে। অর্থাৎ ওদের ও পছন্দসই সঙ্গী বলে প্রথম চোটে মেনে নিয়েছে। সেই দিনটি থেকেই ওরা চারজন যেন বাঁধা পড়ল অটুট মায়ার বাঁধনে। প্রথম প্রথম চারজনের মধ্যে

প্যাটিকে দেখাত সব থেকে বড়। ওর ছয় বছরেরও বেশি বয়েস, আর তাল-পাকানো ভেলভেটের গোলার মত বাচ্চা তিনটের থেকে ভারিক্কি বলে মালুম হত ওকে। তখনো বাচ্চাগুলো টলমল করে না পড়ে হাঁটতে পারত না।

দুধ ধরাতে দুটো দিন কাটল। মিষ্টি না দেওয়া গোলা দুধ যত কায়দাকানুন করে খাওয়াতে চাই না কেন ওদের, খায়নি। ক্ষুদে নাক দুধের বাটি থেকে আপত্তি জানিয়েই ফিরিয়ে নিয়েছে ঘোঁৎঘোঁৎ করে। ঠিক যেমন ছোটবেলায় ঝিনুকের দুধ থেকে মাঝে মাঝে মুখ সরিয়েছি আমরা প্রত্যেকেই। তখন যদি সহবৎ শিখে যেতাম আমরা, মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো বলতাম, —উহুঃ! চলবে না। বাচ্চাগুলোর নাক ফিরিয়ে নেবার ভঙ্গিতেও যেন সেই ভাষা।

যখন দুধ খেতে শিখলো ওরা, একসঙ্গে বেশি খেতে পারত না। দু'ঘণ্টা অন্তর গরম করতে হয়, রবারের নলগুলো পরিষ্কার করতে হয়। যখন ওদের মায়ের দুধ খাওয়া অভ্যাস ছিল, আর তার সঙ্গে তাল মেলাবার জন্যে আমাদের বাচ্চাদের দুধের বোতল কাছে নেই, তখন তার বদলে রবারের নল আমরা নিয়েছিলাম বেতার যন্ত্র থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য সব থেকে কাছাকাছি এদেশীয় বাজারে লোক পাঠানো হয়েছিল শুধু কৃত্রিম পশুর বাঁট কিনে আনার জন্যে নয়, কড্-লিভার তেল, গ্লুকোজ আর মিষ্টি-ছাড়া দুধের কৌটোও আনার জন্যে। এই বাজারটা মাইল পঞ্চাশ দূরে। আর দেড়শো মাইল দূরের ইসিওলোতে জেলাশাসকের কাছে জরুরী খবর পাঠানো হল,—দিন পনেরোর মধ্যে পশুরাজ পরিবারের তিন শিশুকে নিয়ে হাজির হচ্ছি আমরা। ওদের রাজকীয় কায়দায় থাকার মত কাঠের ঘর তিনটি যেন তৈরি রাখার ব্যবস্থা হয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই বাচ্চাদের মন বসে গেল। সকলেই ওদের সোহাগ করে। প্যাটি যেন আপনা থেকেই ওদের ধাই-মা বনে গেল। ভারী খুঁতখুঁতে ধাই-মা। তবুও ও বেচারীকে অনেক দামালেপনা সইতে হত তিনটে দুষ্টুর! চটপট্ যতই বড় হয়ে উঠছে ওরা, দস্যিগিরি বাড়ছে। কখনো টানা-হেঁচড়া করত প্যাটিকে, কখনো বা ওকে ঠেলে ফেলে ওর ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যেত বাচ্চা তিনটে। সব ক'টাই কন্যে। এত ছোট হলেও ওদের সবায়েরই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য ছিল। বড়টা আর দু-বোনের ওপর ভারী উদার, ওদের ভালো করার মাতব্বরী ভাব যেন ওর মধ্যে। মেজোটা ভারী মজার—যেন হেসেই আছে সব সময়ে; আর সামনের থাবা দুটো দিয়ে দুধের বোতলটা সজোরে আঁকড়ে ধরে চোখ দুটি বন্ধ করে আরাম্‌সে পড়ে থাকত। ওর নাম দিয়েছি 'লাস্টিকা'—মানে আহ্লাদী।

সব থেকে ছোটটা ছুবলা চেহারার, কিন্তু সব থেকে তেজী। চারদিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াত সব সময়ে সবাইকে। কোন ব্যাপারে যদি ওদের সকলের সন্দেহ হত ছোটটাকেই যেন আগে পাঠাত ওরা ভাবগতিক বুঝে আসতে। ওর নাম দিয়েছি এল্‌সা; কেন না হাব-ভাবে ও আমাকে ওই নামের একজনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ওদের বরাতে এমনটা না ঘটলে অর্থাৎ আমাদের হাতে না পড়লে যূথের মধ্যে ছোটটা ঠিক্‌রে বেরিয়ে যেত। দুয়ের বেশি সিংহ-সিংহী একসঙ্গে থাকলে তাকে 'প্রাইড' বা যূথ বলা যায়। এক বা তার বেশি সিংহ পরিবার যাতে কয়েকটা পরিণত সিংহ সিংহীও থাকতে পারে দল বেঁধে শিকার করার জন্যে এটাই হলো 'প্রাইড' বা যূথ। এক এক জোড়া বা এক একটা সিংহের সঙ্গে আলাদা করে বোঝাবার জন্যে এই কথাটা ব্যবহার করা হয়।

এখন এল্‌সা এমন যে যূথে থাকত তার মধ্যে থেকেই ঠিক্‌রে যেত বলে ধরে নেওয়ার কথা বলছি। গড়পড়তা চারটে বাচ্চা হয় সিংহীর। হয়েই সচরাচর মরে যায় একটা। আর একটা খুবই দুবলা থাকে। এমন দুবলা যে মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও পারে না। এজন্যেই সিংহীর সঙ্গে দুটো করে বাচ্চা দেখা যায় সাধারণত। দু'বছর বয়েস অবধি মা দেখাশোনা করে ওদের। এল্‌সা মায়ের এই দুবলা বাচ্চা বলেই মনে হয়। মা নিজে চিবিয়ে গাল থেকে বার করে ওদের মাংস খাওয়ায়। দু-বছরেরটি হলেই 'চরায়' নিয়ে বেরোয় ওদের। কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হয় ওদের তখন, শৃঙ্খলা মেনে চলতে না পারলেই ওদের বিপদ শুধু নয়, প্রাণ সংশয়। এ সময়ে নিজেরা শিকার ধরতে পারে না ওরা। কাজেই ধাড়ীরা পেট পুরে খাওয়ার পরে যা ক্ষুদকুঁড়ো পড়ে থাকে তাতেই ওদের তুষ্ট থাকতে হয়। এতে কিছু না জুটতেও পারে কিংবা আধপেটা সিকিপেটাও হতে পারে। তার বেশি চাইতে গেলেই ওদের ভারী বিপদ। এ সময়টা তাই ওদের বড় দুঃখে কাটাতে হয়। কখনো কখনো খিদে চাপতে পারে না ওরা। তখন শিকার নিয়ে খেতে থাকা ধাড়ীদের মধ্যে গিয়ে ভাগ বসাতে যায়। ফলে ওদের কামড় বা থাবা খেয়ে অনেক সময় মরতেও হয়। কিংবা ছোট ছোট দলে ওরা যূথ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। শিকার ধরতে শেখে না তখনো। কিন্তু পেটের জ্বালায় শিকার করতে গিয়ে প্রায়ই বিপদ বাধায়। প্রকৃতির নিয়ম এদের বেলায় ভারী নিষ্ঠুর আর ছোটবেলা থেকেই সিংহদের এই কঠিন নিয়মে তৈরি করতে হয় নিজেদের। এলসার ভাগ্যে যে এমনটা ঘটত না, তা জোর করে বলা যায় না।

এখন, এই চতুরঙ্গিনী—প্যাটি আর তিন রাজকন্যে, দিনের বেশির ভাগ সময়টা তাঁবুর মধ্যে আমার ক্যাম্প খাটের নিচে থাকে। ওদের এটাই বেশ

নিরাপদ জায়গা বলে মনে হয়েছে আর ওদের শৈশবের প্রাকৃতিক লীলাভূমির সব থেকে কাছাকাছি আশ্রয় বলেই ঠাউরেছে ওরা। ঘরোয়া স্বভাব হয়ে গেছিল ওদের, বাইরের বালিতে পৌঁছতে চাইত না ওরা। প্রথম প্রথম ওদের দু-একটা অঘটন ঘটত। পরে যখন ক্বচিৎ কদাচিৎ ওদের থাকার জায়গায় ছোটখাট জলাশয় হয়ে যেত ওরা বিরক্তির সঙ্গে মুখভঙ্গি করে মিউ মিউ করত। খুব পরিষ্কার থাকত ওরা। গায়ের কোন বদ গন্ধই ছিল না, শুধু ছিল একটা মিষ্টি গন্ধ, ঠিক মধুর মত, কিংবা বোধহয় কড্‌লিভারের গন্ধ হবে। শিরীষ কাগজের মতই খর্‌খরে হয়ে উঠেছে ওদের জিভ। যত বড় হচ্ছে ওরা, আমাদের খাকি জামাকাপড়ের ওপর দিয়ে চাটলেও বুঝতে পারি আমরা।

দু'সপ্তা পরে ফিরছি ইসিওলো। আমাদের রাজকন্যেদের প্রাসাদ তৈরী হয়েই আছে। সকলেই ওদের দেখতে এল। জানাল রাজকীয় অভ্যর্থনা। ইউরোপীয়দের পছন্দ করছে ওরা, ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে ভালবাসছে। এই মাটির মানুষদের ভালো লাগে না ওদের। শুধু নুরু বলে যে সোমালি ছোকরা ছিল আমাদের বাগানের কাজের জন্যে, তার সঙ্গে ওদের বেশ বনিবনা হচ্ছে। নুরুকে আমরা ওদের দেখাশোনার ভার দিলাম। ও হল রাজকন্যেদের দেহরক্ষী। এতে খুব ফুর্তি হল নুরুর, ওদের সমাজে ইজ্জৎ বেড়ে গেল ওর। সারা বাড়িটায় আর তার চারপাশে দৌড়ঝাঁপ করে ওরা ক্লান্ত হয়ে যখন কোন ঝোপ-ঝাড়ের ছায়ায় শুয়ে জিরোয় কি ঘুমোয় নুরু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে ওদের কাছাকাছি, দেখে যাতে সাপ বা হনুমানেরা ওদের না উত্ত্যক্ত করে।

বারো সপ্তা ধরে ওদের খাওয়াচ্ছি কড্‌লিভার তেল, গ্লুকোজ, হাড়ের গুঁড়ো আর একটু নুন দেওয়া মিষ্টি-ছাড়া দুধ। দেখছি, তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়ার দরকার ওদের ; অবশ্য যত দিন যাচ্ছে খাবার সময়ের তফাৎটা বাড়ছে ক্রমে। পুরোপুরি চোখ ফুটেছে এবার ওদের। তবুও ঠিক নজর আসেনি ষোল আনা, কাজেই ওদের তাগ করা প্রায়ই ঠিক হত না, ফস্কে যেত। এই অসুবিধে ঘোচাবার জন্যে আমরা ওদের দিলাম রবারের বল আর পুরনো টিউব। টিউব নিয়ে চলত ওদের টানাটানি খেলা। রবারের বা অন্য কোন কিছু যা নরম আর টানলে বাড়ে তা নিয়ে খেলতেই ভালবাসত ওরা।

টিউব একে অপরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করত। যার কাছে টিউব থাকত, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে অন্য কেউ পাশ দিয়ে গড়িয়ে চলে আসত। টিউবটার ওপরে এসে গড়াত। তাতে যদি ছেড়ে গিয়ে টিউবটা নেওয়া যেত ভাল। নইলে আর এক দিক ধরে গায়ের জোরে টানত। এতে

যার জিৎ হত সে টিউবটা মুখে করে ধরে আর সবায়ের নাকের ডগায় বাহাদুরের মত জাঁক দেখিয়ে বেড়াত, যতক্ষণ না আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কেড়ে নেওয়ার জন্যে। এই মজার খেলা দেখে খুব হাসাহাসি করতাম আমরা।

ওদের সব খেলাধুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি থাকত চমক। ওরা একে অপরের পিছু নিত চুপিসাড়ে, আমাদেরও বাদ দিত না। একেবারে গোড়া থেকেই অলক্ষিতে শিকারের কাছাকাছি গুঁড়ি মেরে আসা শিখছিল যেন ওরা।

ওদের আক্রমণ সব সময়েই পিছু দিয়ে হত। আড়াল রেখে মাটির সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দিয়ে একটু একটু করে গুঁড়ি মেরে নির্বিকার লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগোয় ওরা। শেষ অবধি এমন প্রচণ্ড গতি আর তেজে লাফিয়ে পড়ে যে যার ওপর পড়ছে সে সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে চিৎপটাং। আমাদের নিশানা করত যখন আমরা ভাব দেখতাম যেন আমরা সত্যি সত্যিই হুঁশ করিনি। যতক্ষণ অবধি না ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য কিছু দেখার ভান করি। এতে বাচ্চাগুলো বেশ মজা পায়।

প্যাটির অবস্থা হল করুণ। এসব খেলাধুলোয় মেতে যেতে চায় ও। কিন্তু ওর থেকে তিনগুণ বড় হয়ে গেছে বাচ্চাগুলো। ওদের দৌড়-ঝাঁপের নাগালের বাইরেই থাকতে হয় বেচারীকে, নইলে চ্যাপ্টা-চেপ্টি হয়ে যাবে। অন্য সব ব্যাপারে ও নিজের মাতব্বরি বজায় রাখত শুধু যেন চরিত্রবলে বাচ্চাদের কেউ দুষ্টুমি শুরু করলে ও ঘুরে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা করত তাকে। ওর মনোবলের প্রশংসা করতে হয়। ছোট্ট চেহারা নিয়ে নিজের নির্ভীকতা প্রমাণ করা সহজ নয় খুব একটা। আত্মরক্ষার জন্যে ওর সম্বল ধারাল দাঁত, ত্বরিত পাল্টা জবাব, বুদ্ধি আর সাহস।

একেবারে ছোট্টটি থেকেই আমাদের কাছে আছে প্যাটি, আমাদের রোজকার জীবনধারণের সঙ্গে ও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে পুরোপুরি। গেছো হাইর্যাক্সের মত নিশাচর নয় ওরা, রাতে পশুর লোমের গলাবন্ধের মত আমার গলায় বেড় দিয়ে থাকত। ও নিরামিষাসী কিন্তু অ্যালকোহলের ওপর কেমন একটা দরুণ টান এসে গেছিল। সুযোগ পেলেই বোতল টেনে নিয়ে ছিপি খুলে চুক্‌চুক্ খেত। ওর নৈতিক চরিত্রের কথা না হয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু এমন পানদোষ ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। কাজেই আমাদের হুইস্কি বা জিনের ব্যাপারে ওর সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হত।

ওর মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসটা ছিল ভারী মজার। পাহাড়ী হাইর্যাক্স এজন্যে সব সময়ে একই জায়গা, বিশেষ করে কোন পাহাড়ের ধারের দিক পছন্দ

করে। বাড়িতে প্যাটি ল্যাভাটরীর বেড়ের কানায় বসে বেশ একটা হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা করত। সাফারীতে এমন বন্দোবস্ত ব্যবস্থা থাকে না ওর জন্যে। কাজেই ও একেবারে হতবুদ্ধি হত। ওর জন্যেই আমাদের বিশেষ ল্যাভাটরীর বন্দোবস্ত করতে হয়।

ওর গায়ে কোনদিনই আমি কোন কেঁট বা উকুন দেখিনি। যখন ওকে সব সময়ে লোম আঁচড়াতে দেখি, অবাক হতাম। ওর পায়ের নখগুলো গোল আর থাবাগুলো মাংসল, ঠিক যেন ক্ষুদে গণ্ডারের মত। চারটে আঙুল সামনে, তিনটে পেছনে। পেছনের পায়ের মধ্যেকার আঙুলে একটা বাঁকানো নখ, যাকে সাফাই-নখ বলা যায়। এটা দিয়েই ও গায়ের লোম পরিপাটি রাখে আঁচড়ে। নিজের গায়ের লোমকে ছিমছাম রাখার জন্যেই ওর এমন অবিরত আঁচড়ানো, বুঝেছি।

দেখার মত কোন লেজ নেই প্যাটির। ওর মেরুদণ্ডের মাঝ বরাবর একটা গ্রন্থি আছে। সেটাকে দেখায়, ওর ডোরাকাটা ছাইরংয়ের লোমের মধ্যে একটা সাদা তালির মত। ভয়ে বা আনন্দে উত্তেজিত হলে ওর এই গ্রন্থিটা থেকে রস বেরোয় আর চারপাশের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। বাচ্চাগুলো বড় হতে হতেই ঘন ঘন ওর এমন রোমাঞ্চ হয়। খেলার নেশায় দুরন্ত বাচ্চাগুলো প্রায়ই ওকে যখন ভয় খাওয়ায়, তাতেই প্যাটির এই হাল হয়। সত্যি সত্যি, যদি না ও কোন জানলার ওপরে, কি মইয়ে কি অন্য কোন জায়গায় উঠে পড়ে বাচ্চাগুলো ওকে রবারের বল ভাবে আর তেমনি করেই খেলা করতে যায় ওকে নিয়ে। ফলে ও বেচারীর প্রাণান্ত!

যতদিন না বাচ্চাক'টা এসেছে প্যাটি ছিল একেশ্বরী। আমাদের পোষা জীবগুলোর মধ্যে ওর ছিল সব থেকে বেশি আদর। আমাদের অতিথিদের নজরও পড়ত ওর ওপরে বেশি। কিন্তু এই ছোট্ট দুষ্টু তিনটে আসার পর থেকে প্যাটির খাতির আর আদর দুই কমে গেছিল। তবুও যে ও ওদের আদর উৎপাত মেনে চলছিল, তা দেখে ওর ওপর ভারী মায়া হত আমার।

রাজকন্যেদের গায়ের জোর বেড়ে যাচ্ছে এটা ওরা নিজেরাই বুঝে যেখানে-সেখানে মস্তানী ফলিয়ে বেড়ায়। মাটিতে পাতার বনাত, যতই বড় হোক না কেন টেনে বার করত ওরা। বিড়ালী স্বভাবে নিজেদের শরীরের নীচে রেখে সামনের দু পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়ে যায়। বড় হয়ে শিকার ধরে ঠিক এমনি করেই নিয়ে যাবে। আর একটা প্রিয় খেলা ছিল ওদের—'প্রাসাদের রাজা'। আলুর বস্তায় লাফ দিয়ে উঠবে একটা। আর একটাকে মুখোমুখি আটকাবে যতক্ষণ না তৃতীয়টা পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ঠেলে নীচে ফেলে নিজে চেপে বসবে। এ খেলায় এল্‌সাই জিতত বেশির ভাগ, কেন না আর

দুটো যখন লড়ালড়ি করত, সেই সুযোগেই ও কিস্তি মাত করত। আমাদের গোটাকতক কলাগাছও ওদের খেলার কাজে লাগত। ফলে অল্পক্ষণ পরেই নধর পাতাগুলি ছেঁড়াখোঁড়া ঝুলঝুলিতে পরিণত হত। গাছে চড়া ছিল ওদের আর এক প্রিয় খেলা। ওরা যেন জাত খেলোয়াড়। কিন্তু প্রায়ই ওরা এত উঁচুতে উঠে পড়ত যে নেমে আসার জন্যে পিছু ফেরার উপায় থাকত না। তখনই আমরা ওদের 'উদ্ধার' করতাম।

সকালে ওদের ছেড়ে দেয় নুরু। সারা রাত ধরে জমিয়ে রাখা উদ্যম নিয়ে ওরা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। এ সময়টায় ওরা যেন ডালকুত্তাদের দৌড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। একদিন হয়েছে কি,—এমন ছুটে বেরিয়ে একটা তাঁবু নজরে পড়ে গেছে ওদের। তাঁবুতে আমাদের দুই অতিথি ছিলেন আগের সন্ধ্যা থেকে। ওরা বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁবুর ওপর তিনটেতে। ব্যস্! পরক্ষণেই এক ধ্বংসস্তূপ। আমাদের অতিথিদের চেঁচামিতে ঘুম ভেঙে গেল। গিয়ে দেখি, বৃথাই ভদ্রলোকেরা তাঁদের জিনিসপত্র আগলাচ্ছেন। বাচ্চারা এদিকে মজার আনন্দে মাতোয়ারা। একবার করে ভাঙা ছেঁড়া তাঁবুতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর এক একবার একধরনের পুরস্কার নিয়ে উঠে আসছে—যথা, চটিজুতো, পাজামা, মশারীছেঁড়ার টুকরোটাকরা ইত্যাদি। তখন একটা ছড়ি নিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয় দুষ্টুগুলোকে।

ওদের রাতে ঘুম পাড়ানো সোজা নয়। ভেবে নিন—তিনজনা ভারী দুষ্টু ছোট্ট মেয়ে, কিছুতেই শোবে না,—ঠিক যেমন বাচ্চারা সহজেই শুয়ে ঘুমুতে চায় না, তেমনি। যে বা যারা ওদের ঘুম পাড়াতে চাইছে তাদের থেকে অনেক বেশি জোরে ছুটতে পারে, আর বাড়তি সুবিধে হল অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পায়। তেমন অবস্থায় কী ব্যাপারটা হয়?—সেই রকম নাজেহাল করত ওরা।

কাজেই কায়দাকানুন করতে হয়। একটা কায়দা খুব কাজে আসে। কিছুটা দড়িতে একটা পুরনো থলি বেঁধে শক্ত করে ধরে টানতে টানতে ওদের খোঁয়াড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ওরা এটাকে ধাওয়া না করে পারে না। তখন খোঁয়াড় আটকে দেওয়া হয়।

বাইরের খেলাধুলো বেশ হয় ওদের কিন্তু বইপত্র আর গদির ওপর কেমন নেকনজর আছে। কাজেই আমাদের লাইব্রেরী আর জিনিসপত্র বাঁচাবার জন্যে শেষ অবধি ঘরদোরে ওদের 'প্রবেশ নিষেধ' করে দেওয়া হল। কাঁধ অবধি শক্ত তার লাগানো একটা কাঠের ফ্রেমের দরজা বাঁরান্দায় ওঠার মুখে বসাতে হল। বাচ্চাদের মনঃপূত নয় ব্যবস্থাটা। ওদের খেলার জায়গা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই কিছুটা ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত হল গাছ

থেকে একটা টায়ার ঝুলিয়ে দিয়ে। ওদের চিবুনোর পক্ষে আর দোলা খাওয়ার জন্যে ভারী জুৎসই হল ব্যবস্থাটা। আরও, খালি মধুর পিপে একটা দেওয়া হল ওদের খেলা করার জন্যে। সেটা ঠেললেই একটা আওয়াজ হত। কিন্তু সব কিছুর ওপর টেক্কা দিয়েছিল একটা চটের বস্তা। বস্তাটা পুরনো বাতিল টিউব ভরে মুখ বেঁধে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাছ থেকে। এটা ঝুলত ওদের লোভ দেখিয়ে। আর একটা দড়ি বাঁধা থাকত অন্য দিক দিয়ে। বাচ্চাগুলো যখন বস্তাটা আঁকড়ে ধরত লাফিয়ে, সেই দড়িটা টেনে তুলতাম আমরা। ওরাও শূন্যে উঠে যেত বস্তা আঁকড়ে ধরে। খুব হাসতাম আমরা মজা দেখে। বাচ্চাগুলোরও বেশ ফুর্তি হত।

এত যে খেলা দুষ্টুগুলোর জন্যে, তবু ভবি ভোলার নয়। বারান্দায় ওঠার মুখে ওদের আটকাবার যে দরজা আছে তা খোলেনি। প্রায়ই এসে দরজার জালে ওদের তুলতুলে নাকগুলো ঘষত।

একদিন বিকেল গড়িয়ে গেলে পথচলা জনাকয় বন্ধু এলেন আমাদের রাতের অতিথি হয়ে। আমাদের বাড়ির মধ্যে ফুর্তির যে হৈচৈ চলছে তাতে ওদের কান গেল। কিন্তু সে সন্ধ্যায় ওরা এমন লক্ষ্মী মেয়ের মত ব্যবহার করল, তা বলার নয়। জালে নাক ঘষল না দরজায় এসে। তিনটে বাচ্চা ফুটখানেক তফাতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণে বুঝলাম অন্য কোন ব্যাপার আছে। লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখি, ওদের আর দরজার মাঝে একটা লাল সাপ ফণা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। একদিকে সিংহের বাচ্চা তিনটে আর একদিকে আমরা—গ্রাহ্যই না করে বেপরোয়া ভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে সাপটা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ওপর। একটা শটগান আনতে আনতেই গেল পালিয়ে।

কিন্তু লাস্টিকা বাড়িতে ঢোকার মতলব করলে ওকে আটকানো দায়। বেড়া থাক, আটক থাক, সাপ থাক—গ্রাহ্যই করত না ও। সব দরজাই ঢুঁড়ত। ক্রমে ক্রমে দরজার হাতল চেপে ধরা অনেক সোজা হল ওর কাছে, এমন কি হাতলের মাথাটা ঘোরাতেও পারত দরজা খোলার জন্যে। শুধু যখন আমরা তাড়াতাড়ি চারদিক দিয়ে ছিটকিনিগুলো এঁটে দিতাম, পেরে উঠত না লাস্টিকা। তবুও একদিন লক্ষ্য করেছি দাঁত দিয়ে ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করছে দুষ্টুটা। যেই তাড়িয়ে দিলাম, ও শোধ নিল আমাদের কাপড় শুকুতে দেবার দড়িটার ওপরে। সেটা ছিঁড়ে নিয়েই ঢুকে গেল একটা ঝোপের মধ্যে। এমনি দুষ্টুমি বুদ্ধি!

তিন মাস বয়েস হতেই ওদের দাঁতগুলো বড় বড় হল বেশ। মাংস ছিঁড়ে চিবিয়ে খেতে পারবে এবার। কাজেই এখন থেকে ওদের কাঁচা মাংসে নানা

জিনিস মিশিয়ে দিতে লাগলাম। ওদের মা যেমন চিবিয়ে ওদের মাংস খেতে দিত এ বয়সে, তারই বদলে এমন ব্যবস্থাটা। বেশ কিছুদিন ধরে ওদের মন উঠল না এমন খাওয়ায়। বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত। শেষ অবধি এমন খাবার চেখে দেখল আগে লাস্টিকা। সোয়াদ লাগল ওর মুখে। ওর যেই রুচল, সঙ্গে সঙ্গেই আর দুটোরও ভরসা হল। এই খাবারই খেতে শুরু করল ওরা। অল্পদিনেই খাবার সময়ে ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি শুরু হল। ফল হল এই যে বেচারা এল্‌সা ফাঁক পড়ত। ওর অন্য দুটো বোনের চেয়েও তখন ও দুবলা। নিজের ভাগটুকু পাওয়া দায় হয় ওর। এজন্যে কিছু কিছু সরিয়ে রেখে দি। পরে কোলে তুলে খাওয়াই। ওর খুব ভালো লাগত এমন খাওয়া। মাথাটা এধার থেকে ওধার অবধি গড়িয়ে, চোখ বুজে ভাব দেখায় যেন কত না সুখ ওর। এই সময়ে ও আমার বুড়ো আঙুল চুষত আর সামনেও থাবা দুটো দিয়ে আমার উরু ডলত—যেন দুধ বেশী পাবার জন্যে মায়ের বুক দল্‌মস্ত করছে। এই সময় থেকেই এল্‌সার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। খাওয়ার সঙ্গে খেলাও চলত ওর। আমার দিন কাটে ভারী সুখে এই সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের নিয়ে।

ওরা যেন স্বভাব-আল্‌সে। আরামে কোন জায়গায় থাকলে সেখান থেকে ওদের নড়ানো দায়। সবচেয়ে লোভনীয় মজ্জার হাড় দেখিয়েও ওদের ওঠানো যেত না। গড়িয়ে চলে আসত কায়দামত জায়গায় হাড়টা ধরার জন্যে। কিন্তু সব থেকে ভালো লাগত ওদের—চিৎ হয়ে শুয়ে হাড়ের মজ্জা চুষে খাওয়া, থাবাগুলো শূন্যে তুলে। হাড়টাকে এসময়ে আমাকেই ধরে থাকতে হত।

জঙ্গলের মধ্যে বেরোলেই ওদের অনেক আচমকা দুঃসাহসিক ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হত। একদিন সকালে ওদের পিছু পিছু চলেছি। আগের সন্ধ্যায় ওদের ক্রিমির ওষুধ খাইয়েছি, কী হয় সেটা দেখার দরকার ছিল। কিছুটা দূরে গিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। হঠাৎ দেখি একসার কালো পিঁপড়ে ওদের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। এমনকি কতকগুলো ওদের গায়ের ওপর উঠে পড়েছে। এই পিঁপড়েগুলো মারাত্মক। ওদের যাতাযাতের পথে যাই পড়ুক না কেন ওরা তা কামড়ে তছনছ করবে। চোয়ালের জোর ওদের খুব বেশি। কাজেই এ অবস্থায় প্রমাদ গুনলাম। বাচ্ছাদের জাগিয়ে দেওয়া দরকার কিন্তু তার আর দরকার হল না। কোন অজানা কারণে পিঁপড়েগুলো পথ বদলে ফেলল।

কিছুদিন পরেই পাঁচটা গাধা চরতে চরতে একেবারে এসে পড়েছে ওদের কাছে। ঘুম ভেঙে তো ওদের চক্ষু ছানাবড়া। এমন বড় জানোয়ার এ অবধি দেখেনি ওরা। তবুও কিন্তু ঘাবড়াল না। কথায় বলে সিংহ বিক্রম। সত্যি সত্যিই

তাই দেখিয়ে দিল ওরা। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাধাগুলোর ওপর। ব্যস্! গাধাগুলো একেবারে তল্লাট ছাড়া। এতে ওদের এত দিল্ খুলে গেল যে কয়েকদিন পরে যখন আমাদের বোঝা বওয়ার চল্লিশটা গাধা আর অশ্বতর এসে পড়ল, এই তিনটি শিশু বাহাদুরের মত তাড়া করে সমস্ত বাহিনীটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিল।

পাঁচ মাস বয়সে ওদের দেখতে হল আরও সুন্দর, তাকৎও বেড়ে গেল প্রচুর। সারাটা দিন ছাড়া থাকত ওরা। আর রাতে ঘুমোত বালি আর পাথর দিয়ে সাজানো একটা ঘেরার মধ্যে—ওদের কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা যায় যেখানে। এই হুঁশিয়ারীটুকু দরকার ছিল। আমাদের বাড়ীর চারপাশে ঘন ঘন ঘোরাঘুরি করে বন্য সিংহ, হায়না, শিয়াল, হাতী—এরা সব। তাদের যে কারো কাছে মারা যেতে পারত বাচ্চারা।

যতই ওদের জানছি বেশি করে, ততই ভালো লাগছে আরো। তবুও নিষ্ঠুর সত্য দেখা দিচ্ছে একটা—যত দিন যাচ্ছে চট্পট্ বেড়ে উঠছে ওরা। বরাবরের জন্যে তো আর রাখতে পারব না ওদের।

দুঃখের সঙ্গে ঠিক করতে হল আমাদের, দুটিকে বিদায় দিতে হবে—বড় দুটিকেই। ওরা দুটিতে গায়ে গা লাগিয়ে থেকেছে বরাবর। আর এল্সার মত আমাদের ওপর অত নির্ভর করে না ওরা। ওদের বিদায় জানানোই বরং ভালো। আমাদের এদেশীয় লোকজনদের সঙ্গে কথা বললাম। আমরা যা ঠিক করেছি তাই বলল ওরা। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হয়ত মনে হয়েছে ওদের—যদি গেরস্থালীতে সিংহই থাকে নেহাৎ, সব থেকে ছোটটি থাকা ভালো।

এল্সার কথায় মনে হল, ছোট্টটি থেকেই আমরা ওর কাছাকাছি রয়ে গেছি। বোনেদের তত ঘেঁষাঘেঁষি ও থাকেনি। ওকে তৈরী করে নেওয়া যাবে, শুধু ইসিওলোতে থাকার জন্যে নয়—সফারীর সঙ্গিনী হিসেবেও বটে।

'বড়ো' আর 'আহ্লাদী'র জন্যে আমরা বেছে নিলাম রটারডাম ব্লাইডর্প পশুশালা। ব্যবস্থা করা হল ওদের হাওয়াই জাহাজে পাঠানোর।

ওরা রওনা হবে নাইরোবি হাওয়াই-বন্দর থেকে। ইসিওলোর একশো আশী মাইল দূরে। ওদের গাড়ি চড়া অভ্যাস করিয়ে নেওয়া দরকার আগে। দেড় টনি ট্রাকে রোজই কিছুটা করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি ওদের। এই ট্রাকটা জালে ঢাকা। এর মধ্যেই ওদের খাওয়ানো অভ্যাস করাই। যাতে করে ওদের খেলাধুলোর খোঁয়াড় বলে ভাবতে পারে ওরা এই জালঘেরা গাড়িকে।

শেষ দিনে গাড়ীটায় নরম নরম বালির বস্তা বিছিয়ে দেওয়া হল।

যখন গাড়ি ছাড়ল কিছুটা পিছু পিছু দৌড়ে এল এল্সা। যে গাড়িটায় ওর

বোনেরা চলে যাচ্ছে নজরছাড়া হয়ে, তার দিকে বুক ফেটে যাওয়া চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কেমন একটা আর্ত আবেদনে ভরে উঠেছে চোখ দুটো—মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

গাড়ির পিছনে বাচ্চাদের নিয়ে আমি বসে। পাশে হাতিয়ার নিয়েছি প্রাথমিক চিকিৎসার একটা বাক্স। যোল আনা আশা ছিল, ভয় বলব না—পথে কিছু কিছু আঁচড় খেতে হবে ওদের আদরের ঠেলায়।

কিন্তু বলছি, আশাই হোক আর ভয়ই হোক—কোন কাজেই লাগেনি আমার বাক্স। লজ্জা পেল যেন সেটা।

ঘণ্টাখানেক ছটফট্ করল 'বড়ো' আর 'আহ্লাদী'। তারপর আমার পাশেই বস্তার ওপরে শুয়ে পড়ল ওরা—থাবা দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে রইল।

এমন ভাবে এগার ঘণ্টা চললাম আমরা। পথে চাকা ফেঁসে দু-দুবার দাঁড়াতে হল। বাচ্চাদুটোর কাছ থেকে এর চেয়ে শান্তশিষ্ট ব্যবহার কোনদিনই পাইনি।

নাইরোবি পৌঁছলাম। শহরে গাড়ি যখন পথ দিয়ে চলেছে, বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল ওরা। যেন জানতে চাইল—এসব অদ্ভুত গন্ধ, শব্দশাব্দি,—মানে কী এ সবের?

তারপরে হাওয়াই জাহাজ জন্মভূমি থেকে ওদের সব বাঁধন ঘুচিয়ে নিয়ে চলল। কয়েকদিন পরে কেব্‌ল্ পেলাম, হল্যাণ্ডে বাচ্চাদুটো নিরাপদেই পৌঁছে গেছে।

প্রায় তিন বছর পরে দেখতে গেছিলাম ওদের। আমাকে বেশ ভালোভাবেই অভ্যর্থনা জানাল, বন্ধুবান্ধবের মত। ওদের গায়ে চাপড় দিয়ে আদর করতেও দিল। কিন্তু চিনল না আমাকে। চমৎকার আছে ওরা—দিব্যি আরামে।

শুধু আমার সান্ত্বনা—মুক্ত জীবন যে ওরা আগে কাটিয়েছে, নিশ্চয় ওদের মনে নেই সে কথা। সেই ভালো—খাঁচায় থেকে খাঁচার বাইরের স্মৃতিটুকু নাই বা রইল—।

বন্য পশুদের মাঝে এল্‌সা

নাইরোবি থেকে ফিরতেই জর্জ জানাল এল্‌সা বিগড়ে গেছে। এক পলকের জন্যেও সঙ্গ ছাড়েনি জর্জের। চারদিকেই ওর পায়ে পায়ে জড়িয়ে বেড়িয়েছে; ওর অফিসে কাজ করার সময়ে শুয়ে থেকেছে টেবিলের নীচে; রাতে ওর বিছানাতেই ঘুমিয়েছে। জর্জ রোজ সন্ধ্যেবেলায় ওকে বেড়াতে নিয়ে গেছে।

কিন্তু যেদিন আমার ফেরার কথা, বেড়াতে যেতে চায়নি এল্‌সা। গাড়ি এসে দাঁড়াবার জায়গায় বসে থেকেছে, শুয়েছে—যেন কারো আসার আশায়। কিছুতেই নড়ানো যায়নি ওকে। আমি ফিরছি, তা জানা কি সম্ভব ছিল ওর পক্ষে? যদি তাই হয় এমন আগে থেকে জানতে পারার ব্যাপারকে পশুদের কোন্ ধরনের বোধশক্তি বলা যাবে? এমন আচরণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন বৈকি!

একা গাড়ি থেকে যেই নামছি কী অভ্যর্থনার ঘটা এল্‌সার। কিন্তু যখন ও বোনেদের দেখার জন্যে গাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন আমার ভারী দুঃখ লাগছিল—সত্যি ওর আকুল চোখ দুটি ফিরে ফিরে ওর দিদিদের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, দেখে যেন আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। এর পরে বেশ কিছুদিন অরণ্যের পানে চেয়ে ডেকেছে তাদের। আমাদের পিছু পিছু সর্বত্র ঘুরেছে। নিশ্চয়ই ভয় হয়েছে ওর, হয়তো আমরাও ছেড়ে চলে যাব ওকে। আশ্বাস দেওয়ার জন্যে বাড়িতেই রাখা হল ওকে, রাতে শুল আমাদের বিছানায়। প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায় আমাদের, যখন ও মুখ চাটতে থাকে রাত দুপুরে।

এল্‌সার এমন অবস্থায়, কিছুদিনের জন্যে ওর জায়গা বদলানো দরকার, বুঝলাম আমরা। এই যে পথ চেয়ে থাকা আর বিচ্ছেদের বেদনা—তা অন্য পরিবেশে কাটবে। যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা সম্ভব হল, ওকে নিয়ে আমরা বেরোলাম সফারীতে। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, সফারীর সব কিছুর সঙ্গেই বেশ বনে গেল ওর, আর আমাদের মতই ও সফারী-প্রেমিকা হয়ে পড়ল।

আমার ট্রাকে যে বোচকাবুঁচকি তা সবই নরম। বিশেষ করে বিছানার বাণ্ডিল। এল্‌সার গাড়িতে শুয়ে বসে যাতায়াত করার পক্ষে ভারী সুবিধে। আরামে গদীর ওপর বসে আশপাশে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে দেখতে গেল।

শিবির ফেললাম উয়াসো নাঈরো নদীর ধারে। নদীর তীর একধরনের পাম-গাছ আর বাবলা ঝোপে ভরা। শুখার সময়ে অগভীর নদী বুকের জল বয়ে যায় লোরীয় জলাভূমিতে—পরের পর মাছে ভর-ভরন্ত ঢল দিয়ে অনেকগুলো জলাশয় তৈরী করে।

আমাদের শিবিরের কাছে কতকগুলো শৈলশিরা। এল্‌সা এগুলোর মাঝের ফাটল দিয়ে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল, পাহাড়ের বাতাসের গন্ধ নিল কখনো কখনো আর শেষ অবধি কেবল কোন কোন উঁচু চুড়োয় উঠে গিয়ে শুল, যাতে চারদিকটা বেশ ভালো করেই ওর চোখে পড়ে। বিকেল গড়িয়ে এলে

ডুবন্ত সূর্য এ অঞ্চলটাকে নাইয়ে দেয় হলদে-লালরঙের ছটায়। তখন লালচে পাথরের সঙ্গে গা মিশিয়ে থাকে এল্‌সা—যেন ও এক হয়ে গেছে পাহাড়টার সঙ্গে।

সারা দিনের মধ্যে এ সময়টাকেই চোখ জুড়োনো মন ভরানো লাগে। দুপুরের প্রচণ্ড তাপের পরে সব কিছুই যেন হাত-পা ছড়ায়। ছায়া লম্বা হয়, ঘন বেগুনী লাল হয়ে যায় আকাশটা। আর চট্‌পট্ যখন সূর্য দিগন্তে ডুব দেয়, যেন নিভে যায় সব কিছুর চেহারা। একটু একটু করে কোন পাখীর হালকা ডাক মিলিয়ে যায় কোথায়, পৃথিবীর সাড়াশব্দ নিরুদ্দেশ হয়। আঁধারকে আশা করতে করতে কোন অজানা রোমাঞ্চে সবাই হয় তটস্থ—তারই সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে অরণ্য। হায়নাদের একটানা ডাক যেন সেই জেগে ওঠার সংকেত।

শুরু হয় শিকার।

এক সন্ধ্যের কথা আজও মনে আছে। এল্‌সাকে তাঁবুর সামনের একটা গাছে নিরাপদে বসিয়েছি। ও ওর রাতের খোরাক চিবোতে শুরু করেছে। অন্ধকারে বসে আমি কান পেতে আছি।

প্যাটি লাফিয়ে আমার কোলে উঠে বেশ আরামে গুটিসুটি দিয়ে বসে দাঁত কিড়মিড় করছে। আরাম পেলে এমনটাই করে ও। নদীর কাছে ডেকে চলেছে একটা সাইকাডা পতঙ্গ। উঠন্ত চাঁদ ছোট ছোট ঢেউয়ের ওপর পড়ে ঝক্‌মক্ করে তুলছে নদীর বুক। ওপরের আবছা আঁধারে জ্বলজ্বল করছে তারার দল। উত্তর সীমান্ত প্রদেশের আকাশে অন্য যে কোন জায়গার থেকে দু'গুণ বড় দেখায় ওদের বলে আমার ধারণা। দূরে কোন প্লেনের শব্দের মত একটা আওয়াজের গভীর কাঁপন শুনলাম—জলের টানে গলা ভেজাতে নদীতে আসছে হাতীর পাল। সৌভাগ্য, বাতাসটা আমাদের অনুকূলে, কাজেই আমাদের সন্ধান পাচ্ছে না ওরা। শীঘ্রই থেমে গেল আওয়াজটা।

হঠাৎ নির্ভুল ভাবেই শুনলাম কাটা কাটা সিংহনাদ। প্রথমে খুব দূরে, কিন্তু ক্রমেই তা জোর আরও জোর হতে থাকল। এসব নিয়ে কী ভাবনা হতে পারে এল্‌সার মনে? আসলে স্বজাতের সান্নিধ্যে এসেও একেবারে নির্বিকার ও। মাংস ছিঁড়ে খেয়ে চলল কশের দাঁত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে; চারটে পা শূন্যে তুলল তারপর গড়িয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল শেষ অবধি। আমি শুনতে লাগলাম হায়নার হাসি, শিয়ালের হুক্কাহুয়া আর সিংহদের জমকালো ডাকের কোরাস্।

ভারী গরম সে সময়টায়; দিনের কিছুটা এল্‌সা কাটায় জলে। রোদে জল তেতে গেলে ওর অস্বস্তি লাগে, তখন নলখাগড়া বনের ছায়ার মায়া টানে

ওকে। মাঝে মাঝে আল্‌সেপনায় গড়িয়ে পড়ে নদীতে—ছলাৎ করে ছিটিয়ে পড়ে জল। উয়াসো নাঙ্গীরো নদীতে অনেক কুমীর, জানতাম আমরা। কাজেই ভাবনা হত। কিন্তু কোন দিনই ওরা কেউ ধারে কাছে ঘেঁষেনি এল্‌সার।
চব্বিশ ঘণ্টাই ওর দুষ্টুমির মতলব। যখনই আমরা একটু অন্যমনস্ক, জলকাদা ছিটিয়ে আমাদের একেবারে চিত্র-বিচিত্র করে দেয়; কখনো জলকাদা থেকে চট করে উঠে আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সোহাগ কাড়াতে গিয়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করে—আর আমরা আমাদের ক্যামেরা, ফীল্ড গ্লাস, রাইফেল—এসব নিয়ে গড়াগড়ি খেতে থাকি জলকাদায় মাখামাখি হয়ে ওর শরীরের ভারে। ও থাবা চালায় নানা কায়দায়। কখনো আলতো আদরে, আবার পুরো জোর দিয়ে বেশ তাগ করেই জবর ঝাপ্টাও দেয়। এমন একটা ছোট্ট জুজুৎসু প্যাঁচও জানা আছে ওর যে অব্যর্থভাবেই তাতে আমরা চিৎপটাং হই। আমরা তৈরি আছি কি না আছি, বয়ে গেছে ওর। আমাদের পায়ের গোছে থাবা দিয়ে এমন একটা ছোট্ট মোচড় দেয় যে আমরা একেবারে সটান মাটিতে।
থাবার নখের ওপর ভারী যত্ন ওর। রুক্ষ বাকলের কয়েকটা গাছের গায়ে নখ শানায় এল্‌সা। আঁচড়ায়, গভীর টানা টানা গর্ত হয়। যতক্ষণ অবধি না ওর মন ওঠে এমনটা করে ততক্ষণ অবধি থামে না। আসলে কিন্তু ও নখ গুটিয়ে নেবার পেশীগুলো শক্ত করে এইভাবে।
গুলির শব্দে ভয় পায় না ও। ও জানত, 'গুড়ুম!' মানেই হচ্ছে একটা মরা পাখী। শিকার কুড়িয়ে নিয়ে আসতে, বিশেষ করে বনমুরগী কুড়িয়ে আনতেই ভালো লাগে ওর। পালকের ডঁটিগুলো চিবোয়। ক্বচিৎ কদাচিৎ এমন পাখীর মাংস খায়, কখনো পালক খায় না। যে কোন দিনের শিকারের প্রথম পাখীটা ওর। যতক্ষণ অবধি না বিশ্রী লাগবে, ততক্ষণ অবধি মুখে ধরে নিয়ে যায় সেটা বেশ জাঁক করে। তারপর আমার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে চাইবে মুখের দিকে,—যেন বলবে, 'একটু নিয়ে চলুন না আমার জন্যে—।' তখন ওর সামনে সেটা ঝুলিয়ে যাব আমি, আর তার পিছু পিছু বেশ খোশ মেজাজে দুল্‌কি চালে চলবে ও।
আফ্রিকার এই বনমুরগী এল্‌সার কাছে বেশ ভালো লাগত শিকার হিসেবে। কিন্তু ফ্র্যাংকোলিন বলে তিতির জাতের একরকমের পাখীর ব্যাপারে ওর যেন কোন আগ্রহ ছিল না।
কোন জায়গায় হাতীর নাদ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গড়াগড়ি যেত তার ওপর। যেন স্নানান্তের প্রসাধনী অঙ্গরাগ। বড় বড় তালগুলো জাপটে ধরে গন্ধটা গায়ের চামড়ায় বেশ ভালো করে বসিয়ে নিতে চাইত। গণ্ডারের নাদও ভালবাসত

এমন করে মাখতে। আসলে সব তৃণভোজী জন্তুর বিষ্ঠাই এমন আকর্ষণীয় ওর কাছে, বিশেষ করে মোটা চামড়ার, অল্প অনুভূতির যে সব এমন জন্তু, তাদের। ওর এই অদ্ভুত অভ্যাসের বিষয় ভেবে আমাদের মনে হয়েছে—এটা কি সেই গোড়াকার পাশব প্রবণতা ?—যখন স্বাভাবিক অবস্থায় শিকার ধরে খাবার দরকার হবে ওর, তখন নিজের গায়ের গন্ধ এমন করেই ঢেকে রাখবে ? কেউ যদি লক্ষ্য করেন, দেখবেন—ঘরোয়া কুকুর বেড়ালদের মধ্যেও তৃণভোজী অন্য গৃহপালিতদের বিষ্ঠায় গড়াগড়ি দেবার একটা ঝোঁক আছে। বোধহয় বড় বড় মাংসাশীদের স্বভাবের বিকৃত রূপ এটা। এল্‌সাকে কখনো কোন মাংসাশী প্রাণীর বিষ্ঠার ধারেকাছেই ঘেঁষতে দেখিনি।

এল্‌সার নিজের অভ্যাস ছিল ভদ্র। হাঁটা চলার পথ কখনো নোংরা করত না ও।

এক বিকেলে জঙ্গলের মধ্যে হাতীর দলের হৈচৈ শুনে ছুটে গেল এল্‌সা। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের কানে এল জোর হাতীর ডাক আর বনমুরগীদের ক্যাঁক্ কোঁক্ শব্দ একসঙ্গে। প্রবল উত্তেজনায় আমরা এমন দেখাশোনার ফলাফলের অপেক্ষা করছি। একটু পরে হাতীর দলের গণ্ডগোল থেমে গেল। কিন্তু বনমুরগীদের ডাকাডাকি উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলল। তারপর অবাক হয়ে দেখলাম শকুনজাতীয় একধরনের এক ঝাঁক বনমুরগী ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসা এল্‌সার পিছু পিছু আসছে। যেন এল্‌সাকে ধাওয়া করে তাড়াতে কোমর বেঁধে লেগেছে ওরা। যখনি বসতে যাচ্ছে এল্‌সা ওরা চেঁচামেচি করে উঠছে, কাজেই সব সময়ে চলতে হচ্ছে এল্‌সাকে। পাখীগুলোর দুঃসাহস ঘুচে গেল আমাদের দেখে, এল্‌সাকে স্বস্তি দিয়ে পালাল ওরা এবার।

একবার বেড়াতে বেড়াতে এল্‌সা হঠাৎ একটা স্যান্‌স্‌ভিয়েরিয়া ঝোপের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর লাফ দিয়েই তাড়াতাড়ি ফিরে এল আমাদের কাছে। চাইল এমন করে, যেন বলছে,—'আমি যা করছি আপনারা তা করছেন না কেন বলুন তো—?' তখনি দেখলাম স্যান্‌স্‌ভিয়েরিয়ার ধারালো সুচোলো পাতার ফাঁকে একটা প্রকাণ্ড সাপ। ক্ষুরধার পাতাগুলোর আবডালে বেশ গা বাঁচিয়ে রয়েছে—কিছুই করার উপায় নেই। বাহাদুরি দিলাম ওকে এমন সাবধান করার জন্যে।

ইসিওলোতে ফিরে দেখি, শুরু হয়েছে বর্ষা। সারা দেশ ছেয়ে গেছে ছোট ছোট নদী আর খালবিলে। এতে এল্‌সার মজা হল খুব। প্রত্যেকটাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে একবার করে, আর তাতে ফুর্তি পেয়ে গায়ে লাফিয়ে পড়ে আমাদের কাদায় লেপ্টালেপ্টি করে দেয়। কাদা জল ওর কাছে যেন স্বর্গসুখ এনে দেয়। ওর এমন তামাসা আমাদের কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে। ওকে তখন

বুঝিয়ে দিতে হয় এমন ফাজলামোর উড়ন্ত লাফ এখন আর ঠাট্টা নয়, কেন না ওর শরীর অনেক ভারী হয়ে গেছে। ওর তামাসা আমাদের শোচনীয় অবস্থায় ফেলছে। ওকে অবস্থাটা বোঝানো হল একটা ছড়ি বেশ কায়দা করে কাজে লাগিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল ও, পরে ক্বচিৎ কদাচিৎ আমাদের ছড়িটা ব্যবহার করতে হয়েছে। অবশ্য ওকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে কাছে থাকত আমাদের ওটা। ইতিমধ্যে বুঝতে পারে কোন্ কাজটা করতে মানা করা হচ্ছে। এমনকি কোন হরিণ দেখে ওর খেলা করার লোভ হলেও আমাদের বারণ বুঝলে যেত না।

মাঝে মাঝে অবস্থাটা বড় করুণ লাগত। ওর সহজাত শিকার প্রবৃত্তি আর আমাদের খুশী রাখার প্রয়াস এই দুয়ের দ্বন্দ্বে যেন ও ক্ষতবিক্ষত হত অন্তরে। যা কিছুই সামনে নড়া-চড়া করছে, লাফিয়ে ধরতে যায় ও– ঠিক যেমন কুকুরদের স্বভাব। কিন্তু এখনও মেরে ফেলার প্রবৃত্তিটা ওর মধ্যে জাগেনি। ও যে ছাগলের মাংস খেত, তাকে কখনো জ্যান্ত অবস্থায় আনা হত না ওর সামনে। বন্য পশুদের দেখার অনেক সুযোগ ঘটেছে ওর। কিন্তু এমন দেখার সময়ে বরাবরই থাকি আমরা ওর সঙ্গে। শুধু খেলার ঝোঁকে ধাওয়া করে ও, আবার ফেরে আমাদের কাছে কিছু পরেই। মাথা ঘষে আমাদের হাঁটুতে, মৃদু আওয়াজ করে যেন বলতে চায় খেলাটা কেমন জমেছিল।

বাড়ির চারদিকেই আমাদের সব জাতের জন্তু জানোয়ার। অনেক বছর ধরে একপাল জল হরিণ, ইম্পালা হরিণ আর প্রায় ষাটটা জিরাফ আমাদের প্রতিবেশী। বেড়াতে যাবার পথে এল্সা দেখে ওদের, ওরাও এল্সাকে বেশ চিনে গেছে। এমন কি কয়েক গজ অবধি এল্সাকে ওদের পিছু পিছু গুঁড়ি মেরে আসতে দেয়, তারপর শান্তভাবে মুখ ফিরিয়ে ওরা চলে যায়। বাদুড়-কান শিয়ালের একটা দল ওকে এত চিনে গেছিল যে আমরা এল্সাকে নিয়ে ওদের গর্তের খুব কাছাকাছি যেতে পারতাম। তাতে ভয় খেত না ওরা। আসলে কিন্তু ওরা ভারী ভীতু। একটু শব্দেই গা ঢাকা দেয়। আমাদের খুব কাছে এসে পড়তে দেখলেও ওদের গর্তের মুখে শেয়ালছানাগুলো গড়াগড়ি করে খেলত, আর ধাড়ীরা যেন ওদের পাহারায় বসে থাকত।

বেজীরা এল্সার সঙ্গে বেশ মজা করত। ওরা থাকে ফাঁকা উইঢিবির মধ্যে। সিমেন্টের মত শক্ত ধাঁচের মাটিতে তৈরী বলে সত্যিই ওগুলো যেন বেজীদের দুর্গ। প্রায় আট ফুট করে লম্বা এক একটা–গায়ে অজস্র গর্ত। দিনের গরমে বেশ ঠাণ্ডা আস্তানা।

আমাদের চায়ের প্রায় সময়ে সময়ে বেজীগুলো বেরোয় ওদের গর্ত থেকে– সারাদিন এটা-ওটা-সেটা খেয়ে পেট ভরিয়ে সন্ধ্যে না হলে ফেরে না। সেই

সময়ে প্রায় দিন আমরা ওদের বাসার পাশ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরতাম। এল্‌সা করত কী—ওদের গর্তগুলোর সামনে গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাকত। বেজীগুলো গর্ত দিয়ে ছোট ছোট মুখ বার করে ওকে দেখেই শিস্ দিয়ে হাওয়া হত। এল্‌সা বসে বসে বেজীগুলোর এমন মজা দেখে নিশ্চয়ই খুশী হত। ওদের পথ আটকে এমন বসে থাকায় বেশ তৃপ্তি পেত এল্‌সা।

বেজীদের হাঙ্গামায় ফেলে যেমন মজা পেত এল্‌সা, তেমনি খেপে যেত হনুমান দেখলে। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা খাড়াই পাহাড়ের চূড়োতে ওদের আস্তানা—যেখানে চিতাবাঘ যেতে পারে না। সারারাত সেখানে ওরা নিরাপদে থাকত। পাহাড়টার একটু-আধটু খাঁজ থাকলেও সেখানে আঁকড়ে থাকে ওরা। সূর্য ডোবার আগেই ওদের এই আশ্রয়ে ফিরে যেত। ওরা আশ্রয় নেবার পর পাহাড়ের চূড়োটা দূর থেকে দেখায় যেন কালো বিন্দুতে ভরা। ঐ নিরাপদ আশ্রয় থেকেই এল্‌সাকে দেখে ওরা ডাকত, দাঁত খিঁচোত। এল্‌সা ভয়ানক রেগে যেত, কিন্তু বদলা নেবার কোন উপায় ছিল না ওর।

জীবনে প্রথম যখন হাতীর মুখোমুখি হল এল্‌সা, কী ভাবনাই না হয়েছিল আমার! সিংহশিশুদের প্রধান শত্রু যে এই জীবগুলো, তা ওর মায়ের কাছ থেকে শেখার সুযোগ বেচারী এল্‌সার হয়নি। হাতীরা দেখলেই মেরে ফেলে সিংহশিশুদের—কাজেই ভয় ভাবনাটা অকারণ ছিল না।

সকালে নুরু এল্‌সাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিল, এল্‌সা একটা হাতীর সঙ্গে খেলছে। রাইফেল নিলাম আমরা, নুরু আমাদের নিয়ে গেল ঘটনাস্থলে। একটা বিরাট বুড়ো হাতী ঝোপের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে প্রাতরাশ সারছে। এল্‌সা পেছন থেকে গুঁড়ি মেরে আসতে আসতে হাতীটার পেছনের পায়ে খেলাচ্ছলে একটা ঝাপ্টা দিল থাবার। এই বেয়াদবির ফলে হাতীটা আহত বিস্ময় আর বেইজ্জতির ভয়ে চিৎকার করে উঠল। তারপর পেছিয়ে ঝোপটা থেকে বেরিয়ে এসেই আক্রমণ করল হাতীটা। এল্‌সা ওর সামনে থেকে সরে গেল চকিতে। হাতীর আক্রমণকে আমলে না এনেই পেছন থেকে গুঁড়ি দিয়ে হাতীটার দিকে আবার আসতে থাকল। ব্যাপারটা দেখতে মজা লাগলেও ভয় হবার কথা। আমরা মনে মনে চাইছিলাম যেন গুলি ছুঁড়তে না হয় আমাদের। কিছুক্ষণ এমনটা চলল। তারপর ওদের দুজনেরই বিরক্তি ধরে গেল। হাতীটা আবার ঝোপে ঢুকলো খাওয়া সারতে। এল্‌সাও হাল্লাক হয়ে ওর কাছেই পথের ওপর শুয়ে পড়ে ঘুম দিতে লাগল।

এরপর থেকেই কয়েক মাস ধরে এল্‌সা হাতী দেখলেই এমন নাকাল করত।

হাতীদের মরসুম তখন শুরু হওয়ায় এমনটা প্রায়ই হত। মরসুমে হাতীরা একবার করে কয়েকশোর এক এক পালে ঘুরে বেড়াত। এই বিরাট পশুগুলো ইসিওলোর কোথায় কি আছে না আছে সে সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। কোথায় জনার আর জোয়ারের কোঁক বেরোয়—ওদের তা ভালো করেই জানা, দল বেঁধে সে সব জায়গায় যেত। এদেশীয় বসতি এখানে বেশ ঘন, গাড়ি যাতায়াতও প্রচুর, তবু হাতীর দল বেশ সুশৃংখলেই চলাফেরা করত, কোন ঝামেলা বাধাত না।

আমাদের আবাস ইসিওলো থেকে তিন মাইল দূরে—চারপাশে চমৎকার করে খুঁটে খাবার জায়গা। কাজেই হস্তী অভিযাত্রীর দলকে দল আসত আমাদের কাছে-পিঠে। আমাদের বাড়ির সামনে একটা পুরনো চাঁদমারীর মাঠ। সেটা ওদের খুব পেয়ারের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ মরসুমে বেড়াতে যাবার সময় খুব হুঁশিয়ার থাকতে হত। কেন না হাতীদের ছোট ছোট দল সব সময়ে ঘোরাঘুরি করছে। এল্‌সা আর নিজেদেরও বাঁচাতে সব সময় তটস্থ থাকতে হয়।

এক দুপুরে এল্‌সা আর নুরু ফিরল, পিছু পিছু এক হাতীর পাল। খাওয়ার ঘরের জানলা দিয়ে ঝোপের মধ্যে দেখলাম ওদের। অন্যদিকে এল্‌সার মন ফেরাবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বৃথা। এগিয়ে আসা পালটার দিকেই চলল ও। তারপর হঠাৎ বসে পড়ল। হাতীর দলও মুখ ফেরাল। এক একজনের লাইনে ওরা চাঁদমারীর মাঠ পার হয়ে গেল। বসে বসে ওদের দেখল এল্‌সা। প্রদর্শনীটা বেশ জাঁকাল। যে ঝোপের মধ্যে শুয়ে থেকে এল্‌সা ওদের নিজের গায়ের গন্ধে জানিয়ে দিচ্ছিল যে ও আছে সেখানে—সেই ঝোপ দিয়ে বেরোচ্ছে এক একটা হাতী আর লাইন করে চলেছে। প্রায় গোটা কুড়ি হাতীর শেষটা অবধি ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখল এল্‌সা। তারপর আস্তে আস্তে পিছু নিল ওদের। কাঁধ আর মাথা সোজা রেখে আর লেজটা লম্বা করে চলল। হঠাৎ একেবারে পেছনের বিরাট মদ্দা হাতীটা ঘুরেই এল্‌সার দিকে বিরাট মাথাটা ঝাঁকিয়ে সজোরে চেঁচিয়ে উঠল ডাক ছেড়ে। এটা লড়ায়ের চীৎকার; কিন্তু এল্‌সা ঘাবড়ে গেল না এতে। সোজা ও এগিয়ে চলল, হাতীটাও এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। বেরোলাম আমরা। সাবধানে এগিয়ে যাবার পরে একটা বড় গাছের নীচে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে হাতীর ভিড়ে মাঝে মাঝে এল্‌সাকে এক এক পলক দেখা যাচ্ছিল। কোন চিৎকার বা ডালপালা ভাঙার শব্দ নেই, কাজেই বোঝা গেল ঝামেলা হয়নি কোন। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছি তবুও, যে কোন মুহূর্তেই একটা বিপদ বাধতে পারে। যাই হোক শেষ অবধি দেখা গেল

বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে এল্‌সা।

কিন্তু যত হাতীর সঙ্গে মোলাকাত করেছে এল্‌সা, সবাই এমন ভদ্রতা করেনি। আর একবার এল্‌সা প্রায় একটা বিরাট ছত্রভঙ্গ ব্যাপার ঘটিয়েছিল আর কি! চাঁদমারীর মাঠের দিক থেকে প্রচণ্ড শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখি একপাল হাতী দৌড়ে নামছে পাহাড়ের পথে আর তাদের খুব কাছ ঘেঁষে ধাওয়া করে আসছে এল্‌সা। শেষ অবধি একটা হাতী ওকে আক্রমণ করতে এল, কিন্তু চট্ করে পাশ কাটাল এল্‌সা। যথাসময়ে হাতীটা বিফল আক্রমণ ছেড়ে সঙ্গীদের ভিড়ে মিশল গিয়ে।

জিরাফ দেখেও মজা লাগত ওর। বিকেলে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, ও গোটা পঞ্চাশ জিরাফ নিয়ে পড়ল। মাটির সঙ্গে শরীরটা মিশিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ও চুপিসাড়ে পিছু নিল ওদের—এক-এক পা এগোতে লাগল। জিরাফগুলো ওকে গ্রাহ্যই করেনি, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরল মনে দেখতে লাগল ওকে। এল্‌সা একবার ওদের দিকে চাইল, তারপর আমাদের পিছু ফিরে দেখল। বলতে চাইল যেন,—'কেন বাতিদানের মত দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে আমার তাক করে পিছু নেওয়ার মজাটা মাটি করছ বাপু?' জিরাফগুলো নির্বিকার দেখে এবার ও চটে গেল কিন্তু শেষ অবধি ঝালটা মেটাল আমার ওপর। তীরবেগে ছুটে এসেই ধাক্কা দিয়ে আমায় মাটিতে ফেলে দিল।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি একবার আমরা গিয়ে পড়লাম একপাল হাতীর মধ্যে। আলো চট্‌পট্ কমে আসছিল, চারদিকে শুধু হাতীদের আকৃতিগুলো কোনমতে দেখা যাচ্ছিল।

এই বিরাট জন্তুগুলো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে এত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে তা আমার কাছে ভারী অতিপ্রাকৃত মনে হচ্ছিল। এরা আর কাউকে যে এমন বিনা নোটিসে ঘিরে ফেলতে পারে তাও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এবারে নিঃসন্দেহে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এল্‌সার সঙ্গে আমাদের। যেখানেই বেরিয়ে পড়ার জন্যে একটু ফাঁক খুঁজছি, একটা না একটা হাতী আমাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। আমরা এল্‌সার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছি। এটা এমন দৈত্যের মত জন্তুদের সঙ্গে ওর খেলা শুরু করার সময় নয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ও ওদের তাগ করে মধ্যিখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে আমাদের ইঙ্গিত ঠিকমত বোঝার অবকাশ পেল না, নাগালের বাইরে চলে গেল। শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা হাতীদের বিস্ময়াহত চিৎকার আর কান ফাটানো আর্তনাদ। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই। অন্ধকার ঝোপের আড়াল দিয়ে একটু ফাঁক

থাকলেও তা দিয়ে এগোতে গেলেই পথ আটকাচ্ছে ওরা। উদ্বেগ; আশংকা আর অস্থিরতার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হলো আমাদের এমনভাবে। এল্‌সারও কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে না।

কোনমতে শেষ অবধি আমরা বেরোতে পারলাম হস্তীব্যূহ থেকে। বাড়ি ফিরলাম এল্‌সা ছাড়াই। ও ফিরল অনেক পরে। বোঝাই যাচ্ছিল অনেক মজা পেয়েছে ও। আর ও বুঝতেও পারেনি কেন আমরা অমন ঘাবড়ে গেছিলাম।

আমাদের গাড়ী থামার জায়গাটার ধারে ধারে ইউফরবিয়া ঝোপ। সচরাচর কোন প্রাণী এর মধ্যে দিয়ে ভেঙেচুরে আসবে না, কারণ এসব গাছের একটা সাদা আঠা আছে যা গায়ে লাগলে জ্বালা ধরায়। এর সামান্য একটু ছিটে যদি কোনভাবে চোখে লাগে দারুণ জ্বালা করে আর বেশ কয়েকদিন তা থাকে। এজন্যেই হাতী ছাড়া অন্য জন্তুরা ছেড়ে রেখেছিল এ জায়গাটা। হাতীরা অবশ্য এই গাছের রসাল পল্লব খেতে ভালবাসে। এক রাতের খাওয়ার পরেই ওরা ঝোপে বড় বড় ফাঁক করে রেখে যায়।

একবার এল্‌সাকে খাওয়াচ্ছি ওর ঘেরা জায়গাটায়—গাছপালার খস্‌খসানি কানে এল। এল্‌সার কাঠের ঘরের পেছনদিকটায় যে ঝোপের বেড়া আছে, শব্দটা আসছে সেদিক থেকে! নিশ্চিত বুঝলাম, গোটাপাঁচেক দৈত্য শুঁড় তুলে ঝোপের ডালপালা বেশ কচ্‌মচিয়ে চিবুচ্ছে। ওদের আর আমাদের মধ্যে একমাত্র যে ব্যবধান ঝোপঝাড়ের, তাই দিয়েই ওদের জালার মত পেটগুলো ভরিয়ে চলেছে। সত্যি-সত্যি, যে সময়ের কথা লিখছি, তখন হাতীগুলোর নজরে পড়ে ঝোপগুলোর করুণ অবস্থা।

এল্‌সার জীবনের উত্তেজনা বেড়ে গেল আরও। একটা গণ্ডার ঘাঁটি গাড়ল আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি। সন্ধ্যেবেলায় একদিন বেড়িয়ে ফিরছি, হঠাৎ এল্‌সা আমাদের লোকজনের কোয়ার্টারের পেছনদিকে গেল। তারপর প্রচণ্ড এক হুটোপাটি। কী ব্যাপার দেখতে গিয়ে দেখি সে এক দৃশ্য! এল্‌সা আর একটা গণ্ডার মুখোমুখি। কয়েক মুহূর্ত গেল কী হবে কী হবে করে। তারপরে ঘোঁৎঘোঁৎ করে গণ্ডারটা হঠাৎ পিছু ফিরে দিল দৌড়—এল্‌সা ধাওয়া করল পিছু পিছু।

পরের সন্ধ্যায় এল্‌সাকে নিয়ে বেড়াচ্ছি, সঙ্গে আছে নুরু। ফিরতে খুব দেরী হয়েছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ নুরু আমার কাঁধ ধরে আমাকে থমকে দিল। সামনেই একটা ঝোপের আড়ালে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই গণ্ডারটা। লক্ষ্য করিনি আমি, সোজাসুজি গিয়ে গণ্ডারটার ঘাড়ে পড়তাম। লাফিয়ে পেছোলাম, তারপর দৌড় দিলাম। কী ভাগ্যিস্ এল্‌সা

দেখতে পায়নি গণ্ডারটাকে! ও ভাবল আমার দৌড়টা খেলার ছলে। কাজেই এল্‌সাও পিছু নিল আমার। গণ্ডার কখন যে কী করবে বলা যায় না। তাড়া করে যা সামনে পাবে আক্রমণ করে বসবে। তা যদি লরী হয় কি রেলগাড়ী হয়, কুছ পরোয়া নেই ওদের। কাজেই কী হত বলা যায় না যদি গণ্ডারটার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়তাম।

পরের দিন অবশ্য মজাটা লুটলো এল্‌সা। গণ্ডারটাকে উপত্যকা পার করে প্রায় মাইল-দুই তাড়া করে নিয়ে গেল। ওর পিছু পিছু অনুগত বন্ধুর মত নুরু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল। অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয় সুখের হয়নি গণ্ডার মহাশয়ের কাছে। তাই আরও নির্জন কোন জায়গায় ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে গেল সে।

এবার এল্‌সার রোজকার একটা ছক করে ফেলেছি আমরা। সকালগুলো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। সে সময়ে আমরা চাঁদমারীর মাঠটায় দেখতাম ইম্পালা হরিণের চোখ জুড়ানো লাফঝাঁপ আর কানে আসত সবে জাগা পাখীদের মিষ্টি কাকলী-কূজন। আলো ফুটলেই নুরু ছেড়ে দিত এলসাকে, জঙ্গলের মধ্যে দুজনে বেড়িয়ে আসত কিছুটা। এল্‌সার সে সময়ে ভরভরন্ত উৎসাহ। যা সামনে দেখত ধাওয়া করত, এমনকি নিজের লেজটাকেও বাদ দিত না।

তারপর রোদ চড়ত। এল্‌সা আর নুরু বসত কোন গাছের ছায়ায়। এল্‌সা ঝিমোত। নুরু কখনো বা কোরান পড়ত, কখনো বা চায়ে চুমুক দিত। একটা রাইফেল থাকত নুরুর কাছে। বন্য জন্তুদের হামলা রোখার জন্যে। ওকে বলা ছিল গুলি ছোঁড়ার আগে যেন চেঁচিয়ে জানায়। নুরু অক্ষরে অক্ষরে পালন করত এই নির্দেশ। খুব ভালবাসত সে এল্‌সাকে আর সব সময়ে দেখত এল্‌সার যেন কোন কষ্ট না হয়।

চায়ের আসর বসার সময় ফিরত ওরা। তখন এল্‌সার ভার নিতাম আমরা। প্রথমে একটু দুধ খেত এল্‌সা। তারপর ওকে নিয়ে পাহাড়ে ঘুরতাম কি সমতলে বেড়াতাম। ও গাছে উঠত, থাবার নখ শানাত বলে মনে হত, কোন মনমাতানো গন্ধ পেলে—কিংবা গ্র্যান্টের গেজেল কি জেরেনাক দেখলেই চুপিসাড়ে পিছু নিত। কখনো এই জাতের হরিণগুলো লুকোচুরি খেলত ওর সঙ্গে। আমরা অবাক হতাম, কচ্ছপগুলো নিয়ে মজা করা দেখে। ও খালি থাবা দিয়ে ওদের গড়িয়ে দিত। খেলতে খুব ভালবাসত ও। আমাদের সঙ্গে খেলার কোন তাল পেলেই ছাড়ত না। আমরাই ছিলাম ওর 'প্রাইড'-এর সঙ্গী-সাথী। সব কাজ কর্মে আমাদের সঙ্গে লাগত।

আঁধার হলেই বাড়ী ফিরতাম। ওর ঘেরা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত ওকে। সেখানে থাকত ওর রাতের খাবার। ভেড়া আর ছাগলের কাঁচা মাংস —প্রচুর। পাঁজরার হাড় আর নরম হাড় ভেঙে গরাস করত নিজে, তারপর

চিবিয়ে চিবিয়ে খেত। ওর জন্যে মোটা হাড় ধরে থাকতাম, দেখতাম ওর কপালের পেশীগুলো বেশ জোরের ওপর নড়াচড়া করছে। সব সময়েই হাড়ের মজ্জা আমাকে আঁচড়ে বার করে দিতে হত। আমার আঙুল থেকে লোভীর মত চেটে খেত ও, আর ওর ভারী শরীরটা একেবারে আমার হাতের ওপর ভর দিয়ে রাখত।

যখন এইসব ব্যাপার চলত প্যাটি বসে থাকত জানলার ওপর উঠে। এই ভেবে ও চুপ থাকত যে ওর আদর কাড়বার পালা আসবে এর পরেই। তখন সারারাত ও আমার গলায় বেড় দিয়ে থাকবে—তখনকার পুরোপুরি সোহাগটা ওর পাওনা।

কখনো বসতাম, খেলতাম এল্সার সঙ্গে। কিংবা ছবি আঁকতাম ওর। এই সন্ধ্যাগুলো আমাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। আমার মনে হয়, এই সময়টাতেই আমাদের ওপর ওর টান শক্ত হত দিনের পর দিন। ভরপেট খেয়ে আমেজের ঘোরে মুখের মধ্যে আমার হাতের বুড়ো আঙুল নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত এল্সা। শুধু চাঁদনী রাতে চপলা হত এল্সা। তখন ও তারের বেড়া বরাবর ঘুরত, কান খাড়া করে থাকত, যে কোন হালকা গন্ধের লোভে নাকে কাঁপন জাগত ওর—হয়ত ও থাকত কোন শব্দ কি কোন গন্ধের অপেক্ষায়, যা ওর কাছে বাইরের রহস্যময় অরণ্যযামিনীর কোন বার্তা পৌঁছে দেবে। ঘাবড়ে গেলে ওর থাবা ভিজে যেত, মনের অবস্থা বুঝতাম ওর থাবা হাতের মধ্যে নিয়ে।

সাগর বেলায়

এক বছর বয়েস এল্সার এখন। ওর দাঁত বদলেছে। আমাকে ওর একটা দুধে-কুকুর দাঁত নাড়িয়ে তুলে ফেলতে দিয়েছে। তখন ওর মাথাটা চুপচাপ রেখে হাঁ করেছিল, যাতে দাঁতটা তুলতে আমার কোন অসুবিধে না হয়। মাংস খাবার সময় ও কশের দাঁত দিয়ে ছিঁড়ত, সামনের ধারালো দাঁত কাজে লাগাত না। ভারী ছোট ছোট কাঁটা ভর্তি খরখরে জিভটা ও কাজে লাগাত হাড় থেকে মাংস চেঁছেপুঁছে নেওয়ার জন্যে। ওর লালা ঘন আর নোন্তা।

প্যাটি বুড়ী হয়ে যাচ্ছে, ওকে যতটা পারি ঠাণ্ডা রাখি।

এদেশে কাটাবার জন্যে ছুটি পাওনা হয়েছে আমাদের। ঠিক করা হল, উপকূলের সীমান্তের কাছে ছোট্ট জেলেদের গাঁ বর্জুনে যাওয়া হবে। ওখান থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি শ্বেতাঙ্গ বসতি লামু হল নব্বই মাইল দূরে। এল্সার পক্ষে জুত মতো জায়গা হবে। সমুদ্রতীরে ক্যাম্প ফেলব আমরা।

লোকজনের ভিড় নেই। মাইলের পর মাইল চারদিকে শুধু বালুকাবেলা। পেছন দিকে ঝোপালো পশ্চাৎভূমি—ছায়া দেবে আমাদের।

তুই বন্ধু জুটল আমাদের। ডন—তরুণ জেলা অফিসার আর হার্বার্ট—আমাদের অতিথি এক অষ্ট্রিয় লেখক।

সুদীর্ঘ যাত্রা! রাস্তা একেবারে খারাপ। তিন তিনটে দিন লাগল।

সবার আগে আমার ট্রাকে এল্‌সাকে নিয়ে আমি—সচরাচর যেমন যাই। পেছনে আর সবাইকে নিয়ে প্যাটির সঙ্গে তুটো ল্যাণ্ডরোভারে জর্জ। যেসব জায়গা দিয়ে চললাম, শুকনো, বালিভর্তি আর গরম।

একদিন রাস্তাটা দেখা গেল উটের খুরের দাগে দাগে ভরে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে যখন রাস্তা হারালাম, তেল ফুরলো। পিছু পিছু জর্জ এসে পড়ছে আশা করে দেরী করছি: ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেই চলেছে। এমন সময়ে জর্জের গাড়ীর আলো চোখে পড়ল। এসে ও বলল আরো কয়েক মাইল পিছিয়ে আমাদের ক্যাম্প করতে হয়েছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, একটা বিপত্তি ঘটেছে। সর্দি-গর্মি লাগা অবস্থায় প্যাটিকে রেখে এসেছে জর্জ ক্যাম্পে।

কিছুটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে এসেছে বটে, কিন্তু ওর বাঁচার আশা নেই।

ক্যাম্পে পৌছেই দৌড়ে এসে দেখি, প্যাটি তখন অচৈতন্য—জীবনমৃত্যুর মাঝামাঝি। ওর বুকের ধুক্‌ধুকুনি এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে যে তার কষ্ট বোধ হয় বেশিক্ষণ সইতে পারবে না ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা। একটু একটু আধাচেতন হল ও. চিনল আমাকে। দাঁত কিড়মিড় করাব তুর্বল প্রচেষ্টা দেখলাম ওর। বরাবরই এমন করে সোহাগ জানায় ও। এই শেষ সোহাগ কাড়ানো ওর। পরে শান্ত হল ও, বুকের ধুক্‌ধুকুনি ধীর হয়ে এল। ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ শেষবারের মত ওর ছোট্ট দেহটা খিঁচিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। শক্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

প্যাটি আর নেই! চলে গেল ও চিরদিনের মত আমাদের মায়া কাটিয়ে—। ওর ছোট্ট দেহটা আঁকড়ে ধরলাম। মরে গেছে—তবুও ওর শরীরের গরম জুড়োতে না জানি কতক্ষণ লাগল।

মনে পড়ল কত না সুখের সেই সব মুহূর্তগুলোর কথা! গত সাত বছর থেকেছে প্যাটি আমাদের সঙ্গে—সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত না তৃপ্তি দিয়েছে ও আমাদের। কতগুলো সফারীতে ও ছিল আমাদের সাথী। লেক রুডল্‌ফে—সেই প্রচণ্ড গরমে কত না কষ্ট হয়েছিল ওর! উপকূলে একটা আরব নৌকো ধাও-এর মধ্যে আটকানো অবস্থায় কেনিয়া পাহাড়ে—সেখানকার ঝোপঝাড় কত ভাল লেগেছিল ওর; সুগুতা উপত্যকা আর

নাঈরো পাহাড়ে—খাড়াই পথ দিয়ে খচ্চরের পিঠে চড়ে যখন যাচ্ছি, ও কেমন বুদ্ধি করে আঁকড়ে ধরেছিল। সারা কেনিয়া দেশে যেখানে যেখানে ক্যাম্প করেছি, ও ছিল সঙ্গে সঙ্গে—তখন ছবি এঁকেছি আফ্রিকার উপজাতীয়দের। কখনো কখনো মাসের পর মাস ও ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী।

ঝোপঝাড়ের ছোট ছোট প্রাণী—কাঠবিড়ালী, বেজী আমাদের গেরস্থালীতে যারা যাতায়াত করত, কত সহ্য করেছে তাদের। তারপর সিংহশিশুদের কেমন মানিয়ে নিয়েছিল। খাবার সময়ে বসে থাকত আমার থালার পাশে, টুকরো-টাকরা খেত আমার হাত থেকে খুঁটে খুঁটে।

ও যেন আমারই একটা অঙ্গ হয়ে গেছিল।

ওকে একটুকরো কাপড়ে জড়ালাম, ওর গলার ফেট্টি বাঁধলাম তাতে তারপরে ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে গেলাম। কবর খুঁড়লাম একটা।

রাতটা গরম। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া সমতলের ওপরে গাছের ছায়াগুলো চাঁদের আলোতে নরম হয়ে এসেছে। চারদিক নিথর, কত না শান্তি!

পরের সকালে এগিয়ে চললাম আমরা। রাস্তাটা এত খারাপ যে সেদিকেই মন পড়ল আমার—ভালোই হল, হতভাগী প্যাটির কথা ভুলে থাকতে পারলাম।

বিকেল গড়িয়ে গেলে আমরা পৌঁছলাম উপকূলে। জেলেরা অভ্যর্থনা জানাল। বলল, একটা সিংহ তাদের বড় উত্ত্যক্ত করছে; বেশির ভাগ সময়েই রাতে ওদের ছাগলের পালে হানা দিচ্ছে। ওদের আশা, জর্জ নিশ্চয়ই মারতে পারবে এই উৎপাতটাকে।

ঠিকমত ক্যাম্প করার সময় নেই। খোলা জায়গাতেই বিছানা পাতলাম আমরা। চারজন ইউরোপীয়, ছজন আফ্রিকাবাসীর মধ্যে আমিই একমাত্র মহিলা। কাজেই আমার খাটিয়া পাতা হল কিছুটা তফাতে। এল্‌সাকে ঠিক আমার পাশেই ট্রাকের মধ্যে রাখা হল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি, জেগে রইলাম একা আমি। এমনি জাগি, শুনতে চাই কোন্ অব্যক্ত বাণী এই অরণ্য প্রান্তরের নৈশ বিহারের নিঃশ্বাসে ধ্বনিত হয়।

হঠাৎ কানে এল কিছু একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গেই টর্চ জ্বাললাম। আলোটা পড়ল একটা সিংহের গায়ে, আমার খাটিয়া থেকে মাত্র কয়েক গজ তফাতে। সেদিন বিকেলে আমরা যে হরিণটা মেরেছিলাম, তার চামড়া সিংহটার মুখে।

পলকের জন্যে সন্দেহ হল আমার, বোধহয় এল্‌সা। কিন্তু চকিতে গাড়ীটার পেছনদিকে নজর ফেলে দেখলাম বহাল তবিয়তে সেখানে রয়েছে এল্‌সা।

আবার চাইলাম সিংহটার দিকে, তখনো একদৃষ্টে দেখছে আমাকে। এবার গর্‌গরিয়ে উঠল।

আস্তে আস্তে জর্জের খাটিয়ার দিকে চললাম। বোকার মত পিছু ফিরেছি সিংহটার সামনে থেকে। মাত্র কয়েক পা'র ব্যবধান। পিছু ফিরেই মনে হল সিংহটা আসছে। আবার ফিরেই টর্চ জ্বাললাম। তখন সিংহটা মাত্র গজ-আটেক দূরে। কাজেই পিছু হটে হটে যেদিকে ক্যাম্প খাটে খাটে আর সবায়ের নাক ডাকছে সেদিকে চললাম। শুধু জর্জেরই ঘুম ভেঙেছে তখন। যেই বললাম ওকে একটা সিংহ আসছে আমার পিছু পিছু, কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল,—দূর! ও হয়তো কোন হায়না বা নেকড়ে।

তবুও কিন্তু ওর ভারী রাইফেলটা তুলে যেদিকে দেখলাম সেদিকেই গেল ও। গিয়েই নির্ঘাৎ দুটো চোখ দেখেছে জ্বলন্ত ভাঁটার মত আর শুনেছে গর্‌গরানি। ওর কোন সন্দেহ রইল না, যে সিংহটার উৎপাতের অভিযোগ এসেছে, এই সেই মহাপ্রভু। কাজেই গাড়ির সামনাসামনি গজ ত্রিশ দূরে গাছের ডালে এক মস্ত মাংসের টুকরো ঝোলাল জর্জ। গাড়ীতেই বসে দেরী করতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ীগুলোর পেছনদিক থেকে বাসনকোসন নাড়াচাড়ার আওয়াজ শোনা গেল। ওখানেই আমাদের রাতের খাবার রান্না হয়েছিল।

গুঁড়ি মেরে ঘুরে গেল জর্জ। রাইফেল সোজা করে নিয়ে টর্চ জ্বালল। দেখল, সিংহটা বাসনপত্রের মধ্যে বসে আমাদের এঁটোকাঁটা সাবাড় করছে। ট্রিগার টানল জর্জ। শুধু আওয়াজ হল – ক্লিক! আবার টানল, একই ব্যাপার ঘটল। গুলি ভরতেই ভুলে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সরে গেল সিংহটা আস্তে আস্তে। লজ্জা পেল জর্জ। আবার ফিরে গেল গাড়ীতে।

অনেক পরে জর্জের কানে এল গাছে বাঁধা মাংসের টুকরোটা টানাটানি শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর আলো জ্বালতেই সিংহটার চেহারা ফুটে উঠল চমৎকারভাবে। জর্জ গুলি করল একেবারে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে।

উপকূল এলাকার মার্কামারা কেশরহীন তাজা জোয়ান সিংহ।

আলো ফুটলেই খাবার দাগগুলো খুঁটিয়ে দেখা হল। বোঝা গেল, প্রথমে হরিণের চামড়াটা টেনে নিয়ে গেছে আমার বিছানা থেকে কুড়ি গজের মধ্যে —ওখানেই ভোজ সেরেছে। ভরপেট হবার পরে আয়েসী চক্কর দিয়েছে একটা ক্যাম্পের চারপাশে। এই নাটকীয় দৃশ্যের উৎসুক অথচ নীরব দর্শক ছিল এল্‌সা। কিন্তু টু-শব্দটি অবধি করেনি। অবাক কাণ্ড!

রোদ উঠল। সমস্ত ক্যাম্পটাকে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে হল সাগরের ধারে যাতে এল্‌সার সঙ্গে ভারত মহাসাগরের পরিচয় ঘটে।

ভাঁটা পড়ছে। ঢেউ-এর গর্জন আর বেগ কখনো দেখেনি এল্‌সা। কাজেই

ঘাবড়ে গেল। তারপর সন্তর্পণে জলে নাক ছোঁয়াতে গিয়ে হাঁচল, ঢেউ-এর ফেনায় কামড় দিতে গেল। শেষ অবধি জল খাবার জন্যে মাথা নামাল। কিন্তু একমুখ জল নিয়ে যখন নোনা ঠেকল, মুখ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করে ছিটিয়ে ফেলল।

যাই হোক, পরে যখন দেখল দলের আর সবাই সমুদ্র-স্নানে ফূর্তি পাচ্ছে, বিশ্বাস এল ওর, তখন যোগ দিল আমাদের সঙ্গে মহোল্লাসে। অল্পক্ষণের মধ্যে জল-মাতাল হয়ে পড়ল। এ অবধি বৃষ্টির জমা জল, অল্প জলের নদী ওকে চাগিয়ে তুলেছে। এবার ভারত মহাসাগর ওর কাছে এনে দিল স্বর্গসুখের তৃপ্তি। ডুব জল ছাড়িয়ে অনেক দূর অবধি অনায়াসে সাঁতার দিত ও। আমাদের চুবিয়ে দিত, লেজ দিয়ে জল ছিটিয়ে দিত। যতক্ষণ না বুঝত আমাদের সবাই ঢোঁক ঢোঁক লোনা জল খেয়ে ফেলেছি ততক্ষণ অবধি ওর দৌরাত্ম্য থেকে আমাদের রেহাই ছিল না।

সব জায়গাতেই আমাদের পিছু পিছু যেত। কাজেই আর সকলে মাছ ধরতে গেলে ওকে নিয়ে থেকে যেতাম আমি একলা। নইলে মাছ ধরার নৌকোর পেছনে সাঁতরে যেতে চাইত। কেনিয়া উপকূল বরাবর মাছ ধরার সব থেকে ভালো জায়গা এটা। সাঁতারের পরকোলা পরে হার্পুন নিয়ে আমরা ডুব দিয়ে যেতাম এক মনোরম জগতে। মহাসাগরের মধ্যে প্রবাল স্তূপ হয়ে আছে কোথাও প্যাগোডার মত, কোথাও দৈত্যের মস্তিষ্কের মত --কোথাও বা ব্যাঙের ছাতার মত মাথা ছড়িয়ে, তার ওপর ময়ূরপংখী রঙের গোলাপফুল তোলা আর পান্নারঙের ভাঁজে দাগানো। ঝক্‌মকে রঙের সামুদ্রিক আগাছার পর্দা স্রোতের নিশানা দেখাচ্ছে, তাতে ছোট্ট মাছের ঝাঁক লুকিয়ে।

সাঁতার দিতাম আমরা গভীর উপত্যকা দিয়ে, মাঝে মাঝে তা শেষ হয়েছে হয়ত কোন গুহায়। আলো-আঁধারী সুড়ঙ্গে উঁকি দিতাম। তার মাঝ থেকে দেখা দিত মাছের ঝাঁক—আমাদের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হতবুদ্ধি হয়ে দেখত। অবাক হওয়াই স্বাভাবিক ওদের পক্ষে, কেন না জলের নীচে সবকিছু দুগুণো দেখায়, তার ওপর ডুব সাঁতারের ঐ বিদঘুটে পোশাক।

মাছ দেখতাম, সাঁতার কাটার সময়ে যাদের মনে হত লাল ডোরাকাটা সজারু আবার ওরাই যখন কোন প্রবালস্তরের কাছে ঘুরত যেন কাঁটাগুলো বদলে হয়ে যেত পালক-পাখা—প্রজাপতির মত।

কতকগুলো যেন নীল ফুটকি দেওয়া সোনালী বাক্স, চোখের ওপরেই গরুর মত শিং! কতক আবার ঘন নীল যেন আফ্রিকার ম্যাপের চওড়া দিকের ওপর আঁকা নীল সমুদ্রের রঙে ছোপানো। কাউকে আবার রঙচঙে দাবা-বোড়ের মত দেখতে। কেউ বা জেব্রার মত রঙের। কারো বা মুখোশ আছে,

আবার লম্বা পাখনা পেছনে ঝুলিয়ে যেন চলেছে ওড়না মেলে। কতকগুলো বেলুনের মত শরীর ফুলিয়ে সজারুর মত গায়ের কাঁটা শক্ত করে আছে আক্রমণ আটকাবার জন্যে। ভয়ে কেউ কেউ আবার পিঠের পাখনার পেছনে ইঞ্চিটাক লম্বা ছুরির মত বার করে আছে। নড়ে সরে যাওয়া বালির মাঝে লুকিয়ে রয়েছে কেউ শুয়ে, দৈত্যের পায়ের তলার মত সাগরের মেঝের ওপর। আঠালো মাছেরা রয়েছে গাঢাকা দিয়ে, সাগরতলের ঠিক ওপরেই ওদের ভয়ংকর হাঁ-গুলো। সাংঘাতিক বিষাক্ত পাথরমাছ, টুকটুকে লাল ধারিতে যাদের বিষের থলি ঢাকা রয়েছে। প্রবাল পাথরের গায়ে একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে, শুধু দেখা যাচ্ছে ওদের হল্‌দেটে চোখ - প্রতিটি মাছের আসা যাওয়া লক্ষ্য করছে। ক্রে-মাছ তীক্ষ্ণ বড়শির মত, যার সারা গায়ে বর্ম। দেখতে ভয় লাগে খুবই কিন্তু ওদের হার্পুন গাঁথা ভারী সোজা। পাথরের মধ্যে কিছুটা লুকিয়ে থেকে বোকার মত দেরী করবে ওরা—তারপরেই দু-চোখের মাঝে মাঝে এসে বিঁধবে হার্পুন। ওদের সরু লম্বা দাড়া হুঁশিয়ারী দেবার জন্যে ভেসে থাকে, কিন্তু হুঁশিয়ার করে না সচরাচর। সাগরের আানিমনি, আমাদের কাছে সুন্দর ফুলের রাশ মনে হয়, কিন্তু ছোট ছোট প্রাণীব পক্ষে মারাত্মক। ওদের সব সময়ে নড়ে চড়ে বেড়ানো ডগার মধ্যে দিয়ে সাঁতরে যাচ্ছে মাছগুলো। আমাদের সৌভাগ্য, বিষের রশ্মিগুলো আমাদের থেকে অনেক জোর আর বালির মধ্যে লুকোনো ওদের নীল ফোঁটা দেওয়া-আকৃতিগুলো আমরা দেখে ফেলার অনেক আগে বেরিয়ে পড়ছিল।

যখন ঝল্‌মলে রামধনু আলোর এই যক্ষরাজ্যে চোখ জুড়িয়ে আমরা পিছলে বেড়াচ্ছি তখন এল্‌সা কারো সঙ্গে ক্যাম্পের কাছে কোন গরাণ গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছে। সে পথ দিয়ে যাতায়াত করে যে জেলেরা তারা অনেক পথ ঘুরে যেত এল্‌সার কথা জেনে। তারপর কোমরের টুকরো কাপড়টা ভালো করে এঁটে ঝাঁপিয়ে পড়ত মহাসাগরে। যেন জলে নেমেই রেহাই পাবে। কিন্তু যদি ওরা জানত এল্‌সা জলে স্থলে কোথাও কম যায় না, অত নিশ্চিন্ত হতে পারত না কখনোই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সাগরবেলায় বেড়াতে ও ভালবাসত। ঢেউএর সঙ্গে যে সব নারকেল নাচতে নাচতে ভেসে আসত, সেগুলো ধাওয়া করত আর জলের ছিটে লেগে ভিজত কিংবা ডুবে যেত ঢেউ-এ। কখনো কখনো নারকেলে দড়ি বেঁধে আমাদের মাথার ওপরে ঘোরাতাম, আর এল্‌সাও যেন তার পিছু পিছু উড়ত। অল্পদিনেই ও আবিষ্কার করল বালি খোঁড়া খুব কাঁজের। যত খুঁড়বে, যত যত গভীর হবে ততই ঠাণ্ডা—তাতে গড়াগড়ি দেওয়া আরামের। কখনো সাগরের আগাছার লম্বা দাম টেনে নিজে জড়াত তার মধ্যে তখন ওকে এক

উৎকট চেহারার সামুদ্রিক জীব মনে হত। কাঁকড়া নিয়েই হত ওর সবচেয়ে বেশি মজা।

সূর্য ডুবু-ডুবু হলেই সাগরতীর ভরে যেত এই ছোট্ট ছোট্ট লাল জীবে। কোনাচে ভাবে ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে যেত সাগরের জলের দিকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঢেউ-এর ধাক্কায় এসে যেত তীরে। শেষ অবধি অবশ্য ওদের অসীম ধৈর্যের জয় হত। সাগরের জলে গিয়ে ওদের কাছে উপাদেয় কোন আগাছার টুকরো দাড়ায় ধরে নিয়ে আসত আর পরের ঢেউ ওদের ধুয়ে নিয়ে যাবার আগেই সেটি সমেত গর্তে টুপ্ করে সেধিয়ে যেত। ওদের উদ্যমের যেন শেষ নেই। কতবার অবিরত ঢেউ-এর ধাক্কায় আছড়ে পড়ে পড়ে তবে কোনমতে একবার ওদের খাবার যোগাড় হত। এই ব্যস্ত জীবগুলোর কাজ এল্‌সা শুধু বাড়িয়ে তুলল। একটার পর আর একটা ধাওয়া করে বেড়াত, নাকে খেত দাড়ার কামড়। তাতেও ঘাবাড়ত না ও, আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ফের নাকে চিমটি খেত ওদের কাছে। কাঁকড়াদের বাহাদুরি আছে। হাতী, মোষ, গণ্ডার সমেত অন্য যারা সবাই ছিল এল্‌সার প্রতিপক্ষ কেউই এঁটে উঠতে পারে না ওর সঙ্গে, শুধু এই জীবগুলোর কাছে জব্দ হত এল্‌সা। ওরা গর্তের সামনে একটা দাড়া উচিয়ে দেরী করত। এল্‌সা যতই ধূর্তোমি করে ওদের ওপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করুক না কেন ওদের ত্বরিৎ গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না, ঠিক কাঁকড়ার দাড়া ওর নরম নাকটা খামচে ধরত।

এল্‌সার খোরাক যোগানো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। এখানকার জেলেরা মওকা পেয়ে গেছে। দিনে দিনে ছাগলের দাম বেড়ে চলেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এল্‌সার কল্যাণে এ অবধি যেমন বাবুয়ানা কখনো করতে পায়নি গ্রামবাসীরা, তেমনটা করেছে। শেষ অবধি, এল্‌সাই বুঝি এর বদলা নিল।

যারা রাখাল তারা কখনোই পাহারা দিত না পশুগুলো চরে খুঁটে বেড়াবার সময়। সারা দিন ছাগল ভেড়ার পাল ঝোপঝাড় জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকত। চিতা বা সিংহের ভারী সহজ শিকার। এক সন্ধ্যায় আমরা বেরিয়েছি সমুদ্রতটে। তখন নৌকা ভিড়িয়ে তুলে রাখার সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ এল্‌সা একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কানে এল ছাগলের জোর আর্তনাদ আর তারপরেই সব চুপচাপ।

নিশ্চয় এল্‌সা ছিট্‌কে পড়া একা কোন ছাগলের গন্ধ পেয়ে থাকবে। তারপর গিয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়ে নিজের শরীরের চাপে তাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু এ অবধি নিজে কাউকে না মেরে এর পরে কী করতে হয় জানতে না

পেরে, আমাদের ওর কাছে পৌঁছনোর অপেক্ষায় আছে। এল্‌সা যখন ছাগলটার ওপর চেপে দাঁড়িয়ে আছে, জর্জ তাড়াতাড়ি ছাগলটাকেই গুলি করল আবার। ছাগলটার মালিক কোন নালিশ জানায়নি। কেন না এমনটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে কোন সিংহ পালের একটা ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমরাও চেপে গেলাম। নইলে আমাদের ক্যাম্পের উত্তর দক্ষিণে যত ছাগল ভেড়া চরে বেড়াত তাদের মধ্যে একটা না একটা রুগ্ন বা মরো-মরো অবস্থায় রোজ ছেড়ে যাওয়া হবে, যাতে করে খেসারত দাবী করা যায়। এই বলে আমাদের বিবেকের তাড়না থামালাম যে জর্জ এই জেলাকে একটা সিংহের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এ ছাড়াও এ পর্যন্ত যে বেশি দর দিতে হয়েছে আমাদের ছাগলের জন্যে তাও মনে পড়ল।

আমাদের ছুটি শেষ হয়ে যাবার মুখে জর্জের ম্যালেরিয়া হল। মাছ ধরতে যাবার এত নেশা জর্জের, যে চড়া মাত্রায় মেপাক্রিন খেল ও যাতে তাড়াতাড়ি জ্বর ছাড়ে। আর যতটা শুয়ে থাকার দরকার ছিল, তা না থেকে মাছ ধরতে গেল সাত তাড়াতাড়ি।

বেড়িয়ে সাগরতট থেকে এক সন্ধ্যেয় এল্‌সাকে নিয়ে ফিরছি, ক্যাম্পের কাছে এসে আমার কানে এল জোর চিৎকার আর আর্তনাদ। ভয় হল। এল্‌সাকে ট্রাকে তুলে রেখে তাঁবুতে গেলাম তাড়াতাড়ি। দেখি জর্জ একটা চেয়ারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ভয়ংকর গোঙানী, চিৎকার করে পিস্তল চাইছে, আমাকে ডাকছে, শাপান্ত করছে এল্‌সাকে, গুলি করে আত্মহত্যা করতে চাইছে।

ওর সেই আধাচেতন অবস্থায় চিনল আমাকে, লৌহদৃঢ় মুষ্টিতে আমায় ধরল আর বলল, যখন আমি এসে গেছি, ও মরে শান্তি পেতে পারে। ভারী ভয় পেলাম। লোকজনও ভয় পেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে গেছে। অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের বন্ধু হাতে একটা লাঠি নিয়ে। বলল, যদি জর্জকে সামলানো না যায়, লাঠি দিয়ে ওকে শুইয়ে ফেলতে হবে।

ফিস্‌ফিসিয়ে জানাল সবাই, একেবারে আচমকা জর্জ এলোমেলো ভাবে অঙ্গভঙ্গী করতে শুরু করে। তারপরে তীব্র চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আত্মহত্যা করার জন্যে পিস্তল চাইতে থাকে। সৌভাগ্যের কথা, ওর এই অবস্থা হবার অল্পক্ষণের মধ্যে আমি ফিরে এসেছি। এখন সব থেকে প্রথম কাজ হল ওকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে শান্ত করা। ওকে যখন আমরা ধরে নিয়ে যাচ্ছি বিছানায়, ওর শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, হাত-পা মড়ার মতই শক্ত শক্ত।

ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। তবুও খুব শান্ত কণ্ঠে ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু

করলাম। বললাম, সাগরবেলায় কেমন বেরিয়েছি, রাতে কী মাছ আছে আমাদের খাওয়ার, কেমন একটা ঝিনুকের খোলা দেখেছি। সব শেষে ওর এই অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যে ঠাট্টা করলাম। কিন্তু সব সময়েই ভয়ে আমি কুঁকড়ে ছিলাম, কোন অঘটন না ঘটে যায়। শিশুর মত আমার ভোলাবার চেষ্টায় জর্জ সাড়া দিল, ঠাণ্ডা হল। কিন্তু ওর রগদুটো পাঁশুটে হয়ে গেছে। নাকের গর্ত দুটোর যেন কোন স্পন্দন নেই, চোখ দুটো বন্ধ। ফিস্‌ফিস্ করে আমায় বলল পায়ের দিক থেকে কোন শীতল প্রবাহ ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে উঠছে। হাত দুটো অসাড় ঠাণ্ডা। যখন ঐ শীতল প্রবাহ ওর হৃৎপিণ্ডে পৌঁছবে, ও মারা যাবে। হঠাৎ এমন আতংক পেয়ে বসল জর্জকে, ও মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরল আমায়, যেন জীবনের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। ওর শুকনো ঠোঁটে কয়েক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি ঢাললাম, গায়ে মৃদু চাপড় দিলাম ঘুম পাড়াবার মত। অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন কথা বলে ওকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করলাম। আরও বললাম, ইসিওলো থেকে সারা পথ বেয়ে ওর জন্মদিনের যে কেক এনেছি তার কথা। আরও বললাম, ও যদি উঠে বসতে পারে তখনি কেকটা খাওয়া হবে।

ওর এমনটা হবার কারণ বুঝেইছিলাম। অত মেপাক্রিন খেয়েই এমন অবস্থা। তার ওপর ওষুধটা ঠিক সময় পায়নি কাজ করার। যতটা জিরোবার দরকার তা না জিরিয়ে মাছ ধরতে গেছে জর্জ। ধকলটা সয়নি শরীরে।
বছর কয়েক আগে জর্জের ঠিক এমনটা হয়েছিল। একই লক্ষণ। কিছু পরে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অনর্গল প্রলাপ বকেছে সারা রাত। ওর মাথার মধ্যে চলছিল এক ঝড়।
সকাল হলে লামু গেলাম ডাক্তার আনতে। তুখোড় ভারতীয় ডাক্তারটি এমন রোগীকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া ছাড়া আর করবেনই বা কী। অবশ্য জর্জকে ভরসা দিয়ে গেলেন মাছ ধরতে যাওয়া বন্ধ করলে চট্‌পট্ সেরে উঠবে।
জর্জ সুস্থ হল। ফিরে এলাম আমরা ইসিওলোয়।
ছুটির দিনগুলো কেমন তাড়াতাড়ি যেন পিছলে যায়। এ কটা দিনও কাটল দেখতে দেখতে। কিন্তু বাড়ী ফিরে দেখলাম মহাসাগরের লোনা হাওয়ায় আমরা কালচে হয়ে গেছি, আর এল্‌সার গায়ের চামড়া হয়েছে ভারী সুন্দর —রেশমের মত ঝলমলে।

ইসিওলো ফেরার অল্প কয়েকদিন পরেই লক্ষ্য করলাম এল্‌সার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, নিশ্চয়ই কোন যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমাদের বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে রয়েছে তখন কাঁটাঝোপ ভর্তি খাড়াই পাথুরে ঢাল আর বেশ কিছুটা দূরত্ব। কিছু পরেই আর হাঁটতে পারল না এল্‌সা। জর্জ ভাবল, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যেই এমনটা হচ্ছে এল্‌সার। কাজেই আমায় বলল, ওখানেই এল্‌সাকে 'এনিমা' দিতে। বাড়ি ফিরে গাড়ি নিয়ে ইসিওলো থেকে তার যোগাড়যন্ত্র করে আনতে হয় তাহলে। জর্জ রইল এল্‌সার কাছে, আমি চললাম ব্যবস্থা করতে।

যখন বন্দোবস্ত সারা হল, অন্ধকার হয়ে গেছে। গরম জল নিয়ে বেশ মেহনত করেই আমায় চড়াই ঠেলতে হচ্ছে। সঙ্গে আছে আরও আলো আর 'এনিমা'; পশুচিকিৎসকের শস্ত্রবিদ্যায় 'এনিমা' দেওয়া এক ব্যাপার, আর কাঁটাঝোপের মধ্যে অন্ধকারে অবিরত আঁচড়ে চলা একটা সিংহীকে 'এনিমা' দেওয়া একেবারে আলাদা।

পাঁইটখানেক তরল পদার্থ এল্‌সার ওপর প্রয়োগ করতে পেরে স্বস্তিই পেলাম। এটুকু যেন কোনমতে সইল এল্‌সা। কোন কাজ হবার পক্ষে পরিমাণটা একেবারে যৎসামান্য। কাজেই ওকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসা ছাড়া অন্য উপায় রইল না।

আবার হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি ফিরতে হল আমায়। স্ট্রেচার করার জন্যে নিলাম একটা ক্যাম্প খাটিয়া, কয়েকটা টর্চ আর বইবার জন্যে জনাছয়েক লোক। তারপর শোভাযাত্রাটা চলল পাহাড়ের দিকে।

যখন পৌঁছলাম, এল্‌সা সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় উঠল। তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে এমন ভাব দেখাল যেন এই অদ্ভুত পরিবহনের কায়দাটা বেশ রসিয়ে উপভোগ করছে ও। সত্যি সত্যি মনে হচ্ছিল, অন্যভাবে কখনোই এ অবধি যাতায়াত করেনি। কিন্তু ওর ভারটা তো আর কম নয়, একশো আশী পাউণ্ড। আরামে শুয়ে শুয়ে যেটুকু মজা ও পাচ্ছিল, যারা বইছিল তাদের তাদের কাছে সেটা প্রাণান্তকর। ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেচারীরা কয়েক মিনিট পরে পরেই উৎরাই এর পথে থামছিল।

খাটিয়া ছেড়ে যাওয়ার একটুও মতলব নেই এল্‌সার। পায়ের দিকে সব থেকে কাছে যে লোকটা ছিল মাঝে মাঝে তাকে খোঁচা দিচ্ছিল—যেন বেশ মজা

হচ্ছিল ওর। হয়ত তাড়া দিচ্ছিল জোরে যাবার জন্যে।

শেষ অবধি যখন বাড়ি পৌঁছনো হল, এল্‌সা ছাড়া আমরা সবাই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। বিছানা থেকে গড়িয়ে নামিয়ে দিতে হল ওকে, কেন না কোন মতলবই ছিল না ওর বিছানা ছাড়ার।

পরে চোখে পড়ল ক্রিমির জন্যেই এই কষ্ট হয়েছে ওর। সমুদ্রোপকূলে থাকার সময়ে কোন ফাঁকে সংক্রমণ হয়ে থাকবে।

এল্‌সা সেরে ওঠার পর বেশিদিন কাটেনি, দু-দুটো মানুষখেকো সিংহের মোকাবিলা করার কাজ পড়ল জর্জের। গত তিন বছর ধরে বোরা উপ-জাতীয়দের ওপর হামলা করছে এ দুটো। অন্তত আঠাশ জনকে মেরেছে বা জখম করেছে। ওদের হানা দেওয়ার অনেক কাহিনীই ভয়াবহ।

এক অন্ধকার রাতে 'বোমা'র মধ্যে ঢুকে পড়ে এই দুটোর একটা এক জোয়ানকে টেনে নিয়ে যায়—তখনো অবধি সে আর্ত চীৎকার করে সাহায্য চেয়েছে। 'বোমা' কথাটার আসল মানে হল সুরক্ষিত এলাকা। এখানে কোন সরকারী ঘাঁটি এই নামে চিহ্নিত করা হয়, আবার কোন এদেশীয় বসতির বেড়া ঘেরা এলাকাও এই নামে পরিচিত। যাই হোক এই জোয়ানটিকে উদ্ধার করার জন্যে কেউ ভরসা করে এগোয়নি। শুধু তেড়ে গিয়েছিল দুটো কুকুর। ডাকতে ডাকতে ওরা এগিয়ে গেছিল। বিরক্ত হয়ে মুখ থেকে শিকার নামিয়ে তাদের ধাওয়া করল সিংহটা। পেছিয়ে এল কুকুর দুটো এবার। তখন সিংহটা আবার গিয়ে শিকার তুলে নিয়ে চলে যায়। জোয়ানটি তখনো চেঁচিয়ে চলেছে—ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল তার আর্তনাদ।

বোরা খুব সাহসী জাত। অল্প যে কয়েকটা এদেশীয় জাত বল্লম দিয়ে সিংহ শিকার করে তাদের অন্যতম। বলা দরকার, শিকারের দুটো আদিম উপায় এখনো কাজে আসে। ছোট্ট ছোট্ট নৌকো করে সেকেলে হার্পুন নিয়ে আজও শিকারে যায় কেউ কেউ। পিগ্‌মীরা নিজেদের খাওয়ার জন্যে হাতী শিকারে বেরোয়। ওদের যে কোন একজন গুঁড়ি মেরে চলে যায় হাতীর পেটের নীচে। তারপর ছুরি মেরে চলে আসে সঙ্গীদের কাছে। তারপরেই আর সবাই যোগ দেয় শিকার অভিযানে।

বোরারা খাবার জন্যে না হলেও বর্শা রক্তে ভেজাবার জন্যে আর তাদের পৌরুষ দেখাবার জন্যে হাতী শিকারও করে। হাতী কোথায় আছে সন্ধান পেলে ওদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা যায়। যুবকদের মধ্যে পাল্লা দেওয়া চলে। প্রত্যেকেই চায় সব থেকে আগে তার বর্শায় রক্ত মাখাতে। যে তা পারে সে পুরস্কার দাবী করে। তরুণীরা কোন তরুণকে পছন্দ করে না, যদি

না কোন ভয়ংকর জন্তু মেরে সে বাহবা পেয়ে থাকে একসময় না একসময়।
বোরারা এমন সাহসী হলেও, এ দুটো মানুষখেকো যেন ওদের আতঙ্কে জড়োসড়ো করে রেখেছে। এর কারণ, একদিক দিয়ে যেমন চাতুরি আর বিক্রম ছিল সিংহ দুটোর, আর এক দিকে যখনই ওদের তাড়া করা হতো শিকার করার জন্যে, ওরা নদীর ধারের ঘন ছোট ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে এমন করে আশ্রয় নিত যে কারো পক্ষে সেখানে তাগ করে বর্শা ছোঁড়া সম্ভব হত না। আতঙ্কের সঙ্গে মিশেছিল কুসংস্কার। বলা হত, হানা দিতে বেরবার আগে সিংহেরা একটা খোলা বালিভর্তি জায়গায় এসে থাবা দিয়ে গর্তের দুটো সার করে। তারপর গাছের পল্লব সামনে রেখে আদিম 'বাউ' খেলে। 'বাউ' খেলার প্রচলন ছিল কোন অজানা অতীত কালে। খেলাটা ড্রাফ্ট্ ধরনের। সারা আফ্রিকায় এই খেলা চলে। এখন সিংহেরা এই 'বাউ' খেলায় যদি লক্ষণ ভালো দেখে তবেই কোন 'বোমা'য় হানা দেবে, নইলে নয়। আর একটা জনশ্রুতি হল, সিংহ দুটো জন দুই গুণিনের প্রেতাত্মা। অনেকদিন আগে বোরা উপজাতির লোকেরা এদের হত্যা করেছিল, এবার সিংহের রূপ নিয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে তারা। এই ধারণাটা এত জোর হয়েছিল যে ওরা এক পসারওয়ালা গুণিনকে খোসামোদ করছিল এই দুই আত্মাকে 'ঝেড়ে' দেবার জন্যে। লোকটা এল বইপত্র, ঘণ্টা, বাতি এইসব নিয়ে—নজরানা নিল ষাটটা ছাগল। কিন্তু কিছুই হল না। সিংহ দুটো ওদের হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছিলো এর আগে জর্জ আর অন্য শিকারীদের ব্যর্থতা। ওদের সময়ের অভাব তখন, বেশিদিন চেষ্টা করতে পারেনি। কিন্তু তাতে কী? ধারণা জেঁকে বসল বোরাদের মনে যে সিংহ দুটো অবধ্য, অজেয়। কেন না ওরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। ওদের শিকার করার চেষ্টা বৃথা।
বর্ষা এসে পড়ছে। তবুও এই আতঙ্কের অবসান ঘটাতে আমরা কোমর বাঁধলাম। তখন ধারণাই করিনি আমরা যে এই কাজে আমাদের চব্বিশটি দিনরাত লেগে যাবে। রওনা হলাম জায়গাটার দিকে। ট্রাকে আমি আর এল্সা; জর্জ আফ্রিকায় ইংল্যাণ্ডেশ্বরের রাজকীয় রাইফেল্স বাহিনীর এক তরুণ অফিসার, আর কয়েকজন বনরক্ষী নিয়ে ল্যাণ্ডরোভার আর তার ট্রেলারে চলল।
আমাদের বরাত ভালো মার্তি ব্যবসাকেন্দ্রের মাইল দুই আগে সুন্দর একটা জায়গা পাওয়া গেল ক্যাম্প করার। চমৎকার কতকগুলো বাবলা গাছের নীচে তাঁবু পড়ল আমাদের। উয়াসো নাঙ্গীরো নদী থেকে আধ মাইলটাকের মধ্যে নদীপ্রান্তিক ঝোপঝাড়ের কাছে। খোলা প্রান্তরে বেশ জুৎসই জায়গাতেই

ঝোপঝাড়টা। কেননা নরখাদকের মোকাবিলার পক্ষে এমন জায়গাই সুবিধের। জঙ্গলে ঘেরা কোন আস্তানার থেকে খোলা জায়গায় ওদের আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

ক্যাম্প করে আমরা মার্তি গেলাম নরখাদকদের শেষ সংবাদ নিতে। জায়গাটায় সোমালিদের গোটা তিনেক দোকান—মাটি আর করোগেটে তৈরী। ওরা জানাল আমাদের, গত তিন মাসে মানুষজনের ওপর নরখাদকদের হামলা হয়নি বটে, তবে ছাগল-ভেড়া-গরুর ওপর ওদের হানা চলছে রীতিমত। মাত্র কয়েক রাত আগে প্রধান দোকানটার পেছনের উঠোনে ঢুকেছে বেড়া ভেঙে আর একটা গাধা নিয়ে গেছে একটা সিংহ। কয়েক সপ্তা ধরেই নদীর ধার থেকে ওদের ডাক শোনা যায় প্রতি রাতে।

সঙ্গে সঙ্গে বোরাদের সর্দার আর মাতব্বরদের ডাকিয়ে বলা হল, নদীর ধারে যাদের বসতি তাদের যেন বলে দেয় সিংহরা কোন কিছু মারলেই জর্জকে খবর দিতে।

উয়াসো নাঙ্গিরো নদী বরাবর পঞ্চাশ মাইল এলাকা এই সিংহ দুটোর রাজত্ব। গোড়া থেকেই মনে হল নরখাদকেরা আমাদের মতলব ধরে ফেলেছে। ওদের অনুকূলে এখানকার ভূপ্রকৃতির আর নদীর তীরের খাটো ঝোপঝাড়—প্রায় দুর্ভেদ্য, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছিল ওরা। ঘুরে ফিরে বেড়ানোর ব্যাপারে ওদের ক্ষমতা অপরিসীম। রাতারাতি মাইল ত্রিশ পথ পাড়ি দেওয়া কিছুই নয় ওদের কাছে। ঠাণ্ডা-টাণ্ডায় এমন যাওয়া আসা করত ওরা। আর আমাদের ওদের পিছু নিতে হত দিনের গরমে—ঘন ঝোপ, কাঁটাগাছ, নজর আড়াল করা পামগাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে হেঁটে। কখনো কোন জলার হাঁটু জল ঠেলে কিংবা ঝোপ ঢাকা লেগুনের অল্প জল ভেঙে।

খেল শুরু করার জন্যে চল্লিশ মাইল গিয়ে তবে একটা জেব্রা মারতে হল জর্জকে। তারপরে সেই মৃতদেহটাকে নিয়ে এসে বাঁধা হল নদীর তীরের খাটো জঙ্গলের মধ্যে—আমাদের ক্যাম্প থেকে মাইলখানেক দূরে। একটা বাবলাগাছের নীচে মাটির ওপরেই রইল সেটা। আর সেই বাবলাগাছের নীচের ডালে মাটি থেকে বারো ফুট ওপরে হল মাচান।

পরের তিন রাত পাহারা রাখল জর্জ আর জন—রাজকীয় রাইফেল বাহিনীর তরুণ অফিসার। নদীর উৎসের দিক থেকে সিংহদের গর্জন শোনা গেল সারারাত, আর কিছু ঘটেনি। আমি ক্যাম্পে বসে শুনছি ওদের বজ্রনাদের একহারা দোহারা কাঁপন—যেমনি জাঁকালো তেমনি প্রাণবন্ত। আমার পাশে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ট্রাকের মধ্যে নাক ডাকাচ্ছে এল্‌সা। ও কি জানত ওর স্বজাতি কাছেই রয়েছে? অবস্থাটা কেমন আজগুবি ঠেকল আমার কাছে।

মারাত্মক একজোড়া নরখাদক সিংহকে শিকার করার জন্যে দিনে রাতে তেড়ে বেড়াচ্ছি আমরা। অথচ এই দৌড়ঝাঁপে শ্রান্তি ক্লান্তি ঘোচাবার জন্যে ফিরে এসে আমরা চাইছি এল্‌সার সঙ্গ—ও আমাদের সঙ্গে থেকে সোহাগে আদরে যেন আমাদের কত তৃপ্তি দিচ্ছে। তাহলে লড়াইটা চলছে সিংহের সঙ্গে সিংহের! আমাদের সম্পর্ক খাদ্যখাদকের হলেও জাত হিসেবে এই বনের দুলালদের বেশ লাগে আমার। সঙ্গত কারণেই অবশ্য ওদের ওপর রাগ ছিল জর্জের। একবার যখন ও সিংহের পাল্লায় পড়ে জখম হয় তখন থেকে। তবুও বুদ্ধির বাহাদুরী দিত ওদের, আর কোন বনের জীবকে এতটা সমীহ করত না জর্জ।

চতুর্থ রাতে ওরা ক্যাম্পে ঘুমতে এল। তিন তিনটে রাত জাগার ধকল বড় নয়। সেই রাতেই নরখাদকেরা জেব্রার লাশটার কাছে এসেছে। পরের দিন ব্যাপার দেখে ফের একটা মড়ি যোগাড় করতে হল। আবার ওরা তিন রাত ধরে পাহারায় বসল। তাতেও কোন কাজ হল না। সিংহদের থাবার ছাপ ধরে খুঁজে খুঁজে আবার ওদের কয়েকটা শ্রান্ত দিন আর মাচানে বৃথা বসে থেকে কয়েকটা বিনিদ্র রাত কাটল। তারপর ওরা ক্যাম্পে ফিরল। এই অবসরের ষোল আনা সুযোগ নিল সিংহ দুটো, মড়ি নিতে এল। ইতিমধ্যে বোরাদের বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে আধাআধি একমত হয়ে গেছি আমরা। হয়ত নরখাদক দুটো দুই গুণিনের প্রেত আর খুব সম্ভব অভিশপ্ত।

কৌশল বদলান হল এবার। পায়ের দাগ ধরে ধরে দিনের বেশিটা ঘন ঝোপেঝাড়ে শিকারের খোঁজে কাটান হল। দু-বার ওদের কাছাকাছি গিয়েছি আমরা। শুধু শুনেছি ওদের তীব্রগতিতে পালিয়ে যাওয়ার আওয়াজ—গুলি করার কোন সুযোগই মেলেনি। পায়ে হেঁটে এমন শিকারের খোঁজে বেড়ানো ভারী শ্রান্তিকর। শুধু যে অতিরিক্ত গরমের জন্যেই, তা নয়। ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যেকার গুঁড়িপথে হামাগুড়ি দিয়ে অনবরত যাওয়া আসা কাহিল করে ফেলেছিল আমাদের। আর শুধু গণ্ডার আর হাতীদের আনাগোনা, হাজিরা যে আমাদের কাজ আরও কঠিন করেছিল তা নয়। উচ্চভূমিতে বৃষ্টি নেমে গেছে, ফুলতে শুরু করেছে নদীর বুক। সিংহ দুটো নদীর অপর পারে থাকায় দেরী না করেই আমাদের ক্যাম্প সরাতে হবে, নইলে হেঁটে পার হওয়ার জায়গাটা, মাত্তির নীচে জলে ভরে যাবে।

ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলা হল, ভোরবেলা হাজির হলাম হেঁটে পার হবার জায়গায়। দেখা গেল সারা রাত ধরে অনেকখানি জল বেড়েছে, আরও বাড়ছে। ঠিক করা হল গাড়িতে পার হওয়া যাবে। কতখানি জল বেড়েছে দেখার জন্যে একটা লাঠি পুঁতেছিলাম। ডুবে গেল সেটা, তারপরে স্রোতের

টানে ভেসে গেল।

জর্জ ল্যাণ্ডরোভার থেকে ট্রেলারটা খুলে ফেলল। গাড়ি চালু করার ব্যবস্থাটা জল ছিট্‌কে লেগে যাতে বিগড়ে না যায় সেজন্যে ফ্যান বেল্টটাও সরাল। তারপর গাড়িটা নদীতে নেমে বেশ পার হয়ে গেল। এল্‌সাকে পেছনে নিয়ে এগোল আমার ট্রাকটা। তোড়ে জল বয়ে চলেছে, বেশ টানও রয়েছে তখন, অনেক কিছুই ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গে। ট্রাকটা মাঝ অবধি বেশ বাহাদুরের মতই গেল। তারপর জল ঠিকরে লেগে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনটা। কিছুতেই আর চালু করা গেল না। সঙ্গে সঙ্গেই এল্‌সাকে ছেড়ে দেওয়া হল ; ও লাফিয়ে পড়ল জলে, জল ছিটোতে লাগল, ধরে আনতে চাইল ভেসে যাওয়া কাঠ। ভাবটা যেন আমরা ওর মজার জন্যে এসব সাজিয়ে রেখেছি। সত্যিই, যে লোকগুলো কাঁধ অবধি জলের মধ্য দিয়ে আমাদের বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে পার হচ্ছে তাদের ও এমন করে চোবাচ্ছিল যাতে মনে হয় এমন বিপর্যয়ে ওর যেন আহ্লাদের সীমা নাই। বাধ্য হয়ে ওকে আবার বাঁধতে হল শেষ অবধি। পরে ট্রাকটা খালি করে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু ভয়াবহভাবে একপাশে হেলে পড়ল ট্রাকটা। যে শিকল আনা হয়েছিল তা একেবারে ছোট। তখন তাড়াতাড়ি করে মোষের চামড়া বেঁধে চেষ্টা করা হল কাজ চালাবার। শেষ অবধি সবাই মিলে হাত লাগিয়ে টেনে ঠেলে পার করা হল গাড়িটা। আমাদের এই সব কর্মকাণ্ড—কষ্ট, নাকানিচোবানির সাক্ষী শুধু হনুমানেরা। ওরাই প্রকৃতি-সমাজের সব কিছুর কৌতূহলী দর্শক—যেন হাততালি দিয়ে বাহবা দিল আমাদের।

পার হয়েই ক্যাম্প করতে হল। সারাটা দিন গেল আমাদের ব্যাগ, ওষুধ, গুলি-বারুদ, বই, খাবার, ট্রাকের ইঞ্জিন, গাড়ির বাড়তি যন্ত্রপাতি, বিছানার বাণ্ডিল আর তাঁবু শুকোতে। এল্‌সার সময় কাটল নিশ্চল হয়ে—এটা-ওটা-সেটা শুঁকে নাক ঝেড়ে ঝেড়ে। এমনকি জর্জের পাইপের ধোঁয়া শুঁকে মুখভঙ্গি করে বিরক্তিও জানালো খানিকটা।

পরের দিন সকালে নদী ছাপিয়ে ভেসে গেল দু-কূল। আমাদের সরতে হল আরো উঁচু যায়গায়। তার পরের রাতে বৃষ্টি চলল একটানা। মনে হল এবার বুঝি সিংহ শিকারের প্রচেষ্টা শিকেয় তুলতে হবে। তবু জুৎসই মত একটা উঁচু গাছ খোঁজা হল যাতে অন্তরাল রেখে মাচান করা যায়। কিন্তু এখানে ঝোপঝাড় খুব নীচু নীচু। শেষ অবধি একটা মুসোয়াকি ঝোপে মাচান করেই তুষ্ট হতে হল আমাদের। অবশ্য এমন উঁচু হল না যাতে সিংহের লাফের নাগাল ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার একটা জেব্রা মেরে

জর্জ গাছের নীচে রাখল। তারপর অন্ধকার হতেই জন আর জর্জ গিয়ে গাছে চড়লো। সিংহেরা কী করে যে জানল মাচানটা বেজুৎমত হয়েছে, বলা যায় না। তবে ঘন্টাখানেক পরে ওদের সাড়া মিলল। আধ মাইল দূরে নদীর জল যেখানে একটু কম সেখান থেকে একটার ডাক শোনা গেল, আর নদীর ওপার থেকে সাড়া দিল অপর জন। একটু একটু করে নদীর এপারের সিংহটার ডাক জোর হতে লাগল। সন্দেহেই রইল না সেই সিংহটারই গলার শেষ গর্জনে কেঁপে উঠল মাচান। তারপরে জর্জ নির্ভুল ভাবেই শুনল জেব্রাটার মাংস ছাড়ানোর আওয়াজ। কিন্তু এত অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ওরা দেরী করতে লাগল যাতে সিংহটা খাওয়ায় মন বসায়। তারপর জন টর্চ জ্বালল, দেখা গেল বহু আকাঙ্ক্ষিত পশুরাজকে। ওদের দিকে পিছন ফিরে জেব্রার দেহটায় মুখ ডুবিয়ে তিনি তখন পরমানন্দে আহারে ব্যস্ত। এ অবস্থায় জায়গামত গুলি করা যায় না। টর্চের আলোয় বিব্রত হয়ে সিংহটা ঘাড় ফিরিয়ে মাচানের দিকে তাকাল।

ঘাড় লক্ষ্য করে জর্জ এবার গুলি চালাল। গভীর চাপা গর্জন করে বাতাসে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হল পশুরাজ। শুধু শোনা গেল একটা জোর ঘড়্ঘড়ানি আওয়াজ। নিশ্চয় মোক্ষম জায়গায় গুলি বিঁধে থাকবে। জর্জ নিশ্চিত হল পরের সকালে সিংহটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে। আলো ফুটতেই বনরক্ষীরা মাচানের কাছে এল। জর্জ আর জন ওদের নিয়ে এগোতে লাগল রক্তের দাগ ধরে ধরে। দাগটা বরাবর নদীর ধার ঘেঁষে যেন ঝোপের মধ্যে চলে গেছে।

তখনো সিংহটা যদি বেঁচে থাকে তাকে পিছু পিছু তল্লাশ করা ভারী বিপদের ব্যাপার। কাজেই খুব সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগোল ওরা। প্রতি মুহূর্তে থেমে থেমে, সামান্য শব্দেও কান খাড়া করে। হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। পলকের জন্যে জর্জের নজরে এল দুটো সিংহ পালাচ্ছে। বোঝা গেল নদীর ওপারের সিংহটা এপারের বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাৎ করতে এসেছে। ওরা ভাবল, এবার পশু দুটোর কাছাকাছি হলেই আহত পশুটা নিশ্চিত আক্রমণ করবে।

এতক্ষণে রক্তের দাগটা প্রায় মিলিয়েছে, মাটিতে থাবার দাগ ধরে সাত সকালের অল্প আলোতে এগিয়ে যাওয়া দায়। ওরা থেমে জায়গাটা বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছে, এমন সময় একজন বনরক্ষী জর্জের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে পেছন পানে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পনের গজ দূরে দেখা গেল একটা সিংহের প্রকাণ্ড মাথা। একটা বেঁটে ঝোপের ওপার থেকে মাথা উঁচিয়ে দেখছে ওদের দিকে। দুটো চোখের মাঝামাঝি গুলি করল জর্জ।

তাতে কাজ হল। বিরাট হাঁক ছেড়ে পশুরাজ সেখানে মাটি নিলেন। বিরাট চেহারা—নাকের ডগা থেকে লেজের আগা অবধি ন-ফুট পাঁচ ইঞ্চি। জর্জ নিশ্চিত হল, গতরাত্রে এটাকেই ও জখম করেছে। দু চোখের মাঝে একটা ছাড়াও মাথার পেছন দিকটায় দুটো গুলির গর্ত। আর একটা নিশ্চয় ইতিমধ্যে নদী পার হয়ে ভেগেছে। মনে পড়ল ওর গুলি করার সময়ে জলে কিছু একটা পড়ার আওয়াজ শুনেছিল।

রণক্ষেত্রে পৌঁছে জর্জকে সাফল্যের জন্যে ওর পাওনা বাহবা দিলাম। ঐ চাপ চাপ ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা জখম সিংহকে ধাওয়া করা অবশ্যই খুব ভয়ের ব্যাপার। তিন সপ্তা কেটে গেছে আমাদের এই মানুষখেকোদের সন্ধানে। খাটো ঝোপের মধ্যে চকিতে ওদের সোনালী চামড়ার দর্শন পাবার জন্যে আমাদের মনোবল প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। এই প্রথম দেখলাম ওদের একটাকে।

এবার ওর সবটুকু সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে গেছে; যে থাবার ছাপ আমাদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই প্রকাণ্ড থাবাগুলো অসাড় হয়ে আছে। পূর্ণযৌবন পশুরাজ—বয়েস বছর আটেক।

শেষ পর্যন্ত দুটোর একটা নরখাদকের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেও কিন্তু এমন চমৎকার একটা পশুকে হত্যা করে বিজয়গর্ব বোধ করতে পারলাম না। এটা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক, তবুও এমন ভাবনা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। চামড়া ছাড়াবার পরে হৃৎপিণ্ডটার ছবি নিলাম-কোন বাচ্চার মাথার সমান বড় একটা থলির মত। বুঝলাম, পাঁজরার মধ্যে এল্‌সার হৃৎপিণ্ডের ধুকুপুকুনি আমার কাছে কোন গাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনের মত জোর লাগে কেন।

সে রাতে জর্জ আর জন ফের বসে রইল সেই মাচানে। নীচে জেব্রার টোপ। আশা, যদি দ্বিতীয় সিংহটা আসে। লাভের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে ওরা কষ্ট পেল খুব আর নদীর ওপার থেকে শুনল সিংহের ডাক।

নদীতে জল অনেক বেড়েছে, হেঁটে পার হওয়া যায় না। সাঁতার বিপজ্জনক কেন না নদী কুমীরে ভর্তি। জর্জ ক্যাম্প খাটিয়ার কাঠামোতে বনাত্‌ বেঁধে নৌকো করল একটা। নৌকোটা চমৎকার হল, কিন্তু একজনের বেশি তাতে যাওয়া যায় না। কাজেই ও একা পার হয়ে মার্তিতে গিয়ে খবর দিল, একটা সিংহ খতম হয়েছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে ফুর্তির হৈচৈ পড়ে গেল। ওরা বুঝল, আর যাই হোক সিংহ দুটো অবধ্য বা অজেয় নয়। এবার ওরা এগিয়ে এল আর একটা খুঁজে বার করতে সাহায্য করার জন্যে।

মার্তিতে যাওয়ার পথে জর্জ একটা সিংহীর থাবার দাগ পার হল। জর্জের

সন্দেহ হল আগের রাতে ও যা শুনেছে তা সিংহীর গর্জন কি না। যে সিংহটাকে মেরেছে সেটাই কি আগের রাতে চোট পেয়েছিল? ওর ভারী রাইফেলের গুলি পশুটার মাথার খুলি চূর্ণ করে বেরিয়ে গেছে আর তারই টুকরোতে আরও একটা গর্ত হয়েছে মাথার পেছনটায় —এমন হওয়া অসম্ভব নয়। তাহলে নদীর যে ধারে আমাদের ক্যাম্প সেই ধারেই এখনো একটা চোট খাওয়া সিংহ রয়েছে।

নদী পার হয়ে আবার যখন জর্জ এপারে এল। নদী পায়ে হেঁটে পার হওয়ার জায়গায় দেখল বর্শাধারী ছ'জন বোরা যুবকের একটা দল ওরা এসেছে চোট খাওয়া সিংহটা খুঁজে বার করার কাজে হাত মেলাতে। জর্জ ওদের বলল, ওদের সব থেকে ভালো কয়েকটা শিকারী কুকুর নিয়ে পরের দিন আসতে।

পরের সকালে আবার দেখা হল ওদের সঙ্গে। কথামত সব ব্যবস্থা করেই এসেছে। কিন্তু যে কুকুরগুলো এনেছে তাদের দেখে মোটেই শিকারী বলে মনে হয় না। ওরা অবশ্য আশ্বাস দিলে এরা সিংহ দেখেও ঘাবড়ায় না।

আর একবার জঙ্গলে ঢোকা হল। অল্পক্ষণ পরেই লক্ষ্য করল জর্জ, কুকুরগুলো ওদের প্রভুদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েও এগোচ্ছে না — যেন এক পাও যাবার চাড় নেই। তারপর কুকুরদের পাণ্ডাকে দেখা গেল দু পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা দিতে। আর কুকুরগুলোও তার পথ নিল। দুরু দুরু বুকে সবাই আশা করল— প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে লাফিয়ে পড়বে একটা সিংহ; কিন্তু কিছুই হল না আমরা হনুমানদের ছট্‌ফটানির ডাকও শুনতে পেলাম। নিশ্চয় ওরা ভয়ের কোন কিছু দেখেছে—হয় চিতা নয়তো সিংহ। একটু থেমে চোখ কানকে যতটা সম্ভব সজাগ করে সব দেখে শুনে এগোনো হল। তারপর একটা ঝোপে ঢোকার জন্যে সেই নীচু হল জর্জ, হালকা রঙের কোন বস্তু চোখে পড়ল ওর। একটা কাঁটাঝোপের দুর্গের মধ্যে গুঁড়ি দিয়ে বসে আছে একটা সিংহ। পরিষ্কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার আগেকার ভঙ্গি।

রাইফেল তুলল জর্জ। নিশানা করে ট্রিগার টানার আগেই হঠাৎ মাছির ভন্‌ভনানি ওর কানে এল। তার মানে, পশুটা মৃত। কাছে গিয়ে দেখা গেল মাচান থেকে ছোঁড়া গুলি সিংহটার গলা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সম্ভবত গলার শিরটা নষ্ট করে দিয়েছে তাতে।

এটা অবশ্য আগেরটার মত বড় নয়। তবুও কম যায় না নেহাৎ। মাপে ন ফুট। কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর অত আতঙ্ক জাগাবার মূলে এই মৃত সিংহটার বাহারের তারিফ না করে পারলাম না।

দুটো সিংহই জীবনের জোয়ারকালে পৌঁছেছিল। যেমন সিংহদের বেলায় বলা যায়—মাঝ-বয়সী। অবশ্যই ওদের নরখাদক হয়ে যাওয়ার কোন যৌক্তিকতা

মেলে না।

কোন না কোন ধরনের অক্ষমতা থাকলেই তবে অধিকাংশ সিংহ নরখাদক হয়ে দাঁড়ায়। হয় তারা তীরের ফলায় আহত, কি কোন ফাঁদে চোট পেয়েছে, কিংবা দাঁতের হাল সুবিধের নয়। এমনও হতে পারে থাবায় সজারুর কাঁটা বিঁধে আছে। অথবা খুব বুড়ো হয়েছে, আর ওই অবস্থায় তাদের পক্ষে যা শিকার করা স্বাভাবিক তার থেকে অল্প চট্‌পটে জীবের দিকে খাদ্যস্বভাবটা ভিড়িয়ে দেয়। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। সে সব ক্ষেত্রে প্রকৃতির খেয়ালকেই ওদের নরমাংস-প্রিয়তার কারণ হিসেবে আন্দাজ করতে হয়।

গৃহপালিতদের রক্ষা করে যে কাঁটাবেড়া তার বাইরে প্রায়ই ঘুমোয় যে উপজাতীর লোকেরা তাদের বে-হুঁশিয়ারির ফলেই কি এই নরমেধে রুচি এসেছে? ক্ষুধার্ত কোন সিংহ কাঁটাবেড়া ভেঙে কোন গৃহপালিত পশুকে কখনই টেনে বের করার কষ্ট স্বীকার করবে না, যদি বাইরে কোন খাদ্য তৈরী থাকতে দেখে। তার প্রলোভনটা তখন রোখা দায়। এই সহজ প্রলোভনে লুব্ধ হওয়া কি তার দিক থেকে খুব একটা অযৌক্তিক? এমন এক একটা ঘটনাই একটু একটু করে তার রোজকারের অভ্যেস হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জন্ম হয় এক নরখাদকের। স্বাভাবিকভাবে বাচ্চাগুলোও ক্রমে এমনটাই শেখে। তাদের নরমাংসপ্রিয়তা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কোন প্রবণতা বা প্রবৃত্তি নয়, ধাড়ীদের সঙ্গে থেকে পাওয়া অভ্যাসের ফল।

যাই হোক, আমাদের কাজ শেষ। গুণিনদের প্রেত আর বোরাদের জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলবে না।

ভেবে দেখলাম, এই সিংহ দুটো কয়েকটা তেজী বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। আমরা শুধু আশা করতে পারি, তারা যেন বাপ-কা-বেটা কখনোই না হয়। বলে রাখা ভাল, সম্প্রতি আমরা প্রমাণ পেয়েছি, প্রকৃত ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের অনভিপ্রেত পথ ধরেই এগিয়েছে।

রুডল্‌ফ্‌ হুদে

আঠারো-মাসে পড়েছে এল্‌সা। পশুসুলভ যৌবনের সব লক্ষণ ওর অঙ্গে অঙ্গে একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

ইসিওলোতে ফিরে আসার পরে এক বিকেলে একপাল এদেশী কৃষ্ণসার হরিণের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। এল্‌সাও চুপিসাড়ে পিছু নিতে শুরু করল ওদের। এরা চরছিল একটা খাড়াই ঢালে, অনেকগুলো বাচ্চাও ছিল

ওদের মাঝে। এক মা-হরিণী তার বাচ্চাদের কাছে এল্‌সা এসে পড়ার আগেই ওর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্যে ঝোপের আড়াল থেকে লুকো-চুরি শুরু করলো। যতক্ষণ অবধি না বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সমস্ত পালটা চোখের আড়ালে অদৃশ্য হল, ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুকোচুরি চললো। এল্‌সার নজর রইল হরিণীটারই ওপর। তারপর একসময় তীরবেগে হরিণীটা দৌড় দিল। বেচারী এল্‌সা বোকা বনে দাঁড়িয়েই রইল হাঁ করে।

পাশব কূটনীতির আর একদিনের ঘটনা দেখতে মজা লাগল বেশ :

বাড়ির পেছনের একটা পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম এল্‌সাকে। তার মাথা থেকে দেখা গেল, নীচে অন্তত আশীটা হাতী অনেকগুলো বাচ্চা নিয়ে রয়েছে। এল্‌সাও দেখল ওদের : আমরা কিছু বোঝবার আগেই তীর বেগে নেমে গেল এল্‌সা। কয়েক মুহূর্ত পরেই হাতীর পালের দিকে সন্তর্পণে এগোতে দেখলাম ওকে।

ওর সব থেকে কাছে ছোট বাচ্চা নিয়ে চরছে এক মা-হাতী। এল্‌সা বাচ্চাটাকে তাগ করে এগিয়ে চলেছিল দারুণ ধূর্তভাবে। কিন্তু মায়ের প্রাণ, টের পেয়ে গেল বাচ্চার শিয়রে শমন। উদ্বেগে আমাদের বুক দুরু দুরু, এই বুঝি শুরু হয় লড়াই। অবাক হলাম ব্যাপার দেখে। হস্তিনী এসে বাচ্চা আর এল্‌সার মাঝে ধীর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে একটু একটু করে ধাড়ীদের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। তাতে এল্‌সা দূরে একধারে পড়ে গেল। হতাশ হয়ে ও তখন অন্য খেলার সাথী খুঁজল। বেশ কায়দা করে আড়াল রেখে দুটো মদ্দা হাতীর সঙ্গে খেলায় মাততে গেল। কিন্তু ওকে পাত্তাই দিল না কেউ। তখন ও লাগতে চাইল একটা ছোট দলের সঙ্গে, খুব কাছাকাছি চলে গেল ওদের। তবু ওরা নির্বিকার।

ওদিকে রোদ পড়ে আসছে। আমরা চিৎকার করে এল্‌সাকে ডাকলাম। কিন্তু ও একগুঁয়ের মত আমাদের ডাক কানেই নিল না। শেষ অবধি ওকে না নিয়ে বাড়ি ফেরা ছাড়া আর গতি রইল না। এল্‌সা ওর খেলার সাধ মেটাবেই। নিজের বুদ্ধির জোরে বিপদে পড়বে না এমন আশা করা ছাড়া আর কী-ই বা করব ?

ওর আস্তানার মধ্যে বই নিয়ে পড়তে পড়তে দেরী করলাম। বই-এ কিন্তু মন নেই আমার। ভয়ংকর সব দৃশ্য কল্পনার চোখে ভেসে উঠল একে একে। উদ্বেগ বেড়ে চলল। কী করতে পারি আমরা ? হাতীদের মরসুমে এল্‌সাকে বেঁধে রাখলে ওর মন ভেঙে যাবে আর রাগ বাড়বে। বাস্তবিকই, তাতে শেষ অবধি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে ও। আমরা শেখাতে চাইছি, ঠেকে ঠেকে এল্‌সা তার নিজের এলেমের দৌড় কতটা তা বুঝে নিক। এই বিরাট জানোয়ারদের

সঙ্গে খেলার একঘেয়েমি বা বিপদের বদলে মজা যে কতটুকু পেতে পারে তার ধারণা হোক ওর। তাতেই হয়ত শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে খেলা করার ঝোঁকটা কেটে যাবে।

এদিকে তিন ঘণ্টা ওর দেখা নেই। প্রতি মুহূর্তেই আমার দুর্ঘটনার ভয় হতে লাগল।

হঠাৎ ওর পরিচিত আওয়াজ শুনলাম। এক বুক খুব তেষ্টা নিয়ে ফিরে এল এল্‌সা। তবুও জলের গামলার কাছে যাবার আগে আমার মুখ চাটল, বুড়ো আঙুল চুষল—যেন বলতে চাইল, আবার আমার কাছে আসতে পেরে কত খুশী হয়েছে ও। ওর গা থেকে হাতীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। বেশ আন্দাজ করছিলাম হাতীদের কত কাছাকাছি ও হতে পেরেছে। হাতীর নাদে গড়াগড়িও খেয়ে এসেছে। মাটিতে যেভাবে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল তাতেই বোঝা গেল, ও এখন খুব ক্লান্ত।

ভারী মায়া হল ওর ওপর। যে জগতে যাবার কোন অধিকার নেই আমার সেখান থেকে সবে ফিরল আমারই এক বন্ধু, তবুও আগের মতই সোহাগ ওর আমার ওপর। এই যে দুই জগৎ—যার জীবেরা নিজের নিজের জগতের ডোরে বাঁধা রয়েছে, তার মাঝের কোন রাখীবন্ধনের উপলব্ধি কি ওর এসেছিল?—কী জানি!

অন্য জন্তুদের মধ্যে জিরাফেরা নিঃসন্দেহে এল্‌সার খুব পেয়ারের বলে মনে হয়েছে। প্রায়ই ও চুপিসাড়ে ওদের পিছু নিত, আর শেষ অবধি দু-পক্ষই হাল্লাক হয়ে পড়ত। তারপর ও বসে থাকত কখন আবার ওরা ফিরে আসবে তারই পথ চেয়ে। নিশ্চিতভাবেই কিছুটা পরে আসত, পায়ে পায়ে কাছে আসত এল্‌সার। একেবারে মুখোমুখি। ওর দিকে বড়ো বিষণ্ণ আঁখিগুলো মেলে দিয়ে ওদের সরু সরু গলা কৌতূহলী ভঙ্গীতে সামনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

তারপর স্বাভাবিকভাবেই ওদের প্রিয় বাবলা দানা খেতে খেতে এল্‌সার পাশ দিয়ে চলে যেত। শান্তিপূর্ণভাবে এমনি করে ছেড়ে যেত জায়গাটা।

কিন্তু কখনো কখনো এল্‌সা সিংহবিক্রমে তেড়ে বেড়াত ওদের। তাগ করে বাতাসের অনুকূলে ওদের ফেরাত। তখন মাটির সঙ্গে মিশে যেত ওর পেট, প্রতিটি পেশী কাঁপত। তারপর সমস্ত পালটাকে বেড় দিয়ে আমাদের দিকে তাড়িয়ে আনত। নিশ্চয়ই ও আশা করত পালের দু-একটা আমাদের হাতে মরবে—কারণ অত কষ্ট করে ও আমাদের জন্যেই জাল গুটিয়ে শিকার এনে দিচ্ছে।

অন্য পশুদের ওপরও মন ছিল ওর। যেমন একদিন, বাতাসে কিছুর গন্ধ

পেয়েই জঙ্গলে অদৃশ্য হল হঠাৎ। অল্পক্ষণ পরেই আমরা শুনলাম ডালপালা ভেঙে ঘোঁতঘোঁত শব্দ আসছে আমাদের দিকে। তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দাঁড়াতেই একটা দাঁতাল বনবরাহ প্রচণ্ডবেগে বেরিয়ে গেল, তার পিছু পিছু এল্সা। বিদ্যুৎগতিতে অদৃশ্য হল দুটোতেই। আমরা শুনলাম বনের মধ্যে ডালপালা ঝোপঝাড় দলে পিষে বেড়ানোর আওয়াজ।

এল্সার নিরাপত্তার জন্যে ভাবনা হচ্ছিল, কেন না বরাহের যে মারাত্মক দাঁত তা দিয়ে মেরেও ফেলতে পারে ওকে। যতক্ষণ না ফিরল আমাদের ভাবনা রইল। তারপর দৌড়ের বাজি জিতে ফিরে এসে আমাদের হাঁটুতে মাথা ঘষে ওর খেলার নতুন সাথীর কথা জানাল এল্সা।

আমাদের পরের সফর রুডল্ফ্ হ্রদে। একশো আশী মাইল লম্বা অল্প লোনা জলের বিস্তার ইথিওপিয়া সীমান্ত পর্যন্ত। প্রায় সাত সপ্তার মত থাকতে হবে সেখানে। বেশিটা পথ হাঁটতে হবে আমাদের বোঝা-বওয়া গাধা আর অশ্বতরের সঙ্গে। পায়ে হেঁটে সফর করবার এই প্রথম অভিজ্ঞতা হবে এল্সার, তাও আবার গাধাদের সঙ্গে। আশা করলাম, দু-পক্ষ একে অপরকে সইয়ে নেবে। আমাদের পুরোদস্তুর একটা দলই হয়ে গেল। জর্জ, আমি, পাশের এক এলাকার শিকার সংরক্ষক জুলিয়ান, হার্বার্ট—আবার যে অতিথি হয়েছিল আমাদের, বনরক্ষীরা, গাড়ীচালকেরা, কাজের লোকজন, পথে এল্সাকে খাওয়াবার জন্যে গোটাছয়েক ভেড়া, আর পঁয়ত্রিশটা গাধা আর অশ্বতর। লটবহর দিয়ে গাধা অশ্বতর বাহিনীকে আগে পাঠানো হল, হ্রদের পাড়ে যাতে দেখা হয় আমাদের সঙ্গে। তিনশো মাইল পথ গেলাম আমাদের ট্রাক আর ল্যাণ্ডরোভারে।

গাড়ির শোভাযাত্রাটা—ক্যাভ্যালকেড, বেশ বড়োসড়ো হল।—দুটো ল্যাণ্ডরোভার, আমার দেড়-টনি ট্রাক—তার পেছনে এল্সা, আর দুটো তিন-টনি লরি। লরি দুটো শুধু যে আমাদের আর লোকজনকে নিয়ে যাবার জন্যে দরকার ছিল তা নয়, আমাদের রসদ, গাড়ির পেট্রোল আর আশী গ্যালন জল ছিল তাতে।

কৈস্যুৎ মরুভূমির বালি, গরম আর উড়ন্ত ধুলো আমাদের যাত্রাপথের প্রথম একশো আশী মাইল জুড়ে আছে। তারপর চারপাশের মরুভূমি থেকে হঠাৎ ছিট্কে ওপরে ওঠা সাড়ে চার হাজার ফুটের আগ্নেয়শিলার পাহাড় মার্সাবিৎ—তার উৎরাই দিয়ে নামলাম আমরা। মরুভূমি আর পাহাড়ের গরমিলটা চোখের ওপরে স্পষ্ট। প্রচণ্ড গরমে ঝল্সে যাওয়া বালির বিস্তারের মাঝ-মধ্যিখানে ঘন, শীতল, ছাউনি-ঢাকা বন দিয়ে মোড়া আর প্রায়ই কুয়াশা ছাওয়া পাহাড়টা। এটা যেন পথিকজনের মনোরঞ্জনের—তৃপ্তি দেওয়ার

জন্যেই গর্জিয়ে উঠেছে হঠাৎ।

শিকারের নন্দনকানন এই পাহাড়। আফ্রিকার সব থেকে চমৎকার গজদন্তের মালিক হাতীর দল এখানে চরে বেড়ায়। তাছাড়াও আছে গণ্ডার, মোষ, বড় কুডু হরিণ, সিংহ আর ছোটখাট হাজারো রকমের জন্তু। সরকারী ঘাঁটি এ জায়গার শেষ সীমায়।

এবার আমরা চলেছি বলতে গেলে জনশূন্য সব জায়গা দিয়ে, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত বাঁধন কেটে। বলির খাঁজ আর লাভার শিরা দেখতে একঘেয়ে লাগলেও উপায় নেই। অকস্মাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ধাক্কা লেগে আমার গাড়িটা দু টুকরো হয়ে যায় আর কি! পেছনের একটা চাকা বেরিয়ে চলে গেল। খাপছাড়াভাবে থেমে যেতে হল আমাদের।

বেচারী এল্‌সা! গাড়ি মেরামত করতে লাগল কয়েক ঘণ্টা। গাড়ির মধ্যেই কাটাতে হল ওকে। কোথাও ছায়া নেই একটু, গাড়ির মধ্যে ছাড়া। রোদ রোদ আর রোদ। কিছুতেই ওর তা সয় না। তবুও গাড়ির মধ্যে বসে থেকে মানিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। এদেশীয়দের ও সহ্য করতে পারে না। তবে যারা গাড়ির গা ঘেঁষে ঠেলছিল, আমাদের লোকজনের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কলকল করতে করতে, তাদের ও যেন সহ্য করল কেমন একটা বাধিত হওয়ার ভাব দেখিয়ে।

আবার যখন চলমান হলাম আমরা, ইথিওপীয় সীমান্তের হারী পর্বতমালার সব থেকে ঝাঁকুনি লাগা নির্জন রাস্তায় এসে পড়লাম। যদিও মার্সাবিৎ-এর চেয়েও উঁচু,—ভিজে ভিজে ভাবটা কম। ঢালগুলো দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শরীর এলিয়ে দেওয়া একটা ঝড়। কোন বনজঙ্গল নেই। ঝড়ের দাপটে এল্‌সা বেকায়দায় পড়ল। ট্রাকের মধ্যেই রাত কাটাতে হল ওকে। ঝড়ের ঠাণ্ডা দমক আটকাবার জন্যে চারধারে ক্যানভাসের পর্দা ঘিরে দেওয়া হল।

জর্জের এই পাহাড়গুলোতে আসার উদ্দেশ্য ছিল, শিকারের পরিস্থিতি দেখা আর গাব্বা উপজাতির লোকজনের অনধিকার প্রবেশের কোন চিহ্ন মেলে কি না তা লক্ষ্য করা। এই অঞ্চলটায় কয়েকদিন টহল দিয়ে পশ্চিমমুখো হলাম আমরা। জনমানবশূন্য নীরস লাভা ঢাকা দেশ পার হয়ে চললাম। পথে উঁচু নীচু পাথরের ঝাঁকুনিতে গা-গতর ব্যাথা হয়ে গেল। এল্‌সার কষ্ট হচ্ছিল যখন আমরা এগিয়ে চলছিলাম গভীর বালুময় নদীখাত দিয়ে বা বড় বড় পাথরে ঠোকাঠুকি করে চাঁইগুলোর মাঝ দিয়ে সন্তর্পণে পথ করে যাচ্ছিলাম।

অবশেষে পৌছনো গেল আশী মাইল লম্বা এক হ্রদের শুকিয়ে যাওয়া বুক, চালবি মরুভূমিতে। এখানকার জমিটা বেশ শক্ত আর সমতল, পুরো গতিতে

কোন গাড়ি ছুটতে পারে। এখানকার সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অসংখ্য মরীচিকা। পামগাছের ছায়া পড়ছে যেন বিরাট জলাশয়গুলোর ওপরে —কাছে এলেই কোথায় যেন সব মিলিয়ে যায়। এখানেও গেজেল হরিণগুলো প্রায় হাতীর আকৃতি, আর মনে হয় যেন জলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে আসছে। দেশটা বুকফাটা তৃষ্ণা আর কাঠফাটা গরমের।

চালবির পশ্চিমপ্রান্তে মরূদ্যান আছে – নর্থ হর। পুলিসঘাঁটিও আছে ওখানে। হাজার হাজার উট, ভেড়া, ছাগল ওখানে জল খেতে আসে রেণ্ডিল উপজাতির পোষা পাল থেকে।

আর একটা দেখবার মত ব্যাপার, সকালে বেলে মুরগী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে সামান্য ক'টা জলাশয় থেকেই জল খেতে।

আমাদের এই মরূদ্যানে আর কোন কাজ নেই। যত তাড়াতাড়ি পারা গেল জলের জায়গাগুলো ভরে নিয়েই আমরা আবার পাড়ি দিলাম।

দু-শো ত্রিশ মাইল ধরে চলল আমাদের ওলটপালট যাওয়া আর নাচানাচি। খেজুর-কুঞ্জে জলের প্রস্রবণ একটা জায়গায়, নাম লোওন-গ্যালেন। সেই মরূদ্যানে এলাম আমরা। রুডল্‌ফ্‌ হ্রদের দক্ষিণদিকের কাছাকাছি জায়গাটা। এখানেই দেখা আমাদের ভারবাহী গর্দভ-অশ্বতর বাহিনীর সঙ্গে।

এল্‌সাকে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হল মাইল-দুই দূরের এক হ্রদে। পথের ধকল একচোটে কাটিয়ে ফেলতেই যেন এল্‌সা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে আর একেবারে কুমীরদের মাঝ মধ্যিখানে গিয়ে বসল। নেহাৎ ওদের আক্রমণ করার ঝোঁক ছিল না, তাই রক্ষে। তবুও আমরা ওদের তাড়িয়ে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম।

আমাদের এই সফরের সময়ে স্নান করার আনন্দটা নিরুদ্বিগ্ন ছিল না। রুডল্‌ফ্‌ হ্রদে একেবারে কুমীর থিক্‌থিক্‌ করছে। ধারে ধারে ওদের ভেসে থাকা দুর্ভেদ্য ছায়াময় আকৃতিগুলো অন্তত আমাদের কাছে স্বস্তিদায়ক হয়নি। আমাদের মূল শিবির হল লোওনগ্যালেনে। তিন তিনটে দিন কাটল জিনগুলো মেরামত করে বোঁচকা-বুঁচকি গোছগাছ করে বাঁধাছাঁদা করতে। পঞ্চাশ পাউণ্ডের দু-দুটো বোঝা প্রত্যেক গাধার পিঠে চাপানো হল। সব দিক ঠিকঠাক করা হল। আঠারোটা গাধার পিঠে বাঁধা হল খাবারদাবার আর ক্যাম্পের সরঞ্জাম। চারটের পিঠে তোলা হল জলের জায়গাগুলো। একটা অশ্বতর খালি রাখা হল। যদি হেঁটে যেতে না পারে কেউ কোন কারণে, তাই এই ব্যবস্থা। পাঁচটা বাড়তি গাধা রইল।

এল্‌সা গাধাগুলোকে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, ভাবনা হচ্ছিল তাই নিয়ে। আমরা যখন মালপত্তর আবার বাঁধাছাঁদা করছিলাম, এল্‌সা চুপচাপ ছিল,

ওর আগ্রহ চেপে রেখেছিল কোনমতে। কিন্তু তারপরই বাঁধতে হল ওকে। চোখের সামনে অসহনীয় দৃশ্য দেখছিল ও। বোঝাগুলো ঝেড়ে ফেলার জন্যে লাথি চালিয়ে, গড়াগড়ি দিয়ে, পা ছুঁড়ে আর ডাকাডাকি করে গাধাগুলো হন্যে হচ্ছিল। আর এদেশীয়রা সেই বিশৃঙ্খল অবস্থা সামাল দেবার জন্যে ছুটোছুটি চেঁচামেচি করছে। এমন চমৎকার খাদ্য তার চোখের সামনে অবলীলায় যে নাটক করছে তা দেখে এল্‌সার উত্তেজনা চরমে পৌঁছচ্ছিল। আর ছেড়ে রাখা গেল না ওকে।

গর্দভ আর অশ্বতর বাহিনীর প্রধান মিছিলটা সকালবেলায় রওনা হয়ে গেল। এল্‌সাকে নিয়ে দিনের শেষাশেষি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডায় আমরা পাড়ি জমালাম। তীরভূমি বরাবর আমাদের যাত্রাপথ। এল্‌সার তখন ফুর্তির সীমা নেই। কুকুরছানার মত আমাদের একের কাছ থেকে অপরের কাছে ছুটে যাচ্ছে, মরালের ঝাঁকে লাফিয়ে পড়ছে। আমাদের গুলি খাওয়া এক একটা হাঁসকে তুলে নিয়ে আসছে। আহ্লাদের চরমে পৌঁছে জলে ঝাঁপাই জুড়ছে। তখন আমাদের কাউকে রাইফেল নিয়ে কুমীরের উৎপাতের ভয়ে ওর পাহারায় থাকতে হচ্ছে। পরে যখন একটা উটের পাল পার হলাম আমরা, বাঁধতে হল ওকে।

এবার কিন্তু ক্ষেপে গেল এল্‌সা। এই নয়া দোস্তদের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যেই উতলা হয়ে উঠল। টানাটানিতে আমার হাত দুটো তো ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার যোগাড়। তবুও ছাড়তে পারি না ওকে। ভয়তরাসে উটগুলো ডেকে, ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে আর পায়ে পা জড়িয়ে একে অপরের গায়ে পড়বে আর তাদের সেই ছত্রভঙ্গ ছত্রাকার মারামারির মধ্যে খেলোয়াড় হয়ে থাকবে এল্‌সা—এমন দৃশ্যটা দেখার একটু ইচ্ছে নেই আমার। পশুবাহিনীর সঙ্গে দেখা এ যাত্রায় এই শেষ, তাই রক্ষে।

রাত হলে হ্রদের পাশে আমাদের শিবিরের আলো, আগুন চোখে পড়ল। আবার এল্‌সাকে বাঁধলাম। ভয়, রাসভবাহিনীকে ছুট্ করাবার মত উৎসাহ জমা রয়েছে ওর তখনো। পৌঁছে দেখা গেল শিবির বেশ গোছগাছ হয়ে বসে গেছে। রাতের খানাপিনাও সব একেবারে সাজানো।

ঠিক হল, যখন দেরী করেই রাতের ঘাঁটি গাড়া হয়েছে এবার থেকে রোজ ভোরে সিংহদল, অর্থাৎ এল্‌সা, জর্জ, নুরু, পথ দেখাবার একজন বনরক্ষী আর আমি বেরিয়ে পড়ব। ততক্ষণ শিবির গুটোনো, জিন আঁটা, মালপত্তর বাঁধাবাঁধি বোঝাই দেওয়া এসব চলবে। এভাবে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডায় আমরা এগোব আর রাসভবাহিনী পিছু পিছু নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলবে। ফলে এল্‌সাকে ছেড়ে রাখা যাবে। তারপর সাড়ে নটা নাগাদ কোন ছায়া দেখে আশ্রয় নেব

আমরা। আর গাধাগুলো চরে খুঁটে বেড়াবে। 'ওদের নজরে পড়লেই এল্‌সাকে বাঁধা হবে। বিকেলে বন্দোবস্তটা উল্টে নেওয়া হবে। গর্দভবাহিনী ঘণ্টা-দুই আগে রওনা হবে, সিংহ-বাহিনীর সামনে থাকবে। আঁধার হবার আগেই শিবির ফেলবে তারা।

সমস্ত যাত্রাপথে এই ব্যবস্থা আমরা বজায় রেখেছি, চমৎকার চলেছে। ফলে গর্দভকুলের থেকে দূরে দূরে রাখা গেছে এল্‌সাকে। শুধু দুপুরবেলাকার সময়টায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। তখন এল্‌সা বাঁধা থাকত, ঘুমে ঢুলত। শেষ অবধি ফল হল এই, দু-পক্ষের একে অপরকে সইয়ে নিতে শিখল একটু একটু করে। মেনে নিল,—সহযাত্রী সবাই এক পথেরই পথিক। অতএব মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে।

সকালে প্রায় নটা অবধি বেশ হাঁটত এল্‌সা। তারপর গরম লাগলে আর হাঁটতে চাইত না। কোন পাথর কি ঝোপঝাড়ের ছায়ায় বসে পড়ত। বিকেলে পাঁচটার আগে নড়ানো যেত না ওকে। তারপরে সারারাত চলতে হলেও বোধহয় আপত্তি ছিল না ওর। দিনে সাত আট ঘণ্টা হাঁটত ও গড়ে, হাঁটতও বেশ দ্রুত। হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ত, সম্ভব হলে সাঁতার কাটত। অনেক সময় কুমীরদের সাত আট ফুটের মধ্যেও গিয়ে পড়ত। আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে যত চেঁচাই বা হাত নাড়াই না কেন, শুনতে বয়ে গেছে ওর। যতক্ষণ অবধি না নিজের আশ মিটত, উঠত না জল থেকে। সন্ধ্যে সাতটা আটটার মধ্যে সচরাচর ক্যাম্পে ফিরতাম। আমাদের আগের গর্দভবাহিনী প্রায়ই পিস্তল ছুঁড়ে রঙীন আলো দেখিয়ে আমাদের পথ চেনাত।

যাত্রার দ্বিতীয় দিনে শেষ জনবসতিও আমাদের পেছনে ফেলে এলাম। জেলে প্রধান আদিম এল্ মোলো গোষ্ঠীর গাঁ। সবাই উপজাতি শ্রেণীর লোক। বেশির ভাগই মাছ ধরে খায়, মাঝে মাঝে জলহস্তী আর কুমীরের মাংসেও আপত্তি নেই। এমন অসম খাদ্য আর নিজেদের মধ্যে বিয়ে-থা সন্তানসন্ততি হবার ফলে ওদের মধ্যে অনেকেই বিকলাঙ্গ আর পঙ্গু হয়ে গেছে। হয়ত অপুষ্টির জন্যে কিংবা বোধহয় হ্রদের জল ব্যবহারের জন্যে দাঁতের রোগও লেগে আছে সকলের। হ্রদের জলে প্রচুর নেট্রন আর অন্য খনিজ পদার্থের ভাগ থাকার ফলেই এমনটা হয়ে থাকবে।

এদের ব্যবহার খুব অমায়িক। কোন আগন্তুক বা অতিথি এলেই ওরা টাটকা মাছ দিয়ে সম্বর্ধনা জানায়। জাল দিয়ে মাছ ধরে। ক্ষারধর্মী জলে খেজুর-গাছের আঁশ পচে না, তাতেই জাল তৈরী করে ওরা। নীল-নদের যে অতিকায় পার্চ মাছ ওজনে দু-শো পাউণ্ডও ছড়িয়ে যায়, তাও এই জালে ধরা পড়ে। তাছাড়া কুমীর আর হিপোও ওরা হার্পুন গেঁথে শিকার করে, তিনটে

খেজুর গাছের গুঁড়ি কোনমতে বেঁধে যে ভেলা তৈরী হয়, তার সাহায্যে। এই হুরারোহ জলজান অল্প জলে লগি ঠেলে নিয়ে যায় ওরা। তবে বাতাসের ভয়ে বেশি দূরে নিয়ে যায় না। হ্রদের ওপরে প্রায় যে দমকা বাতাস বয়, সময় সময় তার গতিবেগ নব্বুই মাইলেও গিয়ে দাঁড়ায়। বলতে গেলে, যে কোন ভ্রমণকারীর অস্বস্তির প্রধান কারণ এই বাতাস। তাঁবু খাটানো যায় না, থালা থেকে খাবার উড়িয়ে নিয়ে যায় বা বালি আর পাথরের গুঁড়োতে এমন ঢেকে দেয় যে সে খাবার তখন মুখে তোলাই হুঃসাধ্য। ঘুমোনো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ঝোড়ো বাতাসের দাপটে চোখ-মুখ ভরে যায় বালিতে, বিছানাটাই যেন উল্টে ফেলে।

তবুও, হ্রদ যখন শান্ত তখনকার সৌন্দর্যটাই হল আসল। এমন একটা আকর্ষণ গড়ে তোলে যা বলে বোঝানো যায় না। ঝড়ের উৎপাত সহ্য করেও এখানে বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

প্রথম দশ দিন হ্রদের তীর বরাবর যেতে হল। চারপাশের অঞ্চলটা লাভায় ঢাকা। লাভা, আরো লাভা—কখনও ছাই-এর মত মিহি গুঁড়ো, কখনো বা ধারাল টুকরো। এত ধারাল যে, সেই অসমান জায়গায় পিছলে আছাড় খেতে খেতে আমাদের পায়ে ঘা আর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হল। কতক জায়গায় বালি গভীর। তার মধ্যে পা টেনে টেনে চলতে গিয়ে এক পা এগোনো কী কষ্ট। কখনো কর্কশ নুড়ি বা পাথরকুচির ওপর দিয়েও হাঁটতে হচ্ছিল। গরম বাতাস বয়ে চলেছে একটানা। তাতে আমাদের কখনো কখনো মাথা ঘুরে যাচ্ছে। গাছপালা খুবই সামান্য, এধার ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা শীর্ণ ঘাসের ঝোপ। তাদের খোঁচা লাগছে, ধারাল ঘাসে কেটে যাচ্ছে হাত-পা।

যা রাস্তা, তাতে এল্‌সার থাবায় চোট লাগতে পারে। চর্বি মাখাতে হত ওর পায়ে ঘন ঘন। হুপুরের বিশ্রামের সময় ক্যাম্প খাটিয়াতেই শুতাম, কেন না নুড়ি পাথরের ওপর কিছু বিছিয়ে শোয়া কষ্টকর। এল্‌সাও ক্যাম্প খাটিয়ায় শোয়ার আরামটা বুঝল, কাজেই আমার খাটিয়াতে এসে উঠত। ক্রমশ ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, খাটিয়াতে ও যদি সামান্য একটা কোণ ফেলে রাখত, ভাগ্যি মানতাম আমি। শেষ অবধি জায়গাও থাকত না এক এক দিন। ঢেলা ঢেলা পাথরের ওপর সারাটা হুপুর বসে থাকতে হত, ক্যাম্প খাটিয়ায় চার পা ছড়িয়ে গা ঢেলে দিয়ে আরাম করত এল্‌সা। অবশ্য সচরাচর আমরা হুজনেই কুঁকড়ে শুতাম খাটিয়াটার হু-দিক থেকে। আমাদের হুজনের ভারে খাটিয়াটা ভেঙে যাবে না, এই আশা করা ছাড়া উপায় থাকত না আমাদের। এই দীর্ঘ যাত্রায় নুরুর কাছে থাকত খাবার জল আর

এল্‌সার জল খাবার গামলা। ন-টা নাগাদ রাতের খাওয়া সেরে ও আমার খাটের কাছে জোর ঘুম দিত। তখন বাঁধতে হত ওকে।

এক সন্ধ্যায় পথ হারালাম আমরা। ক্যাম্পের লোকদের পিস্তলের রঙিন নিশানা সবশেষে সঠিক পথের সন্ধান দিল। পৌঁছতে রাত হল অনেক। ভাবলাম এল্‌সা অবসাদে এলিয়ে পড়ছে, কাজেই বাঁধলাম না। কিন্তু ওকে ঢুলন্ত দেখলেও আচমকা সজোরে ঝাঁপিয়ে গেল কাঁটাঘেরা জায়গায় যেদিকে গাধাগুলো থাকে। একেবারে স্বজাতীয় কায়দায় বেড়া ভেঙে ফেলল। গাধাদের উচ্চকিত চিৎকার, আতঙ্ক আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সাড়া পেলাম। আমরা গিয়ে সামলাবার আগেই অন্ধকারের মধ্যে পালিয়েছে গাধাগুলো। সৌভাগ্য, এল্‌সাকে ধরা গেল চট করে। ওকে ভালো করে লুকিয়ে রাখলাম। মনে হল এল্‌সা এর প্রয়োজন বুঝতে পারলো। যতটা পারল দেখাল, ভারি দুঃখিত।

ওর স্বভাবপ্রবণতাকে গুরুত্ব দিইনি, দোষটা আমারই। সময়টাও এমন, যখন বনের পশুদের মধ্যে সহজাত শিকার-প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। পাশেই গাধার পালের লোভনীয় গন্ধ। কাজেই এল্‌সার পক্ষে স্থির থাকা দায়। এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।

বেশি ক্ষতি হয়নি গাধাগুলোর, শুধু একটা ছোট গাধার গায়ে আঁচড় লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষা করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে বলে সারতে দেরি হয়নি। তবে এই ঘটনাটা আমায় হুঁশিয়ার করে দিল—যাতে এল্‌সাকে আর কখনও অরক্ষিত না রাখি।

প্রচুর মাছ। জর্জ আর জুলিয়ান ক্যাম্পে মাছের যোগান রাখছিল নিয়মিত। বেশি আসত রাক্ষুসে তিলাপিয়া—রুডল্‌ফ্‌ হ্রদের অনন্য বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। হয় দড়ি, নয়তো ছিপ দিয়েই ওরা ধরত বা রাইফেলের গুলিতে মারত। বনরক্ষীদের প্রিয় ছিল বিড়াল-মাছ। ওগুলো দেখতে কদাকার। অল্প জলে প্রচুর থাকে। ওগুলোকে লাঠি বা পাথর দিয়ে মারত ওরা।

যে কোন মজার ব্যাপারে লাগতে এল্‌সা সব সময়েই তৈরি। কখনো কখনো আমাদের লোকজনের কেউ হয়তো বিড়াল-মাছ মেরেছে: ও গিয়ে তুলে আনত জল থেকে; কিন্তু মুখে করে এনে মাটিতে ফেলে দিয়েই ঘৃণায় নাক কোঁচকাত। একদিন দেখি নুরু তার শট্‌-গান-এর কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে একটা বিড়াল-মাছ মারছে। মাছটাকে মারতে পেরে নুরু এত খুশি যে, শট্‌-গানটার যে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে সেদিকে খেয়াল নেই। জর্জ ওকে যখন ব্যাপারটা বলল, নুরু তখন নির্বিকারচিত্তে জবাব দিল, 'মানগোর কৃপায় আর একটা বন্দুক পেয়ে যাবেন আপনি।' ঈশ্বরকে ওরা মানগো বলে।

একদিন হ্রদের পাড়ে জুতো ছেড়ে রেখেছিল মুরু। এল্সা সে ছুটো নিয়ে দৌড়। মুরুও সঙ্গে সঙ্গেই ছিনিয়ে নিতে দৌড়ল। সোজাসুজি কাড়তে পারে না। কায়দা করে নিতে যায়। এল্সাও পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে। এমনি করে ওদের কায়দা কসরৎ চলল কিছুক্ষণ। বেশ মজা লাগছিল আমাদের। শেষ পর্যন্ত জুতোজোড়ার যখন আর কিছু পদার্থ রইল না, তখন মুরু ফেরত পেল।

উত্তরে শ'খানেক মাইল দূরে আলি বে'। সেখানে পৌঁছতে হলে আমাদের দীর্ঘ লোওনগ্যালেন পর্বত-শ্রেণী পার হতে হবে। অনেক জায়গায় পাহাড় সোজা হ্রদের মধ্যে এসে পড়েছে। কাজেই ভারবাহী গর্দভ-বাহিনীকে বোঝা পিঠে অনেকটা করে পথ ঘুরে যেতে হচ্ছিল। সিংহ-বাহিনী অবশ্য চলেছিল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে তীরের কাছ ঘেঁষে।

এক জায়গায় এসে মনে হল, হার মানতে হবে আমাদের। এখানে কোণটা বেড় দিয়ে যেতে হয় এল্সাকে লাফ দিতে হবে পনেরো ফুট উঁচু থেকে—এমন একটা শ্যাওলাভরা পিচ্ছিল পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে যেখানে সে আঁকড়ে ধরতে পারবে না কিছু, আর তারপর নামতে হবে অল্প জলে ; নয়তো এমন একটা খাড়াই পাথর বেয়ে নামতে হবে যার নীচে ঢেউ এসে আছড়াচ্ছে। সেখানে প্রায় ওর সমান জল। তাছাড়া ঢেউও দেখাচ্ছে ভয়ংকর। কাজেই এল্সাকে পার করা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এল্সা নিজে পাহাড়ের প্রতিটা খাঁজে দাঁড়িয়ে ভাবগতিক বোঝার চেষ্টা করল। দাঁড়াবার জায়গায় পা রেখে ঘুরল কিছুক্ষণ। তার পরেই হঠাৎ মস্ত এক লাফ দিয়ে উঠল গিয়ে শুকনো ডাঙায়। দেখে বুক জুড়িয়ে গেল।

পথের মধ্যে নোনা জল ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। তাতেই তৃষ্ণা মেটাতে হতো। জলটা নোনা হলেও মোটেই ক্ষতিকর নয়। ভারি নরম জল। তাছাড়া এতে স্নান করতে সাবানের দরকার হয় না। তবে স্বাদটা বিশ্রী, খাবার-দাবারে দাগ ধরে যায়। কাজেই যখন মইতি পাহাড়ের গোড়ায় একটা মিঠে জলের প্রস্রবণ দেখলাম, আমাদের কাছে সেটা হল মনোরম বিস্ময়।

যতদূর জানলাম, পাহাড়গুলোর পশ্চিম পাদদেশ দিয়ে আমাদের আগে কোন ইউরোপীয় যায়নি। আগে যে কয়েকজন এ অঞ্চলে এসেছে তারা সবাই পুব দিক দিয়েই যাওয়া আসা করেছে।

অন্যান্য বারের মত এবারেও আমরা একটা 'অগ্রবর্তী চরের দল পাঠিয়েছিলাম, চোরাগোপ্তা শিকারী কোথাও আছে কিনা তা গোপনে খবর নেবার জন্যে। ন-দিন লাগল লোওনগ্যালেন পার হয়ে বেরোতে। তারপরে পাহাড়ের

উত্তর প্রান্তে শিবির করা হল। আমাদের চরেরা ফিরল বিকেলের শুরুতেই। খবর দিল, ওরা হ্রদের মধ্যে অনেক লোককে ক্যানোতে করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।

হ্রদের ধারে একমাত্র উপজাতি যাদের গাছের গুঁড়ি-চাঁছা ক্যানো আছে, তারা হল গ্যালুব্বা। এরা দুর্ধর্ষ জাত। ওদের কাছে রাইফেল আছে যথেষ্ট। ইথিওপীয়ার সীমান্ত পার হয়ে এদিকে ঘন ঘন হানা দেয়, লুটপাট খুন-খারাপীও করে। যে দলকে আমাদের চরেরা দেখেছে, তারাও এমনি লুঠের খুনের দল হতে পারে, কিংবা চোরাগোপ্তা শিকারী অথবা মাছধরার অভি-যাত্রীও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ওখানে থাকার কোন অধিকার নেই ওদের, এটা নিশ্চিত।

এল্‌সা আর আমি, চারজন সশস্ত্র বনরক্ষীর পাহারায় রইলাম ক্যাম্পে। বাকী দলটা বেরোল পর্যবেক্ষণে।

ওরা এমন একটা পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে পৌঁছল, যেখান থেকে তিন দিক দিয়ে ঘেরা হ্রদের একটা অংশ দেখা যায়। সেখানে পৌঁছে ওরা দেখল তিনটে ক্যানোতে জনা-বারো লোক তীরের কাছাকাছি ক্যাম্পের দিকে আসছে। ওরাও সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দলটাকে দেখতে পেল। কাজেই জর্জ যখন অন্যান্য লোক নিয়ে নেমে তীরের কাছে গেল, ক্যানোগুলো তখন দুশো গজের মত দূরে চলে গেছে। ক্যানোগুলোর মুখ ঘুরিয়ে ওরা চলেছে একটা ছোট দ্বীপে, খুব তড়িঘড়ি। ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে মনে হল না। অবশ্য ক্যানোতে লুকিয়েও রেখে থাকতে পারে। দূরবীন দিয়ে দেখল জর্জ, দ্বীপটার ওপরে অন্তত জনা-চল্লিশ লোক আর অনেকগুলো ক্যানো রয়েছে তীরের কাছে। যে তিনটি ক্যানো এদিকে আসছিল সেগুলো এতক্ষণে পৌঁছে গেছে দ্বীপটায়। লোকগুলো ক্যানো থেকে নামতেই যারা দ্বীপে দাঁড়িয়েছিল তারা ঘিরে ধরল ওদের। ওদের সবাইকে খুব বিচলিত আর চঞ্চল বলে মনে হল।

এমন অবস্থায় নৌকো না থাকলে কিছু আর করার নেই। কাজেই ফিরতে হল আমাদের দলটাকে। ওরা ফিরতেই আমরা ক্যাম্প গুটিয়ে দ্বীপটার যত কাছাকাছি সম্ভব সরে এলাম। সে রাতে বাড়তি পাহারা রাখা হল। আর প্রত্যেকেই গুলিভরা রাইফেল পাশে নিয়ে ঘুমোল।

ভোর হলেই দেখা গেল দ্বীপটা খালি, লোকজন নেই। স্পষ্টতই বুঝতে পারা গেল যে, গ্যালুব্বারা আমাদের দেখে সুবিধে বোঝেনি, তাই রাতের অন্ধকারে সরে পড়েছে। অথচ সারা রাত কী প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসই না বয়েছে একটানা। ওরা যে সত্যি সত্যিই চলে গেছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে

একটা টহলদার বাহিনী পাঠাল জর্জ। তারা তীর ধরে বরাবর গিয়ে দেখবে, কেউ আছে কিনা। সূর্য ওঠার পরেই আমাদের নজরে এল শকুনির পাল আর মারাবুর দল নামছে দ্বীপটায়। মারাবু পূর্ব আফ্রিকার একজাতীয় সারস। ওদের সব থেকে প্রিয় মাংস।

এতে আমরা ধারণা করলাম, গ্যালুব্বারা চোরাগোপ্তা অভিযানে এসে মাছ ধরেছে আর জলহস্তী মেরেছে, তাই শকুনি আর সারসের এই ভোজের মহোৎসব।

সকাল এগারোটা নাগাদ হঠাৎ দুটো ক্যানো নলখাগড়ার ঘন একটা আড়াল থেকে বেরিয়ে মাঝবরাবর আসতে লাগল। ওদের ঘাবড়ে দেবার জন্যে দুটো গুলি ছুঁড়ল জর্জ। ক্যানোটা তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে আবার সেই নল বনের আড়ালে আশ্রয় নিল। তারপর জর্জ কয়েকটা লোক পাঠাল গ্যালুব্বাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের তীরে আসতে বলার জন্যে।

কিন্তু ওরা খুব কাছাকাছি গেলেও গ্যালুব্বারা হাঁকডাকে সাড়া না দিয়ে নল বনের আরো ভেতরে, আরো গভীরে ঢুকে গেল। সারা দিন দেখলাম আমরা, নল বনের ওপর দিয়ে মাথাগুলো বের করে আমাদের খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ওরা। আন্দাজ হল, নল বনের মধ্যে অন্তত চারটে ক্যানো লুকিয়ে আছে। আসল দল থেকে এরা বেরিয়ে গেছে ছিট্‌কে। ওদের কাছে পৌঁছনো অসম্ভব। জর্জ ভাবল, ওদের এখন ঘরমুখো করাই ভাল হবে। কাজেই অন্ধকার হতেই ও ছুঁড়ল আলোর ঝলক দেওয়া গুলি আর পিস্তলের রঙীন গুলি—কিছুক্ষণ পরে পরেই। ঠিক জলটার ওপরেই।

ইতিমধ্যে আমাদের রসদে টান পড়েছে, ফিরতে হবে এবার। ব্যাপার যা দাঁড়াল তাতে এই হল যে, সফরের প্রথম পর্বটা যেন সব কিছু ফেলে ছড়িয়ে এক ধরনের বিলাসিতায় কাটল। দ্বিতীয়পর্বে, অর্থাৎ ফিরতি পথে শুধু জলের প্রাচুর্যই থাকতে পারত—ঐ হ্রদের কিছু লোনা জল। কিন্তু তারই বা উপায় রইলো কই ? কারণ, ঠিক করা হল, যে পথে আসা হয়েছে সেই পথে না ফিরে দেশের মধ্যে দিয়ে ফেরা হবে।

এবারের গন্তব্য পথের অবস্থাটা আমাদের কারোরই জানা ছিল না, তাছাড়া, এই পথে কোথায় জল মিলবে তাও ওদের অজানা। গর্তের মধ্যে জমে থাকা জলই একমাত্র ভরসা—তার সংখ্যাও খুব কম আর অনেক দূরে দূরে, বিশেষ করে এখানকার শুখার সময়ে। জর্জ অবশ্য হিসেব করে দেখল, হ্রদ থেকে আমরা একদিনের বেশি রাস্তার তফাতে থাকব না। কাজেই যদি তেমন জলের টান পড়ে তাহলে আমরা হ্রদে এসে নিয়ে যেতে পারব। হ্রদের তীর ছেড়ে যেতেই মৃদুমন্দ হাওয়া আর রইল না। সময় সময় মনে হচ্ছিল এই

গরমে শরীরে আর বুঝি একটুও জলীয় পদার্থ অবশিষ্ট নেই।

যে পথ দিয়ে এসেছি তার থেকেও এবারের পথ আরো নির্জন। লাভা ছাড়া কোথাও একটু ফাঁক নেই জমিতে। সুতরাং লোকবসতি তো নেই-ই, এমন কি শিকার করার মত কোন প্রাণীও নেই আশেপাশে। নেহাৎ লোওনগ্যালেন থেকে কিছু ভেড়া আনা হয়েছিল, তাই রক্ষে! এল্‌সার রসদ চট্‌পট্‌ ফুরিয়ে যেতে থাকলেও একেবারে ভাঁড়ার খালি হয়নি। কিন্তু আমাদের সবায়ের শরীর শুকিয়ে বাড়তি ওজনটুকু কমে এসেছিল।

এবার ফিরতি পথে আমাদের গতি দ্রুত। গাধাগুলো বেশি ভার বইতে পারছিল না। পথে জল নেই কোথাও, তাই রোজ অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হচ্ছিল।

আঠারো দিন পরে ফিরতি পথে লোওনগ্যালেন পৌঁছে দেখা গেল আমাদের আগুসার বনরক্ষীদের দল নেহাৎ শুয়ে বসে কাল কাটায়নি। অন্তত চার চারজন তার্কানা উপজাতির বে-আইনী শিকারীকে ধরে রেখেছে। ওরা শিকার ধরতে বেরিয়েছিল। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।

ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে জর্জকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। বছর দশেক আগে এই ধরনের এক বে-আইনী কাজের জন্যে জর্জই নাকি ওকে ধরে পুলিসের হাতে সঁপে দেয়। তারপর মার্সাবিতে মেয়াদ খাটতে হয় লোকটাকে। সরলভাবে লোকটা আরো বলল, জেলে জোর-জবরদস্তির বন্দীজীবন ওর মন্দ লাগেনি। কিন্তু তাই বলে নতুন করে সেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। লোকটার বয়েস হয়ে গেছে। তাই জর্জ আর ওকে মোকদ্দমায় ঝোলাবার ব্যবস্থা করল না। শুধু ওকে বলল, আমাদের সফরের বাকী পথটুকু ওকে গাধা চালাতে হবে।

লোওনগ্যালেন থেকে নর্থ হার নামক জায়গাটায় লোক পাঠানো হল। তিনটে সোমালি দোকান আছে সেখানে। এদেশীয় লোকজনের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের দরকার ছিল। থানার দেশীয় ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে জর্জ জানাল, জনা-আষ্টেক ঘোড়ায় চড়া বে-আইনী শিকারীর একটা দল দেখা গেছে লোওনগ্যালনে আর নর্থ হারের মাঝামাঝি। মনে হয় দলটা সীমান্ত পার হয়ে আসা বোরা উপজাতীয় লোকেদের। টাট্টু চেপে এরা চার-পাঁচদিন পর্যন্ত নির্জলা অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে অভ্যস্ত। প্রায়ই রাইফেল থাকে এদের কাছে। ওরা গুলি করে জিরাফ মারে। ওদের একই পথের পথিক রয়েছে এপারে, তাদের সঙ্গে যোগসাজস থাকে, রক্ষীবাহিনীর গন্ধ পেলেই হুঁশিয়ার করে দেয়। যাই হোক, এবারে উটের পিঠে চেপে এক টহলদার বাহিনী ওদের পেছনে কয়েক দিন ধরে ঘোরাঘুরি করে শেষ অবধি আচমকা ঘিরে

ফেলে সকলকে। একজন চোট পায়, সাতটা টাট্টু ধরা পড়ে। বাকী সবাই পালিয়ে যায়।

লোওনগ্যালেনে তিনদিন কাটল আমাদের বাকী পথের জন্যে সব কিছু গোছগাছ করে নিতে। এবার চড়াই ভাঙতে হবে কুলাল পাহাড়ে। রুডল্‌ফ্‌ হ্রদের বিশ মাইল পূর্বে এই পাহাড়টা। উচ্চতা প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট। চারপাশে মরুভূমি। যেটুকু বর্ষণ সে কেবল পাহাড়ের চুড়োয়, ফলে সেখানে গহন বন। ছোটখাটো আগ্নেয়গিরি এটা, আঠাশ মাইল লম্বা। মাঝের জ্বালামুখটার ব্যাস প্রায় চার মাইল। ওটা আবার ফেটে দু-খানা হয়ে পাহাড়টাকে উত্তর দক্ষিণে দু-ভাগে ভাগ করে ফেলেছে।

লোকে বলে, এক বড় ভূমিকম্পে কুলাল পাহাড়ে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়। জ্বালামুখের ওই ভীতিজনক বিরাট চিড়টার সৃষ্টিও তখনই। এর মসৃণ দেওয়ালগুলো খোসা ছাড়ানো কমলালেবুর কোয়ার মত ভাগ ভাগ হয়ে আছে। জ্বালামুখের কানা থেকে এই গভীর শিরাগুলো অন্তত তিন হাজার ফুট করে নীচে; ওপর থেকে দেখা যায় না। নীচে যে গিরিসংকট রয়েছে তার নাম এল্‌সিগাতা। ওটা সোজা চলে গেছে পর্বতের কেন্দ্রে। এর খাড়াই দেয়াল কয়েকশো ফুট করে উঁচু। জায়গায় জায়গায় ফাঁকগুলো এত সরু যে ওপরের আকাশ দেখা যায় শুধু একটা ফাটলের মধ্য দিয়ে।

গিরিসংকটে অভিযান চালাতে গেলাম আমরা। কুলাল পর্বতের পূর্ব দিকের পাদদেশ দিয়ে এগোবার চেষ্টা করা হলো। পথ আটকে আছে বিরাট পাথর আর গভীর জলাশয়। তাই হার মেনে ফিরতে হল আমাদের।

আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য হল, পাহাড়টার বন্য-প্রাণীগুলো বহাল তবিয়তে আছে, না চোরাগোপ্তা শিকারীদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে, তা দেখা। বারো বছর আগে জর্জ এদিকটায় চক্কর দিয়ে গেছে। সে সময়কার তুলনায় এখানকার অবস্থাটা কেমন বোঝা যাবে। বিশেষ করে জানার দরকার ছিল, বড় কুডু হরিণের সংখ্যা কমেছে কি না।

নীচে থেকে কুলালকে দেখতে মোটেই ভালো লাগে না। একটানা লম্বা চলে গেছে পাহাড়টা—চওড়া চওড়া শিরা দিয়ে শেষ অবধি চূড়া আবিষ্কার করলাম। শিরাগুলো এত সরু হয়ে গেছে যে, দল বাঁধা প্রাণীর আসা যাওয়া খুব কমে এসেছে এখানে।

প্রথম দিন আমাদের যেতে হল ঘন লাভার নুড়ির ওপর দিয়ে। এমন অবস্থায় পিঠে বোঝা নিয়ে পথ চলতে জানোয়ারগুলোর ভারি কষ্ট হচ্ছিল। ক্রমশ ছুরির মত ধারাল হল পাহাড়ের খাঁজ। একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা কঠিন। গাধাগুলোর পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে এবার

লোকজনদের দিয়ে বওয়াতে হচ্ছিল।

দ্বিতীয় রাতে পাহাড়ের চড়াই ভেঙে একটা খাড়া উপত্যকায় ক্যাম্প করেছি। লাভা নুড়িতে সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে আছে। কাছেই একটা ছোট্ট প্রস্রবণ, যা মাত্র এক একটা করে প্রাণীর তৃষ্ণা একবারে মেটাতে পারে। শেষ গাধাটার তৃষ্ণা মেটাতে বড় দেরি হল কুলালের ওপরের মুষ্টিমেয় কয়েকটা প্রস্রবণের অন্যতম এটা, কাজেই সম্বুরু উপজাতীয়দের কাছে খুবই দরকারী। শুখার সময়ে ওরা ওদের পালিত পশুবাহিনী নিয়ে আসে এখানে।

এল্‌সার পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতিটা বেশ ঘোরাল। উট, ছাগল, গরু ইত্যাদির পাল তার সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করছে এদিক ওদিক। এই প্রস্রবণ এবং জানোয়ারগুলোকে দেখে লোভ সামলানো দায় হলো এল্‌সার। কিন্তু বুদ্ধি আছে ওর। স্বভাবটাও চমৎকার। পরিস্থিতিটা যেন বুঝে ফেলল এল্‌সা। এই পশুগুলোর মাথা-বিগড়ে দেওয়া লোভনীয় গন্ধটাও সইয়ে নিল ও। ওর মাত্র কয়েক ফুট তফাত দিয়ে যাতায়াত করত ওরা। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অবশ্য বেঁধে ফেলতাম ওকে। তবে ও কোন চেষ্টাই করত না ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। শুধু হট্টগোল আর ধুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে চাইত। কুলালের চড়াই পথ খুব খাড়া। উঁচু ঢালগুলোতে পৌঁছতেই আবহাওয়া হয়ে গেল মেরু অঞ্চলের মত। আমরা টিলা ভাঙলাম, গভীর গিরিখাত পার হলাম, উঁচু গিরিচূড়া টপকালাম। ঝোপগুলো এখানে খাটো খাটো। তারপর থেকে চমৎকার সবুজ আল্পীয় বনভূমি।

পরের সকালে আমরা কুলালের চূড়ায় পৌঁছলাম। কম বেশি সমান জমিতে হাঁটতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সকলে। সুন্দর একটা ছোট্ট উপত্যকায় ক্যাম্প করা হল। খুব কাছে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। সম্বুরু উপজাতীয়দের গৃহপালিত পশুরা ঝর্ণাটার চারধার কাদায় নোংরা করে রেখেছে। আমাদের সঙ্গে প্রায় পুরো আকারের একটা সিংহকে দেখে ওদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

চূড়ার কাছে যে গহন বন সেখানে প্রা॰ প্রতি সকালেই ঘন কুয়াশা হয়। সীডার গুঁড়ি সাজিয়ে আগুন জ্বালতে হল আমাদের। রাতে এত বেশী ঠাণ্ডা যে, এল্‌সাকে আমার ছোট্ট তাঁবুটায় রাখতে বাধ্য হলাম। নরম শ্যাওলার বিছানা করে দিলাম ওকে আর সব থেকে গরম কম্বলটা চাপা দিলাম ওর গায়ে। রাতে জেগে উঠে আবার কম্বল তুলে দিই এল্‌সার গায়ে। কেন না পা থেকে চাপা খুলে যাওয়ায় শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ওর সারা শরীর। যখনই কম্বল তুলে চাপা দিতে যাই এল্‌সা আমার বাহু চাটতে থাকে। কখনো তাঁবু ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়নি। বরং যে সময় জেগে ওঠে তার

অনেক পর পর্যন্ত শুয়ে থাকে ও। শ্যাওলার মধ্যে নাক মুখ গুঁজে উষ্ণ আরাম উপভোগ করে পড়ে পড়ে। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া, শীত আর হিম। কিন্তু যেই রোদ দেখা দেয় প্রাণ আসে ওর মধ্যে. পাহাড়ের চাগিয়ে তোলা বাতাসের ছোঁয়ায় চনমনে হয়ে ওঠে ও। জায়গাটার প্রেমে পড়ল এল্‌সা। সত্যি কত যাদু! নরম মাটি, ঠাণ্ডা ছায়া-ঘন বনবীথি আর গড়াগড়ি দেবার জন্যে ওর সব থেকে প্রিয় মহিষবিষ্ঠা!

কোন কষ্টই নেই হাঁটতে এখানটায়। ছায়াময় উচু জায়গায় ঠাণ্ডার মধ্যে সমস্ত পাহাড় চূড়োটাতে আমাদের সঙ্গে ঢুঁড়ে বেড়াতে থাকে ও। দেখে, ঈগলরা চক্কর দিচ্ছে উঁচুতে। কাকেরা ওকে জ্বালিয়ে মারে। নীচে নেমে ঠোক্কর দিয়েই পালিয়ে যায়। একবার একটা মোষকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পিছু নিয়েছিল। এল্‌সার ঘ্রাণ, শ্রবণ আর দর্শন এই তিন ইন্দ্রিয় দিনের পর দিন সতেজ হয়ে উঠেছে। কখনোই ঘন লতা-গুল্মের জঙ্গলে হারিয়ে যেত না। এক বিকেলে এল্‌সা আমাদের সঙ্গে ঝোপেঝাড়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলেছে। আমাদের সামনের বাহিনী বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে বেশ কিছুটা। একটা মোড়ে এল্‌সার অদৃশ্য হবার পরমুহূর্তে আমাদের কানে এল আতঙ্কিত গাধার ডাক। পরক্ষণেই বনবাদাড় ভেঙে উদভ্রান্তের মত একটা গাধা ছুটে বেরিয়ে এল। তাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে এল্‌সা। বনটা ভাগ্যিস ঘন ছিল, তাই জোরে যেতে পারেনি ওরা। তাড়াতাড়ি আমরা এই আক্রমণকারী আর আক্রান্ত জুটির কাছে এসে ওদের ছাড়িয়ে দিলাম। উত্তম মধ্যম মার দিলাম এল্‌সাকে। এমনটা কখনো করেনি ও এ পর্যন্ত।

মনে মনে খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমার অহঙ্কার ছিল, কথা শোনে আমার এল্‌সা। অযৌক্তিকভাবে কোন জন্তুকে ধাওয়া করলে আমার ধমকে ফিরে আসে। কিন্তু এবার দোষটা হয়েছে আমারই। ওকে আগে রেখে এগোনো উচিত। আর যে লোকটা গাধার পাল সামলাচ্ছিল, তারও দোষ। কেননা দলছাড়া হয়ে একটা গাধা পিছিয়ে পড়েছে এটা তারই দেখা উচিত। আরও একটা খারাপ যোগাযোগ হয়ে গেছে। ভাব বোঝাই হওয়ার সময়ে গাধাগুলো সেই দিনই এল্‌সাকে উত্তেজিত করেছিল। ও তখন বাঁধা, তেমন অবস্থায় ওর খুব কাছে ঘোরাঘুরিও করছে। নিঃসন্দেহে, পরে একাকী একটা গাধাকে বনের মধ্যে পেয়ে এল্‌সা আর প্রলোভন সামলাতে পারেনি। তার ওপর ঐ বাঁট্‌কুল গাধাটারও দোষ রয়েছে। বেশ কিছুদিন বেগ দিচ্ছে নানাভাবে। এইসব ঘটনাবলী বিবেচনা করে এল্‌সাকে ক্ষমা করতে হল, দোষ দিতে পারলাম না ওকে খুব বেশি। আর বিশেষ করে এল্‌সা তখন

হাবভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল, আমাদের খুশি করবার জন্যে ওর যতগুলো কায়দা কানুন জানা ছিল তার কোনটাই কাজে লাগাতে বাকী রাখছিল না। একদিন আমরা দাঁড়ালাম জ্বালামুখের কানায়। পর্বতটা দু ভাগ হয়েছে সেখানে। উত্তরের দিকে চাইলাম। চার মাইলের বেশি দূর নয় বটে, তবে যেতে দু-দুটো দিন হাঁটতে হবে। সেই হাজার ফুট উঁচু চূড়াটায় নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে এল্‌সা দাঁড়াল সরল ভাবে। ওকে দেখে আমার মূর্ছা যাবার উপক্রম। কিন্তু পশুদের বোধহয় উচ্চতাব ভয় নেই। অবিচল ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল এল্‌সা।

পরের দিনই নামলাম এল্‌সিগাতা গিরিসংকটের মুখে। সেখানেই ক্যাম্প হল। সারাটা দিন লম্বা সুদর্শন রেণ্ডিল উপজাতির লোকেরা উট, ভেড়া, ছাগলের পাল নিয়ে গিরিসংকটের চার মাইল ওপরের জলধারায় জল খাওয়াতে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। ওদের পিছু পিছু উটের দড়ি ধরে চলেছে ওদের মেয়েরা। উটগুলোর নাক থেকে লেজ অবধি দড়ি বাঁধা, পিঠে জলের পাত্র। এক এক পাত্রে আন্দাজ ছ' গ্যালন জল ধরে। পাত্রগুলো গাছের আঁশ বুনে তৈরি করা।

ফাটলটা ধরে এগিয়ে গেলাম আমরা। তার মানে, পাহাড়টার মধ্যে ঢুকলাম। গিরিসংকটের মেঝেটা প্রায় পাঁচ মাইল বরাবর কোন শুকিয়ে যাওয়া জলধারার খাত। উঁচু দেয়ালের মাঝ দিয়ে উঠে গেছে শনৈঃ শনৈঃ দেয়াল, দু-দিকে একেবারে খাড়া। কেউ যদি আরো ভিতরে চলে যায়, দেয়ালগুলো পনেরোশো ফুট অবধি উঁচু হয়েছে দেখবে; মনে হবে সেগুলো যেন একদমে ওঠা এক একটা চূড়ো। কোথাও কোথাও গিরিসংকট এত সরু হয়ে গেছে যে, ভারবোঝাই দুটো উট পাশাপাশি চলতেই পারে না। মাথার ওপরে পাথর বেরিয়ে আছে। আকাশটা দেখা যায় না সে সব জায়গা থেকে। যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে ঝির্‌ঝিরে জলের ধারায় বেশ একটা পাহাড়ী স্রোতস্বতী তৈরি হয়েছে—পাথরঘেরা জলাশয় ছড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, পরিষ্কার টলটলে জল। সে জায়গাটা ছাড়িয়ে গেলাম আমরা। অবশেষে অনেকটা পথ পার হয়ে পৌঁছলাম ত্রিশ ফুটের একটা জলপ্রপাতের পাশে। খুব খাড়াই জলপ্রপাত।

আমাদের সঙ্গী হার্বাট একজন পর্বতারোহী। জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে সে খাড়াই চড়ে ওপরে উঠে দেখল, ওপারে আরও একটা জলপ্রপাত—অনেক বেশি উঁচু।

এল্‌সিগাতা জায়গাটা চোরাগোপ্তা শিকারীদের রম্যভূমি। এখানে ঘাপটি দিয়ে থেকে জল খেতে যাওয়া জন্তুদের শিকার করা খুব সোজা। একবার

একটা জানোয়ার এমনিভাবেই ফাঁদে পড়েছিল। ওৎ পেতে থাকা শিকারীদের দিকে গিয়ে পড়া ছাড়া বেরোবার অন্য পথ ছিল না।

এল্‌সিগাতা থেকে উত্তরের পার্বত্যস্তূপের মাথায় যেতে দেড় দিন সময় লাগে। ঐ জায়গাটায় সম্বুরু উপজাতির বসতি দেখলাম খুব ঘন, আর ওদের পালিত জন্তুর পালও মস্ত বড়। অতএব এল্‌সার ঘুরে-ফিরে ইচ্ছেমত বেড়াবার স্বাধীনতা খাটো করতে হল।

শিকার নেই। আগে মোষ আসত প্রচুর। আমরা জানলাম গত ছ-বছর পাহাড়ের উত্তরসীমায় ওরা আসেইনি মোটে। বড় আকারের কুডু হরিণও ক্বচিৎ দেখা যায়। শুধু ওদের সামান্য কিছু পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম আমরা।

জর্জের ধারণা হল, সম্বুরুদের পশুর পাল এখানকার চরে বেড়ানোর জায়গা-গুলোর ঘাস খেয়ে পাহাড়টাকে নগ্ন করে ফেলছে। সম্ভবত এই কারণেই বনের পশুরা আর এধারে ঘেঁষে না।

জমাট লাভার ভাঙা ভাঙা ধারালো টুকরোগুলো লোওনগ্যালেনে ফেরার উৎরাই পথে ছড়িয়ে আছে। কাজেই পড়তে পড়তে হোঁচট খেতে খেতে নামা, একেবারে সমস্ত উৎসাহ আর শক্তিটুকু খুইয়ে। এমন কি, নামার মুখে রুড্‌ল্‌ফ্‌ হ্রদের অপূর্ব মনোহর দৃশ্যও এই কষ্টে সান্ত্বনা যোগাতে পারলো না।

বেগুনী নীল পাহাড়ের পটে সীসে-রঙ হ্রদের বুকে অস্তগামী সূর্যের লালচে রঙ ঝক্‌মক্‌ করছে। মাথার ওপরে কমলা-হল্‌দে আকাশ। রঙে রঙে চৌদিক জমজমাট, নিভন্ত দিনের শেষ রশ্মি কোন শান্ত মায়ায় ঘিরে রেখেছে সেই রঙদারীকে। অত দূরে ওপর থেকে দেখা দৃশ্যটা মনকে জুড়িয়ে দেয়। সব শ্রান্তি, সব অবসাদ এক মুহূর্তে মিলিয়ে যায় কোথায়। কিন্তু হায়! অবিরাম হোঁচট আর আছাড়ের মাঝে প্রকৃতির এই যাদু অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের চোখের সামনে।

পিছু ফিরে ফিরে পাহাড়ের দিকে দেখতে লাগল এল্‌সা, শীতল বনভূমির দিকেও তৃষিত চোখ মেলে চাইল বার বার। তারপর সেইদিকেই দৌড়তে চাইল। কাজেই ওকে বাঁধতে হল আবার।

আঁধার হওয়ার পথ হারালাম সকলে। কয়েক গজ করে গিয়ে শুয়ে পড়ে এল্‌সা। যেন বোঝাতে চায়, যা হয়েছে এ অবধি ওর পক্ষে তা যথেষ্ট। প্রায় পরিণত হয়ে এলেও এল্‌সা ঘাবড়ে গেলে এখনো আমার বুড়ো আঙুল চোষে, সে রাতে অনেকবার আমার বুড়ো আঙুল ওর লালায় ভিজল। শেষ অবধি রঙিন আলোর কয়েকটা গুলি ছুঁড়লো আমাদের আগুসার দল, তাতেই ক্যাম্পের পথ খুঁজে পাওয়া গেলো অবশেষে।

টলতে টলতে ক্যাম্পে ঢুকলাম আমরা। এল্সা কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। এমন কি সে রাতে খেতে চাইল না পর্যন্ত। অবসাদে আমারও ক্ষিদে ছিল না। বেশ বুঝছিলাম, দুঃস্বপ্নের মত সেই পথভোলা পথযাত্রায় কত না কষ্ট হয়েছে ওর। অবশ্যই ও জানত না, রাতে ধারাল নুড়ি বিছানো পথে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কেন আমরা ঘুরে মরছিলাম অযথা। শুধু আমাদের ওপর আদর আস্থা আছে বলেই ও অত কষ্ট সইতে পেরেছে। এই সাফারীতে অন্তত তিনশো মাইল ও হেঁটেছে; আর তাতে যত কষ্টই পাক না কেন, এর ফল হয়েছে এই যে, আমাদের মধ্যেকার অন্তরের বাঁধন শুধু দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে গেছে। যতক্ষণ ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বোঝে ওর সোহাগ আছে, দেখাশোনার লোক আছে, ও সুখ পায়। আমাদেরও ওর প্রতি স্নেহের বাঁধন আরো জোর হয় যখন আমরা বুঝতে পারি এমন এক গরবিনী বুদ্ধিমতী বেড়ে উঠছে আমাদের মাঝে—যার আর কেউ নেই, যেখানে ওর আদর খাবার তীব্র বাসনা মিটবে কিংবা যুথবদ্ধ হয়ে বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তি গড়ে উঠবে। বাস্তবিক সময় সময় ও হয়ে দাঁড়াত একটা মূর্তিমতী উৎপাত ওকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না আমাদের। অন্য কারো কাছে কখনো আমরা ওর ভার দিইনি। কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে এই সামান্য ত্যাগের বদলে ওর প্রতিদান অনেক বেশি।

আমাদের আর ওর পারস্পরিক বোঝাপড়ায় তফাত এসেছিল ওর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে বনের সিংহের জীবনে ব্যবহার করার মত করে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা থেকে। ওর মধ্যেকার যে প্রচণ্ড প্রবৃত্তিগুলো সব সময়েই দেখা দেবার চেষ্টা করত, তাও কেমন করে সামলে রাখত দেখলে বুক ফেটে যেত। আমাদের তুষ্ট রাখার জন্যে আমাদের জীবনের সঙ্গে কেমন মানিয়ে নিয়েছিল নিজেকে।

কিছুটা নিজের চরিত্রের জন্যেই ওর এই চমৎকার মেজাজটা গড়ে উঠছে। আর বাকীটা সম্ভবত আমাদের সহৃদয় ব্যবহার এবং ওর প্রতি ঐকান্তিক মনঃসংযোগের ফলশ্রুতি। শুধু সদয় ব্যবহার করেই ওকে আমরা সাহায্য করতে চাই দুই জগতের মধ্যেকার বেড়া ডিঙোবার বাহাদুরি নেবার জন্যে। স্বাভাবিক জীবনে খাবার পেলে বনের সিংহ কখনো অনেকটা পথ পাড়ি দেয় না। স্বজাতীয় স্বগোত্রদের মধ্যে থাকলে এল্সা যা দেখতে, বুঝতে, জানতে পারত, আমাদের সঙ্গে থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছে ও। তবু নিজের ঘর ও চেনে। সাফারী থেকে ফিরেই ও নিজের অভ্যাস আর রোজকার কাজের ছকে নিয়মিত হয়ে যেত, একটুও নড়চড় হত না তার।

এল্‌সা আর বনের সিংহ

এল্‌সার আচার ব্যবহার ভারী চমৎকার। সামান্য একটু সময়ের জন্যে ছাড়াছাড়ি হলেও আবার যখন দেখা হতো আমাদের, সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে ছুটে আসতো এল্‌সা। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তার গায়ে মাথা ঘষে, মুখ দিয়ে গোঙানির মত মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ করে নিজের আনন্দ প্রকাশ করতো। অনিবার্য ভাবেই প্রথমে আসি আমি, তারপর জর্জ আর পিছু পিছু নুরু। যেই কাছে এসে পড়ুক না কেন, ওর সম্বর্ধনা চলতো একই ভাবে। তবে ও বোঝে কার আদরটা বেশি আর তার কাছেই বেশি করে সোহাগ কাড়তে যেত।

যুক্তিযুক্তভাবে আমাদের যে অতিথিরা এল্‌সাকে দেখে ঘাবড়ে যেতেন, তাঁদেরও বেশ মানিয়ে নিয়ে চলতো। কিন্তু যাঁরা অহেতুক ভয়তরাসে, তাঁদেরই দুর্গতি হয় বেশি। কোন ক্ষতি করে না তাঁদের, কিন্তু তাঁদের আতংকিত আর তটস্থ করে দিয়ে যেন ও মজা পায়।

ও যখন ছোট বাচ্চা, তখন থেকেই শিখেছে কেমন করে শরীরের ভারটা কাজে লাগাতে হয়। এবার সত্যি কাজের কাজ হয় ওর শরীরের ভার দিয়ে। যখনই আমাদের চলতি পথে থামাতে চায়, ওর সমস্ত জোর দিয়ে শুয়ে পড়বে পায়ের ওপর। তারপর শরীরের চাপ দেবে পায়ের সামনেটায় আর একেবারে আমাদের উল্টে ফেলবে ও মাটিতে।

রুডল্‌ফ্‌ হ্রদের সফারী থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সান্ধ্য-ভ্রমণের সময়ে ওর অস্থিরতা দেখা যেতে লাগল। কখনো কখনো ফিরতেই চাইত না আমাদের সঙ্গে। বাইরে ঝোপে রাত কাটাতে চাইত। ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে গিয়ে তবে ওকে তুলে আনতে পারতাম আমরা। আসলে ও ঠিক করেই ফেলেছিল, হেঁটে বাড়ি ফেরার কষ্ট স্বীকার করাটা কাজের কথা নয়: বিশেষ করে মহারাণীকে বয়ে আনবার জন্যে যখন গাড়ি যাবেই। ফিরে আসবার সময় এক লাফে উঠে যাবে ক্যানভাসের ছাদে, আরাম করে জিভ ঝুলিয়ে বসবে; আর যখন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসব, ও সেই ছাদের ওপর থেকে ওর খেলার শিকার দেখতে দেখতে যাবে। ওর দিক থেকে এমন ব্যবস্থা করে নেওয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিদায়ক। তবে গাড়ি যারা প্রস্তুত করেছেন তাঁরা তো আর গাড়ির ছাদে সিংহীদের বসবার জন্যে কোন বন্দোবস্ত করে রাখেননি! ফলে ওর ভারে ক্রমশ ছাদের কাঠামোটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল ক্যানভাস। এল্‌সার শরীরটা ছাদশুদ্ধু আমাদের ওপর ঝুঁকে পড়তে লাগল।

কাঠামোটা আরও শক্ত করে বেঁধে দিল জর্জ। ক্যানভাসের ঢাকাটাও আরো পুরু করলো।

আমাদের সঙ্গে না থাকলে নুরু ছিল ওর সব সময়ের সঙ্গী।

একদিন ঠিক করা হল নুরুর সঙ্গে ওর ছবি তোলা হবে। কাজেই নুরুকে বলা হল ছেঁড়াখোড়া প্যান্ট সার্ট ছেড়ে ছিমছাম পোশাক পরে আসতে। কিছুক্ষণ পরে যে পোশাক পরে নুরু দেখা দিল তা দেখে আমাদের চোখ কপালে ওঠে আর কি! বিয়ের জন্যে যে পোশাক কিনে রেখেছে, ও তাই পরে হাজির। চমকে দেওয়ার মত আঁটসাঁট মাখনরঙের জ্যাকেট, সামনে সূচের কারুকার্য করা আর নীচের দিকে কোমরবন্ধ। আমাদের মনে হল ঐ পোশাকে ওকে পেশাদার সিংহ বশকারীর মত দেখাবে। এল্‌সা ওকে একটিবার দেখেই দৌড় দিল বনের দিকে। সেখান থেকে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখে অবশেষে চিনতে পারল চীজটিকে। তারপর নুরুর কাছে এসে দিল ওকে এক থাবার ঝাপটা। যেন বলতে চাইল, 'এমন সঙ সেজে কেন ঘাবড়ে দিচ্ছ আমাকে?'

নুরু আর এল্‌সার অনেক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। নুরু যেমন গল্প করেছে, তেমনি বলছি একটা ঘটনা। একদিন একটা ঝোপে জিরোচ্ছে ওরা, বাতাসের অনুকূল দিক দিয়ে এক চিতা এসে হাজির। এল্‌সা উৎকর্ণ হয়ে সব লক্ষ্য করছিল, উত্তেজনায় থরো থরো অবস্থা ওর। কিন্তু চুপ করে সামলে রাখলো নিজেকে। শুধু লেজটা নাড়ছিল। চিতাবাঘটা প্রায় ওর ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল। তারপর হঠাৎ জানোয়ারটা এল্‌সার লেজ নড়তে দেখল। ব্যাস! তারপরেই বিদ্যুৎগতিতে দে ছুট! পালাবার সময় এমন দিশেহারা হয়ে পড়লো যে, নুরুকে ঠেলে ফেলে চলে গেল।

এল্‌সার বয়েস হয়েছে তেইশ মাস। গলার আওয়াজটা বদলে গেছে। ডাক শুনলে মনে হয় গভীর গর্জন। মাসখানেক পরে দেখা দিল ওর সঙ্গ-সাধের লক্ষণ। সাধারণত যেখানেই আমরা যেতাম, ও সঙ্গে সঙ্গে যেত। কিন্তু দিন দুই ধরে মনে হল, উপত্যকা পার হয়ে ওপারে ও যাবেই যাবে। এক বিকেলে ও আমাদের নিয়ে গেল ওর পছন্দ করা দিকে। কিছুটা পথ যেতে না যেতেই আমাদের চোখে পড়ল সিংহের থাবার তাজা ছাপ।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, আর ফিরতে চাইল না ও। গাড়ি চলাচলের রাস্তার কাছেই ছিলাম আমরা। জর্জ ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে রওনা দিল। আমি বাড়ি রইলাম, কেন না এদিক দিয়ে সোজা পথে ও এসে যেতে পারে।

এল্‌সা যেখানে ছিল সেখানে ফিরে এসে জর্জ আর ওকে দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ এল্‌সার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল জর্জ। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

ডাকগুলোর প্রতিধ্বনি শুধু ফিরে এল পাহাড় থেকে। জর্জ আরও মাইলখানেক এগিয়ে গেল এল্সাকে ডাকতে ডাকতে। তারপরে আন্দাজ করল যে, ইতিমধ্যে এল্সা হয়ত বাড়ি ফিরে গিয়ে থাকবে। সেই ভেবেই ফিরে এল ও।

জর্জ ফিরে আসার পর ওকে জানালাম দীর্ঘ দুটি ঘণ্টা কেটে গেছে এল্সার প্রতীক্ষায়, কিন্তু বৃথাই। আবার বেরিয়ে গেল জর্জ ওকে খুঁজতে। কিছুক্ষণ পরে গুলির শব্দ পেলাম একটা। যে পর্যন্ত জর্জ না ফিরল দারুণ উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ফিরে এসে যা বলল, শুনে আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড়।

জর্জ বলল, আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজি ডাকাডাকি করেও এল্সার দেখা মেলেনি। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে গাড়ি থামিয়ে কী করবে ভাবছে, হঠাৎ গাড়ির দুশো গজ আন্দাজ পেছনে একাধিক সিংহের গর্জন শুনতে পেল। পরমুহূর্তেই একটা সিংহী প্রচণ্ড গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। পেছনে পেছনে ধাওয়া করে আর একটা সিংহীও ছুটে আসছে উদ্দাম গতিতে। ওরা যেতেই রাইফেল নিয়ে জর্জ দ্বিতীয় সিংহীটাকে গুলি করল। কারণ জর্জের ধারণা হল যে, ধাওয়া করা সিংহীটা হিংসার বশে এল্সাকে শেষ করতে চাইছে। সম্ভবত জর্জের ধারণাটাই ঠিক। যাই হোক, তারপরে গাড়িতে চেপে জর্জ ওদের পিছু পিছু চলল। আশপাশে টর্চলাইট ফেলতে ফেলতে ঘন কাঁটা ঝোপের সরু শুঁড়ি পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে এলো জর্জ। তারপরেই ওর গতি রুদ্ধ হয়ে গেল একটা সিংহ আর দুটো সিংহী দেখে। অনিচ্ছুক ভাবেই পথ ছেড়ে দিল তারা, শুধু যাবার সময় প্রচণ্ড গর্জনে সচকিত করে তুলল চারধার।

এই অবস্থায় ফিরে এসেছে জর্জ আমায় নিয়ে যাবার জন্যে।

এবার আমি চললাম জর্জের সঙ্গে। পাগলের মত এল্সার নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম বারবার। প্রত্যুত্তরে পরিচিত কোনো শব্দ ভেসে এল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মাত্র কয়েকশো গজ দূর থেকে সিংহ সিংহীর সম্মিলিত গর্জন শুনতে পেলাম। যেন আমাদের ডাককে থোড়াই কেয়ার করছে তারা। সেদিকে গাড়ি চালিয়ে গেলাম আমরা, দেখা হল দীপ্তিময় তিন জোড়া চোখের সঙ্গে।

আর কিছু করবার নেই। অরণ্যের আঁধার বুকে এল্সা তার নিজের ভাগ্য সঁপে দিয়েছে।

বেদনাবিদ্ধ হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম। মনের মধ্যে যে কি গভীর আলোড়ন চলছে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

তাহলে কি ঈর্ষাপরায়ণা সিংহীর ক্রোধের শিকার হবে এল্‌সা ?

ওর এখনকার অবস্থায় নিশ্চয় সিংহ-সংসর্গ ঘটেছে। সিংহের যে ঘরণী সে কখনই তার সতীন-কাঁটাকে সইবে না। বুক দুরু দুরু করতে লাগল আমাদের। শেষকালে কি পাশবী হিংসার বলি হবে এল্‌সা ? এতদিন ধরে কত আদরে, কত সোহাগে তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে ও। কিন্তু অরণ্যের যৌবনের ডাক দোলা দিয়েছে ওর রক্তে, টেনেছে দুর্নিবার আকর্ষণে। এখন প্রকৃতির কঠোর বিধিই ঠিক করে দেবে ওর ভাগ্য। আমাদের সমস্ত স্নেহ, গর্ব, উল্লাসের ইতি করে আমাদের মায়া কাটাবে এল্‌সা। সত্যিই কি তাই ঘটতে চলেছে ?

কোনমতে চোখের জল সামলাতে পারলাম না। মাইলখানেক আন্দাজ পথ পেরিয়ে হঠাৎ গাড়ির আলো পড়ল এল্‌সার গায়ের ওপর। একটা ঝোপের মধ্যে কি যেন শুঁকে বেড়াচ্ছে একা একা।

মনে বল এল। ডাকলাম এল্‌সাকে কত ভাবে। কিন্তু আমল দিল না আমাদের। সঙ্গে আসার জন্যে ওকে নানা প্রলোভন দেখালাম। কিন্তু সেখানেই ও রয়ে গেল। তৃষিত নয়নে চেয়ে রইল সেই ঝোপের দিকে যেখান থেকে সিংহদের ডাক শেষ শোনা গেছে। আবার ডাকতে লাগল ওরা, ধীরে ধীরে কাছে আসতে লাগল।

আমাদের ত্রিশ গজ পেছনে একটা শুকনো নদীবক্ষ। ওখানেই সিংহযূথটা থামল আর মহোৎসাহে ডেকে চলল।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চাঁদের আলোয় বসে আছে এল্‌সা আমাদের আর সিংহযূথের মাঝামাঝি। দু-পক্ষই ডাকছে ওকে কাছে আসার জন্যে।

এই ডাকাডাকির লড়ায়ে জিতবে কে ? কী জানি !

হঠাৎ এল্‌সা এগোল সিংহযূথের দিকে। গলা চিরে চিৎকার করলাম আমি, ‘এল্‌সা—যেও না। ওখানে যেও না। মেরে ফেলবে তোমায়।’

আবার বসে পড়ল এল্‌সা। একবার ওর স্বজনদের দিকে আর একবার আমাদের দিকে চাইতে লাগল। বুঝি ঠিক করতে পারছে না, কী করবে। এক ঘণ্টা এই অবস্থায় রইল। তখন জর্জ সিংহযূথের দিকে দুটো গুলি করল। সিংহযূথ অরণ্যের আঁধারে অদৃশ্য হল। তারপর এল্‌সা আমাদের সঙ্গে নেবে আশা করে গাড়ি পেছিয়ে আনা হল আস্তে আস্তে। এবার সত্যিই আমাদের সঙ্গ নিল এল্‌সা। কিন্তু ভারী অনিচ্ছুক ভাবে। গাড়ির কাছে এল বারবার পেছন পানে তাকাতে তাকাতে। শেষপর্যন্ত লাফ দিয়ে উঠল গাড়ির ছাদে। ওকে ফিরিয়ে আনলাম আমরা।

বাড়ি ফিরে এল্‌সা একনাগাড়ে জল খেয়ে চলল অনেকক্ষণ। ভারী শ্রান্ত মনে হচ্ছিল ওকে।

এই যে পাঁচ ঘণ্টা একটা সিংহযূথের সঙ্গে কাটিয়ে এল এল্‌সা, তার ফলে ওর কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? ওর গায়ে মানুষের গন্ধ থাকলেও বন্য স্বজাতীয়েরা কি ওকে গ্রহণ করেছে স্বাভাবিক ভাবে? যখন সিংহদের মধ্যে মিলনের উন্মাদনা রয়েছে তখন মিলন-প্রয়াসী কোন সিংহকে সে কি আমল দেয়নি? নিজের জাতের সঙ্গে না মিলে কেন ও ফিরে এল আমাদের কাছে? ও কি ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহীদের ভয়ে আর এগোতে চাইলো না?

প্রশ্নগুলো মুখর হয়ে উঠেছে মনের মধ্যে। শুধু আমাদের সান্ত্বনা, কোন ক্ষতি হয়নি ওর, তবুও অভিজ্ঞতা হল বেশ কিছুটা।

এই তুঃসাহসিক চেষ্টার পর থেকেই এল্‌সার কাছে অরণ্যের আহ্বান দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠল। আঁধার হয়ে গেলে ফিরতে চাইত না আমাদের সঙ্গে। ওকে খুঁজে বেড়াতে হত আমাদের। শুধার সময়ে একটা ভরসা, একমাত্র আমাদের কাছেই জল মিলতে পারে ওর। হয়ত শুধু এই জন্যেই বাড়ি ফিরে আসবে।

ওর প্রিয় জায়গা হল পাহাড়। সব সময়েই ও বেছে নিত কোন চূড়ার আশ্রয় কিংবা পাহাড়ের মধ্যে অন্য কোন নিরাপদ জায়গা—যেখান থেকে নির্বিঘ্নে চারপাশ দেখা যেতে পারে। একবার কাছাকাছি চিতাবাঘের খ্যাঁকখ্যাঁকানি শুনেও এমনি এক পাহাড়ের আশ্রয়ে রেখে আসতে হল ওকে। পরের দিন সকালে যখন ফিরল—গায়ে অনেকগুলো আঁচড়ের দাগ, রক্ত পড়ছে। বোঝা গেল না, চিতাবাঘটার কল্যাণেই এমন হল কিনা!

আর একবার সূর্যাস্তের পরে হায়নার হাসির শব্দ শুনে তার পিছু পিছু গেল এল্‌সা। অল্পক্ষণ পরেই হাসিটা বদলে হয়ে গেল আতংকের তীক্ষ্ণ চীৎকার আর তার জবাব, এল্‌সার গলার জোর গর্জনও শুনতে পাওয়া যেতে লাগল।

জর্জ দৌড়ে গেল, কী ব্যাপার দেখার জন্যে। তুটো হায়না এল্‌সার দিকে এগিয়ে আসছে, এমন সময়ে গিয়ে পড়ল জর্জ। একটাকে গুলি করতেই পালাল আর একটা। এরপরে মৃত হায়নাটাকে ধরে এল্‌সা টেনে নিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে। এটা যেন ওর নিজের শিকার। ঠিক যেমন করে ছোটবেলায় দাঁতে করে কামড়ে ধরে সামনের তু-পায়ের ফাঁকে রেখে বনাতের টুকরো টেনে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি করেই নিয়ে গেল। কিন্তু প্রায় তু-বছর বয়স হলেও এল্‌সার দাঁত হায়নাটার চামড়ায় বসেনি। আর 'শিকার' নিয়ে যে কি করবে তাও সঠিক জানা ছিল না এল্‌সার।

এই বয়সেও জিরাফেরা ওর প্রিয় বন্ধু রয়ে গেছে। তাদের পিছু নেয় ও চুপিসাড়ে, ওর স্বজাতির প্রতিটি কায়দা যেন কাজে লাগাবে। তবুও কাছে আসার আগেই দেখে ফেলবে ওরা। প্রধানত এল্‌সার লেজের জন্যেই এই কাণ্ডটা ঘটত। কিছুতেই লেজটাকে ও বাগ মানাতে পারে না। ওর সারা শরীরটা কুঁকড়ে যাবে—কানটাও নড়বে না একটুও। কিন্তু ওর লেজের যে কালো গুছি সেটা কখনোই স্থির থাকবে না।

একবার জিরাফেরা দেখতে পেল ওকে। ওদের মধ্যে সব থেকে যে সাহসী তার পাল্লা দেওয়ার শুরু হয়। একে একে অর্ধবৃত্তের বেড় দিয়ে ওরা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আর চাপা লম্বা আওয়াজ করছে নাক দিয়ে। এর পরে আর সামলাতে পারে না এল্‌সা। ঝাঁপিয়ে পড়ে, জিরাফের পালটা দেয় চোঁ চোঁ দৌড়। দু-দুবার একটা প্রকাণ্ড মদ্দা জিরাফকে ধাওয়া করে একটানা। মাত্র মাইলখানেক যাওয়ার পরে ঘুরে দাঁড়ায় জিরাফটা,—হয় পাক দেবার জন্যে, নয়ত উত্যক্ত হয়ে। তখন এল্‌সা খুব কাছ থেকে বেড় দিল ওকে। শুধু ওর জবরদস্ত সামনের পায়ের প্রচণ্ড চাট্‌ থেকে দূরে রইল। এল্‌সা হয়ত জানত, চাট্‌ খেলে ওর মাথার খুলিও ভেঙে যেতে পারে।

মনে হল আড়াই মাস অন্তর ওর উত্তেজনা আসছে। শুনেছিলাম এর লক্ষণ হল জোর গর্‌গরানি। এ অবধি দু-দুবার এমনটা ঘটেও গেছে তবুও লক্ষ্য করিনি আমরা। কিন্তু প্রতিবারেই ওর গায়ে পাওয়া গেছে একটা অদ্ভুত গন্ধ আর ঝোপেঝাড়ে ছড়িয়ে রেখে এসেছে মধু মিলনের আমন্ত্রণ।

সিংহদের সান্নিধ্যে ওর দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার অল্প দিন পরে নুরু এসে খবর দিল : সকালে রোজকার মত বেড়াতে বেরিয়ে এল্‌সা ওর দিকে চেয়ে বারবার গর্জন করেছে। সঙ্গে আসতে দেয়নি ওকে। নিশ্চয়ই এল্‌সা চেয়েছে, যেন নুরু ওর সঙ্গে না যায়। তারপর একলা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। এত জোরে গেছে যে, পিছু পিছু ছুটে গিয়েও নুরু আর ওর হদিশ পায়নি।

বিকেলে এল্‌সার পায়ের দাগ ধরে কিছুটা এগিয়ে আর আমরা এগোতে পারলাম না। ওর পায়ের দাগ মিলিয়ে গেছে। শুধু পাহাড়ের চূড়াগুলোর নীচে দাঁড়িয়ে ডাকলাম ওকে। জবাব এল, অদ্ভুত একটা ডাক—একেবারে অচেনা গর্জন। এল্‌সার নয়, সম্ভবত কোন সিংহের। তারপরেই দেখলাম পাহাড় বেয়ে অতি কষ্টে নামছে এল্‌সা নুড়ি পাথর ডিঙিয়ে। পরিচিত ডাক ডাকতে ডাকতে আসছে। আমাদের কাছে এসেই মাটির ওপর সটান শুয়ে পড়ল অবসন্ন হয়ে। হাঁপাচ্ছে আর খুব উত্তেজিত।

জল ছিল আমাদের সঙ্গে। কিন্তু যথেষ্ট খেতে পারল না। দেখলাম, ওর পেছনের পা দুটো রক্তাক্ত, নখের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত। ওর কাঁধ আর ঘাড়েরও

একই অবস্থা। কপালে সারি সারি ফুটো, অবশ্যই দাঁতের দাগ। এমন দাগ কিসের জন্যে তা জানলাম দু-বছর পরের এক অদ্ভুত যোগাযোগে। বলে রাখি ব্যাপারটা। লণ্ডনের পথে রোম-এ পশুশালা দেখতে গিয়ে মিথুনরত সিংহ-সিংহী চোখে পড়ল। সম্ভোগের শেষ পর্যায়ে দেখলাম, সিংহটা সিংহীর কপালে দাঁত বসাল। তারপরেই লণ্ডনের পশুশালায় সেই একই ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। তখন বুঝেছি, কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেদিন এল্‌সার।

স্বাভাবিকভাবে ওর নিজস্ব কোন গন্ধ ছিল না। এখন একটা তীব্র গন্ধ পাওয়া গেল। ওর উত্তেজনার সময়কার গন্ধের থেকেও অনেক বেশি তীব্র গন্ধটা। কিছুটা সুস্থ হয়ে নিজস্ব কায়দায় অভ্যর্থনা জানাল আমাদের সবাইকে। বেশ চমকে দেবার মত করে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গর্‌গর্‌ করে বলতে চাইছে যেন, 'শুনুন, কী জেনেছি আমি!'

যখন বুঝল আমরা ওর গর্বটাকে বাহাদুরি বলে সত্যি মেনে নিয়েছি, আবার মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে ঝাড়া দুটি ঘণ্টা ঘুম দিল। নিশ্চয়ই সিংহ-সংসর্গে ছিল এল্‌সা, আমরা ডেকে ব্যাঘাত করেছি।

দুদিন পরে একটি পুরো দিন আর পুরো রাত বাইরে কাটিয়ে এল এল্‌সা। ওর পায়ের দাগ ধরে গিয়ে ওকে দেখা গেল এক সিংহীর সঙ্গে। দুজনকেই একসঙ্গে শোয়া অবস্থায় অনেকবার দেখা গেছে।

এবার থেকে এল্‌সা বাইরে রাত কাটাতে শুরু করল। বাড়ি আসার ইশারা জানাতাম আমরা ওর প্রিয় জায়গাগুলোতে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে। ডাকতাম ওকে। কখনো আসত, কখনো আবার আসত না। দুদিন, তিনদিন জল বা কোন কিছু না খেয়েও নিরুদ্দেশ থাকত ও। জলের কিছুটা আকর্ষণ তখনো অবধি ওর ছিল। কিন্তু বর্ষা নামে নামে। বুঝলাম বৃষ্টি নামলেই ওর আর কোন টান থাকবে না আমাদের দিকে। এটা এমন সমস্যা, যা আমাদের সমাধান করতেই হবে। সমস্যাটা আরও তীব্র হয়ে দেখা দেবে যখন মে মাসে আমরা সাগরপারে ছুটি কাটাতে যাব।

এল্‌সার বয়সে হয়েছে দু'বছর তিন মাস। ও এখন প্রায় পূর্ণ, পরিণত। আমরা সব সময়েই জেনে রেখেছি, অনির্দিষ্টকাল ইসিওলোতে ছেড়ে রাখা যাবে না ওকে। গোড়ায় আমাদের ধারণা ছিল রটারডাম পশুশালায় ওর বোনেদের কাছে পাঠানো হবে ওকে, অবশ্য যদি তেমন পরিস্থিতি দেখা দেয়। তার ব্যবস্থাও তৈরি করা ছিল। কিন্তু এখন নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই ঠিক করে নিতে যাচ্ছে এল্‌সা। আমাদের আগেকার অভিলাষ বদলে ফেলতে হল। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা ওকে প্রাকৃতিক পরিবেশেই বাড়তে দিতে পেরেছি। জঙ্গল ওর প্রিয় হয়ে আছে, বন্য পশুরাও মেনে

নিয়েছে ওকে। যে নিয়ম চলতি আছে তা হল মানুষের সংস্পর্শ আর অরণ্য-জীবনের অজ্ঞতার জন্যেই কোন পোষমানা বন্যপ্রাণী বনের জগতে ফিরে গেলে স্বজাতীয়দের হাতে মারা পড়ে। আমাদের মনে হল সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাবার ক্ষমতা এল্সার থাকতে পারে। এল্সাকে অরণ্যজগতে ফিরিয়ে দেবার পরীক্ষা করা একটা কাজের মত কাজ হবে।

ওর সঙ্গে দুটো তিনটে সপ্তাহ কাটাব মনস্থ করলাম। তারপর সব যদি ঠিক-ঠাক চলে, লম্বা ছুটি নেব আমরা। ছুটি কাটাব কেনিয়ার বাইরে, যাতে হাওয়া বদল হতে পারে।

তারপর আরো ভাবনা কোথায় ছাড়ব এল্সাকে। দুর্ভাগ্য, ইসিওলোতে ছাড়া যাবে না। কেন না সেখানে লোকবসতি বেশি। আমরা জানতাম একটা অঞ্চলের কথা, যেখানে জনবসতি খুবই কম, গৃহপালিত পশুও যায় না। বন্যপ্রাণী প্রচুর, বিশেষ করে সিংহ।

সেই জায়গাটায় এল্সাকে নিয়ে যাবার অনুমতি মিলল, বন্দোবস্ত হল যাওয়ার। যে কোন দিন বর্ষা নামতে পারে। কাজেই সময় নেই মোটে। বর্ষার আগেই এল্সার নিকুঞ্জে ওকে পৌঁছে দিতে গেলে একটুও দেরী না করে রওনা হওয়া দরকার।

অভীষ্ট জায়গায় যেতে গেলে আমাদের তিনশো চল্লিশ মাইল পথ পেরোতে হবে। মাঝে পড়বে মালভূমি আর প্রশস্ত উপত্যকা। অনেক ঘন বসতির দেশ, ইউরোপীয় খামার-বাড়িও অনেক আছে সেখানে। আমাদের ভয়, হাঁ করে দেখতে আসা জনতার ভিড়ে উত্ত্যক্ত বোধ করবে এল্সা। প্রত্যেকটা খামার জায়গায় কৌতূহলী দেশীয়দের ভিড়ে বিরক্ত হবে ও। শুধু তাই নয়, দিনে গরমের উৎপাতও আছে। তাই ঠিক করলাম, রাত্রে যাওয়া হবে, দিনে দিনে বিশ্রাম। স্থির হল, সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ রওনা দেব আমরা। এল্সার মতলব কিন্তু অন্যরকম দেখা গেল।

রওনা দেবার আগে ওকে বেড়াতে নিয়ে গেলাম ওর প্রিয় জায়গাগুলোতে, পাহাড়ের মধ্যে—আমাদের বাড়ি থেকে উপত্যকা পার হয়ে। শেষবার বাড়ির কাছাকাছি ফটো তুললাম ওর। এল্সা সত্যি সত্যি ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না। যখনই দেখে এই চক্চকে বাক্সগুলি ওর দিকে তাক করে ধরা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিংবা থাবা দিয়ে মুখ আড়াল করে। নয়তো সোজা সরে যায়। রেখাচিত্র আঁকাও পছন্দ নয় ওর। ইসিওলোতে থাকার শেষ দিকে আমাদের ক্যামেরাটার অনেক অত্যাচার সয়েছে ও। একেবারে বিরক্তির একশেষ হয়েছে ক্যামেরাটা নিয়ে। তাই শেষ অবধি বদলা নিল। এক পলকের জন্যে ক্যামেরাটা রেখে একটু সরেছি,

লাফিয়ে উঠেই সেটা মুখে করে অদৃশ্য হল পাহাড়ের মধ্যে। ভাবলাম গেল বোধহয় ক্যামেরাটা! এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে ওটা উদ্ধার করার চেষ্টা চলল। কিন্তু যতবার আমরা ওটা ছিনিয়ে নেবার নতুন নতুন ফন্দী করি, ততবারই মুখে ধরে বেশ লোভ দেখিয়ে নাড়াতে থাকে ওটা, বা থাবার মধ্যে ধরে চিবোতে থাকে। শেষ অবধি উদ্ধার করা গেল। অবাক কাণ্ড, বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি ক্যামরাটার।

ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে রওনা দেবার সময় হয়েছে। কিন্তু ঠিক তখনই পাহাড়ের একটা চত্বরে গিয়ে বসল ও। উপত্যকার দিকে বেশ চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এমনভাবেই ওর স্বজাতীয়েরা বসে থাকে বেশ ভাবালু ঢঙে। কিছুতেই নড়ানো গেল না ওকে। ওর কোন মতলবই ছিল না বাড়ি ফেরবার। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার আশা জলাঞ্জলি দিতে হল।

বাড়ি গিয়ে জর্জ গাড়ি নিয়ে এল পাহাড়ের নীচে, যেখানে এল্‌সাকে রেখে গেছি। কিন্তু ও ওখানে নেই। নিশ্চয়ই সান্ধ্য অভিসারে গিয়ে থাকবে। এল্‌সাকে ডাকল জর্জ। কোন সাড়া নেই। রাত এগারোটা অবধি পাত্তা মিলল না ওর। তারপর হঠাৎ এসে ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে চড়ে বসল। যেন এতক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়েছে।

প্রথম পরখ

মাঝরাতের পরেই এল্‌সাকে আমরা ওর বাক্সে তুলতে পারলাম। তারপরই রওনা দেওয়া হল। যাওয়াটা যাতে সহজ হয় সেজন্যে ওকে ঘুমিয়ে পড়ার ওষুধ দিয়েছিলাম। ডাক্তারের কাছে জেনেছিলাম, এ ওষুধের খারাপ কোন ফল নেই, আট ঘন্টা ঘুমোবে। এল্‌সার মনের জোর বাড়ানোর জন্যে খোলা লরিতে চললাম ওর সঙ্গে। রাতে যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সে জায়গাটা আট হাজার ফুট উঁচু। ভীষণ ঠাণ্ডা। ওষুধের কল্যাণে এল্‌সা তখন আধো অচেতন। তবুও ও একটা থাবা গরাদের ফাঁক দিয়ে বার করে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে আমি আছি কিনা।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে আমাদের সতেরো ঘন্টা লাগল। ওষুধের প্রভাব রইল আরও এক ঘন্টা। এই আঠারো ঘন্টায় শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল এল্‌সার, নিঃশ্বাস পড়ছিল আস্তে আস্তে। এক সময়ে আমার ভয় হল, হয়ত মরেই যাচ্ছে! সৌভাগ্যক্রমে এল্‌সার সাড় হল। এতেই বোঝা গেল, সিংহের

ব্যাপারে ওষুধপত্তর খুব সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। অন্য পশুদের তুলনায় ওষুধের প্রতিক্রিয়া ওদের মধ্যে অনেক বেশি তীব্র হয় আর এক এক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ফল দেখা দেয়। এল্‌সা আর ওর বোনেদের ছোটবেলায় একবার ওদের গায়ে পোকামারা ওষুধ দিয়েছিলাম। ফল হয়েছিল নানা রকম। একটা বেশ সহ্য করল, আর একটা অসুস্থ হয়ে পড়ল, আর এল্‌সার তো খিঁচুনি দেখা দিয়েছিল।

আমরা যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। এই জেলার প্রধান বন-সংরক্ষক, আমাদের বন্ধু। তিনি দেখা করতে এলেন খবর পেয়ে। হাজার ফুট খাড়াই-এর নীচে চমৎকার একটা জায়গায় ক্যাম্প করা হল। সেখান থেকে খোলা জঙ্গলের বিরাট এক সমভূমি চোখে পড়ে। তার মধ্য দিয়ে ঘন গাছপালার একটা সার নদীর ধারাকে চিহ্নিত করছে।

এখানকার উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। বাতাস টাটকা আর প্রাণ-চঞ্চল। আমাদের ক্যাম্পের ঠিক সামনেই একটা তৃণভূমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমভূমির দিকে। ওখানে চরে বেড়ায় টম্‌সনী গেজেল, টোপি, ন্যূ, বার্চেলী জেব্রা, ফুট্‌কিওয়ালা কৃষ্ণসার, কঙ্গোনি আর অল্প কিছু মোষ। শিকারের নন্দনকানন!

যখন তাঁবু ফেলা হচ্ছে, এল্‌সাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম আমরা। জানোয়ারের পালগুলোকে ধাওয়া করল এল্‌সা। কাকে যে ধাওয়া করবে ঠিক করতে পারল না। চারদিকে শুধু ছুটে বেড়াচ্ছে জানোয়ারগুলো। যেন পথশ্রমের জঘন্য অভিজ্ঞতা কাটাতেই খেলার নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে মেতে উঠল ও। ওদের মাঝে একেবারে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। আর ওরাও নিজেদের মধ্যে একটা সিংহীকে এমন ভাবে খেলা করতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। অদ্ভুত লাগছিল ওদের। কাউকে ধরে নিয়ে যাবার কোন মতলব নেই, শুধু এদিক ওদিক ছুটে গিয়ে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে একটা সিংহী – দৃশ্যটা ওদের কাছে অবিশ্বাস্য। বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁপ কাটাকাটি করে খুশি হল এল এল্‌সা। তারপর ক্যাম্পে ফিরে খাওয়ায় মন দিল।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল এমন :

এল্‌সাকে প্রথম সপ্তা ধরে ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে তুলে এই নতুন দেশের আশপাশ ঘুরিয়ে দেখানো হবে। এই হবে নতুন পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়ার আগের ব্যবস্থা। যে সব জানোয়ার উত্তরপ্রদেশে নেই আর ও কখনো দেখেনি অথচ এখানে আছে, তাদের সঙ্গেও এমন করেই পরিচয় ঘটবে এল্‌সার। দ্বিতীয় সপ্তাহে ওকে রাতের মত ছেড়ে আসা হবে যখন জঙ্গলে ব্যস্ত থাকবে ও, আর সকালে যখন ওর ঘুম-ঘুম ভাব আসবে তখন খাইয়ে

আসা হবে। পরে একটু একটু করে কমানো হবে ওর খাওয়া। তার ফলে নিজের খোরাকের জন্যে শিকার করতে উৎসাহিত করা হবে ওকে, কিংবা কোন বন্য সিংহের সঙ্গে জোট বাঁধার সুযোগ দেওয়া হবে।

আমাদের পৌঁছনোর পরের সকালেই পরিকল্পনামত কর্মসূচী শুরু হল। প্রথমে ওর কলার খুলে নেওয়া হল, যাতে ও নিজেকে মুক্ত মনে করতে পারে। ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে লাফিয়ে উঠল এল্‌সা, আমরা এগিয়ে চললাম। মাত্র কয়েকশো গজ যাবার পর লক্ষ্য করলাম, আমাদের গাড়ির ঠিক সমান্তরালে পাহাড় দিয়ে নেমে চলেছে এক সিংহী। অনেকগুলো হরিণের কাছ ঘেঁষে চলল সিংহীটা, কেউ দেখলেই না তাকে। দৃঢ় পদক্ষেপ দেখে ধরেই নিয়েছে তারা, শিকার ধরার তিলমাত্র ইচ্ছে নেই তখন তার।

সিংহীটার কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে এলাম আমরা। এল্‌সা চঞ্চল হয়ে উঠল। লাফিয়ে পড়ল নীচে, তারপর আস্তে গোঙানির মত আওয়াজ করে সাবধানে বন্ধু পাতাতে চলল নবাগতার সঙ্গে। কিন্তু যেই বনের সিংহীটা থেমে ঘুরে দাঁড়াল, এল্‌সার আর সাহসে কুলোল না। ছুটে চলে এসে গাড়ির মাথায় চড়ে বসল। সিংহীটা কোন নিশ্চিত লক্ষ্যে এগোচ্ছিল। অনতিবিলম্বে আমরা লক্ষ্য করলাম, লম্বা ঘাসের আড়ালে একটা ছোট্ট উইঢিবির ওপর ছ-টা বাচ্চা অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

এগিয়ে চললাম আমরা। হাড় চিবোচ্ছে এমন এক হায়নাকে চমকে দিলাম। এল্‌সা লাফিয়ে পড়েই ধাওয়া করল। কিন্তু চমকেওঠা জানোয়ারটা কোনমতে হাড়টা সামলে নিয়ে দৌড় দিল। শেষ অবধি অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে পালিয়ে যেতে পারলেও হাড়টা ফেলে যেতে হল বেচারীকে।

এরপর পাল পাল নানা জাতের হরিণের মধ্যে দিয়ে আমরা চললাম। ওদের কৌতূহল শুধু বেড়েই গেল, যখন দেখল একটা ল্যাণ্ডরোভার ছাদে সিংহী নিয়ে যাচ্ছে। আমরা গাড়ির মধ্যে থেকে কথাবার্তা বন্ধ করে থাকায় ওরা আমাদের কয়েক গজের মধ্যে আসতে দিচ্ছিল। অর্থাৎ আমাদের দেখে পালাচ্ছিল না। সমস্তক্ষণ এল্‌সা সতর্কভাবে চারধার লক্ষ্য রাখল। ওর দিকে পেছন ফিরে চরছে বা লড়ালড়ি করছে এমন কোন জানোয়ার বা অন্যমনস্ক কাউকে দেখলে তাকে তাক্ করছিল। আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে মাটির সঙ্গে পেট মিশিয়ে আড়াল রেখে রেখে এগিয়ে গেল তাক্ করা জন্তুটির দিকে। সেই জন্তুটার মধ্যে যদি কোন সন্দেহের ভাব দেখা দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে এল্‌সা একেবারে স্থির হয়ে যাবে। যদি আরও ভালোভাবে ব্যাপারটা সারতে চায় তবে ভাব দেখাবে যেন শিকার ধরার কোন আগ্রহই নেই ওর অর্থাৎ থাবা চাটবে, হাই তুলবে, গড়াগড়ি দেবে নির্বিকারভাবে, যতক্ষণ না জন্তুটা

নিশ্চিন্ত হয়। তারপর আবার চুপিসাড়ে পিছু নিতে শুরু করবে সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু ও যতই ধূর্ত হোক না কেন, কোন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মত কাছাকাছি আসতে পারে না একবারও।

ছোট্ট টম্‌সনী গেজেলগুলো এল্‌সাকে এমনভাবে ঠকাত যে ভারী বিসদৃশ লাগত। সম্ভবত অরণ্যের অলিখিত নিয়মেই এমনটা সম্ভব হত। খাদ্যের দরকার না হলে বড় প্রাণীরা ছোটদের ওপর হামলা করবে না —এটাই হল অরণ্যপ্রকৃতির অলিখিত নিয়ম। সমতল ভূমিতে ওরাই হচ্ছে আসল বদমাইস বেঁটে জীব। সব থেকে কৌতূহলী আর লেজ নিয়ে ব্যস্ত সদাসর্বদা। ওরা এল্‌সাকে পাল্লা দেওয়ার ডাক দিল যেন। ওকে উত্ত্যক্ত করে মারল, প্রলুব্ধ করল ধাওয়া করতে। কিন্তু এল্‌সাকে বিরক্ত মনে হত, ওদের আমল দিত না একেবারে। নিজের ভাবগম্ভীরতা বজায় রেখে শুধু ওদের যার যার জায়গায় রেখে দিত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে।

মোষ বা গণ্ডারের বেলায় একেবারে অন্য ব্যাপার। তাদের ধাওয়া করতেই হত।

একদিন গাড়ি থেকে দেখলাম একটা মোষ সমতল জমির ওপর নিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে! হয়ত ল্যাণ্ডরোভারে সিংহী দেখে কৌতূহলী হয়ে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লাফিয়ে পড়ে চুপিসাড়ে মোষটার পিছু নিল এল্‌সা। ঝোপের আড়াল রেখে এগোল স্বভাবসিদ্ধ কায়দায়। বোঝা গেল মোষটারও সেই একই মতলব। সেও উল্টো দিক থেকে ঝোপের আড়ালটা কাজে লাগাতে চাইছে। আমরা দেরি করতে লাগলাম। শেষ অবধি প্রায় মাথা ঠোকে আর কি দুটোর। তারপর মোষটাই পালাল। পরম বিক্রমে এল্‌সা তার পিছু নিল।

আর একবার ল্যাণ্ডরোভারে বসে দুটো মোষকে ঘুমোতে দেখল এল্‌সা। সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে নামল। তারপরেই মোষের ডাক, ডালপালা ভাঙার শব্দ, বেপরোয়া ছুটোপাটি। ঝোপঝাড় ছেড়ে বেরিয়ে এল মোষ দুটো। দুটো দুদিকে দৌড় দিল।

গণ্ডারদের আকর্ষণ ছিল সব থেকে জোরের। একদিন এমন একটা গণ্ডারের দর্শন পেলাম আমরা, যে ঝোপে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুম দিচ্ছে। এল্‌সা চুপিসাড়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। আচমকা জেগে উঠেই ঘাবড়ে গেল বেচারী। চমকে উঠে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল। যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। নিজের চারপাশে পাক খেল কয়েকবার তারপর কাছের একটা জলাভূমির দিকে ছুটল। জল ছিটিয়ে এল্‌সাকে স্নান করিয়ে দিল একেবারে। এল্‌সাও ওর পিছু পিছু জল ছিটিয়ে চলল। জলের ধারা ঠিকরে উঠল আর তার

আড়ালে অদৃশ্য হল ওরা। অনেকক্ষণ পরে ফিরল এল্‌সা—ভিজে গেছে, কিন্তু গর্বে যেন ফেটে পড়ছে।

গাছে চড়তে খুব ভালবাসত ও। কখনো কখনো বৃথাই খুঁজতাম ওকে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে। শেষ অবধি ওকে পেতাম কোন গাছের মগডালে দোল খাওয়া অবস্থায়। বেশ কয়েকবার ওর নেমে আসতে খুব অসুবিধে হয়েছে। একবার খুবই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল বেচারি। যে ডালে ছিল সেই ডালটাকে শরীরের ভারে নুইয়ে দিয়েও নামতে পারছিল না ও—এই অবস্থায় তখন দেখলাম ওকে। পাতার মধ্যে লেজটা নড়াচড়া করছে আর তার আগে-পেছনের পা দুটো আঁকড়ে আঁকড়ে এগোবার চেষ্টা করছে। শেষ অবধি কুড়ি ফুট নীচে ঘাসের ওপর পড়ল গাছ থেকে। আমাদের সামনে মর্যাদা হারিয়ে বিব্রত হল এল্‌সা। যখন ও আমাদের হাসাতে চাইত, তখন আমাদের হাসতে দেখলে ও মজা পেত। কিন্তু যখন ওকে নিয়ে হাসাহাসি করা হত তখন ওর সহ্য হত না। এবার ও আমাদের থেকে দূরে চলে গেল। ওকে সময় দিলাম নিজের ইজ্জত ফিরে পাবার। পরে যখন ওর খোঁজে গেলাম, দেখা গেল ছ-ছটা হায়না নিয়ে জমিয়ে বসে আছে। এই সিট্‌লে পশুগুলো ঘিরে বসেছে ওর চারপাশে। ওর কথা ভেবে ভয় হতে লাগল। কিন্তু এল্‌সা যেন ওর গাছ থেকে পড়ার পরের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতেই দেখাতে চাইল যে, হায়নাদের থেকেও ও বড় মাতব্বর। ওদের উৎপাতে জ্বালাতন হয়েও চুপচাপ আছে। হাই তুলল, পা ছড়িয়ে শরীরটা টানটান করল আলিস্যি ভাঙতে, তারপর উঠে চলে এল আমাদের কাছে। এল্‌সার এমন আশ্চর্য বন্ধুদের দেখে পায়ে পায়ে সরে গেল হায়নাগুলো।

এক সকালে শকুনিদের চক্কর দেখে আমরা আবিষ্কার করলাম একটা সিংহকে একটা জেব্রার মৃতদেহের সদ্‌গতি করা অবস্থায়। আমাদের দিকে কোন নজরই দিল না সিংহটা, নিজের কাজ নিয়েই বিভোর হয়ে রইলো। গাড়ি থেকে সন্তর্পণে নামল এল্‌সা, সিংহটার উদ্দেশ্যে মৃদু আওয়াজ দিল দু-একবার। উৎসাহ পাবার মত কোন সাড়াই এল না ওদিক থেকে। তবুও এল্‌সা খুব সাবধানে এগোল সেদিকে। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে সিংহটা সোজা এল্‌সার দিকে চাইল। মনে হল বলছে, 'সিংহসুলভ সৌজন্য জানো না? নারী হয়ে কোন্ সাহসে পুরুষের ভোজের সময় ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছ? আমার জন্যে শিকার করতে পার তুমি। কিন্তু আমার সিংহ-ভাগ নেবার আগে পর্যন্ত দেরী কর। তারপর যা পাতে পড়ে থাকবে, শুধু তাতেই তোমার অধিকার।'

এল্‌সা এই ভাবটাকে পছন্দ করল না। যত তাড়াতাড়ি পারল গাড়িতে

এসে উঠল। ওদিকে প্রভু রয়ে গেলেন সেবায়। অনেকক্ষণ ধরে আমরা দেখলাম ওর খাওয়া। আশা করলাম যাতে এল্‌সা সাহস পায়। কিন্তু কিছুতেই ওর নিরাপদ জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

পরের সকালে ভাগ্য কিছু সুপ্রসন্ন হল। দেখলাম একটা উইঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে একটা টোপি প্রহরীর মত একদিকে চেয়ে আছে যেন কোন কিছুর আশায়। তার নজর বরাবর লক্ষ্য হল আমাদের, উঁচু ঘাসের মধ্যে রোদ পোয়াচ্ছে এক তরুণ সিংহ। চমৎকার তাজা জোয়ান, সোনালী কেশর। ওর দিকে মন পড়ছে এল্‌সার। আমরা ভাবলাম, এই হবে ওর মনের মত বর। সিংহটার ত্রিশ গজের মধ্যে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। ভাবীবধূকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ঈষৎ বিস্মিত হলো পশুরাজ, তবে সাড়া দিল বেশ অমায়িক-ভাবে।

এল্‌সা যেন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল। শুধু গোঙানির মত আওয়াজ করতে লাগল মৃদুকণ্ঠে। কিন্তু কোন মতেই ছাদ থেকে নামল না। কাজেই আবার কিছুটা দূরে চলে গেলাম আমরা। ওকে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করলাম ওপর থেকে। তারপর হঠাৎ ওকে ছেড়ে দিয়েই সিংহটার অন্য পাশে গাড়ি নিয়ে এলাম। উদ্দেশ্য যাতে আমাদের গাড়িতে উঠতে গেলে ওকে সিংহটার কাছ দিয়ে আসতে হয়। যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গিতে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল এল্‌সা, তারপর সাহস করে এগিয়ে এল সিংহের কাছে। কান পেছনে রেখে লেজ নাড়াতে নাড়াতে শুয়ে পড়ল। সিংহটা উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছে এল। কোন ক্ষতিকর উদ্দেশ্য নিয়ে নয় নিশ্চয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভয় পেল এল্‌সা. দৌড়ে আবার গাড়িতে ফিরে এল।

ওকে নিয়ে চলে এলাম আমরা। আর আসবার পথে কী অদ্ভুত যোগাযোগ! সোজা চলে এসেছি একটা সিংহী আর একজোড়া সিংহের একটা যূথের মধ্যে। ওরা তখন শিকার নিয়ে আহারে বসেছে।

বাস্তবিক বরাত বটে! বোঝাই যাচ্ছিল শিকারটা ওরা সম্প্রতি করেছে! কারণ আহার্যের দিকেই তখন ওদের দৃষ্টি একাগ্রভাবে নিবদ্ধ. এল্‌সা ওদের ভাষায় যত আওয়াজই ওদের উদ্দেশ্যে দিক না কেন, কোন গ্রাহ্যই করল না। শেষ অবধি ভোজন পর্ব সমাধা হল—ভর্তি পেট ওদের দুলতে লাগল এপাশ ওপাশ। ওরা সরে গেল। শিকারের উচ্ছিষ্ট পর্যবেক্ষণ করল এল্‌সা সঙ্গে সঙ্গেই। কোন শিকারের সঙ্গে এই প্রথম ওর সরাসরি পরিচয়। সিংহদের যোগাড় করা ওই খাদ্য এল্‌সাকে খাওয়াবার সুযোগ মিলে যাওয়ায় আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হল বেশ কিছুটা। কেন না ওতে রয়েছে এল্‌সার বন্য স্বজাতির গন্ধ। এল্‌সা খাওয়ার পরে যেটুকু বাকী রইল, আমরা টেনে

নিয়ে গেলাম সেই তাজা জোয়ান সিংহটা যেখানে ছিল সেখানে। এটা তার অমায়িক ভদ্র ব্যবহারের পুরস্কার। আশা করলাম তাকে যদি এল্‌সা একপ্রস্থ খাবার জুগিয়েছে দেখাতে পারে, তবে স্বাভাবিক ভাবেই এল্‌সার ওপর তার মন আরও বেশি করে বসবে। তারপর সেই খাবার সমেত এল্‌সাকে সেই সিংহটার কাছে ছেড়ে দিয়ে এলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে কী হল দেখতে যাবার মাঝপথে এল্‌সাকে ক্যাম্পের দিকে ফিরতে দেখা গেল। যাই হোক, যখন সিংহটা অনুরাগের আভাস দিয়েছে তখন বিকেলের দিকে আবার তার কাছে এল্‌সাকে নিয়ে গেলাম আমরা। তখনো সেইখানে রয়েছে পশুরাজ। এল্‌সা তাকে পুরনো বন্ধুর মতই নানা আওয়াজ দিতে থাকল, কিন্তু গাড়ির মাথা থেকে নামল না। তেমন কোন মতলবও দেখা গেল না ওর মধ্যে।

ওর আরামের জায়গা থেকে ওকে নামাবার জন্যে একটা ঝোপের পেছনে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। আমি নামলাম, কিন্তু একটা হায়না আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তার ছায়াঘন আশ্রয় থেকে। ঝোপের মধ্যে চোখ পড়ল আমাদের, একটা বাচ্চা জেব্রা সবে মেরে রেখে গেছে। নিশ্চয় ঐ নওজোয়ান সিংহের কীর্তি।

এল্‌সার খাবার সময় হয়ে গেছে। কাজেই গাড়ি থেকে এক লাফে একেবারে জেব্রার ওপরে পড়ল। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে চাইলাম আমরা। এল্‌সাকে ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় গাড়ি নিয়ে চলে এলাম। রাতের অভিসার হবে এল্‌সার। পরের দিন ভোরবেলা আমাদের আশা কতখানি মিটেছে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে গেলাম সেখানে। কল্পনা করছি, দেখব, সুখী কপোতকপোতীর মত নতুন সঙ্গীর সোহাগে মত্ত এল্‌সা।

কিন্তু হতাশ হতে হল। দেখলাম, একলা রয়েছে বেচারী এল্‌সা। জেব্রাটার মৃতদেহ নেই, সেই সিংহটারও কোন পাত্তা নেই।

আমাদের দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল ও। বুঝতে পারলাম পরিচিত প্রিয়জনদের জন্যে মনে মনে হন্যে হয়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যেকার স্নেহের বাঁধন যে আগের মতই অটুট আছে তা বোঝার জন্যে পাগলের মত আমার বুড়ো আঙুল চুষতে লাগল। খুব খারাপ লাগল আমার। মনে বড় দুঃখ পেয়েছে হতভাগিনী, ভেবেছে আমরা ওকে বিদেয় করতে চাই। কিন্তু কী করে বোঝাই ওকে, কাল এখানে ছেড়ে রেখে ওর ভালো করার চেষ্টাই করেছি আমরা। যখন কিছুটা শান্ত হল ও, আমাদের সান্নিধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার মত নিশ্চিন্ত বোধ করল, আবার একটা চেষ্টা নিলাম আমরা খুব দুঃখিত হৃদয়ে। বিশ্বাস ভঙ্গ করলাম ওর সঙ্গে, ওকে সেখানেই রেখে চুপিসাড়ে চলে এলাম। এতদিন ওকে আমরা খাওয়াচ্ছিলাম কোটা মাংস। কারণ তাতে জ্যান্ত

প্রাণীদের সঙ্গে নিজের খাদ্য এক মনে হবে না। কিন্তু এবারে ব্যবস্থা পাল্টাতে হল। দুপুরে এল্‌সা যখন ঘুমে অচেতন, তখন ষাট মাইল গাড়ি চালিয়ে গিয়ে ওর জন্যে একটা ছোট্ট হরিণ মেরে আনলাম। এতটা পথ যেতে হল কারণ ক্যাম্পের কাছাকাছি কাউকে কোন শিকার করতে দেওয়া হত না। একেবারে গোটা হরিণ দেওয়া হল ওকে। আমাদের সন্দেহ ছিল, এল্‌সা ছাড়িয়ে খেতে পারবে কি না। ছোটবেলায় মায়ের কাছে এটা শেখার কথা, কিন্তু ওর বেলায় তো তা হয়নি। সন্দেহ দূর হল। সহজাত প্রবৃত্তি কেউ বোধহয় হারায় না, চাপা থাকে। তাগিদে দেখা দেয়।

পেছনের পায়ের ভেতর দিক থেকে খাওয়া শুরু করল এল্‌সা। এখানে চামড়া সব থেকে নরম। শিকারী জানোয়ার মাত্রেই এমন শুরুতে অভ্যস্ত। তারপর অন্ত্রনালী ছিঁড়ল। এই সব সূক্ষ্ম অংশের সদ্ব্যবহার করল এল্‌সা। রক্তের দাগ পাকস্থলীতে যা ছিল তা মাটি চাপা দিল। একেবারে বন্য সিংহেরা যেমনটি করে তেমনটি। তারপর কষের দাঁত দিয়ে হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে খেতে লাগল আর জিভ দিয়ে হাড় থেকে চেটেপুটে মাংস নিঃশেষ করল।

যখন জানলাম, এল্‌সা নিজেই শিকার ছাড়িয়ে খেতে পারবে, তখন ঠিক করলাম এবার থেকে এল্‌সাকে নিজেই নিজের শিকার ধরবার সুযোগ করে দেবো। সমতলটায় ঘন ঝোপঝাড় ছাড়া ছাড়া হয়ে আছে। পশুদের লুকোবার ভারী সুবিধে। সব সিংহদের এখানে শিকার করার জন্যে একটা কায়দাই হয়। যখন খিদে পায় হাওয়ার উল্টোদিকে কোন ঝোপে ওৎ পেতে থাকে। হাওয়ার দিক থেকে কোন হরিণ এলেই তাকে তাক্ করে চুপিসাড়ে পিছু নেয়। তারপর যথাসময়ে লাফিয়ে পড়ে আহারের যোগাড় করে।

এবার থেকে এল্‌সাকে আমরা এক-একবারে দু-তিন দিনের মত ছেড়ে দিতে লাগলাম। এর ফলে খিদের তাড়নায় ওকে শিকার করতেই হবে। কিন্তু প্রতিবারই ফিরে এসে আমরা দেখতাম, অভুক্ত এল্‌সা কাতর দৃষ্টিতে আমাদেরই পথ চেয়ে আছে। যখন দেখি ও আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে, আমাদের অক্ষুন্ন স্নেহের কাঙালিনী হয়ে রয়েছে, তখন আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ চালাতে বুক ফেটে যেত। কিন্তু উপায় নেই। কয়েকদিন পরে পরে কাছে পেলে ও আমার বুড়ো আঙুল চুষতো কিংবা ওর থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরত আমাদের, তবুও ওর এই আপন থাকার আকুতি কাটিয়ে ফেলতে হবে —এল্‌সারই ভালোর জন্যে। অসীম ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের, চাই প্রচুর অধ্যবসায়।

এতদিনে বুঝলাম, প্রকৃতির কোলে ওকে ছেড়ে দিতে যতটা সময় লাগবে বলে ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সময় দরকার। কাজেই আমরা

সরকারী অনুমতি চাইলাম, সাগরপারের ছুটি এখানে কাটাবার জন্যে। কারণ এই পরীক্ষাটা চালাতেই হবে। সদাশয় সরকারের অনুমতি মিলল। এবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, যথেষ্ট সময় মিলবে।

এল্‌সাকে একা ছেড়ে রেখে আসার সময় এখন থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হল। তাঁবুর চারপাশে অনেক শক্ত করে কাঁটাতারের বেড়া দিলাম যাতে কোন সিংহ না ঢুকতে পারে। বিশেষ করে খিদের সময়ে যাতে এল্‌সা এসে না ঢুকে পড়ে সেজন্যেই এই বিশেষ বন্দোবস্ত।

এক সকালে যখন এল্‌সা আমাদের কাছে রয়েছে, একটা সিংহ চোখে পড়ল আমাদের। সিংহটাকে দেখে মনে হল দিব্যি শান্ত, বেশ খোশ-মেজাজে রয়েছে। এল্‌সা নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। কায়দা করে জোড়টাকে একান্তে রেখে চলে এলাম। সেই সন্ধ্যায় কাঁটা-তারের বেড়ার মধ্যে বসে আছি আমরা, হঠাৎ এল্‌সার মৃদু ডাক শোনা গেল। ওকে থামাবার আগে কাঁটা-তারের ফাঁক দিয়ে গুঁড়ি দিয়ে এসে আমাদের মাঝে বসে পড়ল। ওর গায়ে থাবার আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে। আট মাইল হেঁটে চলে এসেছে ও, সিংহের সঙ্গ থেকে আমাদের সঙ্গই ওর বেশি প্রিয়।

পরের দিন আরো দূরে ওকে নিয়ে যাওয়া হল।

যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম, যুদ্ধরত দুই বিরাট মদ্দা কৃষ্ণসার – ইল্যাণ্ড। প্রত্যেকটা প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ড হবে ওজনে। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে এল্‌সা চুপিসাড়ে ওদের পিছু নিতে থাকল। গুঁতোগুঁতি করতে ওরা এল্‌সার দিকে দৃষ্টি নেই কারো। যখন নজর পড়ল, আর একটু হলে এল্‌সা ওদের একটার দুর্ধর্ষ চাট্‌ খেত। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থামল, ধাওয়া করল এল্‌সা তদের কিছুটা। তারপর ফিরে এল সদর্পে।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম ঘাসের ওপর দুটি অল্পবয়সী সিংহ বসে রয়েছে। একেবারে ফাঁকা জায়গায়। আমাদের মনে হল এরা এল্‌সার সঙ্গী হতে পারে। কিন্তু এল্‌সা আমাদের কায়দা বুঝে ফেলেছে। সন্দেহ জেগেছে ওর, আবার ফেলে যাব ওকে। কাজেই গাড়ি থেকে নামল না ও মোটেই। সিংহ দুটোর দিকে বেশ উত্তেজিত ভাবেই আওয়াজ দিতে থাকল অবশ্য। ওকে ফেলে যাবার কোন উপায় নেই অতএব সুযোগ হারাতে হল আমাদের। এগিয়ে চললাম আবার। এবার ফের সামনে পড়ল লড়ায়ে দুই টম্‌সনী গেজেল। নিজেকে আর সামলাতে পারল না এল্‌সা। লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে। ওই সুযোগে ওকে রেখেই আমরা তাড়াতাড়ি চলে এলাম, যাতে অরণ্য জীবনের আরো কিছু ও শিখে নিতে পারে।

প্রায় এক সপ্তা পরে আমরা ফিরলাম। দেখলাম, ক্ষুধার্ত এল্‌সা আমাদের

পথ চেয়ে রয়েছে। তখনো কত আদর ওর! কতবার ঠকিয়েছি ওকে, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি বার বার। আস্থা হারিয়ে ফেলার কাজও করেছি অনেক—তবুও ভোলেনি আমাদের স্নেহ। সঙ্গে যা মাংস আনা হয়েছিল, গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গেই খেতে শুরু করল এল্‌সা!

হঠাৎ সিংহের গর্জন কানে এল। পরক্ষণেই দেখা গেল একজোড়া সিংহ জোর কদমে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। নির্ঘাৎ শিকারে বেরিয়েছে। গন্ধ পেয়েছে মাংসের, তাই খুব জোরেই আসছে ওরা। বেচারী এল্‌সা ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেল একেবারে। মুখের গ্রাস ফেলে ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই পালিয়ে এল। পলকের মধ্যে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল ছোট্ট এক শিয়াল। নিশ্চয় এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল ঘাসের মধ্যে। সুযোগ নিতে একটুও দেরী করল না ধূর্তচূড়ামণি। এসেই গোগ্রাসে কামড় বসাতে লাগল এল্‌সার ফেলে আসা মাংসে। তার জানা ছিল এ সৌভাগ্য বেশিক্ষণের জন্যে নয়। মূর্তিমান যমদূতের মত প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে দৃঢ় পায়ে এসে গেল একটা সিংহ। কিন্তু শিয়ালের মুখের গ্রাস তো বটে, সহজে ভয় পেয়ে পালাবার পাত্র নয় সে। মাংস আঁকড়ে ধরে রেখে যঃটা পারল কামড় দিয়ে চলল যতক্ষণ না একটা সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায় ওর ঘাড়ে। এমন কি, তখনো অবিশ্বাস্য সাহসে খোরাক বাঁচাবার চেষ্টা করতে ছাড়ল না শিয়ালটা।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই নাটক দেখল এল্‌সা। কত দিন পরে খোরাক জুটছে তবুও তা ওর চোখের সামনে থেকে বেহাত হয়ে গেল। ওই অবস্থায় সিংহ দুটোর খাওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে মন ছিল না। এল্‌সাকে তুলে নিয়ে চললাম আমরা।

ক্যাম্পে থাকার সময়ে কিছু অতিথি এলেন। দুপুরের কিছু আগে একটা ল্যাণ্ডরোভার ক্যাম্পের সামনে এসে থামল। তাতে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারী, কেনিয়ার এক খ্যাতনামা ভদ্রলোক আর তাঁর তরুণ পুত্র। ওঁরা এসেছেন অরণ্যপ্রাণী দেখতে। জর্জ ওঁদের ক্যাম্পের মধ্যে আসার আমন্ত্রণ জানাল। ক্যাম্পে ওঁরা এসে বসার পরে জর্জ সবে বলতে যাচ্ছে যে, আমাদের এক পোষা সিংহী আছে, এমন সময় গাড়ির শব্দে এল্‌সা লাফিয়ে ঢুকে পড়ল। ওর হাবভাবে কৌতূহল, বন্ধুত্ব। ওর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য দেখাতে প্রতি অতিথির কাছে গিয়ে সম্বর্ধনা শুরু করল। অতিথিদের কিছুটা বিহ্বল দেখাল, শুধু মিশনারী ফাদার রইলেন অচঞ্চল। তবুও বলতে হবে ব্যাপারটা তাঁরা ভালভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। নিজের কর্তব্য সেরে এল্‌সা টেবিলের পাশে সটান শুয়ে পড়ল আর নাক ডাকাতে শুরু করল অবিলম্বে।

তারপর এক সুইস্ দম্পতি এলেন আমাদের দেখতে। ওরা শুনেছিলেন

আমাদের পোষা এক সিংহ শাবক আছে। মনে হয় ওদের ধারণা ছিল, শাবক মানে ছোট্ট কিছু—যা কোলে তুলে নেওয়া যায়। কিন্তু যখনই ওরা দেখলেন তিনশো পাউণ্ডের বেশি ওজনের এল্‌সা ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে বসে আছে, থমকে গেলেন। গাড়ি থেকে ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নামিয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে বসাতে কিছু সময় গেল। এল্‌সা যেন মূর্তিমতী সৌজন্যময়ী। অভ্যর্থনা জানাল অতিথিদের। একবার মাত্র লেজের ঝাপটায় টেবিলে যা কিছু ছিল সাফ করে দিল। এর পরে তাঁদের আর বিশেষ ভয় রইল না। নানা ভঙ্গিতে এল্‌সার সঙ্গে ছবি তুললেন নিজেদের।

চার সপ্তা ক্যাম্পে ছিলাম আমরা। শেষ পনেরো দিনের অধিকাংশ সময় যদিও জঙ্গলে জঙ্গলেই কাটিয়েছে, কিন্তু এখনো অবধি নিজে শিকার শুরু করতে পারেনি। ইতিমধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। রোজ বিকেলে বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। ইসিওলোর থেকে এই অঞ্চলের আবহাওয়া সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে ঠাণ্ডা অনেক বেশি। ইসিওলোতে বৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যায় কারণ সেটা বেলে মাটির দেশ, কিন্তু এখানের কালো নরম মাটিতে বৃষ্টির পরেই চারদিকে জলাভূমি হয়ে যায়। তার ওপর কোমর সমান ঘাস থাকার দরুন জল শুকোতেও কেটে যায় কয়েক সপ্তা। ইসিওলোতে বৃষ্টি হলে এল্‌সা মজা লুটে বেড়াত কিন্তু এখানকার এমন অবস্থায় ওর বড় দুর্দশা।

এক রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হল অবিশ্রান্ত। ভোর হবার আগে অন্তত পাঁচ ইঞ্চি দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির পরিমাণ। ভেসে গেল সারা দেশ। সকালে প্রায় এক হাঁটু কাদা ভেঙে এগোচ্ছি, এল্‌সার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তখন ও আধা ফিরতি পথে। ওকে দেখে এত অসুখী মনে হল আর এমনভাবে আমাদের সঙ্গে থাকার আকুতি জানাল বার বার যাতে করে ওকে একলা ফেলে আসতে মন উঠল না।

সেই সন্ধ্যায় আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে এক আতংকিত দৌড়ের সাড়া পাওয়া গেল, তারপরেই একেবারে চুপচাপ। বাইরে নিশ্চয় কোন আরণ্যক নাটকের মহড়া চলছে! তারপরেই হায়নার আর্ত চিৎকার মিশে গেল শিয়ালের উর্ধ্বশ্বাস ডাকের সঙ্গে। কিন্তু অল্পক্ষণ বাদেই তারা স্তব্ধ হল। শুধু ভেসে এলো অন্তত তিন তিনটে সিংহের গর্জন। বুঝলাম, ক্যাম্পের ঠিক বাইরেই তারা কোন শিকার ধরেছে। কী সুযোগ এল্‌সার! মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমরা, তীক্ষ্ণ কর্ণভেদী আলাদা আলাদা আওয়াজের জমকালো কোরাস্ মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে টানা গভীর গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে। এল্‌সা মাথা ঘষল আমাদের গায়ে। যেন বোঝাতে চাইল কাঁটাতারের বেড়ার সুরক্ষার মধ্যে আমাদের সঙ্গে থাকতে পেয়ে কতখানি সুখী ও।

কিছুদিন পরে বৃষ্টি কমল। এল্‌সাকে বন্য সিংহী করে তোলার চেষ্টা শুরু হল আবার। কিন্তু ওকে আমরা ফেলে আসব এই সন্দেহটা এত জোর দেখা দিল ওর মধ্যে যে, আমাদের সঙ্গে ওকে সমতলভূমিতে নিয়ে যাওয়াই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

শেষ অবধি অবশ্য আমাদের সঙ্গে গেল এল্‌সা। দুটো সিংহীর দেখা মিলল। খুব তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে এল তারা। কিন্তু এল্‌সা পালাল ওদের কাছ থেকে। মনে হল সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে এবার।

পরিষ্কার বোঝা গেল এ জায়গায় সিংহ দেখে ভয় পাচ্ছে ও। কাজেই আমরা ঠিক করলাম, জোর-জবরদস্তিতে ওকে বন্ধুর সন্ধানে না ফিরিয়ে ওর মিথুন মরসুমের জন্যে দেরি করা হবে। তখন হয়ত স্বয়ংবরা হবার মত বোঝাপড়া করার সুযোগ মিলবে ওর।

ইতিমধ্যে বরং আমরা ওকে শেখাব কেমন করে শিকার ধরতে হয়। তার ফলে খাদ্যের জন্যে ওকে আর আমাদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না। আর শিকার করতে পারলে কোন সিংহের সঙ্গিনী হবার যোগ্যতা হবে ওর, যদি অবশ্য ওর মনের মধ্যে তেমন কোন বাসনা জেগে থাকে।

সমতলভূমি তখনো জলে ডুবে আছে। অধিকাংশ বন্য প্রাণীই আশ্রয় নিয়েছে অল্প কয়েক টুকরো উঁচু জমিতে। এল্‌সা ভালবাসত একটা ছোট্ট টিলা যার সর্বাঙ্গে পাথর সাজানো। মনে হয় কোন শিল্পী এইভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছে পাথরগুলো। ঠিক করা হলো এইখানেই পরীক্ষামূলকভাবে এল্‌সার সদর ঘাঁটি করব। দুর্ভাগ্যক্রমে এ জায়গাটা আমাদের ক্যাম্প থেকে মাত্র আট মাইল দূরে। আর একটু দূরে হলে ভাল হত। কিন্তু জলহাওয়ার যা অবস্থা, তাতে বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব নয়।

সেই টিলার ওপরে সপ্তাখানেকের জন্যে ছেড়ে এলাম ওকে। কিন্তু ফিরে এসে ওর যা হাল দেখলাম, তাতে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্র করে মন বাঁধতে হল আবার। নইলে আমার পক্ষে ওর এমন শিক্ষা চালাতে দেওয়া কখনই সম্ভব হত না। দুপুরের ঝিমধরা পরিবেশে বসে রইলাম ওকে নিয়ে, যে অবধি না ঢুলতে ঢুলতে আমার কোলে মাথা রেখে ও ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ ঠিক আমাদের পেছনের ঝোপের মধ্যে ছুটোপাটির আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে সামনে এসে দেখা দিল বিশাল এক গণ্ডার।

বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা গাছের আড়াল নিলাম আমি। এল্‌সা মহাবিক্রমে গণ্ডারটাকে তাড়া করল। খুব অশোভন ভাবেই এমন করে এল্‌সাকে একলা ফেলে আবার ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

সেদিন শেষ অপরাহ্ণে ভিজে ভিজে আবহাওয়ায় ভারি হয়ে উঠল চারধার।

পাশাপাশি রামধনুর কাটা টুকরো বিদীর্ণ করছে অস্তগামী সূর্যের রঙে ঘন লাল মেঘের পর্দা-ঝোলা ধূসর আকাশটাকে। উজ্জ্বল রঙবাহারের এই দূরাভাস সমারোহ ত্বরিতে বদলে গেল। জলভরা কালো মেঘে ছেয়ে গেল পৃথিবী। ক্রমে মেঘটা আরো ঘন হয়ে বিরাট এক কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের মত ঝুলে রইলো মহাশূন্যে। সবাই দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে কখন সেই ভয়াবহ কালো জমাট পাথরখানা চৌচির হয়ে ভেঙে পড়বে পৃথিবীর বুকে।

ভারি সীসের মত মাটিতে পড়ল কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা। কোন অদৃশ্য হাত যেন দৈত্যের প্রচণ্ড ক্ষমতায় আকাশটাকে খান খান করছে। বর্ষণ নামল—দুরন্ত, দুর্বার, অশান্ত। কী প্রচণ্ড তেজ সেই বৃষ্টিধারার! অচিরে আমাদের ক্যাম্প যেন একটা ছুটন্ত প্রবাহের মাঝে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল সেই ঢল। মনে মনে ভাবলাম হতভাগী এল্‌সার কথা। একা এই বরফঠাণ্ডা রাতে ভিজে কাঁপছে অসহায়ের মত। বজ্রবিদ্যুতের তাণ্ডব দেখে আমার আরো দুঃখ বাড়ল ওর জন্যে। বড় কষ্টে কাটল সেই দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ রাত।

পরের সকালে জল ভেঙে আট মাইল পেরিয়ে সেই জায়গায় এলাম। একই ভাবে পথ চেয়ে আছে এল্‌সা। আমাদের দেখে একই ভাবে আহ্লাদে আটখানা হল। প্রত্যেককে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওর সেই চিরাচরিত ভঙ্গিতে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই দুর্দশার একশেষ হয়েছে এবারে ওর। যেন কেঁদে ফেটে পড়ছিল কষ্টে।

ঠিক করলাম, শিক্ষার ব্যাঘাত হয় হবে, এমন বৃষ্টিবাদলের সময়ে আর ছাড়া হবে না ওকে। এখানকার সিংহেরা এমন জলহাওয়ায় অভ্যস্ত। কিন্তু এল্‌সা আধা-মরু অঞ্চলে জন্মেছে, সেই পরিবেশে বড়ো হয়েছে। এতটা আবহাওয়ার ফারাক মানিয়ে নিতে ওর পক্ষে সময় লাগা স্বাভাবিক। এবার এল্‌সা আমাদের সঙ্গে বেশ দিলখোশ হয়েই ফিরল। ঠিক ইসিওলোতে যেমনটা করত তেমন করেই জল ছিটোতে ছিটোতে এল জলাভূমি দিয়ে। যেন দেখাতে চাইল, এবার কত সুখ ওর!

পরের দিন সকালে ও অসুখে পড়ল। নড়াচড়া করতে খুব যাতনা পাচ্ছে। গ্রন্থিগুলো ফুলে উঠেছে। জ্বরও হয়েছে বেশ। জর্জের তাঁবুর লাগোয়া যেটুকু বাড়ানো ছাউনি ছিল সেখানে ওকে ঘাসের বিছানা করে দেওয়া হলো। সারাক্ষণ শুয়ে রইল হাঁপাতে হাঁপাতে, অসাড় মর্মান্তিক অবস্থায়। আমার কাছে যা একমাত্র ওষুধ ছিল তাতেই কাজ হবে ভেবে দিলাম। সব সময়েই কাছে চাইছিল আমায় আর আমিও ওর পাশে পাশে ছিলাম।

বৃষ্টি নেমে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। সুতরাং এল্‌সার রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজনে একজন পদাতিক বার্তাবহ পাঠানো

হল একশো মাইল দূরের এক হাসপাতালে। সেই সঙ্গে করে নিয়ে গেল রক্তের নমুনা। এই যাওয়া আর আসার মাঝে যেন অনন্ত উৎকণ্ঠা।

পরীক্ষার ফলে জানা গেল হুক্ আর লম্বা ক্রিমির প্রকোপেই এই কাণ্ড। এর আগে একই রোগে ভুগেছে ও। ওষুধ জানাই ছিল আমাদের। কিন্তু এর জন্যে জ্বর হওয়ার বা গ্রন্থি ফুলে ওঠার কথা নয়। মনে হল গায়ের পোকার মারফত কোন রক্তবাহী বীজাণুর সংক্রমণ ঘটেছে ওর দেহে। দেখা গেছে এর ফলে নিজের পরিচিত পরিবেশে কোন প্রাণী কোন বিশেষ রোগের আক্রমণে অসুস্থ না হতে পারে কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে তার শরীর আর সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে না। পূর্ব আফ্রিকায় যে সব জন্তুজানোয়ার দেখতে পাওয়া যায় তাদের প্রকৃতি বিচারের মধ্যে যে গরমিল থাকে, এই তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

এল্‌সার অসুখ এত বাড়ল যে, এক সময় মনে হল ও আর সারবে না। যাই হোক সপ্তাখানেক পরে ছেড়ে ছেড়ে ওর জ্বর এল। তিন চার দিন পরে পরে জ্বর, বাকি সময় স্বাভাবিক থাকত। ওর সুন্দর সোনালী রঙ চটপট মিলিয়ে যাচ্ছিল, গায়ের চামড়াটা কুশ্রী—যেন সুতী পশমের মত হয়ে গেল। পিঠে অনেকগুলো সাদা লোম দেখা দিল। মুখখানা পাঁশুটে। নিজেকে কোনমতে যেন তাঁবুর ছাউনি থেকে ছিটেফোটা রোদ্দুরে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। একমাত্র ভরসার কথা সব সময় ওর খিদে থাকত প্রচণ্ড। যত খেতে চায় ও তত দুধ আর মাংস দিতাম ওকে, যদিও দুধ আর মাংস অনেক দূর থেকে আনতে হত।

ভীষণ বর্ষার জন্যে গাড়ি যাতায়াতের অসুবিধে তবুও নাইরোবির পশু-চিকিৎসা ল্যাবরেটরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছিলাম আমরা। যে সব নমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে কোন বীজাণু ধরা পড়েনি। কাজেই অল্প-বিস্তর আন্দাজের ওপর চিকিৎসা চালাতে হচ্ছিল।

ওষুধ দেওয়া হল হুক-ক্রিমি আর রিকেটসিয়ার জন্যে। শেষের রোগটা গায়ের এঁটুলি পোকার মধ্যে থাকে। খুব সম্ভবত অসুখটা তাই থেকেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা নিশ্চিত জানার জন্যে দরকার ছিল ওর একটা গ্রন্থি থেকে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ দিয়ে কিছুটা নমুনা নিয়ে পরীক্ষার জন্যে পাঠানোর। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই ওকে যতটা সম্ভব সুস্থির রাখার চেষ্টা করছিলাম। যতটুকু আদর চাইছিল ও ততটুকু দেবার কোন কসুর করিনি। ভারি লক্ষ্মী এল্‌সা। আমরা যা কিছু করছিলাম ওর জন্যে, সবই বুঝছিল। ওর কাঁধের ওপর মাথা দিয়ে থাকতাম যখন আমাকে থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখত।

অসুখের সময় আমাদের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ হল ও, অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে গেল আমাদের ওপর আর সবচেয়ে বেশি গা-ঘেঁষা হয়ে উঠল। বেশির ভাগ দিন আমাদের কাঁটাতার ঘেরা ডেরার প্রবেশপথে এমন একটা কায়দার জায়গায় শুয়ে থাকত যেখান থেকে ক্যাম্পের মধ্যে যা হচ্ছে আর বাইরের সমতলেও কী ঘটছে তাও দেখা যায়। খাওয়ার সময়েও নড়ত না। লোকজনকে বরং ও ডিঙিয়ে যেতে দিত। ডিঙিয়ে যাবার সময়ে এল্‌সা তাদের সবাইকে একবার করে আদরের চাপড় দিত, আর তারা হাসতে হাসতে এই নিগ্রহটুকু ভোগ করে প্লেট ভর্তি ঝোল সামলে দৌড় দিত।

জর্জের তাঁবুতে ওর কাছেই ঘুমোত এল্‌সা, তবু চরে বেড়াত যখন খুশি। এক গভীর রাতে হঠাৎ এল্‌সার মৃদু ডাক শুনে ঘুম ভাঙল জর্জের। আর ওর মনে হল তাঁবুর পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে এল্‌সা। উঠে বসেই তাঁবুর দরজায় একটা পশুর আকৃতি দেখতে পেল। ভাবল এল্‌সা এত তাড়াতাড়ি পেছন থেকে ঘুরে সামনে আসতে পারবে না। তখন টর্চ জ্বালতেই দেখল একটা বন্য সিংহী আলোর ফোয়ারার মুখে কটমট চোখে তাকিয়ে আছে। জর্জ হাঁক দিতেই চলে গেল সিংহীটা। নিঃসন্দেহে এল্‌সার গন্ধ পেয়ে থাকবে আর তাঁবুর মধ্যে স্বজাতির সাড়াশব্দ পেয়ে দেখতে এসেছিল।

পাঁচ সপ্তা হল এল্‌সা অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিন্তু এতদিনেও উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছিল এখানকার জলহাওয়া সইছে না ওর। বিভিন্ন অঞ্চলের এঁটুলি পোকা বা সেৎসি মাছির মারফত যে সব রোগ সংক্রমণ হয় তার ইতরবিশেষ আছে। এক এক জায়গায় এক এক রকম। এখানকার সংক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা এল্‌সার নেই। এ ছাড়াও আকারে স্থানীয় সিংহীদের থেকে ও আলাদা। ও আরও ঘন রঙের, নাক লম্বা, কান আর আকৃতি ছোট। সব দিক দিয়েই এল্‌সা মরুপ্রায় অঞ্চলের, উচ্চ পার্বত্য-ভূমির নয়। কেনিয়ার দু-ধরনের সিংহ হল :

ফেলিক্স ম্যাসাইকা—হলদে কেশরওয়ালা, পায়ের রঙ আলতো হলুদ ; ফেলিক্স লিও সোমালিয়েনসিস্—আকারে একটু ছোট, বড় কান, দাগগুলো স্পষ্ট, লেজ বেশি লম্বা।

এল্‌সা এই সোমালিয়েনসিস্ জাতের।

আরও, সংরক্ষিত এলাকায় থাকার অর্থ হল—এল্‌সার জন্যে যে জর্জকে শুধু বিশ মাইল পথ গিয়ে মাংস যোগাড় করতে হয় তাই নয়, জর্জের সঙ্গে শিকারে যোগ দিতেও পারত না। তাহলেও শিকার ধরতে শেখার সুযোগ পেত এল্‌সা। কোন জ্যান্ত পশুকে পেড়ে ফেলার তাগিদও বোধ করতে পারত। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা ওর মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই হওয়া উচিত ছিল। সোজা

ব্যাপার যা বুঝছিলাম, তিন মাস এখানে ক্যাম্প করে থাকার পরে এল্‌সার জন্যে আরো ভালো জায়গা খুঁজতে হবে আমাদের।

এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া সোজা নয়। ওর জুৎসই আবহাওয়া, বরাবরের মতন জল, খাওয়ার জন্যে যথেষ্ট পশু, উপজাতীয় বসতি বা শিকারী দল থাকবে না। তার ওপর সেখানে গাড়ি যাবার পথও থাকা চাই!

শেষ অবধি এমন একটি নন্দন অরণ্যের সন্ধান পেলাম। সরকারী অনুমতিও মিলল সেখানে একটি সিংহ ছাড়ার। বৃষ্টি থামলেই অর্থাৎ বর্ষাশেষে সেখানে যাওয়া হবে ঠিক হল।

তাঁবু গোটানো হল, মালপত্তর ভরা হল গাড়িতে, শুধু এল্‌সা নেই। ঠিক সেইদিনই ওর মিলনলিপ্সা দেখা দিয়েছে আর অদৃশ্য হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। অপেক্ষায় আমরা আড়াই মাস বসে থেকেছি, কিন্তু এখন ওকে এখানে বন্য-জীবনে ফিরে যাবার জন্যে ছেড়ে দিতে পারি না। সেদিন ওর দেখা মিলল না আর। আমরা হেঁটে গাড়িতে সব জায়গায় খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু হদিশ পেলাম না। ভারি ভয় হল কোন বন্য সিংহী ওকে মেরে না ফেলে!

ওর জন্যে দেরি করে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। দু দিন দু রাত এল না ও। শুধু একবার তড়িঘড়ি এসে আমাদের হাঁটুতে মাথা ঘষেই চলে গেল। পরক্ষণেই ফিরে এসে আরও বেশি করে মাথা ঘষল, আবার চলে গেল। ফের ফিরে এসে আমাদের দিকে চাইল। ওর চোখের ভাষা যেন পড়া যাচ্ছিল পরিষ্কার—

সুখের আমার নাইক সীমা, বুঝেই দেখ যেতেই আমায় হবে।
বলতে এলাম নেই ভাবনা, করব আশা, একটু আরো রবে।

তারপর চলে গেল।

ফিরে এল যখন, ওর গায়ে ভয়ংকর সব থাবার আঁচড় থেকে রক্ত ঝরছে। ক্ষতগুলোর শুশ্রূষা করতে দিচ্ছিল না, রেগে যাচ্ছিল।

অনেক চেষ্টায় ওকে গাড়িতে তোলা গেল তারপরে।

এইভাবেই আমাদের পরীক্ষাকালের তিন মাস গেল। এবারে ব্যর্থ হলাম আমরা ওর অসুখের জন্যে। কিন্তু আমাদের ভরসা ছিল ধৈর্য আর সময় ঠিকমত লাগালে আমাদের সাফল্য অবধারিত।

এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার, আমরা অবাক হয়েছিলাম মিথুন মরসুমে সিংহ সঙ্গ পেলেও এ অবধি ওর বাচ্চা হবার কোন লক্ষণ নেই কেন। এক পশুশালার কর্তৃপক্ষের কাছে জেনেছি যে, চারদিনের মধ্যে দিনে ছয় থেকে আটবার সিংহ সিংহীর মিলন হয়, তার শেষ দিনের ফসলই সন্তান সম্ভাবনাময়। এমনটাই হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। যদি তাই হয় নিঃসন্দেহে এল্‌সার সে

সুযোগ মেলেনি। যূথের অন্য সিংহীরা কোন নবাগতাকে তার দয়িতের সঙ্গে একটানা সঙ্গসুখ ভোগ করতে দেবে না। এল্‌সাকেও সে অবকাশ দেয়নি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহীরা।

দ্বিতীয় প্রয়াস

কথায় বলে অ-যাত্রা। কাজেই মাঝে মাঝে যে তা দেখা যায় না, এমন নয়। আমাদের এবারের চারশো চল্লিশ মাইলের যাত্রায় তা টের পাওয়া গেল মর্মে মর্মে।

বারো মাইল যেতে না যেতে জর্জের গাড়ির সামনের একটা বেয়ারিং নষ্ট হল। সব থেকে কাছের সরকারী ঘাঁটি নব্বুই মাইল দূরে! অগত্যা আমাকেই গাড়ি নিয়ে যেতে হল মেরামতের বন্দোবস্ত করতে। সারারাত গাড়িতে গাড়িতেই কেটে গেল; এল্‌সাকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছিল আমার গাড়ির পিছনে। ইতিমধ্যে যখন একটা বেয়ারিং জর্জের কাছে গিয়ে পৌঁছল. দেখা গেল অত বড় স্প্যানার নেই ওর গাড়িতে। কাজেই ঠোকাঠুকি ঘষাঘষি করে শেষ অবধি আটকাতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তারপর এসে পৌঁছল ও। আবার চললাম আমরা। সে রাতে আর পরের সকালে মোট ছ-বার চাকা ফাঁসল গাড়ির। অবশেষে রাত নটায়, গন্তব্যে পৌঁছতে আর যখন মাত্র বারো মাইল বাকী আমাদের, বিশ্রী আওয়াজ শুরু করল আমার গাড়িটা। কাজেই খোলা জায়গায় থেমে আস্তানা গাড়তে হল তখনকার মত। এক নাগাড়ে বাহান্ন ঘণ্টা গাড়ি হাঁকিয়ে আমরা সবাই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এল্‌সা ভালো মেয়ের মত শান্ত হয়েই রইল। কোন আপত্তি জানায়নি। এবার ও আমাদের পাশে সটান শুয়ে পড়ে ঘুম শুরু করল। পরের সকালে আমরা ভাবলাম, ওকে গাড়িতে ওঠানো দায় হবে. কেন না কিছু আগেই ও বেরিয়ে গেছে আমাদের আস্তানার কাছে একটা ছোট খরস্রোতা নদীর পাড়ে ঘন নলখাগড়ার বনে শুয়ে থাকার জন্যে। নদীটা পার হওয়া খানিক পরে কঠিন হয়ে উঠবে। তাই ঠিক করা হল, আগে গাড়িগুলো পার করা হবে, তারপর তোলা হবে এল্‌সাকে।

ল্যাণ্ডরোভারটা পার হয়ে গেল ঠিক। কিন্তু আমার গাড়িটা আটকে গেল, কাজেই টেনে তুলতে হল সেটা। তারপর আবার আমরা হেঁটে এপারে এসে এল্‌সাকে ওর ছায়াঘন আশ্রয় ছেড়ে গাড়িতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই চলে এল ও, লাফিয়ে আমার গাড়ির পেছনে উঠে পড়ল। যেন

আগে থেকেই ওর জানা ছিল যাত্রা এখানে শেষ নয়, কাজেই মাঝপথে আয়েশ করে বসে থাকা চলে না।

একটা অসমান রাস্তা দিয়ে চললাম আমরা এবার। দু-পাশে ঘন জঙ্গল। দেখা গেল আমাদের বিপদ এখনো কাটেনি। কয়েক মাইল গিয়ে আমার গাড়ির পেছনের একটা স্প্রীং ভেঙে গেল। তার ফলে এল্‌সার নতুন আবাসে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল।

আফ্রিকার সেই একান্ত এটা, যেখানে শিয়ালেরাও একে অপরকে সেলাম ঠুকে কেটে পড়ে। ঠিকমত ক্যাম্প করার জায়গায় পৌঁছবার জন্যে জর্জ লোকজন নিয়ে জঙ্গল কেটে একটা রাস্তা বানাল। চারদিন লেগে গেল এতে আমাদের। সুন্দর নদীতীরে স্থায়ী ক্যাম্প করা হল। তীর বরাবর খেজুর, বাবলা, ডুমুর গাছের সারি—লতাপাতার সাহায্যে একে অপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রয়েছে। নদীর স্রোত ফেনা তুলে, ঢল দিয়ে বুড়বুড়ি কেটে, নল বন ঢাকা ছোট ছোট দ্বীপের পাশ কাটিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে, তবেই পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলাশয়ে শান্ত হয়েছে। গভীর এই জলাশয়ে মাছ প্রচুর। মৎস্যবিলাসীর অক্ষয় স্বর্গ। ছিপ নিয়ে বসতে একটুও আর দেরি করল না জর্জ।

যে অঞ্চল ছেড়ে এলাম তা থেকে এখানকার অবস্থা একেবারে আলাদা। গরম বেশি, তৃণভূমিতে বিরাট পশুর পাল চরে বেড়াতে দেখা যায় না। শুধু কয়েক গজ ফাঁক ফাঁক কাঁটাঘেরা ঝোপ-ঝাড়। শিকারীদের দুঃস্বপ্নের রঙ্গভূমি। কিন্তু এল্‌সার জন্মভূমি থেকে এ জায়গাটার দূরত্ব মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল, আর এ ধরনের দেশই ওর গা-সওয়া হবে।

যখন আমরা রসাল শাঁসাল ক্রান্তীয় হরিৎক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে এলাম, মনে হল রোদের প্রচণ্ড তাপ যেন তরঙ্গের মত আমাদের সর্বাঙ্গে আঘাত করছে। এই হরিৎক্ষেত্র শুধু নদীর চত্বরে। বিষুব রেখার খুব কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। এখানকার উচ্চতা ষোলশ' ফুট। কাঁটাঝোপগুলোর পাশ দিয়ে শুধু জঙ্গলের পশুরাই যাতায়াত করতে পারে। এই পথগুলো দেখে সকলে হুঁশিয়ার হলাম রোজ এখান দিয়ে যাতায়াত করে হাতী, গণ্ডার, মোষ—ওদের তাজা নাদ পড়ে আছে। পায়ের দাগগুলোও টাটকা।

আমাদের ক্যাম্প থেকে দুশো গজ দূরে একটা জায়গা রয়েছে যেখানে গণ্ডারের খড়্গ আর হাতীর দাঁতের দাগ দেখা গেল। তার মানে ওরা ঘন ঘন আসে এখানে। এ ছাড়াও গাছ-গাছড়ায় হাতীর গা ঘষার স্পষ্ট চিহ্ন। এল্‌সার খুব অসুবিধে। এবড়ো-খেবড়ো কোন গাছের গা নেই যার ওপর ওর থাবা শানিয়ে নেবে। হাতীর কল্যাণে সব গাছের বাকলই অল্প-বিস্তর পালিশ করা।

শুধু ব্যাওবাব গাছই একমাত্র ব্যতিক্রম। এই লালচে ধূসর গাছের বিরাট আকৃতি ছায়া ধরে আছে বেঁকে কাঁটাঝোপের ওপর। কারণ কোন পশুর কাজে আসে না এই গাছের মসৃণ বাকল।

এই জায়গার মস্ত আকর্ষণ, একটা লাল পাহাড়ের সারি—অনেক চূড়া, অনেক গুহা তাতে। তার ছায়াতে আমরা দেখলাম হাইর্যাক্স ছোটাছুটি করছে। সিংহ-নিবাস হিসেবে এই পাহাড় আদর্শ, চমৎকার পরিবেশ। এর শিখর থেকে আমরা দেখলাম জিরাফ, জলহরিণ, ছোট কুডু হরিণ, জেরেনাক ও ঝোপহরিণ চলেছে নদীর পথে। এই আধা-মরু অঞ্চলে জল নামে জীবন-প্রবাহের একমাত্র লীলাক্ষেত্র ঐ নদী।

হয় আমাদের রিকেটসিয়া চিকিৎসার গুণে কিংবা জলহাওয়া বদলের ফলে এল্‌সার স্বাস্থ্য দিনে দিনে ফিরতে লাগল। কাজেই শুরু করতে হয় আমাদের শিক্ষা। রোজ ভোরের আলো ফুটলে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতাম আর বিকেলেও ঘুরে বেড়াতাম এদিক ওদিক। অসংখ্য পশু-চলা রাস্তা, নদীর নানা জায়গায় বালির চড়ায় জল।—এ সবই এল্‌সার কাছে খুব আদরের। ও শুঁকতো, পায়ের দাগ ধরে ধাওয়া করত, হাতী বা গণ্ডারের নাদে গড়াগড়ি খেত। তারপর বুনো শুয়োর বা ডিক্‌ডিক্‌ তাড়া করত। আমাদের সাবধান থাকতে হত যথেষ্ট। পশু চলার পথ লক্ষ্য করে কে বা কারা কতক্ষণ আগে কোন্ দিকে গেছে ঠাওর করতাম প্রথমে। কোন্ দিক থেকে বাতাস আসছে খেয়াল রাখতে হত। চোখ কান সজাগ রেখে কোন দিক থেকে কোন শব্দ বা নড়াচড়ার কোন ইঙ্গিত আসছে কিনা বুঝে নিয়ে তবেই সামনে অগ্রসর হতাম। এতটা সাবধান হওয়া একান্তই দরকার; কেননা এসব স্থানে হঠাৎ কোন গণ্ডার, মোষ বা হাতীর মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আর আচমকা তাদের মুখোমুখি হলেই বিপত্তি।

এখানে এল্‌সা জর্জের সঙ্গে শিকারে বেরোতে পারছিল। বন্যপ্রাণী হত্যা আমরা মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু আমাদের সইতে হচ্ছে এল্‌সার মুখ চেয়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে এল্‌সা নিজের প্রাণ ধারণের জন্যে অনেক প্রাণী মারত, এই ভেবে বিবেকের তাড়নার হাত থেকে রেহাই পেলাম। যত তাড়াতাড়ি নিজের মুখের গ্রাসের জন্যে শিকার করতে শেখে এল্‌সা ততই মঙ্গল।

এল্‌সা এখন তার লক্ষিত প্রাণীর পিছু নেবে চুপিসাড়ে, তারপর যদি মারতে না পারে, গুলি করবে জর্জ আর এল্‌সাকে ওস্তাদের মার ফলাবার সুযোগ দেবে। এবার নিজের শিকার—শকুন, হায়েনা বা অন্য কোন সিংহের হাত থেকে বাঁচাবার ভার থাকবে ওরই ওপর। এমনি করেই স্বাভাবিক অবস্থায়

অন্য জন্তুদের সংস্পর্শে আসবে ও।

আমাদের ক্যাম্পের কাছ ঘেঁষে অন্য সিংহরা আসছে। তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। তাদের থাবার ছাপ প্রায় প্রতিদিনই চোখে পড়ত আমাদের।

এক সন্ধ্যায় এল্সা ওর প্রিয় শৈলশিখর থেকে ফিরল না। ওখানে বসেই ও চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিরীক্ষণ করে। ওই চমৎকার জায়গায় মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রাচুর্য। কোন সেৎসি মাছি এখানে ওকে জ্বালিয়ে মারত না। অন্য জানোয়ার, কে কোথায় কী করছে সবই চোখে পড়ত ওর এখানে বসে। বেশিদিন হয়নি এ জায়গায় এসেছি। ওর জন্যে ভাবনা হল। খুঁজতে বেরোলাম।

অন্ধকার হয়ে গে[illegible] অনেকক্ষণ। অরণ্যের দামাল সন্তান-সন্ততি শুরু করেছে তাদের নিত্যলীলা[illegible] ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে সেই অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে আমাদের সাহসে কুলোল না। কোন চিহ্নও মিলল না এল্সার। হার মেনে ফিরে এলাম সকলে।

ভোর হতেই আবার তল্লাসী শুরু হল। অল্প পরেই দেখা গেল এল্সার থাবার ছাপ একটা প্রকাণ্ড সিংহের থাবার ছাপের সঙ্গে মিশেছে। দাগগুলো নদী পর্যন্ত গিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে দূরে। এখানে পাথর বেরিয়ে বেরিয়ে আছে। আমরা ভাবলাম, হয়তো সিংহটার এলাকা এটা আর সে এল্সাকে নিয়ে গেছে তার গুহায়।

দুপুরের খাওয়ার সময় ক্যাম্পের কাছে একদল হনুমানের উন্মত্ত কিচিমিচি শোনা গেল। আশা করলাম, এটা এল্সা ফিরে আসার ইঙ্গিত। সত্যি সত্যিই একটু পরে সাঁতরে নদী পার হয়ে এপারে এল এল্সা। এসে সম্বর্ধনার সেই স্বাভাবিক সমারোহ। গায়ে মাথা ঘষে, উল্লসিত আওয়াজ তুলে যেন ওর দুঃসাহসিক অভিসারের কথাই বলতে চাইল। আমাদের স্বস্তি হল, ওর গায়ে কোন আঁচড়টি অবধি নেই। আগেকার ক্যাম্পে এক সিংহের কাছে দুর্ব্যবহার পাবার পরে পনেরোটা দিনও কাটেনি। তার পরেও এই নতুন অভিসারে এল্সা যে নিজেই পলাতকা হয়েছে, আমাদের কাছে এটা খুব ভালো লক্ষণ বলে মনে হল।

এক সকালে একটা জলহরিণ এল্সার চমৎকার সুযোগ এনে দিল। জর্জ ওটাকে গুলি করেছিল, কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই এল্সা গিয়ে হরিণটার টুঁটি চেপে ধরল ঠিক বুলডগের মত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে মারা গেল হরিণটা। নিজের ওজনের প্রায় সমান কোন প্রাণীকে মেরে ফেলার অভিজ্ঞতা এল্সার জীবনে এই প্রথম।

আমরা লক্ষ্য করলাম, ঠিক মোক্ষম জায়গাগুলো যেন ওর প্রবৃত্তি বশেই

চিহ্নিত করা। একই ভাবে খুব তাড়াতাড়ি মেরে ফেলার কায়দাও ওর জানা। আসলে শিকারকে খতম করার জন্যে সিংহ ইত্যাদি শিকারী পশুরা স্বাভাবিক ভাবে যা যা করে, তা সবই এল্সার আচরণে প্রকাশ পেল। লোকের যে প্রচলিত ধারণা—বাঘ সিংহেরা ঘাড় ভাঙে আগে, তা ভুল। ধরার সময় যেমন দেখেছিলাম খাওয়ার বেলাতেও সেই একই সিংহসুলভ কৌশল। পেছনের পায়ের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে অন্ত্রনালী পর্যন্ত প্রথমে শেষ করা—এল্সা সেই জাতীয় প্রথাকেই বহাল রাখল। রক্তের সমস্ত চিহ্ন সাফ করল চেটে-লুটে; আর পাকস্থলী মাটি আঁকড়ে চাপা দেওয়া কি শকুনদের ফাঁকি দেবার জন্যে!—কী জানি!

এবারে ঘাড়টা কামড়ে ধরল শিকারের। সামনের দুই থাবার মাঝে শরীরটা রেখে টেনে টেনে নিয়ে গেল সব দিক থেকে নিরাপদ একটা জায়গায়, গজ পঞ্চাশেক দূরে। সেখানে ওকে রেখে গেলাম আমরা, যাতে দিনে শকুনের হাত থেকে আর রাতে হায়েনার কবল থেকে নিজের খোরাক সামলাতে পারে। প্রায়ই গল্প শোনা যায়, শিকার ধরে সিংহ ঘুরিয়ে পিঠে তুলে নিয়ে যায়। এমনটা কখনোই আমি বা জর্জ দেখিনি। সত্যি অবশ্য যে, কুকুর বা খরগোসের মত ছোট প্রাণী ওরা মুখে করেই নিয়ে যায়। সব সময়েই আমরা দেখেছি যেভাবে এল্সা নিয়ে গেল হরিণটাকে সেভাবেই সিংহরা বড় প্রাণীকে শিকার করে টেনে নিয়ে যায় ওদের সুবিধেমত খাবার জায়গায়।

চা খাবার সময়ে ওকে দেখতে গেলাম, সঙ্গে জল নিয়ে। বিকেলে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে ও ভালোবাসত, কিন্তু এদিন শিকার ছেড়ে নড়ার কোন ইচ্ছে দেখলাম না ওর। অন্ধকার হয়ে যাবার পরেও এল্সা ফিরল না। রাত তিনটের সময়ে মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙল আমাদের। এর পরেই ফিরল ও আর বাকী রাতটুকু ক্যাম্পেই কাটাল।

পরের দিন ভোরে আমরা দেখতে গেলাম এল্সার শিকারের কী হল। কিছুই নেই আর পড়ে। জায়গাটা সিংহ আর হায়েনার থাবার ছাপে ভর্তি হয়ে গেছে। কাছেই সিংহের গর্গরানি শোনা গেল। সেইজন্যে ঠিক বোঝা গেল না, গতরাত্রে এল্সা ওর শিকার ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল কি কারণে। বৃষ্টির ভয়ে না সিংহের উৎপাতে!

স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হয়ে গেলেও এল্সা এখনো আগের মত হয়ে উঠতে পারেনি। ক্যাম্পেই থাকতে চায় বেশি। অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বদলানো দরকার। কাজেই জর্জ ওকে নিয়ে মাছ ধরতে যেতে শুরু করল যাতে নদীতীরের ছায়ায় জিরোতে ভাল লাগে ওর। মাছ ধরতে গিয়ে ও কান খাড়া করে জলের দিকে চেয়ে থাকে। সামান্য আভাস যদি পায় মাছ বঁড়শিতে

গেঁথেছে, ও সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ তোলার 'ফিনিশিং টাচ্' দেবে। অর্থাৎ ছটফটানো মাছ ধরে তুলে নিয়ে আসবে মুখে করে আর ওর ধরার স্বজাতীয় কায়দায় নিকেশ হবে মাছটা। অনেক সময় মাছে গেঁথে যাওয়া বঁড়শি খুলতেও তর সইত না ওর, মাছ মুখে দৌড় দিতে চাইত ক্যাম্পে। ক্যাম্পে যদি মাছ নিয়ে পৌঁছতে পারে একবার, সটান গিয়ে তুলবে জর্জের বিছানায়; যেন বলবে 'এই ঠাণ্ডা বিদঘুটে শিকারটি আপনারই থাক, স্যার!' তারপর আবার ফিরে এসে পরের মাছটার অপেক্ষায় থাকবে। এ খেলাটা ওর কাছে ভারী মজার। কিন্তু অন্য কোন খেলা আমাদের খুঁজে দিতে হবে যাতে ক্যাম্পের টানটা ওর না থাকে।

নদীর কাছ ঘেঁষেই ছিল একটা চমৎকার গাছ, তার ডালগুলো জলে এসে লাগে লাগে। এর সবুজ চাঁদোয়ার নীচে চোখ ধাঁধানো রোদের ঝলকানির আড়ালে—ঠাণ্ডা ছায়ার কোলে বসে আমার মনে হত, বুঝি কোন গম্বুজের মধ্যে আছি। নেমে আসা ডালের অন্তরাল থেকে বনের প্রাণীদের সহজ স্বাভাবিক গতিবিধি নিরীক্ষণেরও সুবিধে প্রচুর। ওরা,—ছোট কুড়ু, ঝোপ-হরিণের দল আসত নদীতে জল খেতে। একটা হাতুড়ি-মাথা সারস আসত পিপাসা মেটাতে। হনুমানদেব কাণ্ডকারখানা ছিল সব থেকে মজাদার। এল্সাকে পাশে নিয়ে এ সব দেখতে দেখতে মনে হত বোধহয় স্বর্গের নন্দন-কাননে বসে আছি। মানুষ আর পশুতে মিলে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের ঐক্যতান গড়ে তুলেছে। আর এই মন্দাক্রান্তা নদী যেন সেই তানে মেলাচ্ছে তার প্রাণের সুর।

ভাবলাম এ জায়গাটা অনবদ্য স্টুডিও হবে আমার—যেখানে বসে লিখতে বা ছবি আঁকতে পারব। কাজেই ডালপালার ফ্রেমে প্যাকিংবাক্সের কাঠ পেরেক দিয়ে সেঁটে তৈরি হল টেবিল, আর বেঞ্চি হল গাছের কাটা কাটা ডাল সাজিয়ে। চওড়া গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কাজ শুরু করলাম।

পেছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এল্সা আমার রঙের বাক্স আর টাইপ-মেশিনটা সন্দিগ্ধ ভাবে দেখল দু-চার বার। ওর আর আমার মধ্যেকার স্নেহের সম্পর্কে এই যন্ত্রপাতিগুলো কোন ভাগ বসাতে এসেছে কিনা সেই বিষয়েই নিশ্চিন্ত হতে চাইলো মনে মনে। যখন দেখলো আমি ওকে আদর করলাম তখনই কাজ শুরু করতে দিল আমায়। তারপর আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। কাজ শুরু করলাম ওরই অনুপ্রেরণায়।

যেই কাজে মন দেবার চেষ্টা করলাম, কানে এল হনুমানের ডাক—মুখ তুলেই দেখি, পাতার ফাঁক দিয়ে এক কৌতূহলী হনুমানের মুখ উঁকি দিচ্ছে। এই দর্শকদের কথা মনেই নেই আমার এতক্ষণ। ইতিমধ্যে নদীর ঠিক ওপারের,

ঝোপঝাড়গুলোও এমন ধরনের অসংখ্য কৌতূহলী মুখে ভর্তি হয়ে গেছে। ওদের রাজ্যে এমন তাজ্জব ব্যাপারটা কী, তার হদিশ বুঝতে চাইছে ওরা দুষ্টুমিভরা কুৎকুতে চোখ দিয়ে।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ওরা যেন এল্‌সাকে নিয়ে পড়ল। মহোৎসাহে বেরিয়ে এল সবাই, গাছ থেকে গাছে বেপরোয়া ভাবে ঝোলাঝুলি দোলাদুলি শুরু করল, কিচিমিচি লাগল প্রচণ্ড। গুঁড়ি দিয়ে কিছুটা করে পিছলে নেমে আসে, গাছের মাথায় মাথায় লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে! শেষ অবধি একটা ঝপাং করে পড়ল নদীতে। সঙ্গে সঙ্গেই মহাবীর একজন ডাল ঝুলিয়ে দোল খেয়ে টেনে হিঁচড়ে তুলল তাকে। এতে দুনিয়ার সমস্ত হনুমান যেন একসঙ্গে ছাড়া পেয়ে গেল, মহানন্দে এইসা চিৎকার জুড়ে দিল যে, কানে তালা লেগে যায় আর কি!

এল্‌সা আর সইতে পারল না। নদীতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে গেল ওপারে। এল্‌সার কাণ্ড দেখে মহোল্লাসে আর একপ্রস্থ কলরোল তুলল শাখামৃগের দল। ওপারে শক্ত জমিতে পা দিয়েই এল্‌সা লাফ দিয়ে এই উৎপাতগুলোর সব থেকে কাছে যেটাকে পেল ধরেছিল আর একটু হলে। এল্‌সাকে হতবুদ্ধি করে খুব নীচে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ লাফিয়ে ওপরে উঠল হনুমানটা। এল্‌সার থাপ্পড়টা হাওয়ায় মারা গেল। ওপরে নাগালের বাইরে উঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল এল্‌সার দিকে, আর ডাল নাড়া দিল। এই কাণ্ড দেখে অন্য হনুমানেরাও মহানন্দে যোগ দিল। এল্‌সার রাগ যত বাড়তে লাগল, ততই ওকে বিরক্ত করতে লাগল ওরা। এল্‌সার নাগালের বাইরে বসে বসে দাঁত মুখ খিঁচোয়, পেছন চুলকোয়—ভাবটা অনেকটা গাছের নীচে গর্‌গর্ করছে একটা রাগী সিংহী তা যেন ওরা জানেই না।

দৃশ্যটা এতই মজার, লোভ সামলাতে পারলাম না। এল্‌সা হাস্যাস্পদ হচ্ছে। তবুও ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুললাম। এটা আর সইল না এল্‌সার। যেই দেখল ওর আপদ-বালাই চক্‌চকে বাক্সটার ফোকাস পড়ছে ওর ওপর, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে এল এপারে। ক্যামেরাটা সরিয়ে রাখতে আর সময় মিলল না। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল আমার ওপর। বালিতে দামী ক্যামেরা নিয়ে ওর সঙ্গে গড়াগড়ি খেলাম। সবই ভিজে গেল। আমাদের এই কাণ্ড দেখে হনুমানেরা আবার ফুর্তির চোটে বুঝি হাততালি দিল। তবে আমার মতে এই দর্শককুলের কাছে আমার বা এল্‌সার কারোরই আর মুখ রইল না।

এরপর থেকে রোজই এল্‌সাকে খুঁজত হনুমানেরা। দু-পক্ষের চেনাচিনিটা হয়েছিল জবর। এল্‌সা ক্রমে সয়ে যাচ্ছিল, চটত না। এতে ওদের সাহস বেড়ে চলল। রোজ জল খেত ওরা নদীর ঢল থেকে, এল্‌সার থেকে মাত্র গজ

কয়েক তফাতে। একজন পাহারায় থাকত ওদের। আর সবাই পায়ে ভর দিয়ে মুখ নামিয়ে জল খেত আস্তে আস্তে।

এল্‌সাকে নিয়ে মস্করা করার সাহস যে শুধু এদেরই ছিল তা নয়।

যেমন একদিন আমরা একটা হরিণ মেরে আনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল একটা মনিটর। এরা নিরীহ বড় আকারের গিরগিটি। প্রায় তিন থেকে পাঁচ ফুট লম্বা, চার থেকে ছ-ইঞ্চি চ্যাটালো প্রাণী। জিভ কাঁটাওলা। নদীতে থাকে, মাছ খায়। অবশ্য মাংস পেলেও ছাড়ে না। একটা বিশ্বাস আছে, যেমন বাঘের আগে ফেউ, তেমনি কুমীরের আগে মনিটর। আসলে কুমীরের ডিম খেয়ে এরা প্রকৃতির হয়ে দামাল প্রাণী সামাল দেবার কাজ করে। এখন এই মনিটরটা এল্‌সার খোরাক থেকে কয়েক কামড় ছিনতাই করতে এল। এল্‌সা এই হামলাকারীকে ধরতে চাইল। কিন্তু এত ত্বরিত গতি তার যে, এল্‌সার সাধ্যে কুলোল না কাজেই হরিণটাকে আড়াল করে খাওয়া শুরু করল এল্‌সা যাতে আর এক খাবল মাংসও বেহাত না হয়। আমাদের সঙ্গে ওর খাবারের ব্যাপারে যেমনটা করত এল্‌সা এটা তার উল্টো। আমি যদি ওর জন্যে মাংস ধরে রাখতাম ভারী খুশি হত ও, নুরু বা জর্জ ওর খাবার নাড়াচাড়া করলে কিছু করত না। আমাদেরও ও নিজের যূথের বলেই ভাবত। সব কিছুই ভাগাভাগি করতে চাইত আমাদের সঙ্গে, কিন্তু মনিটরটার সঙ্গে নয়। আমাদের মধ্যেও আবার ওর বাদবিচার ছিল। আমি জর্জ বা নুরু তাঁবু থেকে ওর খাবার নিয়ে গেলে কিছু বলত না। কিন্তু আমাদের লোকজনের কাউকেউ তা করতে দিত না।

আমাদের এ কাহিনী অনেক সোজা হত, যদি এল্‌সা মাংসাশী না হত আর ওকে শিকার ধরা শেখানোর দরকার না পড়ত। এর পরে মারা হল একটা জেরেনাক। এতে এল্‌সা সচরাচর যেমন অংশ নেয় তা নিতে কসুর করল না। তারপরে শিকার সমেত কয়েক মাইল দূরে ওকে রেখে আসা হল। ক্যাম্পে ফেরার পথে আমার দেখলাম ওর দিকেই একটা সিংহ এগিয়ে চলেছে। তাহলে কি সিংহটা গন্ধ পেয়েছে শিকারের?

বিকেলে যখন দেখতে গেলাম, সেখানে এল্‌সা নেই; জেরেনাকটার দেহেরও কোন চিহ্ন নেই আশেপাশে। সিংহের বড় বড় থাবার ছাপ আমাদের আভাস দিল কী ঘটেছে। দু-মাইল এল্‌সার থাবার ছাপ ধরে গেলাম আমরা। ছাপটা বরাবর গেছে পাহাড়ের ওপর ওর সেই প্রিয় জায়গাটির দিকে। ফীল্ডগ্লাস দিয়ে ওকে খুঁজে বের করলাম। একমাত্র জায়গা যেখানে অন্য সিংহদের কাছে ওর কোন বিপত্তি ঘটবে না, অথচ আমরা দেখতে পাব দূর থেকে। জায়গাটি এল্‌সারই আবিষ্কার। সব দিক দিয়ে চমৎকার আর

নিরাপদ।

এক রাতে হাতী আর গণ্ডার ঘোরাফেরা শুরু করেছে বোঝা গেল। ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ আর ছুটোপাটির শব্দে জেগে উঠলাম।

ঠিকমত জেগে পড়ার আগেই তাঁবু থেকে ছুটে বেরোল এল্‌সা ওর 'গহ্বর' অর্থাৎ আমাদের তাঁবু বাঁচাতে। তারপরে আরো ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ আর ছুটোপাটি শোনা গেল, ক্রমে অবশ্য তা মিলিয়ে দূরে চলে গেল। নিশ্চয়ই এল্‌সা ওর কর্তব্য করেছে। ফিরে এল কিছু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে। জর্জের বিছানার পাশেই সটান শুয়ে পড়ে জর্জের গায়ের ওপর একটা থাবা চাপিয়ে যেন বলতে চাইল, 'সব ঠিক আছে এখন, কোন ভয় নেই। একটা গণ্ডার বই আর কিছু নয়।'

কয়েক রাত পরে একপাল হাতীর ব্যাপারে ঠিক অমনটাই করল। তাঁবুর পেছনদিক থেকে ওদের চমকিত ডাকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল এল্‌সা। বরাতজোর, ও একাই সেই দৈত্য বাহিনীকে রণে ভঙ্গ দেওয়াল। ওরা যেমন ডাকছিল তাতে ভয় হচ্ছিল। হাতীদের বরাবর আমি ভয় করি। এই একমাত্র অরণ্য-সন্তান যা আমায় ঘাবড়ে দিতে পারে। না ভেবে পারিনি, কত সহজে সব ব্যাপারটা উল্টো হতে পারত। ওরা তাড়া করতে পারত এল্‌সাকে। ও আমাদের কাছে আসত শরণার্থিনী হয়ে। আমার ভয় দেখে ঠাট্টা করল জর্জ। কিন্তু বরাতের ওপর আস্থা রাখার মত মনের জোর খুঁজে পেলাম না।

রোজই এক মহিষাসুর ক্যাম্পের কাছাকাছি আসত। এক সকালে সে বেচারী শিকার হয়ে গেল। জর্জ গুলি করল। এল্‌সা কাছে আসার আগেই তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে। কিন্তু উত্তেজনায় এল্‌সা একেবারে মাতাল হল। এ পর্যন্ত ওকে শিকার নিয়ে এত মাতামাতি করতে দেখিনি, এটা নিয়ে যা করল! মরা মোষটার ওপর উন্মত্তের মত লাফিয়ে পড়ল, আক্রমণ চালাল সব দিক থেকে, মৃত পশুটার ওপর ডিগবাজি খেল অনেকগুলো। কিন্তু ওর ভাবগতিক যতই বেসামাল মনে হোক না কেন, মারাত্মক শিঙ দুটোকে সব সময়েই পাশ কাটাল। সবশেষে মোষটার নাকের ওপর থাবার ঘা মেরে যেন নিশ্চিন্ত হতে চাইল যে, সত্যি সত্যি মরেছে পশুটা।

এতবড় একটা জানোয়ার মারল জর্জ, কোন বন্য সিংহকে সেদিকে আকৃষ্ট করার জন্যে। যদি কেউ আসে, একসঙ্গে ভোজে বসে। এল্‌সার সঙ্গে ভাব-খাতির জমাতে পারে। যাই ঘটুক না কেন, পরিস্থিতি যাতে আমাদের হাতছাড়া না হয় সেজন্যে মরা মোষটাকে নিয়ে আসা হল ক্যাম্পের কাছে। এল্‌সা সেটাকে নিয়ে বসল। গাড়ি আনতে গেছি আমরা, ইতিমধ্যে আশপাশের গাছ ভরে গেছে শকুনে আর মারাবু সারসে। এল্‌সা ওদের ঠেকিয়

রাখছে। সেই কাঠফাটা রোদে ওর শিকারের পাশে বসে আছে। আমরা আসতেই ও একেবারে নিশ্চিন্ত হল। আমাদের অর্থাৎ ওর যূথের হাতে শিকার ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটা গাছের ছায়ার দিকে চলল কিছুটা জিরিয়ে নিতে।

কিন্তু যেই লোকজন এক ইঞ্চি পুরু চামড়া ছাড়াতে লাগল মোষটার, চুপ করে থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে যোগ দিল নিজে। যখন পাকস্থলীটা কেটে খুলছে, এল্‌সা সাহায্য করল, অন্ত্রনালী ছিঁড়ে ফেলল লোকজনের ব্যস্ত ছুরির যাতায়াতের মাঝেই, আর চিবোতে শুরু করল ফূর্তিতে। স্প্যাঘেটির মতই ক্ষুদ্রান্ত্র চুষে খেতে লাগল আর দাঁতের চাপ দিয়ে তার মধ্যেকার পদার্থ নিঃশেষ করে চলল। লক্ষ্মী মেয়ের মতই দেখল, ছাড়ানো মোষের দেহটা শিকল দিয়ে গাড়ির গায়ে বাঁধা হচ্ছে। তারপর যখন বেচারা ল্যাণ্ডরোভার উঁচুনীচু জায়গা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল সঙ্গে বাঁধা মাংসের বোঝাটি নিয়ে, ছাদে লাফিয়ে উঠে বসে এল্‌সা আরও তিনশো পাউণ্ড ভার বাড়িয়ে দিল গাড়ির।

ক্যাম্পের কাছাকাছি একটা গাছের গায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা হল মোষের দেহটা। এল্‌সা পরের দিন আর রাত সেটাকে পাহারা দিল উৎসাহভরে। হায়েনাদের তারস্বর কোরাসের ঠেলায় আঁধার হবার পর থেকেই এল্‌সা সতর্ক ছিল সারারাত। সকালে গিয়ে দেখি, তখনো পাহারায় আছে ও। আমরা যেতেই—যেন এবার পাহারার পালা আমাদের, এমন ভাব দেখিয়ে কদম চালে ও চলল নদীর পাড়ে জিরোতে। আমরা কাটা চাপা দিয়ে শকুনদের হাত থেকে মড়িটাকে অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করলাম, যাতে আরো এক রাত এল্‌সাকে প্রতিরোধের শিক্ষা দেওয়া যায়।

রোজকার বৈকালিক ভ্রমণে আমাদের সঙ্গ নিল এল্‌সা। মোষের মাংসে ভর্তি পেটটা ওর তখন দোলা খাচ্ছে। অল্পক্ষণ পরেই ঝোপের মধ্যে একটা হায়েনাকে তাক্‌ করল ও। হায়েনাটা মড়িতে ভাগ বসাতে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে গেল এল্‌সা, বাঁ দিকের সামনের থাবা তোলা রইল ওপরে। তারপর দুর্দান্ত সাবধানতার সঙ্গে নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নীচু হল। খড়ের রঙের ঘাসের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিল একেবারে। প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না ওকে। উত্তেজনা দমিয়ে থরো থরো অবস্থা ওর তখন। লক্ষ্য করছে হায়েনাটা কেমন শান্তভাবে চলেছে, জানেই না তাকে অন্য কিছুতে দেখছে। যখন মাত্রকয়েক গজের মধ্যে এসে গেছে, এল্‌সা ছুটে গিয়েই দিল নির্ভুল লক্ষ্যে থাবার এক ঝাপটা। চিৎকার করে গড়াগড়ি দিতে লাগল হায়েনাটা, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কাঁউমাঁউ করে কাতরাতে শুরু করল।

আমাদের দিকে চাইল এল্‌সা। ওর পাল্লায় পড়া হায়েনাটার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল নিজস্ব কায়দায়, বুঝি জিজ্ঞাসা করল, 'এবারে কী করা হবে?' আমাদের কাছে কোন উৎসাহ না পেয়ে থাবা চাটতে শুরু করল, সামনের হতভাগ্য জীবটার ওপরে ওর যেন বিরক্তি ধরে গেছে। একটু একটু করে উঠে বসল হায়েনাটা। শেষ অবধি প্যান্‌প্যান্‌ করে আপত্তি জানিয়ে সরে পড়ল পায়ে পায়ে।

আমাদের ওপর এল্‌সার আস্থা আরও কয়েকবার লক্ষ্য করেছি।

বিকেল শেষ হয়ে এলে একটা হরিণের মৃতদেহ এল্‌সার পাহারায় রাখা হল। হরিণটাকে ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে জর্জ আর এল্‌সা দু-জনে শিকার করেছে। সারারাত অত দূরে এল্‌সা থাকবে না বুঝে আমরা গাড়ি নিতে এলাম যাতে ক্যাম্পের কাছাকাছি ওটাকে আনা যায়, ফিরে গিয়ে এল্‌সা আর শিকার কাউকেই দেখা গেল না। তারপরেই জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ও, আমাদের দেখাতে নিয়ে গেল যেখানে লুকিয়ে রেখেছে ওর শিকার। আমাদের দেখে ও খুশিই হয়েছিল কিন্তু তাই বলে কিছুতেই গাড়িতে তুলতে দিল না হরিণটাকে। ওকে সরিয়ে দেবার জন্যে যত কৌশল করি না কেন কোনটাই কাজে এল না। বোকা বনতে রাজী নয় ও বারবার। শেষ পর্যন্ত গাড়িটাকে কোনমতে আনা হল মরা হরিণটার সামনে। আমি প্রথমে দেখলাম গাড়িটার দিকে তারপর হরিণটার দিকে, আবার গাড়িটার দিকে—ওকে দেখাতে চাইলাম, সাহায্য করতে চাই আমরা। নিশ্চয়ই বুঝল ও। উঠে দাঁড়াল হঠাৎ, এসে আমার হাঁটুতে মাথা ঘষল। কাঁটাঝোপের মধ্যে থেকে টেনে আনল হরিণের লাশটা। তারপর সেটাকে গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা অসুবিধে দেখে লাফিয়ে উঠল গাড়ির মধ্যে। সেখান থেকে হরিণের মাথাটা মুখে চেপে ধরে টানতে লাগল আর পেছনের দিকটা আমরা তুললাম।

হরিণটা ঠিকমত গাড়ির মধ্যে উঠল দেখে, এল্‌সা হাঁপাতে হাঁপাতে তার ওপর গিয়ে বসল আর জর্জ গাড়ি নিয়ে চলল। কিন্তু যখন দেখল জঙ্গলের মধ্যে যেতে গাড়িটা লাফাচ্ছে আর তার মধ্যে হরিণটার ওপরে আঁকড়ে বসে থাকা দায়, তখন আবার লাফিয়ে বেরিয়ে এসে চড়ে বসল ছাদে। বার বার মাথা বেঁকিয়ে ভেতরে দেখতে লাগল, আমরা সবাই আছি কিনা।

ক্যাম্পে পৌঁছে দেখা গেল, গাড়ি থেকে হরিণের দেহটা বের করা মুস্কিল। এল্‌সা এবারে ব্যাপারটা ছেড়ে দিল আমাদের ওপর। বেশির ভাগ টানা-হেঁচড়া আমাদেরই করতে হল। সবাই কাজে হাত লাগিয়েছে আমি ছাড়া, এল্‌সা তাই আমার কাছে এসেই দিল এক ঝাপটা, যেন শাসন করল আমায়,

'কী ব্যাপার, হাত লাগাও না!'

ক্যাম্পের বেশ কাছাকাছি ফেলা হয়েছে হরিণটাকে। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল এল্‌সা সেটাকে টেনে আনছে। মতলবটা বোঝা গেল, ও ওর খাদ্যবস্তুটাকে ক্যাম্পের কাঁটাবেড়ার মধ্যেই আনতে চায়। তাড়াতাড়ি আমাদের বেড়া আটকে দেওয়া হল, তখন গন্ধ বেরোচ্ছে পচে। বেচারী এল্‌সা! ভেবেছিল বেড়ার মধ্যে কোন ভাগীদার জুটবে না ওর। এখন ওকে সারারাত আগলে বসে থাকতে হবে। হরিণের দেহটাকে সঙ্গে নিয়ে বসাই ওর পক্ষে সব থেকে ভালো আর তাই করল ও। ফলে ক্যাম্পের এত কাছা-কাছি হায়েনাগুলো সারারাত উৎপাত করল আর চেল্লাচেল্লি শুরু করল যে, রাতে ঘুমোনো দায়। হায়েনাগুলোকে তাড়া করে করে তিতিবিরক্ত হল বোধহয় এল্‌সা। নদীর দিকে হরিণটা টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। তারপর সেটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। এতে হায়েনারা হার মেনে রণে ভঙ্গ দিল। কী করে বুঝল এল্‌সা জল ভেঙ্গে হায়েনারা ওর পিছু নেবে না! পরের সকালে ওর পায়ের ছাপ আর শিকার টেনে নিয়ে যাবার টানা দাগ দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম, নদীর ওপারেও লক্ষ্য করা হল। আমাদের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ও পছন্দ করেনি, কাজেই আবার সেটা টেনে এনেছে আমাদের দিকে। ঠিক জলের ধারে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে রেখে দিয়েছে হরিণটা, যাতে কাউকে আসতে হলে জল পার হয়ে আসতে হবে, তার ফলে নজরে পড়ে যাবে ওর।

এখানেই এল্‌সাকে দেখা গেল মড়ি আগলে জিরোচ্ছে। ভাবভঙ্গিতে বোঝাতে চাইলো আগের রাতে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকতে না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছে ও। মানিনীর মান আর ভাঙে না! অনেক চেষ্টা করে আবার মন পেলাম ওর।

মায়ের শিক্ষা ও কোনদিন পায়নি। তবুও জানত, বনের পশুদের কার সঙ্গে কতদূর লাগতে পারে! আমাদের সঙ্গে বেড়াবার সময় দেখেছি হঠাৎ বাতাসে কিছুর গন্ধ পেয়েই কোন একদিকে চুপিসাড়ে গুঁড়ি দিয়ে গিয়েই লাফ দিয়েছে ওর লক্ষ্যে। কোন কিছুর পতনের শব্দ শোনা যায় তারপরে, কিংবা ঝোপ-ঝাড় ভেঙে কোন বিরাট আকৃতি তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার শব্দ কানে আসে। বহুবার গণ্ডারের সাড়া পেয়ে আমাদের কাছ থেকে তাড়া করে পগার পার করে দিয়েছে। আসলে ও পাহারাদার কুকুরের কাজ করত চমৎকার।

কাছের একটা পাহাড়ী আলের ওপর কয়েক পাল মোষ আস্তানা গেড়েছিল। তাদের মধ্যে আতঙ্কের হুল্লোড় বাধিয়ে দেবার সুযোগ পেলে কখনো ছাড়তো না এল্‌সা। যখন ওরা ঘুমে অসাড় ওদের সচকিত করে তুলত। সব সময়েই শিং-এর নাগালের এপাশে ওপাশে ত্বরিৎ গতিতে লাফ দিয়ে দিয়ে

ওদের তাড়া করত। যতক্ষণ না পালের সব মোষগুলো বিরক্ত হয়ে ছুটে পালাত ততক্ষণ অবধি ওদের অমন ভাবে ধাওয়া করে চলত।

একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে একটা শুকনো নদীবক্ষে বালির ওপর আমরা গত রাতের আগন্তুকদের বার্তা পেলাম। দুটো সিংহ আর প্রচুর হাতীর পায়ের দাগই বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রোদ চড়ে গেছে, তিন ঘণ্টা হাঁটার পরে আমরা সবাই ক্লান্ত। বাতাস আমাদের সামনাসামনি। অসাবধান হয়ে একটা বাঁক পেরোতে গিয়েই আমরা একটা হাতীর পালের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিলাম আর একটু হলে। আমাদের পেছনে এল্‌সা একটু দূরে ছিল। কাজেই উঁচু পাহাড়ের ওপর লাফিয়ে ওঠার সময় মিলল। হাতীরা অন্য পাড় দিয়ে উঠে তিনটে বাচ্চাকে নিরাপদে নিয়ে গেল। একটি বুড়ো মদ্দা হাতী পেছনে শুঁড় উচিয়ে রইল, কোন বিপদ হলেই মোকাবিলা করবে প্রথম চোটে।

এল্‌সা এল যেন ঝিমন্তভাবে, তারপরেই হাতীটাকে দেখে বসে পড়ল। কী হবে সেই অপেক্ষায় আমরা উৎকণ্ঠিত। দু-পক্ষ একে অপরকে দেখল। সে সময়টা আমাদের কোনমতে যেন কাটে না। শেষ অবধি হাতীটাই পেরিয়ে গেল, পালে ভিড়ল। এল্‌সা মাটিতে গড়াগড়ি দিল কয়েকটা সেৎসি মাছির উৎপাত কাটাবার জন্যে।

ক্যাম্পে ফেরার পথে দেখা গেল নদীর মধ্যে অল্প জলে একটা জলহরিণ। জর্জ গুলি করতেই সেটা উল্টোদিকে চলে গেল। পিছু পিছু ছুটল এল্‌সা। গভীর জলে অবিশ্বাস্য গতিতে সাঁতার দিয়ে নদী পার হল। যখন অন্য তীরে এসে পৌঁছলাম আমরা, ঝোপের মধ্যে মরা হরিণটা চেপে এল্‌সাকে বসে থাকতে দেখা গেল। খুব উত্তেজিত ছিল ও, আমাদের ছুঁতে দিল না ওর শিকার। কাজেই আমরা ওকে ওখানে ঐ অবস্থায় রেখেই ফিরব ঠিক করলাম।

যেই আমরা জল ভেঙে চলে আসছি, আমাদের পিছু পিছু আসতে লাগল। বোঝা গেল অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ও। শিকার নিয়ে নদীর উল্টোদিকে থাকতে রাজী নয়, আবার ফেলে চলে আসতেও চাইছে না। অনিচ্ছুকভাবেই অবশেষে ফিরল। কিন্তু আবার নদী পার হয়ে আসার জো করল। মন স্থির করতে না পেরে ফের মরা হরিণটার দিকে ঘুরল। যতক্ষণে আমরা নদীর অন্য দিকে উঠে গেছি, তার মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে এল্‌সা।

এবার দেখা গেল ওকে হরিণটা মুখে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কী করতে চাইছে ও? নিশ্চয় হরিণের ভারি দেহটা ও একা নদী পার করে নিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু হার মানবে না এল্‌সা। গভীর জলে এসেও মুখে

ধরে রয়েছে হরিণটাকে, সাঁতরাচ্ছে। ভালো করে ধরতে' গিয়ে মাঝে মাঝে মাথা ডুবে যাচ্ছে। ও টেনে, ঠেলে, ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে হরিণটাকে নিয়ে আসতে লাগল। যখন আটকে গেল কোথাও, ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার ভাসাবার চেষ্টা করল। মাঝে মাঝে এল্সা আর তার শিকারের কাউকেউ দেখা যাচ্ছিল না, শুধু এল্সার লেজ বা হরিণটার পা দেখে বুঝছিলাম জলের মধ্যে কী কাণ্ড ঘটে চলছে।

মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম আমরা। আধঘণ্টার প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরে এল্সা আমাদের কাছাকাছি অল্প জলে তার শিকার টানতে টানতে নিয়ে এসে সগর্বে মুখ তুলে দাঁড়াল। এবার এল্সা সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছে, কিন্তু কাজ এখনো শেষ হয়নি ওর। হরিণটাকে সর্বপ্রথম কোন নিরাপদ স্থানে টেনে এনে রাখল, যাতে স্রোতে না ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারপরে একটা লুকিয়ে রাখার জায়গার অন্বেষণে চারিদিকে ফিরে তাকাল। ঠিক ঐ জায়গায় শক্ত কাঁটাওলা খেজুর চারার ঝোপগুলো এমনি নিশ্ছিদ্র যে, এল্সারও সাধ্য নেই তার মধ্যে প্রবেশ করে।

এল্সাকে ওখানে ঐ অবস্থায় রেখে আমরা ক্যাম্পে এলাম জঙ্গল কাটার হাতিয়ার, দড়ি এসব নিয়ে যেতে। অনেক দেরি হল প্রাতরাশ সারতে। ফিরে এসেই সেই খেজুর ঝোপের একটা দিক কেটে পথ করলাম জলের ধারে। এল্সা হরিণটার কাছে দাঁড়িয়ে চোখভরা সন্দেহ নিয়ে লোকজনকে ঝোপ কাটতে দেখছে। আমি একটা দড়ির ফাঁস হরিণটার মাথা দিয়ে গলিয়ে দিলাম। এবার হরিণটাকে সেই খাড়া তীরে তোলার সব ব্যবস্থা পাকা।

প্রথম হ্যাঁচকা টান পড়তেই এল্সা গর্ গর করে উঠল, সতর্ক ভঙ্গিতে কান খাড়া করল। নিশ্চয় ভাবল, শিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে ওর কাছ থেকে। কিন্তু যখনই দড়ি টানায় হাত লাগালাম আমি, ও নিশ্চিন্ত হয়ে তীর দিয়ে উঠল। আমাদের সমবেত চেষ্টায় হরিণের মৃতদেহটা নদী থেকে দশ ফুট ওপরে টেনে তোলা হল যেখানে ঝোপ কেটে এল্সা আর ওর শিকারের জন্যে জায়গা করা হয়েছে। এতক্ষণে ও বুঝল কী করছি আমরা, ওরই সুবিধের জন্যে। তখন যে দৃশ্য দেখলাম সবাই, তা বাস্তবিকই হৃদয়স্পর্শী। জনে জনে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গায়ে মাথা ঘষে মৃদু আওয়াজ করে ধন্যবাদ জানাল যেন।

দুবার দেখেছি ওকে কালো পিঁপড়ের চওড়া সারের ওপর দিয়ে নিরুদ্বেগে চলে যেতে। ফলে ওর বড় বড় থাবায় পিঁপড়ে সার ভেঙে ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গেছে। এই পিঁপড়েগুলো ভয়ংকর। ওদের চলাফেরার পথে যা কিছুই বাগড়া দিক না কেন ওরা সচরাচর তা কামড়ে অস্থির করে দেয়। কিন্তু

এল্সার বেলায় অদ্ভুত ব্যবহার করল ওরা। কিছুই করল না। কারণ কী, বুঝিনি।

খুব ক্লান্ত হয়ে একদিন আনমনাভাবে ফিরছি এল্সায় পিছু পিছু। হঠাৎ এল্সা ভয়ংকর আওয়াজ করে ওর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই পিছু লাফ দিল। ফুট পাঁচেক লম্বা একটা গাছের পাশ দিয়েই যেতে হত। এল্সার অদ্ভুত ব্যবহারে ভাল করে লক্ষ্য করেই চোখে পড়ল সেই গাছটায় জড়িয়ে রয়েছে একটা লাল কেউটে, আমাদের দিকে ফণা তুলে। কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এল্সার জন্যেই, নয়তো গাছটার একেবারে পাশ দিয়ে গেলে বিপদ হতে পারত। এই প্রথম গাছের ওপর ঐ সাপ দেখলাম। এল্সাও অনেক বেশি সজাগ হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে। কয়েকদিন ধরে ঐ গাছটার কাছ দিয়ে যখনই যেতে হয়েছে আমাদের, এল্সা এগিয়ে এসে গাছটার আশপাশ দেখে নিয়েছে আগে।

এ সময় গরম বড় বেশি। নদীতেই দিনের বেশি সময় কাটিয়ে দেয় এল্সা। মাঝে মাঝে শরীরের অর্ধেকটা ডুবিয়ে রাখে ঠাণ্ডা জলে। কুমীর দেখা যায় ঘন ঘন, কিন্তু ওর কোন ভাবনাই নেই তার জন্য। জর্জ যখনই বনমুরগী মারত প্রায়ই তা জলে গিয়ে পড়ত ; কুড়িয়ে আনত এল্সা। পাখীটা মুখে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জলে ঝাঁপাই জোড়ার অছিলা পেত যেন। আমরা যেমন ওর শিকার কুড়িয়ে আনার পদ্ধতি দেখে মনে মনে মজা পেতাম, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম, এল্সাও তেমনি আমাদের এই হাসিখুসি অবস্থাটা মনে মনে উপভোগ করতো।

এবার এল্সা একেবারে সেরে উঠে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ওর অভ্যেসগুলো পাল্টাতে চাইত না কখনো। সামান্য অদলবদল ছাড়া আমাদের রোজকার রুটিনের হেরফের ঘটত না খুব একটা। ভোরবেলায় খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো, নদীতীরে আমার কাছে বসে দুপুরের ঘুম। বৈকালিক চায়ের পরে আবার বেড়ানো। ফিরেই ওর খাবার তৈরি থাকত। খাবারটা নিয়ে ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে গিয়ে উঠত যতক্ষণ অবধি না আলো নেভে সেখানেই বসে বসে খাওয়া সারত। সবাই শুতে গেলে আস্তে আস্তে নেমে এসে ঢুকত জর্জের তাঁবুতে। জর্জের খাটিয়ার পাশে মাটির ওপর শুয়ে থাকত। আর একটা থাবা জর্জের গায়ে লাগিয়ে ঘুমুত।

বিকেলে বেড়াতে বেরোল না এল্সা একদিন। আমরা বেড়িয়ে ফিরে এলাম। তখন ও নেই। ফিরল পরের দিন সকালে। পরে দেখলাম ক্যাম্পের খুব কাছেই সিংহের বড় বড় থাবার দাগ। এল্সার গায়েও সেই অদ্ভুত গন্ধ। যেমন ওর মিলনকাল এলে পাওয়া যায়। ওর হাবভাবেও এই ইঙ্গিত মিলল। খুবই

অমায়িক ভঙ্গি, কিন্তু কেমন যেন অন্তরের টান নেই। প্রাতরাশের পরেই ও হাওয়া হল, সারাদিন এল না। অন্ধকার হলে ওর ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে ওঠার আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেরোলাম ওর ভাবগতিক বুঝতে। কোন সাড়া শব্দ দিল না, অথচ ভারি চঞ্চল। আবার লাফিয়ে পড়েই অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

রাতে ওর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আওয়াজ শুনলাম। সেই সঙ্গে আতঙ্কিত হনুমানদের চিৎকার সোরগোলও শোনা যাচ্ছিল। সারা রাত চলল সেই হৈ চৈ একেবারে ভোর অবধি। তারপর অল্পক্ষণের জন্যে ক্যাম্পে ফিরল। জর্জ গায়ে চাপড় মেরে আদর করতেই সোহাগে ঢলে পড়ে গর্ গর্ করল কিছুক্ষণ। আবার চলে গেল।

নিশ্চিত বুঝলাম আমরা, প্রেমে পড়েছে এল্সা।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এই আসঙ্গলিপ্সার মেয়াদ দিন চারেক। আগেকার ক্যাম্পের মত অবস্থা নয় এখানে। প্রকৃতির রাজ্যে অবাধ মুক্ত জীবনে ওকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিটি সুযোগ রয়েছে। সময়ও এসেছে মনে হল। কাজেই একটু কৌশলে সপ্তা-খানেকের জন্যে আমরা সরে যাওয়া ঠিক করলাম। একা থাকবে ও—আশা করা যায় নিশ্চয় এটা ওর নির্জন দ্বীপান্তর হবে না। কোন দয়িতকে খুঁজে পাবে এই ফাঁকে।

আমাদের এই চলে যাওয়াটা যাতে ওর চোখে না পড়ে সেজন্যে তাড়াতাড়ি করার দরকার।

যখন বাঁধাছাঁদা চলছে, এল্সা ফিরে এলো। ঠিক করলাম আমি ওকে দেখব, ততক্ষণে জর্জ তাঁবু গোটাবার কাজে থাকবে। তারপর সব কিছু গোছগাছ করে নিয়ে মাইলখানেক এগিয়ে গিয়ে খবর পাঠাবে আমায়, তখন সুকৌশলে আমিও ওর সঙ্গে যোগ দেবো।

আমাদের সেই যে গাছ, ওর সঙ্গে যার তলায় দিনের পর দিন দুপুর কাটিয়েছি সেখানে গেলাম ওকে নিয়ে। এই কি শেষ দেখা? বুঝছিল এল্সা, কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের রোজকার কাজকর্ম বজায় রাখার চেষ্টা করলাম। সঙ্গে টাইপরাইটারটা নিয়েছিলাম। এল্সার পরিচিত টুকটাক শব্দ তুললাম মেশিনে, যাতে ওর সন্দেহ ঘোচে। কিন্তু ওর মনের ধন্দও ঘুচল না, আর আমিই বা টাইপ করায় মন দিতে পারলাম কই!

তৈরি ছিলাম আমরা ওকে ছেড়ে দিতে। বড় আশা, বন্দী জীবন কাটাবার চেয়েও অরণ্যের শিশু অরণ্যের কোলে ঠাঁই পেলে আরো সুখী হবে। কিন্তু ভাবা যায় কত সহজে, আর কাজে তা করতে গেলে কত না আঘাত লাগে, কত না সইতে হয়। আমাদের এতদিনের স্নেহ, আদর, সোহাগ সে কি মুখে

বললেই দু-দণ্ডে ফুরিয়ে যায়? ওকে ছেড়ে দেব, ফেলে চলে যাব ধোঁকা দিয়ে—হয়তো জীবনে আর দেখাও হবে না কখনো।

আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম আর ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে মনের অবস্থা যে কেমন হচ্ছিল, নাই বা লিখলাম!

বোধহয় এল্‌সা আমার মন বুঝল। যে গভীর অস্থিরতা প্রাণপণে চেপে রেখেছি বুকের মধ্যে তা বুঝি টের পেল ও। ওর রেশম-নরম মাথাটা ঘষতে থাকল আমার গায়ে।

আমার আর এল্‌সার সামনে দিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে চলেছে সেই একই নদী। গতকাল যেমন বয়েছে, আজও বইছে, তেমনি বইবে আগামী কালও। হর্নবিল পাখী ডেকে গেল, কিছু শুকনো পাতা ঝরে পড়ল, স্রোতে ভেসে গেল আস্তে আস্তে।

এই জীবনেরই অংশীদার ছিল এল্‌সা। ও প্রকৃতির, মানুষের নয়। আমরা মানুষ, ওকে ভালবেসেছি, আমাদের ভালবাসতে শিখিয়েছি ওকে। আজ সকাল অবধি যা কিছু ওর পরিচিত ছিল, তা কি ভুলতে পারবে ও? খিদে পেলে ও কি গিয়ে শিকার করতে পারবে? নাকি আমাদের ওপর অটল বিশ্বাস বুকে নিয়ে পথ চেয়ে বসে থাকবে অনাদিকাল? ও তো জানে ওকে একেবারে ছেড়ে যাইনি কখনো আমরা এ পর্যন্ত। আমার স্নেহ যে এখনো আছে তা বোঝাবার জন্যে ওকে চুমো দিলাম, কিন্তু তা কি বিশ্বাস ভঙ্গের? কেমন করেই বা জানবে এল্‌সা, এখন ওকে ছেড়ে যেতে ওর জন্যে আমার যত ভালবাসা সব উজাড় করেই তৈরি হচ্ছি আমি! শুধু প্রকৃতির বুকে ফিরিয়ে দিতে চাই ওকে। ওর সত্যিকারের আপনজনদের যাতে খুঁজে নিতে পারে, তাই তো এই ছেড়ে যাওয়া! একা থাকবে এখন, তারপর একটু একটু করে মিশে যাবে ওর প্রকৃতিজীবনের সবকিছুতে। একদিন মুছে যাবে আমাদের স্মৃতিটুকু।

নুরু এসে আমায় চলে যাবার ইশারা করল। কিছু মাংস এনেছিল ও। কোন সন্দেহ না করেই এল্‌সা ওর পিছু পিছু গিয়ে নলবনের মধ্যে খেতে বসল। চুপিসাড়ে পালিয়ে এলাম।

দশ মাইল গিয়ে আরো একটা ছোট কিন্তু গভীরতর নদীর তীরে ক্যাম্প করলাম। ঠিক হল এখানে এক সপ্তা কাটানো হবে। বিকেল গড়িয়ে গেলে একদিন আমি আর জর্জ নদীর পাড়ে বেড়াচ্ছি শান্ত ভাবে, মন আমাদের এল্‌সার ভাবনায় বিভোর। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল কতই না নির্ভর করতো ও আমাদের ওপর। প্রায় তিন বছর এক সিংহীর জীবনের সব বোধ, আগ্রহ, চাঞ্চল্যের কতখানি আমাদের জুড়ে ছিল। একসঙ্গে এমন ভাবে থেকেছি যে একা থাকা যেন অসহ্য। সত্যিই কত একা লাগছে বেড়াতে—পাশে এল্‌সা নেই, গায়ে মাথা ঘষার কেউ নেই, নরম গরম গায়ের ছোঁয়া লাগানোর কেউ নেই, যেন ভাবাই যায় না! এক সপ্তা পরে ওর সঙ্গে দেখা হবার আশা আছে কিন্তু দিন কাটে কই? কত দেরি সাত দিন শেষ হবার?

হঠাৎ থেমে গেল জর্জ। সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখাতেই আমরা বসে পড়লাম। লতাগুল্মের কচি কচি ডগা দাঁতে কাটতে কাটতে একটা ছোট্ট কুডু হরিণ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ মাথা তুলল, সতর্কভাবে চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। প্রত্যেক চলন্ত ছায়া বা গাছের ডালপাতার শব্দে সচকিত হওয়া ওদের প্রবৃত্তিগত। যদিও আমরা একেবারে ওর নজরের আড়ালে ছিলাম, বাতাসও উল্টোদিকে, তবুও সন্দেহ হচ্ছিল, আমাদের উপস্থিতির আভাস পেল বুঝি হরিণটা। কিংবা হয়তো সহজাত ভয়েই ওরা সর্বদা এমন সতর্ক হয়ে থাকে।

নিখুঁত গড়ন, মনোহর গায়ের আঁজি আর সাদা ডোরাগুলো আর সুন্দর আকৃতির শিং—হরিণটি যেন প্রকৃতির অনবদ্য সৃষ্টি। দেখতে দেখতে আমরা আনন্দে আত্মহারা হলাম আর সে ঝোপে ঝোপে লতাপাতা চিবোতে চিবোতে শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হল।

এ দৃশ্য জীবনে একবারই দেখা যায়, দুবার নয়।

এর পরেই নদীর ধারে একটা গণ্ডগোল শুনে সাবধানে এগোলাম। এক জলহস্তী আর তার বাচ্চা উল্টো দিকের রসাল গাছপালা খেয়ে চলেছে। রোদ এখনও গরম, কাজেই জল ছেড়ে উঠছে না। আধ ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোজ সারছে ওরা। নদীর যা গভীরতা তাতে ওরা নিশ্চয় মায়ে-পোয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে পাশ ফিরে এগিয়ে চলেছে নদীর ওপর ঝুলে পড়া লতাপাতা খেতে খেতে।

এই দৃশ্য যখন দেখছি, আমার মন পড়ে আছে এল্‌সার কাছে। এমন সময় নজরে পড়ল ওপারে তীরে দাঁড়িয়ে একটা হাতী, মাঝে সামান্য কয়েক গজ জলের ব্যবধান। এবার তার পেছনের ছোট পালটাকেও দেখা গেল। আমাদের উল্টো তীর থেকে নিঃশব্দে নদীর ঢলে জল খেতে এসেছে অশরীরী প্রেতের মত। সেখানকার পাথুরে তীরে নামার জায়গাটা খুব সরু। প্রত্যেককেই একে একে নেমে জল খেতে হবে। জলে লম্বা চুমুক দেওয়ার আগে শুঁড়টা বার কয়েক জলে ছোঁয়াবে সবাই। যখন তৃষ্ণা মিটবে, সন্তর্পণে পিছু হটে সরে যাবে পরবর্তী তৃষ্ণার্ত সাথীকে নামার পথ করে দিতে। ইতি-মধ্যে দুটো বাচ্চাকে সমস্ত পালটা ঘিরে রেখেছে, কোন বিপদ সামনে থাকলে বাচ্চাদের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

সূর্য ডুবছে। চক্‌চকে খেজুর পাতার ওপর এসে পড়েছে তার শেষ উষ্ণ স্পর্শ; গাছের মাথায় লাগছে এসে রাঙা আভা।

আবার এল্‌সার কথা মনে এল। কী সুন্দর এক পৃথিবীর অধিবাসী ও। ছেড়ে যেতে যতই বুকে লাগুক না কেন সেই জগতের প্রাণভরা আলো বাতাস এখন ওকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। বন্দীদশার জীবন থেকে যেন রেহাই পায় ও। এ পর্যন্ত মানুষের কাছে বেড়ে ওঠা কোন সিংহকে সগৌরবে অরণ্যের কোলে ফিরিয়ে দেবার দৃষ্টান্ত নেই। তবুও বড় আশা আমাদের, অরণ্য জীবনের মধ্যে না বেঁচেও তার কাছাকাছি বেড়ে উঠেছে ও, সেই প্রকৃতির বাঁধন নিজের জগতে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, অরণ্যের সন্তান যৌবনের উপবন খুঁজে পাবে শৈশবের লুণ্ঠিত শিশুশয্যায়।

কিন্তু যতই দেরি হোক, দিন কাটে। শেষ অবধি উদ্বেগে অধীর সুদীর্ঘ একটা সপ্তা কাটল। দেখতে গেলাম কেমন আছে এল্‌সা।

আগে যেখানে আমরা ক্যাম্প করেছিলাম সেখানে প্রথমে এল্‌সার পায়ের ছাপ খুঁজলাম। কিন্তু তা নেই। এল্‌সার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে ওর সেই চিরপরিচিত আওয়াজ শুনলাম। নদীর দিক থেকে যত তাড়াতাড়ি পারে দৌড়ে আসছে। যেমন ভাবে স্বাগত জানাল তাতে মনে হয় আমরা ওর অভাবে যতখানি কষ্ট পাচ্ছি ঠিক ততটা কষ্ট ওরও হচ্ছে আমাদের হারিয়ে। ওর মাথা ঘষা, মৃদু সোহাগের ডাক আমাদের অন্তরে নাড়া দিল।

একটা হরিণ আনা হয়েছিল ওর জন্যে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। আদর সোহাগের পালা তখনো মেটেনি। আদর কাড়া শেষ হলে দেখলাম, ওর পেট ভর্তি আছে কিনা। ভর্তি পেট। নিশ্চয় খেয়েছে কিছুক্ষণ আগে। মনে বিরাট দুর্ভাবনার বোঝা চেপে বসেছিল, এতক্ষণে নেমে গেল। তাহলে

নিরাপদ ও। এখন নিজের খোরাক নিজেই যে যোগাড় করতে পারবে তার প্রমাণ মিলেছে, আমাদের ওপর আর নির্ভর করতে হবে না।

তাঁবু খাটানো হচ্ছে। এল্‌সাকে নিয়ে নদীর ধারে এসে জিরোলাম কিছুক্ষণ। এবার আমি সুখী, নিশ্চিন্ত, এল্‌সার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। এল্‌সাও সুখী, নিশ্চিন্ত। আমার গায়ের ওপর ওর বিরাট নরম একখানা থাবা চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ ঘুম ভাঙল এল্‌সা মাথা তোলায়। ওপারে লতাপাতার মধ্যে লালচে রঙের একটা ঝোপহরিণ দেখতে পেয়ে কান খাড়া করে সেদিকে চাইল। আমরা আছি বুঝতেই পারেনি হরিণটা, ধীর পায়ে চলে গেল—এল্‌সা চেয়ে চেয়ে দেখল শুধু। এ সময়টায়, এল্‌সার সুখ কানায় কানায়। তবুও বুঝলাম পেট ভর্তি থাকায় ওর কোন আগ্রহ হল না হরিণটাকে দেখে। কী খেয়েছে ও? গাছ থেকে কতকগুলো ছোট ছোট ভারভেট বাঁদর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমাদের হট্টগোলে দর্শক সেই শাখামৃগকুল কোথায়? সব সময়ে তো ওরা এল্‌সাকে দেখলেই হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। পরে এল্‌সার প্রথম শিকার সম্বন্ধে আমার আশংকা সত্যি হয়ে দেখা দিল। যেখানে ওরা এল্‌সাকে উত্ত্যক্ত করে মারত সেখানে জল খাবার জায়গাটার পাশে আমাদের চোখে পড়েছিল হনুমানের লোম ছিঁড়ে পড়ে আছে থোকা থোকা।

এল্‌সার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোন ভয়ই নেই আমাদের মনে। তাই স্বল্প-কালের জন্যে ওর সঙ্গ পেয়ে চিরবিচ্ছেদের জন্যে অপেক্ষা করা হবে ঠিক করা হল। তাতে বিচ্ছেদবেদনা খুব বড় হয়ে দেখা দেবে না। আমাদের নিত্যকার জীবন যেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে ফিরলাম। যদিও এল্‌সা কদাচিৎ চোখের আড়াল হতে দিল আমাদের, শুধু সুলক্ষণ এই যে, ওর শিকারের ঝোঁক বজায় ছিল। বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ ঘণ্টাখানেকের মত আমাদের ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যেত।

শুকিয়ে গেছে চারদিক। ঘাসের আগুনে আকাশে লাল রঙ ধরে মাঝে মাঝে। পরের দু তিন সপ্তার মধ্যেই নামবে স্বল্পকালীন বৃষ্টি। আধপোড়া মাঠ সেই বৃষ্টির তৃষ্ণায় হা হা করছে। বড় বেশি সেৎসি মাছির প্রকোপ এ সময়টাতে। বেচারী এল্‌সা ওদের জ্বালায় অস্থির—বিশেষ করে সূর্য ওঠার পরে আর ডোবার আগে। নীচু ঝোপে-ঝাড়ে পাগল হয়ে ঢুকবে ও, গা ঘষে ওদের উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে, কিংবা মাটিতে সটান শুয়ে গড়াগড়ি দেবে। ওর চক্‌চকে লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠবে।

ক্যাম্প জীবনের ওপর ওর টান কমাবার জন্যে সারা দিনের মত ওকে নিয়ে বেরোই। ভোরে দু'তিন ঘণ্টার মত বেড়ানোর পরে নদীর ধারে গাছের

ছায়ায় গিয়ে বসি। সেখানে চড়ুইভাতি হয় আমাদের। আমার আঁকার খাতা বের করি। এল্সা ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি ওর গায়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমোই বা পড়ি। বেশির ভাগ সময় মাছ ধরে জর্জ, আমাদের খাওয়া জোটে নদী থেকেই!

প্রথম শিকারটা আগে আগে হত এল্সার পাওনা। কিন্তু ও এখন মাছটা কিছুক্ষণ মুখে রেখে বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে ফেলে দেয় মাটিতে। জর্জের পরের শিকারে আর কোন উৎসাহ দেখায় না। নুরু আর আমাদের অস্ত্রশস্ত্র বাহক ভারি চমৎকার রাঁধে। মাছ ধরা হতেই রোস্ট্ তৈরি।

একবার এক খণ্ড পাথরের ওপর রোদ পোয়াচ্ছে এক কুমীর, আমরা এসে পড়াতে চমকে উঠেই একটা সরু খালে ডুব দিল। খালটার দু' পারে নদীর চল। খালের জল স্বচ্ছ, অগভীর। তলা পর্যন্ত দেখা যায় স্পষ্ট। কিন্তু কোন চিহ্ন নেই কুমীরটার। অবাক হলাম, তাহলে গেল কোথায়? খেতে বসলাম। জলের ধারে গা এলিয়ে আরাম করছে এল্সা আর ওর ওপর ভর দিয়ে রয়েছি আমি।

জর্জ উঠে পড়েই মাছ ধরতে গেল তাড়াতাড়ি। কুমীরটা ওখানে আছে কিনা দেখার জন্যে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে খালটার তলা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চলল। হঠাৎ লাঠিটা ওর হাত থেকে মুচড়ে উঠল। ছ-ফুট কুমীরটা এতক্ষণ লুকিয়েছিল বালিতে। চলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল পরের খালটায়। এবড়ো খেবড়ো লাঠিটার মাথা কামড়ে ভেঙে দিয়েছে।

এ ঘটনা দেখেনি এল্সা। কুমীর শিকারে ওর উৎসাহ দিয়ে কাজ নেই. সরে এলাম আমরা।

অল্পক্ষণ পরেই এক বুনো শুয়োর এল দুপুরের তেষ্টা মেটাতে। এল্সা সাবধানে তার পিছু নিল চুপিসাড়ে। তারপর জর্জ শুয়োরটাকে গুলি করতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি কামড়ে ধরল আর দম বন্ধ করে মেরে ফেলল জন্তুটাকে। নদী থেকে সামান্য দূরে ঘটল ব্যাপারটা। ভাবলাম নদীর ধারে ছায়াতে এই শিকারটা আগলে থাকা ওর কাছে স্বস্তিদায়ক হবে। শুয়োরটাকে আর নদীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললাম ওকে, 'মাজি, এল্সা, মাজি, এল্সা।' 'মাজি' কথাটা ও ভালো করেই বুঝত। ও কথাটা বলতাম নুরুকে এল্সার গামলায় জল দেবার জন্যে। এবার মনে হল ঐ স্বাহিলি কথাটার মানে যে জল তা বুঝেছে ও। কারণ শুয়োরটাকে টেনে নিয়ে চলল নদীর দিকে। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে নদীর জলে শুয়োরের মৃতদেহটা নিয়ে জল ছিটকে, ডুবে খেলা শুরু করল। যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়ল একেবারে, ততক্ষণ চলল এই খেলা। শেষপর্যন্ত শুয়োরটাকে টেনে তুলল নদীর ওপারে, তারপর একটা ঝোপের

আড়ালে অদৃশ্য হল বোঝা সমেত। আমাদের ক্যাম্পে ফেরার সময় হওয়া অবধি আগলে বসে রইল। তারপর মনে হল শুয়োরটাকে ছেড়ে আসা ওর মনোগত বাসনা নয়। যেই উঠলাম আমরা, নদী পার করে এদিকে টেনে নিয়ে এল সেটা। ওর সামনেই কাটা হল। ক্যাম্পের দিকে রওনা হলাম আমরা। পিছু পিছু এল্‌সা চলল ভালো মেয়ের মত।

এবার থেকে নদীর কাছেই শিকার করত এল্‌সা। অনেক মেহনত করে শিকার টেনে নিয়ে যেত নদীতে আর সেই শুয়োরটাকে নিয়ে যেমন খেলা করেছিল তেমন খেলায় মত্ত হত। ওর এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে অবাক হতাম আমরা। হয়তো 'মাজি, এল্‌সা' কথাটাকে বেদবাক্য ধরে নিয়ে এমন আচরণ করা ওর শিক্ষার অঙ্গ বলেই ভেবেছিল।

প্রাত্যহিক এই বহির্বিচরণ আমাদের সবাইকে যেন গেঁথে ফেলেছিল একই সূত্রে। এমন কি নুরু আর অস্ত্রশস্ত্র বাহকও এল্‌সা থাকলে কোন অস্বস্তি বোধ করত না। ওরা শুয়ে থাকার সময়ে খেলার ছলে এল্‌সা ওদের গায়ে নাক ঘষত কি ওদের গায়ের ওপর গা দিয়ে বসত, ওরা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াত না। একসঙ্গে ল্যাণ্ডরোভারের পেছনে বসতেও কোন অস্বস্তি হত না ওদের। অথচ তখন ওদের হাড়সার হাঁটুর মাঝে এল্‌সা ওর তিনশো পাউণ্ডের ভার চাপিয়ে বসে থাকত। শুধু হেসে আদর করত ওরা আর এল্‌সা খরখরে জিভে ওদের হাঁটু চাটত।

একবার ঘুমন্ত এল্‌সার পাশে নদীতীরে বসে আছি। জর্জ লক্ষ্য করল, নদীর অপর তীর থেকে ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একজোড়া কালো মুখ। বোঝা গেল, চোরাগোপ্তা শিকারী গা ঢাকা দিয়ে আছে, জন্তু জানোয়ার জল খেতে এলেই বিষাক্ত তীর দিয়ে মারবে।

সঙ্গে সঙ্গেই জর্জ হুঁশিয়ার করল সবাইকে। চলল নদী পার হয়ে, নুরু আর শস্ত্রবাহক চলল পিছু পিছু। এল্‌সা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই কোন মজার ব্যাপার মনে করে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। পালাল সেই শিকারীর দল। কিন্তু গাঁয়ে ফিরে নিশ্চয়ই ওরা সবাইকে জমজমাটি গল্প করেছে, আজকাল 'শিম্বা' অর্থাৎ সিংহ লাগিয়েছে 'বোয়ানা' অর্থাৎ হুজুর, চোরা-গোপ্তাদের জব্দ করার জন্যে।

আর এক সকালে প্রাতরাশের আগে বেড়াতে বেরিয়ে এক কাণ্ড। সামনে চলেছে এল্‌সা। হঠাৎ এক দিকে দৃঢ় পায়ে এগোল। আগের রাতে সেদিক থেকে হাতীর ডাক শুনেছি আমরা। বাতাসে গন্ধ শুঁকেই মাথা বাড়িয়ে আমাদের পেছনে ফেলে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরেই বহুদূর থেকে এক সিংহের অস্পষ্ট গম্ভীর ডাক কানে ভেসে এল।

সারা দিন ফিরল না ও। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেলে বেশ দূর থেকে ওর ডাক ভেসে এল আর একটা সিংহের ডাকের সঙ্গে মিশে। সে রাতে হায়েনাদের বড় বেশি সাড়া মিলছিল আর ওদের অর্থহীন হাসির অবিরাম তরঙ্গে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল আমাদের। ভোরে এল্‌সার পায়ের দাগ ধরে চললাম আমরা। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে অন্য সিংহটার পায়ের দাগের সঙ্গে মিশেছে। পরের দিন ওর একার পায়ের দাগ দেখা গেল। চারদিনের দিন নদীর ওপারে ওর চিহ্ন মিলল। সারা দিন ধরে খুঁজতে খুঁজতে অপ্রত্যাশিত-ভাবে একপাল হাতীর মধ্যে আবিষ্কার করা গেল ওকে। কিন্তু কিছুই করার নেই। পাঁচ দিনের দিন ভোরে ও ফিরল একপেট খিদে নিয়ে। গোগ্রাসে গিলে চলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে উঠল গিয়ে আবার ক্যাম্প খাটিয়ার ওপর। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, যেন ওকে কেউ এখন বিরক্ত না করে।

পরে ওর পেছনের পায়ের খাঁজে লক্ষ্য করলাম দুটো কামড়ানোর গর্ত আর কয়েকটা ছোট ছোট আঁচড়ের দাগ। যতটা যত্ন নেওয়া যায় তা নিয়ে ধুয়ে মুছে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলাম। ও সে সময়ে খুব আদর জানাল। আমার বুড়ো আঙুল চুষল আর থাবা দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে রইল। বিকেলে বেড়াতে যেতে চাইল না। সন্ধ্যে অবধি বসে রইল গাড়ির ছাদে আর তার-পরেই চলে গেল রাতের আঁধারে। ঘণ্টা দুয়েক পরে একটা সিংহের গর্জন শোনা গেল কিছু দূর থেকে। আর পাওয়া গেল এল্‌সার তড়িঘড়ি জবাব—প্রথমে কাছে তারপরে একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে গেল এল্‌সার কণ্ঠস্বর। ঠিক করলাম আমরা, ওকে আর একবারের মত ছেড়ে যাবার সুযোগ মিলেছে এই মিলন অবকাশে। ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়া হল, যাতে ওর প্রেমিক সিংহপ্রবরের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাঘাত না ঘটে ; কারণ তিনি আমাদের এই উপস্থিতিটা ভালো মেজাজে না নিতেও পারেন। এবার এল্‌সা নিজেই নিজের ভার নিতে পারবে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তাই প্রথম বারের থেকে এবার আমাদের ভয় ভাবনা কম, বেদনাটাও অত দুঃসহ নয়। শুধু ওর গায়ে কামড়ের ঘায়ের জন্যেই যা কিছু চিন্তা, মনে হয়েছিল যেন বিষিয়ে যাবে।

এক সপ্তা পরে আবার ফিরে এলাম। তখন এল্‌সা একজোড়া জলহরিণের পিছু নিয়েছে চুপিসাড়ে। ব্যাঘাত ঘটালাম। সবে বিকেল হয়েছে, খুব গরম। বেচারার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছিল। নইলে দম ফুরিয়ে গেলেও শিকারে মন দেবে কেন ? আমাদের প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানাল। ওর জন্তে যে মাংস আনা হয়েছিল, খেল আশ মিটিয়ে। ওর কনুইতে আর একটা কামড়ের দাগ। আগের ঘাগুলোরও একান্ত শুশ্রূষার দরকার। তিন দিন ধরে খেয়ে খেয়ে

উপোসের শোধ তুলল এল্‌সা।

ইতিমধ্যে এল্‌সার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশ বিদেশে। একদল আমেরিকান খেলোয়াড় এসেছেন ওর ছবি তুলতে। রাজকীয় আপ্যায়ন মিলল তাদের এল্‌সার কাছে। অতিথিদের মন ভরাবার জন্যে যা পারল করল। গাছে চড়ল, নদীতে খেলা করল, আমাকে জড়িয়ে ধরল, চায়ের আসরে ও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। এমন শান্ত-শিষ্টটি হয়ে রইল যে আমাদের অতিথিরা কেউ বিশ্বাস করলেন না, ও এক পরিণত বয়সের সিংহী যে তাঁদের আসার ঠিক আগেই বন্যসিংহদের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে।

সে রাতে সিংহের ডাক শুনলাম। অবিলম্বে এল্‌সা হাওয়া হল অন্ধকারে, দুদিন আর দেখা নেই ওর। এর মধ্যে অল্পক্ষণের জন্যে একবার জর্জের তাঁবুতে এসে ঘুরে গেছে। তখন ওর সোহাগ একেবারে উপচে পড়ছে। ঘুমন্ত জর্জের গায়ের ওপর উঠে বসে ওর ক্যাম্প খাটটা ভেঙে ফেলে আর কি! সামান্য খেয়ে আবার চলে গেল। সকালে পায়ের দাগ ধরে দেখা গেল ক্যাম্পের কাছের পাহাড়ের দিকে গেছে। ওপরে উঠে ওর প্রিয় শোয়ার জায়গাগুলো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, দেখা পেলাম না। তারপরে এক ঝাড় ঘন ঝোপে প্রায় ওর ঘাড়ের ওপরে পড়ছিলাম আমরা। ওকে আমরা খুঁজে বের করব না এই আশায় এমন চুপটি করে রয়েছে! তবুও আমাদের দেখে সচরাচর যেমন খুশি ভাব দেখায় তারও কোন কসুর করল না। ওর অভিপ্রায়টা বুঝে আমরা কৌশলে সরে এলাম। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেলে সিংহের গর্জন শুনলাম আর নদীর উল্টোদিক দিয়ে তার ল্যাঙবোট হায়েনার হাসি ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে। তার পরে পরেই ক্যাম্পের খুব কাছে শোনা গেল এল্‌সার ডাক। হয়ত এতদিনে শিখেছে কর্তা যখন শিকার নিয়ে ভোজে বসবে তখন দূরে দূরে থাকাই ওর কর্তব্য। কর্তামশায়ের ভরপেট খাওয়া হলে তখনই ভাবসাবের তাল করতে হবে। পরে জর্জের তাঁবুতে ফিরে থাবা দিয়ে জড়িয়ে আদর করল ওকে, মৃদু গোঙানীর মত আওয়াজ করল। বলতে চাইল বোধহয়—'তোমায় ভালোবাসি তো সখা, জানো। কিন্তু সুদূরের ঐ নতুন সখাকেও ফেলতে পারি না। ওর ডাক যে আমার শ্যামের বাঁশী, ঘরে মন থাকে কই, বল?'

তারপরেই এল্‌সা আর নেই।

ভোরবেলায় ক্যাম্পের একেবারে কাছে ওর পায়ের দাগের সঙ্গে এক সিংহের পায়ের দাগ মিশে থাকতে দেখা গেল। তার মানে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এল্‌সা যখন জর্জের সঙ্গে দেখা করতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকেছিল, তখন সেই আগন্তুক অপেক্ষা করেছে বাইরে দাঁড়িয়ে। তিনদিন আর ফিরল না এল্‌সা।

কিন্তু প্রত্যেক সন্ধ্যায় একবার করে চক্কর দিয়ে যেত, যেন বোঝাতে চাইত আমাদের কথা একেবারে ও ভোলেনি। মাংস মজুত থাকত, কিন্তু ও তা ছুঁত না একেবারে। এমনি ভাবে পালিয়ে গিয়ে আবার যখন ফিরে আসতো এল্সা, আমাদের প্রতি ওর আদরের বহর আরো বেড়ে যেত। ইতিমধ্যে আমাদের যেটুকু অবহেলা করেছে বলে ওর বোধ হচ্ছে তার বদলেই যেন এই বাড়তি আদর।

স্বল্পকালীন বর্ষা নেমে গেছে। এতে এল্সার খেলোয়াড়ী মেজাজ আর উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। যে কোন আড়াল থেকে সুযোগ বুঝে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো ঠাট্টার ছলে। এতেই যেন ওর মস্ত আনন্দ। 'যূথে'র মধ্যে আমি ওর সবচেয়ে পেয়ারের। ওর সব মনোযোগটাই তাই আমার ওপর। কাজেই যতক্ষণ অবধি জর্জ এসে আমায় উদ্ধার না করত, সচরাচর ততক্ষণ আমি এল্সার খেলার সঙ্গী হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতাম আর এল্সার ভারি নরম শরীর আমার গায়ের ওপর চেপে বসত। যদিও জানতাম আমার প্রতি গভীর ভালবাসাই ওর এই পক্ষপাতিত্বের কারণ, তবুও এই অভ্যাসটা বন্ধ করতেই হল আমায়; কেন না, অন্য কারো সাহায্য ছাড়া আমি মুক্ত হতে পারতাম না। অল্পদিনেই আমার গলার আওয়াজে ও বুঝে নিল খেলাটায় আমার স্বস্তি থাকে না। পরে আমার ভারি কষ্ট হত ও কেমন করে নিজের অফুরন্ত উৎসাহ দমাবার চেষ্টা করেছে তা দেখে। হয়ত লাফ দেবে দেবে মনস্থ করছে, ঠিক তখনি শেষ মুহূর্তে ইশারা পেয়ে নিজেকে সামলে নিতে পারত ও। আমার কাছে বেশ চুপচাপই থাকত সারাক্ষণ।

প্রথম কয়েক পসলার পরেই শুকনো ধূসর কাঁটাঝোপ কয়েক দিনের মধ্যে যেন নন্দন কাননের মতই নয়নাভিরাম হয়ে গেল। প্রতিটি বালুকণা যেন বীজের অণু-পরমাণুকেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকাশের পথ করে দিতে উন্মুখ। আমাদের চরণে চরণে উচ্ছল উজ্জ্বল সবুজের সমারোহ। প্রতি ঝোপে সাদা, লাল, হলদে ফুল গোছায় গোছায় আলো করে আছে। প্রকৃতির এই বর্ণ সমুজ্জ্বল সমারোহ আমাদের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু প্রতি পদে ভয় রইল চেতনা জুড়ে—দেখে শুনে চলা যায় না। ঐ সবুজ শ্যামলে কোথায় কোন সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে কে জানে! চারদিক ঢাকা, চোখ যায় না আদি-মধ্য-অন্ত-প্রত্যন্তে। বৃষ্টির জল জমে রয়েছে সর্বত্র, আর তার মধ্যে হরেক রকমারি জানোয়ারের যাতায়াতের পায়ের দাগ ভরে আছে।

ঝোপে ঝোপে অরণ্য সমাজের যে সংবাদ-বিচিত্রা, তার ষোলো আনা সুযোগ নিত এল্সা আমাদের ফেলে রেখেই শিকারে চলে যেত। কখনো কখনো দেখতাম জলহরিণের পিছু নিয়েছে চুপিসাড়ে। তাড়িয়ে নিয়ে আসত

আমাদের দিকে। সব সময়েই এঁকে বেঁকে চলা জানোয়ারদের সোজা পথে গিয়ে ধরত। যাই যোক, সাধারণত এ সব সময়ে ভরপেট থাকত এল্‌সার, কাজেই এই শিকার শিকার খেলা ছিল ওর অবসরের আনন্দ।

সারা দিন বাইরে কাটানো হবে ঠিক করেই সকালে বেরিয়েছি আমরা নদীর ধার ধরে। এল্‌সাও আমাদের সঙ্গে। উৎসাহে ভরা ভারী চমৎকার মেজাজ, লেজ নাড়া দেখেই সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ঘন্টা দুই হাঁটার পরে প্রাতরাশ সারার মত একটা জায়গা খোঁজা হচ্ছে, হঠাৎ দেখলাম এল্‌সা থেমে গেল, খাড়া হয়ে গেল ওর কান দুটো, উত্তেজনায় থরো থরো শরীর। পলকে লাফিয়ে গেল ও নিঃশব্দে, পাহাড়ের যে অংশটা এখানে নদীর ধারে রয়েছে সেদিকে। তারপর নীচের ঘন ঝোপঝাড়ে অদৃশ্য হল। এখানে কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপে ভাগ ভাগ হয়ে আছে নদীটা। প্রত্যেক দ্বীপই দুর্ভেদ্য ঝোপে ঢাকা।

এল্‌সার অদৃশ্য হওয়ার ফল কী দাঁড়ায় দেখার জন্যে আমরা থামলাম। হঠাৎ মনে হল যেন হাতীর ডাক শুনতে পেলাম জঙ্গলের মধ্যে থেকে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে তারা। বুঝলাম নীচের ঝোপে একের বেশি হাতী আছে। জর্জ আমার কথা মানল না। ওর মতে গোলমালটা মোষেদের। অগুণতি মোষকে দেখেছি নানা রকমের ভাবে ডাকতে। কিন্তু হাতীর আওয়াজের এমন ধরন কখনো শুনিনি। অন্তত পাঁচ মিনিট দেরি করলাম, যাতে ওর এই দৈত্যাকৃতি বন্ধুদের ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে ফিরে আসে। সচরাচর এমনই হত ব্যাপারটা। তারপরে একটা হুটোপাটির আওয়াজ—কী হয়েছে বোঝার আগেই জর্জ লাফিয়ে পড়ল নীচে, চেঁচিয়ে বলল, এল্‌সা ঝামেলায় পড়েছে। প্রাণপণে ওর পেছনে দৌড়ালাম। কিন্তু একটু গিয়ে আবার একপ্রস্থ ভয়ংকর চিৎকারে দাঁড়িয়ে পড়লাম থমকে। ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছি ভারী অস্বস্তি লাগছে। ভাবছি, যে কোন মুহূর্তে ক্ষেপা হাতীর জগদ্দল চেহারা ঝোপ ভেঙে ঢুকে সামনে যা পাবে দলে পিষে যাবে। আমরা থামলাম, জর্জকে চেঁচিয়ে ডেকে বললাম, যেন না যায়। কিন্তু কিছুতেই দমল না জর্জ, লতা আর গাছের সবুজ প্রাচীরের পারে ও অদৃশ্য হল। এবার আমরা জর্জের জরুরী কান ফাটানো চিৎকার শুনলাম, 'এস, তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি।'

আমার বুক উড়ে গেল। নিশ্চয় দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে যখন ছুটছি ভয়ংকর সব কল্পনা আমার মনে ভাসতে লাগল। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পাতার ফাঁকে দেখলাম জর্জের রোদপোড়া পিঠখানা। সোজা দাঁড়িয়ে আছে, কাজেই গণ্ডগোল নেই কোন।

তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে আবার হাঁক দিল জর্জ। শেষ পর্যন্ত যখন ঝোপের ফাঁক দিয়ে নদীকূলে হাজির হলাম, দেখি একটা ঢলের মাঝখানে এল্‌সা একটা মদ্দা মোষের পিঠে চেপে বসে, গা দিয়ে জল ঝরছে ওর চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার। এত বড় একটা মোষ অসহায়ভাবে ছটফট করছে জলের মধ্যে. এল্‌সা থাবা চালিয়ে মোষটার মোটা চামড়া ছিন্নভিন্ন করছে, আক্রমণ চালাচ্ছে সব দিক দিয়ে।

শুধু আন্দাজ করতে পারলাম দশ মিনিট আগে অর্থাৎ যখন আমি হাতীর ডাক শুনেছি বলে মনে হলো তখন থেকেই এই নাটকের শুরু। পরে আমরা বুঝলাম, এল্‌সা এই বৃদ্ধ মহিষটিকে উত্ত্যক্ত করে থাকবে। তখন জলের ধারে বোধহয় জিরোচ্ছিল বেচারা। নদী অবধি ধাওয়া করেছে তাকে। নদী পার হতে গিয়ে নিশ্চয় ঢলে পড়ে গেছে পিছল পাথরে পা দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়েছে এল্‌সা। এক লাফে মোষটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের মধ্যে চেপে ধরেছে মাথাটা। তার ফলেই হাঁফিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারী। এর পরে সব থেকে দুর্বল জায়গায়—পেছনের দু-পায়ের ফাঁকে থাবা বসিয়েছে এল্‌সা—ঠিক সেই সময়েই আমরা হাজির হয়েছি।

যতক্ষণ না এল্‌সা সুযোগ দিল এক গুলিতে মোষটার ভব-যন্ত্রণার ইতি ঘটাতে ততক্ষণ অবধি অপেক্ষা করতে হল জর্জকে। যেই এই শেষ পর্ব চুকল, নুরুকে দেখা গেল এক কোমর জল ঠেলে ফেনা ওঠা ঢলের দিকে এগিয়ে-যেতে। এই মাংসের পাহাড় দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি বেচারী। কিন্তু ওর ইসলাম ধর্মবিশ্বাসে আগে গলা না কেটে ফেললে, সে মাংস ভোগে লাগানো নিষিদ্ধ।

নষ্ট করার মত একটুও সময় নেই। কাজেই জলে ডোবা পিছল পাথরের ওপর দিয়েই নুরু ছুটে চলেছে মোষটার দিকে। মোষটার পিঠে বসে এল্‌সা নুরুর গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখছে উত্তেজনায় অধির হয়ে। যদিও ছোট্টটি থেকে ও নুরুর কাছে কাছেই থেকেছে। সব রকম পরিচয়ই দুজনের আছে, তবুও এল্‌সার সন্দেহ এখন তীব্র। কান খাড়া করে, ভয় পাওয়ানো গজ্‌রানি দিয়ে শিকারকে ওর ধাইমার হাতে ও পড়তে দেবে না। এখন এল্‌সার হাবভাব খুবই ভয়ঙ্কর, সত্যিই নুরুর বিপদ হতে পারে এল্‌সার কাছে। নুরুর কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই সেদিকে, পেটুকপনার তাড়ায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে ও। মুমূর্ষু হাত পা ছুঁড়তে থাকা এক মোষের ওপরে চেপে বসে গজরাতে থাকা ভয়ংকরী এক সিংহীর দিকে এগিয়ে চলেছে এক কংকালসার ক্ষীণ মানুষ—দৃশ্যটা কেমন হাস্যকর। এগোতে এগোতে ওর তর্জনী তুলে নুরু

এল্‌সাকে ডেকে বললে, 'না না।'

অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু এল্‌সা নুরুর কথা শুনল। শান্তভাবেই বসে রইল চুপচাপ, নুরুকে গলা কাটতে দিল মোষটার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। পরের সমস্যা হল এগারোশো পাউণ্ডের মত ওজনের জানোয়ারটাকে টেনে তোলা। পিছল পাথরের মধ্যে দিয়ে ঢল বরাবর টানতে হবে আমাদের। এক উত্তেজিতা সিংহী পাহারা দিচ্ছে এমন অবস্থায় ঐ বিরাট-বপু টেনে তোলা আরো ঝঞ্ঝাটের।

কিন্তু এল্‌সা এমন বুদ্ধিমতী, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল কী করা দরকার। লেজের দিক থেকে ঠেলতে শুরু করল ও, সঙ্গের লোকজন মোষটার মাথা আর পা ধরে টেনে তুলল। আসলে ও সাহায্যই করল এমন একটা দুরূহ সমস্যায়; অথচ ওর কথা ভেবে সমস্যাটা বড় করে দেখা হয়েছিল প্রথমে। এল্‌সাকে এমনভাবে সাহায্য করতে দেখে সবাই হাসাহাসি করল। তারপরে মোষটা কাটার ব্যাপারেও সাহায্য করল এল্‌সা। এক একটা করে বড়, ভারি পা কাটা হচ্ছিল আর এল্‌সা সেগুলো নিয়ে যাচ্ছিল ঝোপের ছায়ায় টেনে টেনে। এতে করে লোকজনের পরের খাটুনিটাই বাঁচিয়ে দিচ্ছিল ও। গাড়িটাকে সৌভাগ্যক্রমে আমরা মাইলখানেকের মধ্যে এনে ফেলতে পেরেছিলাম। বেশির ভাগ মাংসই ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া গেল।

এল্‌সা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। মোষটার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বোধ হয় ওর পেটে কিছু জল ঢুকে গিয়ে থাকবে। নদীর ঢলের প্রবল স্রোতের মধ্যে ঐ লড়াইয়ে পুরো দু' ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে তাকে। তবু যতক্ষণ অবধি না সঙ্গের লোকজন মাংসটা কেটেকুটে ঠিক করে রাখল ততক্ষণ অবধি ও কোথাও নড়ল না। যখন সব সারা হল তখনি ও গেল কোন ঝোপের মধ্যে জিরোতে।

কয়েক মিনিট পরে যখন ওর সঙ্গে যোগ দিলাম আমি, ও আমায় জড়িয়ে ধরল থাবা দিয়ে, হাত চাটল। সারা সকালের প্রবল উত্তেজনার পরে এখন আমরা হাত পা ছড়াতে পারছি। ওর সোহাগী হাবভাবে ভারি সুন্দর লাগল আমার। যে যত্নে ও আমার গা বাঁচিয়ে সোহাগ জানাল তা লক্ষ্য করে অবাক হলাম। ভাবাই যায় না, মাত্র কয়েক মিনিট আগে ওর যে থাবার ভয়ংকর নখের আঁচড়ে মোষের পুরু চামড়া ছিন্নভিন্ন হয়েছিল সেই থাবা দিয়ে সস্নেহে আমায় আলিঙ্গন করে অক্ষত শরীরেই ছেড়ে দিয়েছে।

কোন মদ্দা মোষকে একাকী শিকার করা যে কোন বন্য সিংহের পক্ষে গৌরবের। এল্‌সার পক্ষে সে গৌরবটা অনেক গুণ বেশি। কেননা ও সবে শিকার শিখেছে অনেক নীচু দরের শিকারনবীশ পালক বাপ-মায়ের কাছ

থেকে। নদীটা ওর কাজের অনেক সুবিধে করেছে বটে কিন্তু সে সুবিধে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে বুদ্ধির দরকার ছিল বৈকি! সত্যি গুমর করার মত বাহাদুরি আছে এল্‌সার!

বিকেলে ক্যাম্পে ফেরার পথে নদীর অপর পারে এক জিরাফকে জল খেতে দেখা গেল। শ্রান্তি ভুলে চুপিসাড়ে ওর পেছন নিল এল্‌সা। হাওয়ার অনুকূলে খুব সাবধানে নদী পার হল যাতে জিরাফটা ওর সাড়া না পায়। জল ছিটোবার একটুও শব্দ না করে নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হলো এল্‌সা। কোন বিপদের আভাস না পেয়ে জিরাফটা যতটা পারে লম্বা পা বাড়িয়ে দিল। তারপরে ঘাড় নামাল জল খাবার জন্যে। আমরা দম বন্ধ করে আশা করছি যে কোন মুহূর্তে এল্‌সা ঝোপ থেকে লাফ দেবে ওর ঘাড়ে। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, যখন দেখলাম জিরাফটা বিপদ বুঝতে পেরে ত্বরিত-গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড় দিল। জিরাফটার সৌভাগ্য এল্‌সার পেট তখন মোষের মাংসে ভর্তি!

ওর সেদিনের দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানার এখানেই শেষ নয়। যখন একটা হাতী হেলতে দুলতে একেবারে আমাদের মুখোমুখি এসে পড়লো এল্‌সারও কাজ মিলে গেল একটা। আমরা তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে ঘুরে যাবার তোড়-জোড় করছি, এল্‌সা পথের মধ্যে চুপচাপ বসে রইল গ্যাট হয়ে। অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না সেই পর্বত প্রমাণ জানোয়ারটা ওকে প্রায় মাড়াবার উপক্রম করে। তারপর চট্ করে লাফিয়ে পাশে সরে গেল। তাতে হাতীটা ভয় পেয়ে পিছু ফিরেই দৌড় লাগাল প্রচণ্ড। এর পরে আমাদের সঙ্গে ক্যাম্পে ফিরেই এল্‌সা জর্জের বিছানায় উঠে ঘুম লাগাল। একদিনের কীর্তিটা নিন্দের নয় নেহাত!

এর অল্প কয়েক দিন পরেই নদীর ছায়াঘেরা তীরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা তিন ফুট ব্যাসের একটা বাটিমত জায়গায় দেখলাম জলভর্তি একটা অগভীর লেগুনের মত হয়ে আছে। জর্জ বলল, এমন জায়গায় তিলাপিয়া মাছ জন্মায়। এতদিন এ মাছ নদীতে দেখিনি। এই কাদাঘেরা গর্তে যখন আমরা তিলাপিয়ার খোঁজ করছি, এল্‌সা একটা ঝোপে ঢুকে আগ্রহভরে নাক ঝাড়ল, নাক কোঁচকাল। সিংহের গন্ধ পেলে এমনটাই করে ও। এবার আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম সিংহের খাবার টাটকা ছাপ কাছাকাছি রয়েছে, খুশির আমেজে গরগরিয়ে উঠল এল্‌সা। সিংহের পায়ের দাগ যেদিক পানে গেছে সেদিকে অদৃশ্য হল। সারা রাত আর পরের দিনটা এল না। বিকেলে খুঁজতে খুঁজতে ফীল্ড গ্লাস দিয়ে ওর প্রিয় সেই পাহাড়ের চূড়ায় ওর আকৃতির রূপরেখা দেখা গেল।

আমাদের অবশ্যই দেখে থাকবে, কেন না ওর ডাক শুনলাম। কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না। ভাবলাম, বন্য সিংহরা কাছাকাছি আছে। কাজেই ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলাম না, ফিরে এলাম। সে রাতে সবাই শুতে গেলে জর্জের কানে এল কোন প্রাণীর বেদনাহত চীৎকার। কিছু পরেই ওর তাঁবুতে হাজির হলো এল্সা। এসেই জর্জের খাটিয়ার পাশে মাটির ওপর সটান শুয়ে পড়ল। থাবা তুলে জর্জের গায়ে বেশ কয়েকবার আলতো আঘাত করল, বুঝি অনেক কথাই বলার আছে ওর। দু-পাঁচ মিনিট বাদেই আবার চলে গেল। সে রাতে আর তার পরের দিন ফিরল না মোটে।

সন্ধ্যেবেলায় খেতে বসেছি, তাঁবুতে ঢুকেই এল্সা আদর করে আমার হাঁটুতে মাথাটা ঘষেই আবার চলে গেল রাতের মত। সকালে অনেক দূর অবধি ওর পায়ের দাগ ধরে আমরা গেলাম। আরো দূরে গভীর বনানির মধ্যে গিয়ে মিশে গেছে অভিসারিকার পদরেখা। সে সন্ধ্যাতেও ফিরল না ও। তিনদিন ক্যাম্পে নেই এল্সা, শুধু মাঝেমধ্যে একবার করে এসে ওর আদর জানিয়ে গেছে। ও যে ওর যূথ খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু এখনো আমাদের ভালোবাসে সেই কথাই কি জানিয়ে যেতে চায় ও? এ ভাবেই কি ও আলগা করছে আমাদের মায়ার বাঁধন?

রাতে ঘুম ভাঙল আমাদের, বুক কাঁপানো সিংহের গর্জনের সঙ্গে হায়নার হাসির অট্টরোলে। তাঁবুর মধ্যে থেকেই সব শুনলাম আমরা। আশা করলাম, এল্সা যে কোন মুহূর্তে ফিরবে। দিনের আলো ফোটবার পর যেদিক থেকে গর্জনটা এসেছে সেদিকে অগ্রসর হলাম। কয়েক শো গজ গিয়েই থেমে যেতে হলো সিংহের গম্ভীর গর্জনে। আমাদের নীচে নদীর দিক থেকে গজরাচ্ছে কোন সিংহ। সেই সময়েই দেখা গেল ঝোপঝাড় ভেঙে দুদ্দাড় করে পালাচ্ছে একটা হরিণ আর কিছু ভারভেট বাঁদর। ঘন লতাগুল্মের মধ্যে দিয়ে পা টিপে টিপে নদী দিকে নেমে চোখে পড়ল বালিতে অন্তত দু-তিনটে সিংহের থাবার দাগ—একেবারে টাটকা। নদী পার হয়ে চলে গেছে। জল ভেঙে ওপরে গেলাম। তখনো ভিজে ভিজে থাবার ছাপ ধরে এগিয়ে ঘন ঝোপের মধ্যে চোখে পড়ল একটা সিংহের চেহারা—পঞ্চাশ গজেরও কম দূরে।

ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছি ওটা এল্সা কি না, জর্জ এল্সার নাম ধরে ডাকল। আমাদের কাছে থেকে দূরে চলে গেল এল্সা। আবার ডাকল জর্জ, এল্সার গতি দ্রুততর হল জানোয়ার হাঁটা পথ বরাবর। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শেষ দেখলাম ওর লেজের কালো গুছি।

আমি আর জর্জ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

এল্সা কি নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে নিয়েছে? আমাদের ডাক শুনেছে,

সাড়াও পৌঁছেছে ওর কাছে। তবুও আমাদের পেছনে ফেলে সিংহের পদচিহ্ন ধরেই এগিয়ে গেল ও। তাহলে প্রকৃতির কোলে ওকে ফিরিয়ে দেবার যে আশা বুকের মধ্যে এতদিন লালন করেছি তা কি পূর্ণ হল? সব আঘাত বাঁচিয়ে ওর জন্মের স্বাদ কি ফিরে পেতে দিয়েছি আমরা?

ফিরে এলাম ক্যাম্পে—একাকী, কেন না এল্‌সা নেই। মন আমাদের ভারি। এমন করেই কি ওকে আমরা ছেড়ে যাব? আমাদের জীবনের অচ্ছেদ্য এক পরিচ্ছেদ কি তবে এখানেই শেষ? জর্জ বলল, এল্‌সা কোনো যূথে ঠাঁই পেয়েছে কি না তা দেখার জন্যে কয়েক দিন দেরি করা যাক।

নদীর পাশে ছায়াঘন তীরে গেলাম—সেই আমার স্টুডিওতে। লিখে চললাম এল্‌সার জীবননাট্যের কাহিনী। সকালে ও ছিল আমাদের কাছে। একা,—মন বিষণ্ণ, হৃদয় বেদনাহত। খুশি হবার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম, হয়তো এই মুহূর্তে অনুরাগের বিলোল বিলাসে এল্‌সা কোন প্রেমিকের গায়ে গা দিয়ে বসে আছে, ছায়ায় জিরোচ্ছে তার সঙ্গে. যেমন এখানের এই ছায়াতীরে আমার কাছে নিশ্চিন্ত আরামে থাকত।

উত্তরলিপি

ভাবতেই পারছিলাম না তিন বছরের এত বেশি ঘনিষ্ঠতার পরে এল্‌সার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা সম্ভব হবে কি আমাদের,—অন্তত আমাদের সঙ্গে যেটুকু যোগসূত্র রাখতে চায় সেটুকুও কি রাখা হবে না?

জর্জকে ওর কাজে সদাসর্বদাই ঘোরাঘুরি করে বেড়াতে হয়। কাজেই তিন সপ্তাহ অন্তর অন্তর এল্‌সাকে যে অঞ্চলে ছাড়া হয়েছে সেখানে যাবার চেষ্টা করেছি।

ক্যাম্পে পৌঁছে আমরা দু-একবার গুলি ছুঁড়েছি, কিংবা বাজের ঝলক দেখিয়েছি বন্দুক থেকে। প্রত্যেকবারেই প্রায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দৌড়ে এসে হাজির হয়েছে এল্‌সা। আমাদের ঘটা করে স্বাগত জানিয়েছে, আগের চেয়েও বেশি সোহাগ করেছে। একবার পনের ঘণ্টা পরে, আর একবার ত্রিশ ঘণ্টা পরে এসেছে আমাদের সাড়া পেয়ে। নিশ্চয়ই অনেক দূরে ছিল, কী ভাবে যে আমাদের এসে পড়ার আঁচ পেল তা এক রহস্য। তিন দিনের ক্যাম্পে কখনো চোখের আড়াল করে না আমাদের, ওকে তখন কত খুশি দেখায় তা ভাবলে মন কেমন করে ওঠে।

বিদায়ের সময় জর্জ দশ মাইল দূরে চলে যায়। কোন হরিণ বা দাঁতাল মেরে এল্‌সার জন্তে উপহার নিয়ে আসে। তখন তাঁবু তোলা হয়, জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা হয়। ইতিমধ্যে সেই বড় গাছের নীচে আমার স্টুডিওতে আমি এল্‌সাকে নিয়ে বসে ভোলাবার চেষ্টা করি। এখন ওর খোরাকের কোন অভাব নেই, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। হরিণ বা অন্য কিছু মেরে নিয়ে আসার পর একপ্রস্থ ভুরিভোজ হয় এল্‌সার। নিশ্চয়ই নিজের খোরাক যোগাবার মত শিকার ও এখন করতে পারে। আগের মত আর আমাদের ওপর নির্ভর করে না। যখন খাওয়ার পরে ঢুলতে থাকে ও, চুপিসাড়ে সরে আসি।

শেষ বিদায়ের কিছুক্ষণ আগে থেকেই বেশ নির্লিপ্ত হয়ে যায় এল্‌সা। মুখ ফিরিয়ে নেয় আমাদের দিক থেকে। ও একান্ত ভাবে থাকতে চায় আমাদেরই কাছে। যখন বোঝে—চলে আমরা যাবই, সহজ করে নেয় বিদায়ের পালাটুকু। প্রতিবারই বিদায়ের সময় এই একই নাটকের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

এল্‌সাকে নিয়ে লেখা বই প্রকাশের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডে আসার আগে অবধি এই আমার শেষ কথা। লণ্ডনে যখন ছিলাম জর্জ চিঠির পর চিঠিতে জানিয়েছে আমি চলে আসার পরে ওর এল্‌সার কাছে যাওয়ার বৃত্তান্ত। জর্জের কতকগুলো চিঠিতেই এল্‌সার বাকী গল্পটুকু বলা যাক। চিঠিগুলো থেকে বোঝা যাবে, বনচারিণী এক সিংহী তার জীবন আমাদের পুরোনো সম্পর্কের সঙ্গে মিলিয়ে চলার ক্ষমতাই শুধু অক্ষুন্ন রাখেনি, এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেছে সমান বন্ধুত্বে।

ইসিওলো

৫ই মার্চ ১৯৫৯

লরিটা আর আমার গাড়ির ট্রেলারটা ফের খারাপ হয়েছিল। তাই দেরি হল এল্‌সার কাছে যেতে। ২৫শে সন্ধ্যের আগে বেরোতেই পারিনি। আমি পৌঁছনোর পনের মিনিট পরে নদীর ওপার থেকে দেখা দিল এল্‌সা। ডিজেল লরির আওয়াজ পেয়ে থাকবে। ঠিক আছে ও তবে বড় রোগা, ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছিল। যেমনটা করে, খেতে শুরু করার আগে ঠিক তেমন করে আমায় নিয়ে নাচানাচি করল। প্রথম বারের মত ততটা রোগা হয়নি। দু-একদিনে আবার মাংস লাগল গায়ে, আগের মতই হাল হল ওর চেহারার। তুমি নেই বলে হতবুদ্ধি হয়েছে। তোমার 'বোমা'য় গেছে বহুবার, লরির মধ্যে উঁকি দিয়ে ডেকেছে শুধু শুধু। যাই হোক, ওর রোজকার যা কাজ তা সবই করল, শুধু বেড়াতে যেতে চাইল না। সকালে আমার সঙ্গে তোমাদের স্টুডিওতে গিয়ে সারাদিন কাটাল। রবিবার সকালে যখন ফের একটা হরিণ মেরে এনে দিলাম ওকে, কাউকেই ঘেঁষতে দিল না কাছে, একেবারে ভয়াল মূর্তি ধরল।

কিন্তু যেই স্টুডিওতে গেলাম আমি, হরিণটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাখল আমার বসার জায়গার পাশে। আমি কেটে দিতে আর কিছু বলল না। পরের দিন বিকেলে বললাম—এল্সা, ফেরার সময় হয়েছে। হরিণটা খেয়ে যা পড়েছিল, যতক্ষণ ধরে কুড়িয়ে নিলাম, দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলল ক্যাম্পের দিকে গম্ভীর চালে। ওর পিঠের সাদা দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। ওর বন্ধু সেই মনিটরটা ছিল ওর খাওয়ার জায়গায়, তাল করেছে কোন ফাঁকে কতটুকু মাংস ছিনতাই করতে পারে। এখন কিন্তু এল্সা যেন তার এই ছিঁচকেমির অধিকারটুকু মেনে নিয়েছে, কিছুই আর বলে না। এখনো অবধি ওর সিংহ-সংসর্গের কোন চিহ্ন নেই।

মঙ্গলবার ছেড়ে এসেছি ওকে। ক্যাম্প গোটাবার সময় ওকে স্টুডিওতে রেখে দিয়েছি বিশেষ করে। কিন্তু যেই ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ দূরে যেতে থাকল, সঙ্গে সঙ্গে বুঝল আমার ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে। সেই নির্লিপ্ত ভাব হল ওর, মুখ ফিরিয়ে রইল। চোদ্দ তারিখে আবার দেখতে যাব ঠিক করেছি।

ইসিওলো

১৯শে মার্চ, ১৯৫৯

চোদ্দই দেখতে গেলাম এল্সাকে। বেলা সওয়া দশটায় বেরিয়ে পৌঁছলাম সন্ধ্যে সাড়ে ছ-টায়।—এল্সার পায়ের দাগ বা অন্য কোন চিহ্ন নেই। রাতে বাজের ঝলক তিনটে আর পিস্তলের বেগুনী আলো একটা ছুঁড়লাম। পরের দিন ভোরে ওর তল্লাসে বেরোলাম। চলার রাস্তা বরাবর যে বড় পুকুর, যেখানে এল্সা একবার একটা হাতীকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে ঘাপটি দিয়েছিল, ততদূর গেলাম। পুকুরটা শুকিয়ে গেছে, এল্সার থাবার দাগ নেই কোনখানে। আবার একটা বাজের ঝলক গুলি ছুঁড়ে পাহাড়ের মাথা ঘুরে গাড়ির রাস্তায় এলাম। ক্যাম্পে ফিরলাম। তবুও কোন চিহ্ন নেই ওর। ক্যাম্পে আসতে প্রায় সোয়া নটা হল। পনের মিনিট পরে হঠাৎ দেখা দিল ও নদী পার হয়ে। গায়ে বেশ মাংস লেগেছে, চেহারা থল্থলে হয়েছে। এগার দিন আগে ওকে ছেড়ে যাবার পর থেকে অন্তত একবার শিকার করেছে। দারুণ জোর অভ্যর্থনা জানাল। গায়ে ওর কতকগুলো আঁচড়। হয়ত শিকার করতে গিয়ে হয়েছে ওগুলো। তবে চামড়া ফুঁড়ে দাগ বসেনি, নেহাৎ ওপর-ওপর আঁচড়।

ক্যাম্পে যেমনটি করে, তেমনটি শুরু করল সোজাসুজি। ওকে মনে হল, ভারি হাসিখুশি। দু-দুবার আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, একবার একেবারে কাঁটাঝোপের ওপর। নদীর ধারে একটু বেড়াতে অভিরুচি ওর হল বটে, তবে বেশির ভাগ সময়টা কাটাল স্টুডিওতে।

এখনো বন্য সিংহের সঙ্গে ওর সংসর্গের কোন চিহ্ন মেলেনি। এবারে যাতা-য়াতের পথে ওদের কারো সাড়াশব্দও পাইনি। খুব শুকনো এখন, হয়ত সেজন্যেই শিকার করার সুবিধে এল্সার। জল খেতে অনেক প্রাণী আসে। গাছপালা কম হওয়ায় দেখাও সহজ। আমার ছিল পাহাড়ী তাঁবু। এল্সাকে তার মধ্যে থাকতে দেওয়ায় একটু ঠাসাঠাসি হয়েছিল বৈকি। তবে এল্সা একেবারে সুশীলা বালিকা, একবারও মাটিতে পাতা বনাত ভেজায়নি। যেমনটা করে ও, ঠিক তেমন করেই আমার গায়ে নাক ঘষে আর ওপরে চেপে বসে ঘুম ভাঙিয়েছে বহুবার। বুধবার ওকে ছেড়ে আসার সময় কোন ঝামেলাই বাধায়নি। সত্যি সত্যি, মনে হয় আমার, স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে ও আরও। একা ফেলে গেলে কিছুই করে না আর। যাদের ধারণা, কোন পশুর জীবন আর কাজকর্ম শুধু প্রবৃত্তি আর অবস্থার হেরফেরেই পরিচালিত হয়, তাদের সঙ্গে তর্ক করার মত ধৈর্য সত্যিই আমার নেই। কোন সিংহযূথের শিকারের সতর্ক কৌশল আর এল্সার বুদ্ধিদীপ্ত, সুচিন্তিত আচরণের যে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যুক্তিবিচারের ক্ষমতা ছাড়া এ সবের কোনটারই সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা যায় না।

ইসিওলো

৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৯

রাত আটটা নাগাদ ক্যাম্পে এলাম। বাজের ঝলক আর বেগুনী আলোর গুলি ছুঁড়লাম। কোন সাড়া নেই এল্সার, দেখাও দিল না রাতভোর। সকালে খুঁজতে বেরোলাম সেই পথে যেদিকে বনমুরগী মারতে যেতাম। দেখলাম, খুব সম্প্রতি একটা ক্যাম্প হয়েছিল। তারপর দূর নদীতীর থেকে বেশ চওড়া একটা আধো বৃত্তের চক্কর চালালাম, ওর থাবার দাগ দেখতে পাব এই আশায়। যখন ক্যাম্পে ফিরছি বিফল মনোরথ হয়ে, হঠাৎ বুকটা ধক্ করে উঠল—এল্সাকে গুলি করে মেরে যায়নি তো-!

ব্যবস্থা ছিল কেন স্মিথ পিছু পিছু আসবে আমার, কেন না এল্সাকে আবার দেখতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। আমার পরেই ও ক্যাম্পে এসে পৌঁছলো। যখন ফিরলাম আমি, বলল আসার পথে এল্সাকে পাহাড়ের বড় চূড়াটায় দেখেছে। ওকে ডেকেছে কেন, কিন্তু এল্সা যেন ঘাবড়ে গেছে—সাড়া দেয়নি ডাকে, নেমে তো আসেইনি। কেনের সঙ্গে গেলাম। যেই ডাকলাম, আমার গলা চিনল ও, পাহাড় দাপিয়ে নেমে এল। আমায় অভ্যর্থনা জানাল জোর। কেনের সঙ্গেও কেমন বন্ধু পাতিয়ে নিল। স্বাস্থ্য হয়েছে ছবির মত, পেটটা ভরে ফুলে আছে। আগের রাতেই শিকার করেছে নিশ্চয়। তোমার 'বোমা'র মধ্যে তাঁবু পাতল কেন্। অবশ্য সারা রাতের মধ্যে একবারও ওকে

জ্বালায়নি এল্‌সা। সবাই মিলে বেড়াতে বেরোলাম আমরা, স্টুডিওতে দিনটা কাটালাম। এল্‌সা ঘুমোল আমার বিছানায় আর কেন্‌ ওর নিজেরটায়। আদর করে এল্‌সা একবার চেপে বসেছিল আমার গায়ের ওপর।
কেন্‌ আগের দিন চলে গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এল্‌সাকে পাহাড়ের মাথায় নিয়ে গেলাম। যখন ক্যাম্পে ফিরব ভাবছি, নীচে থেকে এল চিতাবাঘের গর্জন। সঙ্গে সঙ্গেই এল্‌সা ওর পিছু নিতে গেল চুপিসাড়ে কিন্তু মনে হল চিতাটা আমার সাড়া পেয়ে সরে গেছে। শুক্রবার সকালে ওকে একটা বনবরাহ মেরে উপহার দিয়ে এসেছি, যাতে ও খুশি হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা নিয়ে নদীতে কী খেলাই না খেলল। এল্‌সা এখন একেবারে গায়ে গতরে, হাড় দেখা যায় না একটুও।

ইসিওলো

১৪ এপ্রিল ১৯৫৯

গতকাল এল্‌সাকে দেখতে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু বাগান থেকে আরও হাতী তাড়াবার জন্যে থেকে যেতে হল। যাই হোক না কেন কালই যাচ্ছি। তোমায় লিখে জানাতে পারছি না, ওকে দেখার জন্যে কত উদগ্রীব থাকি আর যে অভ্যর্থনা জানানোর আন্তরিকতাটুকু কখনই ও ভোলে না তা পাওয়ার জন্যে কত ব্যাকুল হই। শুধু যদি একজন জীবনসঙ্গী পেত এল্‌সা, কী স্বস্তিই যে পেতাম! খুবই একা একা দিন কাটে ওর। সময় সময় হয়ত খুব হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তা কখনোই ওর মিষ্টি স্বভাব আর আমাদের বন্ধুত্বের ওপর অশুভ ছায়াপাত করেনি। খুব ব্যথা পাই যখন ভাবি, ওর জানা আছে কখন ওকে ছেড়ে যাচ্ছি। শান্তচিত্তে বিদায়কে মেনে নেয়। কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না, পিছু নেয় না। ওর নিজের মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে বোঝে এই বিদায় অনিবার্য।

ইসিওলো

২৭শে এপ্রিল ১৯৫৯

পনেরোই বিকেলে এল্‌সাকে দেখতে বেরিয়ে পৌঁছলাম রাত আটটা আন্দাজ। একটা বাঁক ঘুরে ছু-ছুটো গণ্ডারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলাম আর কি! রাস্তা থেকে কয়েক ফুট কাটিয়ে তবে ধাক্কাটা সামলাতে পারলাম। গুলির ঝলক, বেগুনী আলো সবই দেখালাম। কিন্তু সে রাতে সাড়া মেলেনি এল্‌সার। পরের সকালে পাহাড়ে উঠে আরও গুলির আওয়াজ করলাম। কোথাও কোন পায়ের দাগ দেখা যায়নি। সে দিন রাতের মধ্যেও এল্‌সার দেখা মিলল না। রাতে বজ্রবিদ্যুতের ঘনঘটায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। বান এল নদীতে। সকালে গেলাম পাহাড়ের যে শিরায় মোষের পাল থাকে সেখানে,

তারপর নামলাম শুকনো নদীবক্ষের বালুকাবেলায় বা লাগ্‌গায়। নদীবক্ষ তখন জলে থৈ থৈ, চোরাবালির ভয়ে ও পথ ছাড়তে হল। এক জায়গায় হঠাৎ কোমর অবধি বালিতে ডুবে গেলাম, উঠতে কষ্ট হল বেশ। তারপর জানোয়ার হাঁটা পথ ধরে একটা পাহাড়ী খাঁজ দিয়ে নেমে এলাম। মানে, আগে যতদূর যেতাম আমরা, তার চেয়েও অনেকটা বেশি এগিয়ে গেলাম। নদীতীরে লাঞ্চ সারলাম। তারপর কোমর জল পার হয়ে কাদায় লাল হয়ে পার হলাম নদী। কোন পায়ের দাগ থাকলেও বৃষ্টির জলে তা ধুয়ে গিয়ে থাকবে। নদীর ধার দিয়েই ফিরলাম।

এক জায়গায় নদীর জলে এমন কিছু একটা দেখলাম, যা দেখে মনে হল কোন জন্তুর মৃতদেহ। কাছে গিয়ে যেই পাথর ছুঁড়তে গেলাম হঠাৎ মাথা ভেসে উঠল, একটা—হিপো। অল্প পরেই প্রচণ্ড ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দের সঙ্গে মিশে এল ফোঁস্‌ফোঁসানি আর তীক্ষ্ণ চীৎকার—পথের পাশ ধরে যে জঙ্গল, সেখানে এক গণ্ডার-জুটি মিথুনরত।

পাঁচটায় ক্যাম্পে এলাম, তবুও কোন চিহ্ন নেই এল্‌সার। সত্যই ভাবনা হল এত দেরি করেনি তো কখনো দেখা দিতে। আমি রাত সাড়ে আটটায় এসেছি, তার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে নদীর ওপর থেকে এল্‌সার নীচু গলার ডাক শুনলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে দৌড়ে এল ক্যাম্পে—ছবির মত স্বাস্থ্য, ভারি খুশি আমায় দেখে। কোন সিংহের সঙ্গে ছিল বলে মনেই হয়নি। খুব খিদে ওর দেখলাম। আসার পথে যে গ্রান্টি হরিণটা মেরে এনেছিলাম তার পেছনের দিকটা পচে গন্ধ বেরোচ্ছিল, তারই বেশির ভাগ সাফ করল। পরের দিন সকালে শুয়োরছানা মেরে দিলাম একটা, বেশ ফুর্তিতে খেল। এমন খাওয়া খেল যে ক্যাম্প থেকে নড়তে পারল না।

রবিবার সকালে যখন আমরা স্টুডিওতে—এল্‌সা আমার পেছনে ঘুমিয়ে কাদা। দেখি উল্টো দিকের তীরে পাথুরে জায়গায় আট ফুট আন্দাজ কুমীর একটা উঠল। নদীর কিনারে গেলাম হামা দিয়ে, ছবি নিলাম, ফের রাইফেল আনতে গুঁড়ি মেরে এলাম ক্যাম্পে। এনে ঘাড় বরাবর গুলি করলাম। নড়েনি কুমীরটা তারপর। মাকান্দেকে পাঠালাম কুমীরটার গলায় ফাঁস ছুঁড়ে লাগিয়ে টেনে এপারে আনার জন্যে।

এতক্ষণে জেগেছে এল্‌সা। উৎকর্ণ হয়ে দেখছে, কী কাণ্ডটা ঘটেছে। কুমীরটাকে তাগ করেনি, অন্তত যতক্ষণ না ওটা এপারে টেনে আনা হয়েছে। এবার ওটার কাছে গেল সন্তর্পণে, ঠিক যেমন করে সেবার মোষটার কাছে গিয়েছিল। একটা থাবা দিয়ে কুমীরটার নাকে থাবড়া দিল। যখন বুঝল, অক্কা পেয়েছে তখন টুঁটি ধরে নিয়ে উঠে এল। এনে ফেলে ওর মুখের ভঙ্গিটা

যে কেমন হল, যদি দেখতে— ! ভয়, বিরক্তি এক সঙ্গে মিলে মুখের সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি। কুমীরটা খাবার কোন চেষ্টাই করল না।

সোমবার সকালে বিদায় নিলাম ওর কাছে থেকে। বৃষ্টিতে যে সব ডোবা পুকুর হয়েছে, তার একটাতে এক মদ্দা মোষ দেখলাম—বিরাট চেহারা। পরের দিন সেই বড় সিংহটা শিকার করতে গেলাম, এল্সার মা যখন মারা যায় তখন যাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুব জ্বালাচ্ছে সেটা এখন, বোরাদের গোটা বারো ছাগল ভেড়া পেটে পুরেছে। চার রাত 'মড়ি মুনে' কাটিয়েছি আর দিনের কিছুটা করে ওর থাবার দাগের সন্ধানে তন্ন তন্ন করেছি। এক সিংহীর থাবার দাগ পেলাম, সঙ্গে তিন-চার মাসের একজোড়া বাচ্চা।— সন্দেহ নেই, জ্ঞাতি ভাইবোন কিংবা সৎ ভাইবোন এল্সার। বুড়ো সিংহটা যে দেখা দেয়নি সেজন্যে দুঃখ নেই। মনে হয় না ওকে ফাঁদে ফেলা যাবে, এল্সাকে কাজে লাগিয়েও।

ইসিওলো

১২ই মে ১৯৫৯

রবিবার, তেস্‌রা মে রওনা হলাম। খুব বৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আসমান আর মাকাদ্দেকে শুধু ল্যাণ্ডরোভারে নিয়ে চললাম। যেখানে একবার তোমার গাড়ি আর আমার ট্রেলার কাদায় আটকে যাবার ফলে পথে রাত কাটাতে হয়েছিল আমাদের, সেখানেই এবারেও গাড়িটা বসে গেল। ঘণ্টাখানেকের মত কাদায় ঠেলাঠেলি করে কোন রকমে ওঠানো গেল বটে কিন্তু ফের পরের লাগ্গাতে বা শুকনো নদীবক্ষে সেই একই বিপত্তি। অন্ধকার হওয়া অবধি মিছিমিছি খেটে খেটে নাজেহাল। ওখানেই ক্যাম্প হল রাতের মত। প্রচণ্ড বৃষ্টি। লাগ্গা ভেসে গেল। সারা সকাল টানা হেঁচটা করে কাটল। পালা করে এক একটা চাকা তুলে কয়েক ইঞ্চি এগোনো গেল বটে, কিন্তু গাড়ি আবার গড়িয়ে এসে সেই কাদায়! বেলা দুটোয় যদি বা পার হওয়া গেল, পরের লাগ্গায় আরো বেশি জল। সেই লাগ্গাটা, যেখানে তুমি ল্যাণ্ডরোভারে পাথর ফেরী করতে বলেছিলে। রাতে সেখানে ক্যাম্প করতে হল। পরে ক্যাম্পের কাছে অন্ধকারের মধ্যে একটা সিংহযূথ এসে গর্জন করতে লাগল। মনে হয় কাছেপিঠে ওদের একটা মড়ি ছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে, খানিকটা টানাহেঁচড়া করে লাগ্গা পার হওয়া গেল। পরের নদীটা গাড়ি চালিয়েই এপার ওপার করতে কোন অসুবিধে হল না। রাতে অনেক ফেঁপে ফুলে ছিল নদীটা। যাই হোক, অনেক কষ্টে এগোলাম।

এল্সার ক্যাম্পের আগের বাঁকটা পৌছতে না পৌছতেই পথের মাঝ-মধ্যিখানে গজ পঁচিশের মাথায় আচমকা এক জোড়া গণ্ডার মায়ে-পোয়ে

হাজির হল এসে। পোটি লায়েক হয়ে উঠেছে, নড়ার কোন মতলবই নেই। বাধ্য হয়ে তিনশো তিন রাইফেলটা হাতে গাড়ি থেকে নামলাম। গণ্ডার জননী মাথা নীচু করে তেড়ে এল। মাঝামাঝি অবধি এসে গেলে হাঁকাহাঁকি করে ওর হুঁশ ফেরাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হল উল্টো, আরো ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এল দেখে গুলি না করে পারলাম না। গাড়ির বনেট থেকে গজ পাচেকের মধ্যে পাক খেয়ে পিছু ফিরেই হাওয়া হল। পায়ের দাগ ধরে কয়েকশো গজ গিয়ে দেখলাম কিন্তু চোট পাবার কোন চিহ্ন মিলল না।

চললাম, ক্যাম্প বসালাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটায়। কোন হদিস নেই এল্‌সার। নদী ফুলে ফেঁপে ছাপিয়ে উঠেছে। কখনও এতটা বান দেখিনি এই নদীতে। কাজেই যদি এল্‌সার থাবার দাগও থেকে থাকে বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা আবার আলোর ঝলক গুলির আওয়াজের নিশানা দেখালাম। তবুও পরের সকালে এল্‌সার দেখা নেই। মাইল দুয়েক গণ্ডারের পায়ের দাগ ধরে গেলাম। গণ্ডারের জখম হওয়ার কোন চিহ্ন নেই। হয়ত শিং-এ গুলিটা লেগেছে। এল্‌সার জন্যে যে গ্রান্টি হরিণটা এনেছিলাম সেটা পচে গন্ধ ছাড়ছে, কাজেই ওর জন্যে আবার একটা জেরেনাক মারলাম। সেদিন তো এল্‌সা এলই না, তার পরের দুদিনও পাত্তা নেই ওর। ভাবনা হল ভীষণ। না আসার সম্ভাব্য কারণ, অরণ্যের কর্তাদের সঙ্গে হয়তো দূরে কোথাও সরে গিয়ে থাকবে। ম্যাকান্দে আর আসমানকে পাঠালাম এদেশীয় বসতিতে খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে, কোথাও সিংহ দেখা গেছে কিনা জানতে। এক সপ্তা পার হয়েছে, আর তো থাকতে পারি না। কাজেই শনিবার সকালে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে তৈরি হলাম ফেরার জন্য।

আচমকা নদীর ওপারে হনুমানেরা প্রচণ্ড হল্লা শুরু করল। এল্‌সাও এসে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে, গা থেকে জল ঝরছে টপ্ টপ্ করে। আগের মতই বহাল তবিয়ত। পেটটা বেশ খালি, তবুও খিদে ছিল না। কদিন আগের মারা জেরেনাকটা পচে গন্ধ ছাড়ছিল, সেজন্যেও নাক ফিরিয়ে নিয়ে থাকতে পারে সেটা থেকে। যাই হোক, এ যে সেই আগের এল্‌সাই তাতে কোন সন্দেহ নেই। তেমন আদুরী, তেমন সোহাগী আর আমায় দেখে ফুর্তিতে ডগমগ। সিংহদের সঙ্গে দিন কাটাবার কোন চিহ্ন এখনো নেই। তুমি চলে যাওয়ার পরে একবারও ওর সঙ্গ-কামনার হদিশ পাইনি। তবে আমার যাতায়াতের মাঝে তেমনটা হলেও হয়ে থাকতে পারে। ও এসে ঘাঁটি গেড়ে বসার পরে টাটকা জেরেনাক এনে দিলাম আর একটা। রাতে সেটাকে ও আমার পাহাড়ী তাঁবুতে নিয়ে এল। ছোট্ট তাঁবুটার মধ্যে সে এক প্রাণান্তকর ঠাসাঠাসি ব্যাপার। ভেবে নিতে পাচ্ছ, ওটুকু তাঁবুতে আমি, এল্‌সা আর জেরেনাকের লাশটা থাকলে

কেমন হাল হয়। যাই হোক গন্ধ বেরোয়নি বলে রক্ষে। শুধু আমার আর তাঁবুটার সর্বাঙ্গ রক্ত আর নোংরায় ভর্তি হয়ে গেছে।
প্রায় মাস-ছয়েক হল, একাই আছে এল্‌সা। যে কোন বনের সিংহীর মত নিজে এখন নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আর নিশ্চয়ই ওকে শিকারের জন্যে প্রায়ই লম্বা লম্বা পাড়ি দিতে হয়। তবুও ওর বন্ধুত্ব রয়েছে অটুট, আমাদের ওপর ওর টান আর ভালবাসা একটুও বদলায়নি। সব দিক দিয়েই ও এখন অরণ্যচারিণী সিংহী, শুধু একটি দিক ছাড়া। তা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে এই অনন্যসাধারণ প্রীতি। আমি জোর গলায় বলি, আমাদের ও নিজেরই কোন স্বজন-স্বজাতি বলে ভাবে। কাজেই ভাব খাতির বজায় রাখতে হয়। এমন বোধটা ওর মজ্জাগত হয়ে গেছে। এখন আর আমার জন্যে দেরি করে করে উন্মুখ হয়ে বসে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমায় দেখে ফুর্তি হয় ওর ঠিকই। আমি চলে যাই ওকে ছেড়ে, তা কখনোই চায় না। তেমনি যদি আমায় বরাবরের জন্যে ওর কাছ থেকে চলে আসতে হয় তাতেও ওর এখনকার জীবনের কোন ওলটপালট হবে না।

ইসিওলো

এল্‌সার ব্যাপারে আর বলার নেই। সব কিছুই লিখেছি। জানো তো, ভরা পেট নিয়ে ও কখনো ক্যাম্প ছেড়ে বেশি দূরে যায় না। শুধু স্টুডিওতে আমার কাছে শুয়ে বসে থেকে দিন কাটায়। অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে, তুমি থাকতে যেমন হত তেমনটাই হয়। তবে এখন ও অনেক বেশি নির্ভর করতে শিখেছে নিজের ওপর। অনেক দূরে দূরে যায়। খোরাকের জন্যে আর আমার তোয়াক্কা করে না। শুধু খাওয়ার সময়েও আজকাল নুরু আর ম্যাকাদ্দেকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। এদেশীয় অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গির জন্যে তাদের ওপর যেন ওর সন্দেহটা বেশি। যখন ক্যাম্প থেকে স্টুডিওতে কি স্টুডিও থেকে ক্যাম্পে, সন্ধ্যাবেলায় মাংস সরাবার দরকার হয়, আমাকেই বইতে হয় —পিছু পিছু ও নিজে চলে। এমন কি ঐ ছোট্ট পাহাড়ী তাঁবুতেও আমায় বরদাস্ত করতে হয় ওর মাংস খাওয়া। শুধু মাংসের কটু গন্ধ বেরোলে নিজেই খাটিয়া নিয়ে বাইরে চলে আসি। এখনও নিশ্চয় করে জানে ও, আমার কাছাকাছি মাংস এসে পড়লে কোন ভয় নেই। আমিও নিশ্চিত, বাচ্চা হলেই এখানে নিয়ে আসবে ও আর দেখা-শোনার জন্যে আমাদের হাতেই ছেড়ে দেবে সবকিছু। সে সময় আমরা ছাড়া অন্য কাউকে ও কাছে থাকতে দেবে বলে আমার মনে হয় না। তখন বাধ্য হয়েই আমাদের লোকজনকে পথে কোথাও রেখে আসতে হবে।

আবার এল্‌সাকে ফিরে ফিরে দেখতে চাই। শেষ বার ছেড়ে আসার সময় দেখেছি কেমন একটা বেদনাবিধুর ভাব ওর। অলক্ষিতে চলে আসবার চেষ্টা করেছিলাম। পিছু ফিরে দেখলাম, বিষণ্ণ চোখ মেলে ও দেখছে আমি চলে যাচ্ছি। নিজেকে কেমন যেন চোর চোর মনে হল।
পিছু নেবার চেষ্টাই করেনি কোন।

ইসিওলো

শনিবার দেরি করেই বেরোতে পারলাম ইসিওলো থেকে। সঙ্গে একজন আমেরিকান ডাক্তার, নাম ডেলানি আর তাঁর শিকারী হেনরি পুলম্যান। খবর পেয়েই শিকারের চেষ্টায় চললাম। ডেলানি খেলোয়াড়ী স্বভাবের, ও চায় নিজেই শিকার করতে। সন্ধ্যায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো গেল। তখন প্রচণ্ড গর্জনে ঝড় বইছে, সমভূমি ধূলিঝড়ে সমাচ্ছন্ন। সকালে বোরাদের সঙ্গে খোদ জায়গায় এলাম। ঘন জঙ্গল, এখানেই লোকটাকে মেরেছে। মনে হয়, সাত-আটজন বোরার একটা দল এক যূথের সাতটা সিংহকে ধাওয়া করে এসেছিল. কারণ সিংহের দলটা উট মেরেছিল একটা। বোরাদের দলটা সিংহদের খুঁজে বার করে এসে পড়েছিল তাদের কাছাকাছি। একটা সিংহ তেড়ে এসেছিল আক্রমণ করতে। বোরাদের একজন বল্লম ছুঁড়ে সিংহটার পিঠে পাঁজরা আর কোমরের মাঝামাঝি সামান্য আহত করে। সিংহটা রেগে ঝোপের মধ্যে ওৎ পেতে থাকে। আবার পায়ের দাগ ধরে যখন বোরাদের দলটা খোঁজাখুঁজি শুরু করে, সিংহটা আচমকা লাফ দিয়ে পড়ে ওদের একজনের হাত কামড়ে ধরে। দলের বাকী লোকজন হৈ-হৈ করে এসে পড়াতে সিংহটা লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। আহত সাথীকে ওরা ঝোপ থেকে বাইরে এনে আবার খোঁজে বেরোয় সিংহটার। অবশেষে একটা দুর্ভেদ্য ঝোপের মধ্যে জখম হওয়া সিংহটাকে দেখতে পায়। দলের আর একজন বোকার মত কয়েক গজ এগিয়ে যায় ওর দিকে। কী হচ্ছে কেউ কিছু বোঝার আগেই সিংহটা এসে লোকটাকে সোজা ধরে বুকে কামড় দেয়। লোকজন এসে পড়ে কিছু করার আগেই সিংহটা ফের সেই ঝোপে গিয়ে ঢোকে। আহত লোকটাকে ওরা উদ্ধার করে বটে, কিন্তু লোকটা তার পরেই মরে যায়।
টাটকা থাবার ছাপ চোখে পড়ল। কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে কিন্তু বাতাসটা বইছে আমাদের দিক থেকে। ঠিক করলাম, কোন টোপ দিয়ে বসে থাকতে হবে। নইলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ধাওয়া করতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।
ডেলানি আর পুলম্যানকে ওখানে রেখে এল্‌সাকে দেখতে গিয়ে পৌঁছলাম.

রাত আটটা নাগাদ। মিনিট পনেরো পরে এসে গেল এল্‌সা। এসেই আমায় ঘটা করে অভ্যর্থনা জানাল। খুব খিদে দেখলাম। অবশ্য শরীর ওর ঠিকই আছে। রাতে গ্র্যাণ্ট গেজেলের আধাআধি শেষ করল বসে বসে। ওর জন্যে এনেছিলাম ওটা। ভোরে বাকীটা টেনে নিয়ে গেল ক্যাম্পের নীচে যে ঝোপটা আছে সেখানে। সারাদিন ওটা নিয়ে রইল, শুধু মাঝে মাঝে স্টুডিওতে ঘুরে গেছে, আমি আছি কিনা দেখতে। মঙ্গলবার সকালে গেজেলটা শেষ করে নদী ধরে আমার সঙ্গে আধ মাইলটাক গেল। হঠাৎ ওপারের দিকে নজর গেল ওর, নিশ্চয় চোখে পড়ে থাকবে কিছু। সঙ্গে সঙ্গেই সন্তর্পণে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে নদী পার হল। যেখানটায় ওর নজর পড়েছিল তার ঠিক উল্টোদিকে লুকিয়ে রইলাম। কিছু দেখতে বা শুনতে পেলাম না। হঠাৎ হুটোপাটির আওয়াজ হল। দেখি একটা মদ্দা জলহরিণ জঙ্গল থেকে নদী পার হয়ে আমার দিকেই এগিয়ে এল সোজাসুজি। পিছু পিছু এল্‌সা। আমায় দেখেই হরিণটা ফেরার চেষ্টা করল। কিন্তু ইতিমধ্যে এল্‌সা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শুইয়ে ফেলেছে। নদীর জলের মধ্যে সে কী ঝুটোপুটি! তারপর হরিণটা যখন নেতিয়ে এল, একেবারে মুখের ওপরে কামড়ে ধরল। হরিণের মুখের সামনের দিকটা এল্‌সার মুখের মধ্যে। যাতে দমবন্ধ হয় সেইজন্যেই বোধহয় এই কায়দা। দৃশ্যটা শেষ অবধি অসহ্য লাগল, হরিণটাকে এক গুলিতে এই মর্মান্তিক কষ্টের হাত থেকে রেহাই দিলাম। হরিণটা কমসে কম চারশো পাউণ্ড তো হবেই। ভাবতে পারবে না, আর আমিও দেখে অবাক—সেই খাড়াই নদীর কোল দিয়ে এল্‌সা ঐ বিরাট হরিণটা টেনে আধাআধি তুলল প্রচণ্ড চেষ্টায়। কিন্তু আর পারলাম না। ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম বটে কিন্তু করতে পারলাম না কিছুই। তখন ক্যাম্পে এসে দড়ি আর নুরু ম্যাকাদ্দেকে নিতে এলাম। যখন ফিরলাম হরিণটা উঁচু শুকনো ডাঙায় তুলে ফেলেছে এল্‌সা। কী অবিশ্বাস্য শক্তি হয়েছে এল্‌সার! বোঝ, কল্পনা কর, মাত্র একটা মানুষকে নিয়ে কী করতে পারে ও! কত সহ্য করে আমাদের। দোন্‌রা ওকে ছেড়ে আসতে বেগ দিল একটু। বুঝেছিল, চলে যাচ্ছি! অনেকক্ষণ ধরে বেশ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আমায়। আমায় চোখের আড়াল হতে দিল না! ঘণ্টা-দুই পরে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন চুপিসাড়ে কেটে পড়তে পারলাম।

তোমার জন্যে যে দারুণ অভ্যর্থনা মিলবে ওর কাছে তার জন্যে তৈরি থেকো। আসলে আমার মতে, সব থেকে আগে দেখা দিও না। আমি দেখা দিলে আমার পালা চুকে একটু থিতু হলে তবে দেখা দিও।

*** *** ***

[ইংল্যাণ্ড থেকে কেনিয়া ফেরার পরে এটা যোগ করা সম্ভব হয়েছে মিসেস্ অ্যাডাম্‌সনের পাঠানো লেখা থেকে।]

পাঁচই জুলাই পৌঁছলাম কেনিয়া। নাইরোবি হাওয়াই বন্দরে নামার আর জর্জের সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগে দেখলাম আমাদের ল্যাণ্ডরোভারটা। গাড়ি থামার জায়গায় যত ঝক্‌ঝকে লিমুজিন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ওটার অবস্থা সব থেকে করুণ,—একেবারে ঝুরঝুরে। এমন একটা বিশ্রি গাড়িতে উঠতে হবে ভেবে হয়ত অন্য সময় লজ্জা পেতাম; কিন্তু এখন তা মোটেই পেলাম না। বরং এই ভেবেই আমার বুকের মধ্যে একটা গভীর আবেগ এসে গেল যে ওর গায়ে আঁচড় বা টোল যা আজো অবধি রয়ে গেছে তার সমস্তটাই এল্‌সার দুরন্তপনার স্বাক্ষর।

জর্জকে বললাম, চল আগে সোজা এল্‌সার কাছে যাই। জর্জ বোঝাল, নতুন গাড়ি একটা আগে কিনতে হবে, কেন না আমাদের এই পুরোনো সাথী এখন ভগ্নদশায় পড়েছে। কাজেই আমাদের দুঃখের সঙ্গেই বিদায় দিতে হল তাকে। সেই ল্যাণ্ডরোভার—এল্‌সার জীবনের শুরু থেকেই আজ অবধি প্রতিটি ক্ষণই যে ওর ছোঁয়ায় পুলকিত হয়েছে, কত দামালপনা সহ্য করেছে ওর! সত্যি আমাদের সাথীর মত সাথী—জরাগ্রস্ত বলে বাতিল হল। একেবারে হাল আমলের সৌখিন ল্যাণ্ডরোভারই কেনা হল একটা।

আমরা ভাবলাম, না জানি এই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অচেনা চেহারাখানা দেখে কী ভাবই না হবে এল্‌সার!

অল্পদিনেই এল্‌সার সঙ্গে দেখা করার জন্যে রওনা হলাম। সন্ধ্যে হচ্ছে এমন সময়ে বারোই জুলাই গিয়ে পৌঁছলাম ক্যাম্পে। মিনিট কুড়ি পরে যখন আমার তাঁবুটা খাটানো হচ্ছে, হনুমানদের পরিচিত চীৎকার শোনা গেল নদীর দিক থেকে। এল্‌সার আগমনই এই চেঁচামেচির উৎস।

জর্জ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ট্রাকে উঠতে বলল। যতক্ষণ না এল্‌সা জর্জকে আদর আপ্যায়ন করে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়, ততক্ষণ আমায় ট্রাকের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে। জর্জের মনে হয়েছে এতদিন পরে দেখার ফলে এল্‌সার প্রথম দর্শন আর আদরের ঠেলায় কোন চোট হয়ে যেতে পারে আমার।

নেহাৎ নারাজ হয়েই ট্রাকে উঠে বসে আড়াল থেকে দেখলাম জর্জকে ও যথা-রীতিই আদর অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে পড়েছি আমি। হঠাৎ আমায় দেখতে পেল এল্‌সা। যেন দু জনের এমন দেখা হওয়াটা দুনিয়ার সব থেকে স্বাভাবিক ঘটনা। জর্জের কাছ থেকে বেশ শান্তভাবেই হেঁটে এল আমার কাছে। আমার হাঁটুতে মুখ ঘষতে শুরু করল, আর সেই সঙ্গে মৃদু 'মিয়াও' গোছের ডাকও ডাকতে লাগল। তারপর খাবার

নখগুলো বেশ ভালো করে গুটিয়ে নিয়েই ওর তিনশো পাউণ্ডের দেহটা দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বিনা আবেগ বা উত্তেজনায় কিছুটা গড়াগড়ি দিল। একেবারে নধর চেহারা, অনেক বড় হয়ে গেছে এল্‌সা। দেখে খুশি হলাম, পেট ভরা আছে ওর। তাই জর্জ ওর জন্যে যে গেজেলটা এনেছিল তার দিকে অনেক পরেই ওর মন গেল। পরে অবাক হয়ে দেখলাম, নতুন ঝক্‌ঝকে ল্যাণ্ডরোভারটার ছাদে উঠে গেল। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা যেমন স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিল, নতুন গাড়িটাকেও সেইভাবেই মেনে নিল। অথচ পুরোনো ভাঙাচোরা গাড়িটার সঙ্গে এই নয়া কিসিমের গাড়ির চেহারার কত না তফাত!

ঠিক করা হল, রাতের মত আমি ট্রাকের মধ্যে বিছানা পাতব। কেন না এল্‌সা আমার খাটের অংশে ভাগ বসাতে আসতে পারে। দেখা গেল, ঠিকই ধারণা করা হয়েছিল। আলো নিভলেই এল্‌সা গুঁড়ি মেরে আমার বোমার কাঁটা-বেড়ার দিকে এগোল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে ট্রাকের ভিতরটা দেখে নিল একবার। আমি আছি দেখে ঠাণ্ডা হল। এর পরে গাড়ির পাশেই শুয়ে পড়ল রাতের মত। তারপর শুনলাম গেজেলটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদীর ধারে। সেখানে আগলে রইল সেটা, যে অবধি না জর্জ উঠে প্রাতরাশে আসার হাঁক পাড়ল। তারপর এল এল্‌সা। এসেই উড়ন্ত ঝাঁপ একটা দেবে দেবে করল আমার দিকে। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'না এল্‌সা, না।' সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল এল্‌সা। শান্তভাবে হেঁটে এসে বসল। আমরা খাচ্ছি আর ও আমার গায়ে একটা থাবা রাখল সারাক্ষণ। তারপর আবার হেলায় ফেলে আসা গেজেলটার দিকে ফিরে গেল।

পরের ছদিন আমাদের ক্যাম্পের কাজের ছক মেনে চলল এল্‌সা। সকাল-সন্ধ্যে বেড়াতে বেরোল। ওপারে জল খাচ্ছে একটা হরিণ। এল্‌সা তাকে তাগ করে চুপিসাড়ে চলল। শক্ত হয়ে জমে রইল যেন খুব অস্বস্তিকর অবস্থায়, যে পর্যন্ত না হরিণটা ওকে বাতাসের অনুকূলে ত্বরিত গতিতে নেমে যাবার সুযোগ দেয়। নদীটা পার হল এল্‌সা একটুও ছলাৎ শব্দ না করে, ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল। যখন ফিরল, গায়ে মাথা ঘষে জানাল ওর শিকারের ব্যর্থতার কথা। আর একবার একটা মৃত ডিক্‌-ডিক্‌ হরিণকে আমরা একটা শিকারী পাখীর কবল থেকে উদ্ধার করলাম। সবে মেরেছে হরিণটাকে। এল্‌সাকে এই ছোট জাতের হরিণ খেতে দেওয়া হল। ও কিন্তু অবহেলায় মুখ ফেরাল। অপছন্দের ব্যাপারে যেমন নাক কুঁচকে মুখভঙ্গি করে ঠিক তেমনটিই করল। আর একবার একদিনের মাছ ধরার জন্যে চড়ুইভাতি হল আমাদের। ওর রেখাচিত্র আঁকতে বসলাম। যেই স্যাণ্ডউইচ খেতে শুরু করেছি, ভাগ চাইল

এল্সা। থাবা দিয়ে আমার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল স্যাণ্ডউইচ। ভাগ দিতে হল ওকে।

আবার অন্য অন্য সময়ে এতটা ভালমানুষিও দেখায়নি। খেলার ছলে ওৎ পেতে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে সব সময়ে। এখন ওর গায়ে এত জোর বেড়েছে আর এত ভারী হয়ে উঠেছে যে তার ধকল সামলানো শরীরের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে।

একদিন সকালে জর্জের ছুঁড়ে দেওয়া একটা ছড়ি নিয়ে নদীর মধ্যে কেমন খেলল। ছড়িটা জলে পড়তেই মুখে তুলে নিল, লাফিয়ে গাড়ির চাকার মতই পাক খেল তার চার দিকে, লেজ আছড়ে জল ছিটিয়ে চল্‌কে একাকার করল। ছড়িটা ফেলে দিল আবার শুধু ডুবে ওটাকে তুলে আনবে বলে। তারপর ঝাঁক করে কামড়ে নিয়ে উঠল সেটাকে। নদীর ধারেই জর্জ ছবি তুলছিল ওর খেলার। এল্‌সা ভান করল যেন দেখেনি কিছু। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এল। হঠাৎ ছড়িটা ফেলে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল জর্জের ওপর— যেন বলল, 'এই তোমার পাওনা, ফটো তুলিয়ে মশাই।' তারপর জর্জ যখন তেড়ে গেল ওর দিকে, লাফিয়ে সরে গিয়ে চোখের নিমেষে একটা হেলানো গাছের গুঁড়ি দিয়ে সবায়ের না গালের বাইরে উঠে গেল অবিশ্বাস্য গতিতে। তারপব ওখানেই ভালোমানুষের মত মুখ করে বসে থাবা চাটতে লাগল।

এই ব্যাপারের পরে দুদিন ধরে এল্‌সা অল্পক্ষণ করে ক্যাম্পে আসত। খুবই আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। তেইশে সকালে বেড়াতে এল না। কিন্তু বিকেলের শেষের দিকে ওর চেহারা দেখা গেল ক্যাম্পের কাছে শৈলশিরার মাথায়। আমরা দেখেও বিশ্বাস করতে পারলাম না, ওর থেকে মাত্র কুড়ি গজের মধ্যে হনুমানের একটা গোটা দল নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ঘোরাফেরা করছে। আমরা ডাকাডাকি করলাম, জবাব দিল নেহাৎ অনিচ্ছুক ভাবে। নীচে এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। তবে তারপরেই জঙ্গলে মিলিয়ে গেল ঝটপট। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত পিছু পিছু গেলাম ওর। পরে আবার ফিরল, মাথা চাপড়ালাম, কিছুই করল না। কিন্তু ভারী ছটফট করছিল। কেমন অস্বস্তি দেখা যাচ্ছিল ওর মধ্যে, চলে যেতে চাইছিল। সারা দিন সারারাত এল না, শুধু একবার এসে খেয়ে গেল চটপট। পরের দিন খাওয়ার পরে যখন কথাবার্তা বলছি আমরা, হঠাৎ দেখা দিল এল্‌সা—সারা গা ভিজে, জল পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। নদী পার হয়ে এসেছে। আমাকে আর জর্জকে ওর স্বভাবসুলভ অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু খেতে খেতে মন দিয়ে বাইরে কিছু শুনল কান পেতে। সকালে আর দেখা গেল না ওকে। এমন অদ্ভুত ভাব-গতিক অবাক করল আমাদের। ওর ঋতুকালের কোন লক্ষণ দেখা দেয়নি।

আমাদের সন্দেহ হল হয়ত আমাদের থাকাটা আর ভাল লাগছে না ওর। ওকে ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে এতদিন কখনো থাকিনি ওর কাছে এসে।
পরের সন্ধ্যায় আবার এসে হাজির এল্‌সা। খাওয়ার সময় হয়েছে তখন আমাদের। আঁধার থেকে বেরিয়ে এসে একবার লেজ বুলিয়ে সাফ করল খাওয়ার টেবিল। একটু বাড়াবাড়ি করল আদরের, জড়িয়ে ধরল একে একে, তারপরেই চলে গেল। আবার ফিরে এসে ঘুরে গেল একটুখানি, যেন ক্ষমা চাইতে এসেছে চলে যাবে বলে।
ওর অমন অদ্ভুত আচরণের হেতু পরিষ্কার ধরা পড়ল পরের সকালে একটা বড় সিংহের থাবার দাগ দেখে। বিকেলে দেখলাম আমরা ফীল্ড গ্লাস দিয়ে, এক ঝাঁক শকুনি পাক খাচ্ছে একটা জায়গায়। কাজেই ব্যাপার কী দেখতে যাওয়া হল। চোখে পড়ল অনেকগুলো হায়েনা, শিয়াল আর সিংহের থাবার দাগ। এগুলো গেছে নদীর দিকে। সিংহটা নদীতে জল খেয়েছে আর রেখে গেছে রক্তাক্ত বালি গোলা খানিকটা জল। কিন্তু এল্‌সার পথের কোন হদিশ নেই বা শকুন ওড়ার হেতুও বোঝা গেল না। রক্তই বা এল কোথা থেকে! ঐ জায়গার আশপাশ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল ঘণ্টা ছয়েক ধরে। রহস্য উদ্‌ঘাটন না করেই ক্যাম্পে ফিরলাম আমরা। সেই সন্ধ্যায় খুব খিদে নিয়ে এল এল্‌সা, রা:টা রইল। কিন্তু ভোরেই আবার রওনা হল।
উনত্রিশে দেখলাম ওকে, সব থেকে উঁচু পাহাড়ের মাথায়। কয়েক মিনিট ধরে ডাকাডাকি করতে তবে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। খুশিতে বারবার গর্‌গর্‌ করল, সোহাগ দেখাল। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফের চলে গেল পাহাড়ে। এবার বুঝলাম প্রিয়মিলনের কাল এসে গেছে ওর। তাই এমন ভাব। বিকেলে আবার যখন দেখতে গেলাম ওকে, জবাব দিল বটে আমাদের ডাকাডাকির, তবে নামল না। আমরাই উঠলাম। যখন অন্ধকার হচ্ছে, ও উঠে দাঁড়াল। বিদায় জানাবার জন্যেই যেন আমাদের সবায়ের গায়ে মাথা ঘষল একবার করে। তারপর ধীরে ধীরে ওর জায়গায় চলে গেল। শুধু একবার ফিরে চাইল আমাদের দিকে। পরের দিনও দেখলাম ওকে পাহাড়ের ওপর ওর সেই জায়গাটিতে। যদি ভাষা থাকত ওর মুখে, বলতে পারত একা থাকতে চায়। যতই ভালোবাসা আমাদের কাছে ও পাক না কেন এখন ওর চাই সত্যিকারের আপনজন।
ঠিক করা হল ক্যাম্প তোলা হবে। পাহাড়ের নীচে দিয়ে যেই আমাদের গাড়ি ছুটো বেরিয়ে গেল, আকাশের পটে দেখা দিল ওর আকৃতিটা। দেখল, গাড়িতে চলে যাচ্ছি আমরা।
আগস্টের আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে এল্‌সার কাছে গেলাম আমরা।

ওর সস্নেহ আদর আপ্যায়নের আন্তরিকতা বজায় রয়েছে, দেখলাম। কিন্তু এই কটা দিনের মধ্যে তিনদিন ও একা একা ঝোপের মধ্যে কাটাল। কোন সিংহের থাবার দাগ যদিও চোখে পড়েনি তবুও আমাদের জীবনের ভাগীদার না হয়ে একা থাকতেই ভালো লেগেছে এল্‌সার। ওর পক্ষে এর থেকে ভালো আর কিছু নিশ্চয় হতে পারে না—আমাদের বন্ধন ঘুচিয়ে থাকবে ও, নিজের ওপর নিজে নির্ভর করে।

উনত্রিশে আগস্ট নিজের কাজের খাতিরে ঐ অঞ্চলে জর্জকে যেতে হল। ছটায় পৌঁছল সেখানে রাত কাটাবার জন্যে। সাড়া দিল এল্‌সাকে ত্থ-ত্থবার বাজের ঝলক গুলি ছুঁড়ে! আটটা নাগাদ একটা সিংহের ডাক শোনা গেল নদীর ওপার থেকে। তখন আর একবার গুলি ছুঁড়ল জর্জ। সারা রাত সিংহটার ডাক চলতে থাকল বটে, কিন্তু দেখাই মিলল না এল্‌সার।

পরের দিন সকালে জর্জ ক্যাম্পের খুব কাছে একটা কম-বয়সী সিংহের বা সিংহীর থাবার ছাপ দেখল। এর পরেই চলে যেতে হয়েছিল ওকে কাজে। কিন্তু চারটের সময় ফিরল বিকেলে। ঘণ্টাখানেক পরে এল্‌সা এল নদী পার হয়ে। আগের মতই সোহাগ আদরে ব্যতিব্যাস্ত করে তুলল। শরীরও ঠিকই আছে আগের মত। জর্জ একটা হরিণ এনেছিল ওর জন্যে। একটুখানি খেয়ে সেটা টেনে নিয়ে এল তাঁবুতে। অন্ধকার হবার কিছু পরেই একটা সিংহ ডাকতে শুরু করল। অবাক হল জর্জ, এই আমন্ত্রণ কানেই তুলল না এল্‌সা। ডাক চলল প্রায় সারারাত ধরে।

সেই ডাক এল্‌সাকে টানল, যখন সকালে ও মৌজ করে একপেট খাওয়া শেষ করেছে। তারপর বেরিয়ে গেল ধীরে সুস্থে। ভাবটা, বেড়িয়ে আসি একটু ; দেখি মরদটা হাঁকাহাঁকি করছে কেন রাতভোর? এর সামান্য পরেই জর্জ এল্‌সার ডাক শুনল। বেরিয়ে এসে দেখল বড় পাহাড়টায় বসে আছে আর গাঢ় স্বরে কাটা কাটা ডাক ছাড়ছে। ওকে দেখতে পেয়ে নেমে এল। খুশির ভাব দেখাল বটে। তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, একা থাকতে চায়। অল্পক্ষণ গায়ে মাথা ঘষে জঙ্গলে ঢুকে গেল। কোন্ দিকে গেছে আন্দাজ করে পিছু পিছু গেল জর্জ। দেখল থাবার দাগ গেছে নদীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই এল্‌সাকে ঝোপ ঢাকা একটা পাথরের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ্য করল জর্জ। মনে হল, খুব অস্থির হয়ে উঠেছে ও। নদীর উল্টোদিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আগ্রহের সঙ্গে। প্রথমে একটু ডাকল, তার পরে চমকে উঠে আগের মতই কাটা কাটা ডাক ডাকতে ডাকতে পাথরটা থেকে নেমে এসেই জর্জের পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলো। পরক্ষণেই দেখা দিল এক তরুণ সিংহ, নিশ্চয় অনুসরণে মত্ত—জর্জকে লক্ষ্য না করেই ওর দিকে

এল। সিংহটা যখন ওর থেকে কুড়ি গজেরও কম দূরত্বে জর্জ চেঁচিয়ে উঠে হাত নাড়ল। চমকে উঠেই ঘুরে গেল সিংহটা আর যে পথে এসেছিল সে পথে অদৃশ্য হল। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার দেখা দিল এল্‌সা। কয়েক পলক জর্জের কাছে দাঁড়াল, ঘাবড়ে গেছে এমনভাবে, তারপর সিংহটার পথেই গেল। জর্জ ফিরে এসে ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা দিল।

দুদিন পরে আবার যেতে হল জর্জকে। এল্‌সার আবাসে পৌঁছবার কয়েক শো গজ আগে, গাড়ির লোকজনের কেউ ওকে বলল, গাড়ির পথের কাছ-ঘেঁষা ঝোপের নীচে এল্‌সাকে দেখেছে। ভাবটা লুকিয়ে থাকার। খুব অস্বাভাবিক ব্যবহার এটা এল্‌সার, কেন না গাড়ি দেখলেই আগে দৌড়ে এসে অভ্যর্থনা জানায় ও। জর্জ ভাবল, অন্য কোন সিংহীকে এল্‌সা ভেবেছে লোকটা। গাড়ি ঘুরিয়ে পিছিয়ে এল সবাই। কিন্তু সেখানেই ছিল এল্‌সা ঝোপের মধ্যে বসে। প্রথমে নড়াচড়া করল না। তারপর ধরা পড়ে গেছে বুঝে বেরিয়ে এল। সেই আগেকার সৌজন্যময়ী এল্‌সা। এবার জর্জকে নিয়ে খানিকটা লাফঝাঁপ করল। ভাবখানা এই, যেন জর্জকে দেখে কত খুশি হয়েছে ও। ওর জন্যে আনা মাংসও খেল কিছুটা। জর্জ এল্‌সার খাওয়ার সময়ে খানিক দূর কোন পায়ের দাগ দেখা যায় কিনা তা নিরীক্ষণ করল। অন্য একটা সিংহের থাবার দাগের সঙ্গে এল্‌সার থাবার ছাপ মিশিয়ে থাকতে দেখা গেল। তখন হঠাৎ জর্জের চোখে পড়ল একটা ঝোপের পেছন থেকে একটা সিংহ উঁকি দিচ্ছে ওর দিকে। কয়েকদিন আগে যে সিংহটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জর্জের, সুদর্শন সেই তরুণ। সঙ্গে সঙ্গেই নদীর ধারের গাছ থেকে হনুমানদের চেঁচামেচি শোনা গেল! তার মানে সিংহটা আসছে। শুনেই তড়িঘড়ি খাওয়া সারল এল্‌সা। স্বামীর সঙ্গে, কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

এগিয়ে চলল জর্জ। তাঁবু খাটিয়ে বাকী মাংসটা রাখল এল্‌সার জন্যে। তারপর নিজের কাজে বেরোল। যখন ক্যাম্পে ফিরল, তখনো মাংস ছোঁয়নি কেউ।

সারা রাতও দেখা দিল না এল্‌সা।

লিভিং ফ্রী

ভাষান্তর : অর্ণব রায়

সেবার ইসিওলোয় ফিরে জর্জ আমাকে বললো, ২৯শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর—এই সাতদিনের মধ্যে সে এল্‌সাকে তার সিংহের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখেছে। সেটা উনিশশো উনষাট। সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করে ফেললাম—প্রথম এবং শেষ তারিখ থেকে একশো আট দিন, তার মানে, পনেরো থেকে একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনো দিন এল্‌সার বাচ্চা হবে।

বাচ্চা হবে, সে তো আনন্দের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষীণ আশঙ্কাও মনে বাসা বাঁধলো—হয়তো বা এবার তাঁবুতে ফিরে এল্‌সাকে আর তেমন করে কাছে পাবো না, হয়তো···হয়তো তার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে থেকে এল্‌সা আমাদের কথা একেবারে ভুলেই যাবে।

কিন্তু না, এল্‌সা আমাদের ভোলেনি। তাঁবুতে ফিরে দেখি—সেই আগে যেমন রাস্তার পাশে শুয়ে ও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতো, সেদিনও ঠিক তেমনই শুয়ে আছে। বরং, অন্যান্য বারের চেয়ে এবার তার আদর-আপ্যায়নের পরিমাণটা একটু বেশি।

তাঁবু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে করতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। ভেতরে ঢুকে সবে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছি খাটিয়ায়—অমনি শুরু হলো গর্জন। এতোক্ষণ আমাদের জামাতা বাবাজী কোথায় ছিলো—কে জানে। আমরা আসার পর থেকে এল্‌সাকে আর সে কাছে পায়নি, তাই গোঁসা হয়েছে—রাগে-অভিমানে তাঁবুর চারপাশে চক্কর দিচ্ছে আর গজরাচ্ছে।

এল্‌সা কিন্তু গেলো না। জর্জ-এর সঙ্গে বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে রাতের খাবার খেলো। তারপর মেঝেয় তার পায়ের কাছে শুয়ে লাগালো এক ঘুম। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে শুনি, সে বেচারা তখনও ডাকছে। তবে, এবার ততটা কাছ থেকে নয়, দূরে—পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসছে তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।

দুদিন এল্‌সা সকাল-সন্ধ্যে রইলো আমাদের পায়ে পায়ে। এই দুদিন ধরে শুধু খেলো আর ঘুমোলো। ঘুমও কি ঘুম! এক ঘুমে একেবারে বিকেল কাবার। দ্বিতীয় দিন ঠেলে-ঠুলে ঘুম থেকে তুলে জর্জ তাকে নিয়ে তখন বেরোলো মাছ ধরতে, তখন দেখে ভারী মায়া হলো।—আহা বেচারা! চলতে চলতেও যেন ও ঝিমুচ্ছে!

তৃতীয় রাতে খাওয়ার পরিমাণটা ওর একটু বেশিই হলো। সকালে ঘুম থেকে

উঠে হেলতে-দুলতে চললো আমাদের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে। দুটো শেয়ালকে তাড়া করে, একঝাঁক বন-মোরগকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় করিয়ে ওর কি আনন্দ! চলতে চলতে বসে পড়ে জিভ দিয়ে থাবা চাটলো। তারপর আবার উঠে চললো আমাদের আগে আগে।

হঠাৎ সামনে এক খট্বাস দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। এই বনে এ জন্তুগুলোর দেখা সহজে মেলে না। খট্বাসটা আমাদের দিকে পেছন ফিরে পচা গাছের গুঁড়ি খুঁড়ে খাবার খুঁজছিল। আমাদের কাউকেই সে দেখেনি। আপন মনে নিজের কাজ করেই চলেছে। এল্সা গুটি গুটি পায়ে এগোলো তার দিকে।

মুহূর্তে পিছন ফিরলো জন্তুটা। এল্সাকে দেখে তীব্র আক্রোশে ফুলে উঠলো তার শরীর। ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করে, পিঠটাকে ধনুকের ছিলার মতো বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণ নখের ঘা মারলো সে এল্সার মুখে। পরিস্থিতি ঘোরালো বুঝে এল্সা লেজ গুটিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এলো। খট্বাসটাও এক পা এক পা করে পেছোতে পেছোতে হঠাৎ দে ছুট।

বুঝলাম, অত্যধিক ভোজনের ফলে বেচারা এল্সার শরীরে এক আলগা-ভাব এসেছে। শিকার করা দূরে থাক, স্রেফ মজা করার জন্যেও ও পরিশ্রম করতে নারাজ।

তবে হ্যাঁ, স্বভাবেই হোক কি অন্য কোনো কারণেই হোক, খট্বাসটার সঙ্গে না যুঝে ও ভালোই করেছে। শক্তিতে যদিও ঐ জন্তুগুলো নগণ্য, তবু আঁচড়ে-কামড়ে কাউকে কাবু করতে ওদের জুড়ি আর দুটি নেই।

ফেরার পথে কি হলো এল্সার, কে জানে। পেছনের দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে মুখ ঘষতে লাগলো। আদরের ঠেলায় আমার তো অবস্থা শোচনীয়। দুজনে জড়াজড়ি করে পড়লাম বালির ওপর। খুব একচোট গড়াগড়ি খেয়ে উঠলাম। অবশ্য না উঠে উপায়ও ছিল না—খুব কাছাকাছি কোথাও একপাল হাতির পায়ের শব্দ এবং ডাক শোনা যাচ্ছিলো।

সে-রাতটুকু আমার তাঁবুর সামনে শুয়ে রইলো এল্সা। ভোরের মুখে শোনা গেলো তার সিংহের ডাক। এবার আর উপেক্ষা নয়। ধড়মড়িয়ে উঠে এল্সা ছুটলো তার দিকে।

দুজনের ডাক শুনতে শুনতে এ ক'দিনে বুঝতে পেরে গেছি—কোন্টা কার ডাক। এল্সার ডাক নিখাঁজ, ভারী। প্রথম ডাকের পর দুবার সে ঘোঁতঘোঁত করে। তার সিংহের ডাক ততটা ভরাট কিংবা ভারী নয়। একটু চিকন। তাছাড়া, প্রথম ডাকের দশ থেকে বারো বার ঘোঁতঘোঁত

করা তার স্বভাব।

এল্‌সা চলে গেলো, আমরাও তাঁবু গুটোলাম। প্রিয়ের কাছে প্রিয়তমা গেছে, যাক। আমাদের আর এর মধ্যে মাথা গলিয়ে কাজ নেই। সুতরাং ইসিওলোয় ফিরে যাওয়াই ভালো।

ফিরে এসে নতুন এক কাজ পাওয়া গেলো। হাতির একটা বাচ্চা ধরা পড়েছিল ফাঁদে। তাকে দেখাশোনা করতে হবে।

জর্জ নিয়ে এলো তাকে বাড়িতে। ভারী সুন্দর দেখতে বাচ্চাটা। নাম দিলাম ওর প্যাম্পো। কিন্তু হা হতোঽস্মি। ঐটুকু বাচ্চা যে আমাদের এতো ভোগাবে, এ কি ছাই তখন জানতাম!

সাধারণতঃ, মা-ছাড়া হাতির বাচ্চারা বড় একটা বাঁচে না। ওদের মায়ের দুধের নাকি এক বিশেষ গুণ আছে। তবু চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। ওর রোজকার খাবার দু'গ্যালন দুধের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কড লিভার তেল এবং গ্লুকোজ মেশাতে শুরু করলাম।

দেখুন কাণ্ড! কোথায় এল্‌সা আর কোথায় প্যাম্পো। দুজনে রয়েছে দু প্রান্তে—দেড়শো মাইলের ব্যবধান। তবু কাউকেই ছাড়তে পারি না। না পারি এল্‌সাকে ভুলে থাকতে, না পারি প্যাম্পোকে ছেড়ে দু'দণ্ড কোথাও যেতে। ঐটুকু একটা বাচ্চা—ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার চাই খাবার একটু চোখের আড়াল হবার জো নেই।

তা কপাল নেহাত ভালো, জোয়ান জাগ্‌লকে পেয়ে গেলাম। জন্তু-জানোয়ার জোয়ান-এর ভারী প্রিয়। কথায় কথায় একদিন বললো, আমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে বাচ্চাটাকে ক'দিনের জন্যে সে দেখাশোনা করতে পারে। সুতরাং সোনায় সোহাগা। নিশ্চিন্ত মনে ওর হাতে প্যাম্পোর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমরা ফিরে গেলাম জঙ্গলে— দেড়শো মাইল দূরে এল্‌সার কাছে। তারিখটা দশই অক্টোবর।

একুশ দিন হলো এল্‌সাকে ছেড়ে গেছি। কি হলো ওর! কেমন আছে! কোথায় আছে! সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবতে ভাবতে তাঁবু খাটাচ্ছি, হঠাৎ দেখি— সাঁতরে নদীর জল কেটে এগিয়ে আসছে এল্‌সা!

মন খুশীতে ভরে গেলো। দড়ি হাতুড়ি রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম ওর উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্যে। কিন্তু কোথায় কি! এক লাফে আমার গায়ের ওপর পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া তো দূরের কথা, একটু ছুটেও এলো না সে। বেশ ভারিক্কী চালে হেলতে-দুলতে এগিয়ে এসে আমার পায়ের কাছে দাঁড়াল। তারপর মাটিতে শুয়ে আয়েশে হাত-পা ছড়িয়ে দিল।

বসে গায়ে হাত বোলালাম তার, আদর করলাম। গায়ের লোমগুলো বেশ

মসৃণ, পেটের কাছে পাঁচটার মধ্যে চারটে দুধের বোঁটা বেশ বড়সড় হয়েছে। নাঃ, আর কোনো চিন্তা নেই! জর্জ যা বলেছে, ঠিক। এল্‌সা মা হতে চলেছে। অন্ততঃ মাসখানেক হলো. তার পেটে বাচ্চা এসেছে।

সিংহদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথার চলন আছে। সিংহী গর্ভবতী হলে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে তাকে আর শিকারের পেছনে ছুটোছুটি করতে হয় না। করবেই বা কিভাবে—শিকারের পেছনে ছুটতে তাগদ লাগে তো! এহেন অবস্থায় তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে অপর গুটি দুই সিংহী। খাবারদাবার তারাই সংগ্রহ করে দেয়। বাচ্চা হলে বাচ্চাদের দেখাশোনাও তারা করে। ধাই-মা গোছের আর কি! বাচ্চাদের ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হলো কি না, ওদের বাবা ত্রিসীমানায় এলো কি না—এসব দেখার কাজ ধাই-মাদেরই।

কিন্তু বেচারা এল্‌সা—জাত-গোত্র ছাড়া হয়ে জন্মাবধি কাটালো আমাদের সঙ্গে, সে কি পেয়েছে কোনো ধাই-মা জোটাতে! মনে হয়, পারেনি। সুতরাং এমতাবস্থায় যা কিছু করণীয়, আমাদেরই করতে হবে! শরীর একে ওর খারাপ। এ শরীর নিয়ে শিকারটিকার করতে গিয়ে শেষে কি হতে কি ঘটিয়ে বসে—কে জানে!

ঠিক হলো, তাঁবুতেই থাকবো আমি প্রায় সময়। এল্‌সার জন্যে প্রচুর পরিমাণে খাবার মজুত রাখবো। তাঁবু থেকে মাইল পঁচিশেক দূরের এক ঘন জঙ্গলে কিছু বুনো ছাগলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এল্‌সার খাদ্য হিসেবে বুনো ছাগল সবচেয়ে প্রিয়। সুতরাং, ঐ ছাগলই আমাদের নিয়ে আসতে হবে।

কে আনবে, কিভাবে আনবে·· ঠিক হলো, আমিই যাবো। সঙ্গে থাকবে নুরু, ম্যাকেদ, ইব্রাহিম এবং সোয়াহিলি সম্প্রদায়ের একটি ছেলে। ছাগল সংগ্রহে নুরু আমাকে সাহায্য করবে, ম্যাকেদ রাইফেল উঁচিয়ে চারপাশে কড়া নজর রাখবে, ইব্রাহিম চালাবে গাড়ি, আর ছেলেটা আমার টুকিটাকি ফাইফরমাশ খাটবে। জর্জ যদি পারে আমাদের সঙ্গে যাবে। না গেলে অবশ্য ক্ষতি নেই। আমাদের অনুপস্থিতিতে সে তাঁবু আগলাবে।

সন্ধ্যের দিকে গুটি-গুটি পায়ে এল্‌সা এসে হাজির। ভাবখানা এমন—আমি যে ওর জন্যে এতো সব বন্দোবস্ত করেছি, এ যেন ওর আগে থাকতেই জানা। তার শরীরের ঐ অবস্থায় আমাদের সাহায্য যে তার একান্ত দরকার—এ কথাও যেন সে ঠিক বুঝতে পেরেছে।

রাতটা আমার সঙ্গে এক বিছানায় কাটালো এল্‌সা।

ভোর হলো। বিছানা ছেড়ে উঠলাম। এল্‌সার ঘুম ভাঙার কোনো লক্ষণ

নেই। ঠেলা দিলাম—গায়েই মাখলো না। একই ভাবে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগলো।

এদিকে শরীরটা আমারও ভালো নয়। গা-হাত-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বর-জ্বর লাগছে। বিছানায় আমারই শুয়ে থাকা উচিত। কিন্তু এল্‌সা···দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমার মজা!

টানতে টানতে খাটটা নিয়ে গেলাম পাশের খুপরি-ঘরে। এল্‌সা একবার চোখ মেলে তাকালো, তারপর আবার নিশ্চিন্তে চোখ বুজলো। এবার একটু রূঢ় আচরণই করতে হলো আমাকে—ঠেলে ফেলে দিলাম ওকে।

মেঝেয় পড়ে তাকালো সে চোখ তুলে—দৃষ্টিতে তার প্রচ্ছন্ন অভিমানের চিহ্ন। সারাটা দিন সে আর বিছানায় উঠলো না। মেঝেতেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রইলো।

বিকেলবেলা বেড়াতে বেরোবার আগে তাকে ডাকলাম। সে যেন এই ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলো। ধড়মড়িয়ে উঠে আমার দিকে তাকালো, স্থির দৃষ্টিতে অভিমান পুঞ্জীভূত হলো। কি ভেবে সে এক লাফে উঠলো বিছানায়, আড়চোখে আমাকে একবার দেখলো, লেজ তুললো, তারপর কখনো কোনো দিন যা করেনি সেই অন্যায় কাজটি করে বসলো—সারা বিছানাটাই পেচ্ছাপে ভাসিয়ে দিলো!

এবার বোধহয় মন সন্তুষ্ট হলো তার। চোখের দৃষ্টিতে আর অভিমানের চিহ্ন নেই—বিছানা থেকে নেমে আমার দিকে বিজয়ী দৃষ্টিতে সে একবার তাকালো, তারপর দুলকি চালে এগিয়ে চললো আমাদের বেড়াবার জায়গা—নদীর দিকে।

যাক বাবা, নিশ্চিন্ত! অন্যায় আমি অবশ্যই করেছি—অমনভাবে ওকে ঠেলে ফেলে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। সারাটা দিন আমারও মন পুড়েছে। এখন শোধবোধ হতে হাল্‌কা হলাম।

বেড়াতে গিয়ে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়লো। এল্‌সার গতিবিধি আগের চেয়ে অনেক মন্থর হয়েছে। হাতির ডাক শুনেও সে তেমন ব্যগ্রতা দেখালো না। শুধু কান খাড়া করে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো। তারপর আবার মন দিলো হাঁটায়। যেন এ ব্যাপারে তার করণীয় কিছু নেই। যেটুকু যা করার—আমরা করলেই ও খুশী।

সে রাতটা কাটলো তার জর্জ-এর তাঁবুতে। বাইরে প্রায় সারারাত ধরেই অবিরাম ডেকে চললো তার সিংহ—সে সাড়াও দিলো না।

রাত তখন প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে, সিংহটা তখনো ডেকেই চলেছে—এল্‌সাকে নিয়ে আমরা বাইরে এলাম। জঙ্গলের দিকে কয়েক পা এগোলো

সে। অবাক হয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। দেখি—ছুটো সিংহের দুরকম পায়ের ছাপে জায়গাটা ভর্তি।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো এল্‌সা। পায়ের ছাপ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চললো। বাধা দিলাম না। এগোক, যাক ও। স্বামীকে না দেখে স্ত্রী কতদিনই বা এভাবে থাকতে পারে!

সে রাতে আর ফিরলো না এল্‌সা। তাঁবুর বাইরে খুব কাছাকাছি নতুন এক সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেলো। (কাছাকাছি মানে, একেবারেই কাছাকাছি। সিংহটা সে-রাতে আমাদের তাঁবুর দশ গজ দূরেই ঘোরাঘুরি করছিল, রাগে ক্রোধে মাটি আঁচড়ে শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে!) পরদিনও এল্‌সার দেখা পেলাম না। অবশেষে স্বামী-সিংহটির হাতে এল্‌সার সবটুকু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমরা ইসিওলোর পথ ধরলাম। যাবার সময় সেই ক্রুদ্ধ সিংহটার সন্তুষ্টির আশায় বিদায়-অভিনন্দনস্বরূপ একটা চিতল হরিণ মেরে তাঁবুর সামনে ফেলে রেখে গেলো জর্জ।

এল্‌সাকে ছেড়ে এসে মনে যেটুকু বিষাদ ছিলো, প্যাম্পোকে দেখে তা ধুয়ে-মুছে গেলো। প্যাম্পো ভালোই আছে। জোয়ান-এর সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। তবে হ্যাঁ, মুশকিল একটা হয়েছে। গাদা গাদা দর্শক আসতে শুরু করেছে এই বাচ্চা হাতিটাকে দেখতে। দেখার জিনিস দেখবে, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এইটুকু একটা বাচ্চা—এতো লোকজন দেখে ভয় পায়, ঘাবড়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায় জোয়ান-এর কাছে ওকে রাখা আর সমীচীন মনে করলাম না। নিয়ে এলাম নিজের বাড়িতে। আহা, কি শান্তিই না পেলো বেচারা! আমার গায়ের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে উঠোনে শুয়েই লাগালো এক ঘুম। যেন কত নিশ্চিন্ত, কত নিরাপদ!

ছু সপ্তাহ কাটলো বাড়িতে প্যাম্পোর কাছে। এবার আবার এল্‌সার পালা। জোয়ানকে খবর পাঠালাম। জোয়ান আসতে লোকজনদের ভিড় সম্পর্কে বাচ্চা জন্তু জানোয়ারদের মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্যাম্পোকে তার হাতে সমর্পণ করলাম। তারপর আর কালক্ষেপ না করে উঠে বসলাম ল্যাণ্ডরোভারে। গাড়ি ছাড়লো।

তাঁবুতে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা। চারদিকে তাকাচ্ছি, এটা-ওটা নানা কথা ভাবছি—হঠাৎ দেখি এল্‌সা এসে হাজির। আহা বেচারা। এই ছু' সপ্তাহে কি চেহারাই না হয়েছে। ক্ষিধেও ওর পেয়েছে খুব। ঘাড়ে পিঠে কয়েকটা আঁচড়-কামড়ের দাগ। ঘড়ের ছু-এক জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। আসার সময় পথে একটা হরিণ মেরে নিয়ে এসেছিলাম ওর জন্যে। দিলাম। খেতে শুরু করলো এল্‌সা। ক্ষতস্থানগুলো এই ফাঁকে ওষুধ দিয়ে যত্ন করে

বেঁধে দিলাম। বিনিময়ে কৃতজ্ঞচিত্তে আমার হাত চাটতে লাগলো সে, গালে মাথা ঘষতে লাগলো।

সে-রাতে তাঁবুর বাইরেই ঘুমোলো এল্সা। রাত একটু বেশি হতে একটা কিছু ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাবার শব্দ হলো। বাইরে এসে দেখি, ভুক্তাবশিষ্ট হরিণের মৃতদেহটি এল্সা টেনে নিয়ে চলছে নদীর দিকে। নদীর পারে গিয়ে হরিণটাকে সে দাঁতে চেপে ধরলো, তারপর নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে গেলো ওপারে। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে এলো।

আরো খানিকক্ষণ পর ওপার থেকে ভেসে এলো একপাল বেবুনের কিচির-মিচির ডাক। তাদের ডাকের শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেলো এক সিংহের গর্জন। উত্তরে তাঁবুর পাশ থেকে চাপা গলায় এল্সাও একবার ডাকলো। বুঝলাম, কার জন্যে এতো কষ্ট করে নিজে না খেয়ে ওপারে খাবার রেখে এলো এল্সা।

ভোরের আলো তখনো ভালোভাবে ফোটেনি, হঠাৎ বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো এল্সা। তাঁবুর চারপাশের উঁচু বেড়ার একটা অংশ তার প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে একসময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি ভাঙা অংশটুকু তার গলার চারদিকে মালার মতো আটকে রয়েছে, আর সেই অবস্থাতেই এগোবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

বেড়াটা ঠেলে সরিয়ে মুক্ত করে দিলাম তাকে। প্রবল উত্তেজনায় আমার হাতের বুড়ো আঙুলটা চুষতে লাগলো সে, ঘুরে ঘুরে বারবার তাকাতে লাগলো নদীর দিকে।

এ তো ভারী অবাক কাণ্ড! হলোটা কি! জর্জ ছুটলো নদীর দিকে। গিয়ে দেখে—এল্সার সিংহের কবল থেকে হরিণটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এক সিংহী। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সেটাকে সে নিয়ে গেছে আরো শ চারেক গজ, পায়ের দিকটা প্রায় সবটুকু খেয়েছে তারপর বাকীটুকু ফেলে রেখে চলে গেছে সেখান থেকে।

আর এগোলো না জর্জ। হয়তো এই সিংহীটার বাচ্চা-কাচ্চা লুকোনো আছে ধারে-কাছে কোথাও। জর্জকে দেখে সে কি করতে কি করে বসে—কে জানে! তাছাড়া সিংহীটার পায়ের ছাপের কাছে অচেনা এক সিংহের আনকোরা এক প্রস্থ পায়ের ছাপ। পাথরের আড়ালে দুজনেই হয়তো ঘাপটি মেরে বসে আছে।

আসল ব্যাপারটা কি! এই সিংহীই কি এল্সার সেই 'ধাই মা! মাঝে-মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে এরই আদর-যত্ন নিতে আসে কি এল্সা।

সে যা-ই হোক, কদিন পরে আবার এলসাকে দেখে একটু অবাক হলাম। একটু ভারী-সারী হয়েছে সে, নড়াচড়া করতেও তার বেশ কষ্ট হয় আজকাল। স্টুডিওতে এসে টেবিলের ওপর শুয়ে থাকে হাত-পা ছড়িয়ে। পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কোনে কোনো দিন সকালে উঠে চলে যায়, ফেরে অনেক রাতে। কোথায় যায়, কেন যায়—সে-ই জানে।

এমনিভাবেই চলছিলো বেশ, হঠাৎ কি যে হলো···সকালে উঠে সে যে সেই বেরোলো, আর ফিরলো না। সারাটা রাত প্রায় জেগেই কাটালাম। পরদিন সকালে জর্জ-এর তাড়া খেয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ছুটলো ইসিওলোর দিকে।

তা ইসিওলোয় ফিরে আর এক কাণ্ড। প্যাম্পোকে দেখে আমি তো যাকে বলে হতভম্ব। এ কি চেহারা হয়েছে প্যাম্পোর! মুখ শুকিয়ে গেছে চোয়াল ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো ঢুকে গেছে গর্তে···অসুখ-বিসুখ হলো নাকি!

জোয়ান বললো, কদিন ধরে প্যাম্পোর দুধ খাওয়ার পরিমাণ দু' গ্যালন থেকে কমতে কমতে দু' বোতলে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ও ভেবেছিল, দাঁত ওঠার সময় হয়েছে, তাই বুঝি খাওয়াদাওয়ার এই হাল। সময়-সুযোগ পেলেই কড়মড় কড়মড় করে সে মাড়ি কামড়াতো, এক চুমুকে এক গামলা জল নিঃশেষ করতো, মাঝে মাঝে চরম অস্বস্তিতে শুঁড় নাড়তো— এই ছিলো উপসর্গ। অগত্যা ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললেন—রোগীকে জল, গ্লুকোজ এবং সালফাগুয়ানাডাইন ট্যাবলেটের ওপর রাখতে।

চেষ্টার ত্রুটি জোয়ান করেনি, আমরাও করলাম না। কিন্তু হলো না কিছু। আমরা আসার কয়েকদিন পরে মারা গেলো প্যাম্পো। বড় শান্তিতেই মরলো। আমার গায়ে আলগোছে মাথাটি ঠেকিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে।

বড় ব্যথা দিয়ে গেলো প্যাম্পো। মাসখানেকের মতো ছিলো ও আমাদের সঙ্গে, কি ভালোই না বেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু ভগবানের প্রাণে বুঝি সেটুকুও সইলো না। ভালোবাসার জিনিসকে বড় তাড়াতাড়িই ছিনিয়ে নিতে ভালোবাসেন তিনি।

পোস্টমর্টেম হলো প্যাম্পোর। দেখা গেলো, একই সঙ্গে ওর নিউমোনিয়া এবং পেটের গণ্ডগোল—দুই-ই হয়েছিল। এ অবস্থায় চেষ্টাই সার—এতটুকু বাচ্চাকে শত ওষুধ খাইয়েও এই রোগের হাত থেকে বাঁচানো যায় না।

সে-বছর গরম একটু বেশিই পড়লো। মাঠ শুকিয়ে ফুটি-ফাটা। বৃষ্টি তো দূরের কথা, এক চিলতে কালো মেঘও আকাশের কোথাও নজরে আসে না। শুরু হলো খরা, আর সেই সঙ্গে ডাঁশের উপদ্রব। বেছে বেছে গরু মোষকে কামড়ায় তারা। কামড় খেয়ে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে ঝিমুতে ঝিমুতেই বেচারারা মারা যায়। সে এক রীতিমতো দুঃখের বিষয়।

তা খরা দেখা দিতে হলো এক নতুন বিপদ। দলে দলে আদিবাসী এসে ঢুকে পড়লো আমাদের সংরক্ষিত এলাকায়। হাঁড়ি-কলসী থেকে শুরু করে গরু-মোষ, মায় বিড়ালটা পর্যন্ত তারা সঙ্গে নিয়ে এলো। হাজারো বিধি-নিষেধ নিয়ম-কানুনের ভয়—কানেও গাঁথলো না। দলকে দল এসে আস্তানা গাড়তে লাগলো। বনের হরিণ, সম্বর অবাধে মরতে লাগলো তাদের তীরে।

খবর পেয়ে টনক নড়লো আমাদের। জর্জ-এর সঙ্গে জেলা-কমিশনারের দফায় দফায় বৈঠক হলো। কতো কি মতলব আঁটলো দুজনে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

সুতরাং নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার রওনা দিলাম। একদিক থেকে ভালোই হলো। প্যাম্পো মারা যাওয়ায় মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছিল এল্‌সাকে।

তাঁবু থেকে মাইল দশেক আগে নজরে পড়লো এক অদ্ভুত দৃশ্য। পথের পাশে পাতলা বনের আড়ালে পড়ে আছে এক বাচ্চা হাতির মৃতদেহ। প্যাম্পোর থেকে হয়তো মাসখানেকের বড় হবে সে। কপালের মাঝখানে তার এক বর্শা গাঁথা। ওপরে গাছের ডালে বসে আছে আট-দশটা শকুন। কাজটা যে আদিবাসীদের—বুঝতে আর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। ওদের জাতের এই এক অদ্ভুত নিয়ম। বর্শা ছুড়ে কোনো জন্তুকে শিকার করে মেয়েদের কাছে ওরা বাহাদুরি নেয়। শিকারের সময় বাছবিচার বড় একটা করে না। যে কোনো বয়েসের যে কোনো বন্যজন্তু মেরেই ওদের বীরত্ব।

তাঁবুতে পৌঁছে দেখি, আর এক কাণ্ড। গরু-ভেড়া-ছাগলের পেচ্ছাপ-পায়খানায় আমাদের তাঁবুর চৌহদ্দিটুকু বোঝাই। নোংরার একেবারে একশেষ। তাইতো তাইতো এল্‌সার কিছু হয়নি তো!

বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে ওর গায়ে আবার কেউ বর্শা ফোঁড়েনি তো! নাঃ, মনটা ভালো লাগছে না। এলাম কোথায় প্যাম্পোর দুঃখ ভুলতে, তা এখানেও দুঃখ! দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-দুশ্চিন্তা—এসব ছাড়া কি মানুষ একমুহূর্তও চলতে পারে না!

আদিবাসীদের ওপর নজর রাখতে জর্জ বনের জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে

দিলো তার টহলদার বাহিনীর লোকজনদের। একজন চাকরকে ঘরদোর পরিষ্কার করতে বলে আমি আর জর্জ বেরিয়ে পড়লাম এল্‌সার খোঁজে। কয়েক ঘণ্টা একনাগাড়ে ঘুরে বেড়ালাম, এ-ঝোপ ও-ঝোপ উঁকি মেরে দেখলাম—কিন্তু না, এল্‌সার দেখা পাওয়া গেলো না। নাম ধরে ডাকলাম, জর্জও ডাকলো—তার সাড়া মিললো না।

অগত্যা কি আর উপায়—সাইরেনটাই বাজাই একবার। আগে তো সাইরেনের ভোঁ-ও শুনিয়ে ওকে কতবার তাঁবুতে ডেকে আনতাম।

বাজালাম সাইরেন। দূরে কোথায় যেন এক সিংহ ডাকলো। বাজাতে লাগলাম—ছুটতে ছুটতে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এল্‌সা।

এসেই শুরু হলো হুজ্জুতি। এই আমার পিঠে মুখ ঘষে তো ওই ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় জর্জকে। জর্জ মাটি থেকে উঠতে না উঠতে আমাকে এক ধাক্কা—আমি একেবারে চিৎপটাং।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম—তা গায়-গতরে আরো খানিকটা ভারী হয়েছে এল্‌সা। দুধের বোঁটাগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে। আগেকার সেই কুড়েমির ভাবটা এখন আর নেই। ক্ষিধে-টিধেও ততটা পায়নি। সব মিলিয়ে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে আমাদের এল্‌সা সুন্দরী।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে ঘনালো। রাতের বনভূমি তার বৈচিত্র্যের পসরা সাজিয়ে ধীরে ধীরে মুখর হয়ে উঠতে লাগলো। আর কালবিলম্ব না করে এল্‌সাকে বিদায় জানিয়ে উঠলাম গিয়ে আমাদের গাড়িতে। গাড়ি ছাড়লো।

তাঁবুতে ফিরে দেখি, কোমরে দড়ি-বাঁধা একদল লোক গুটি-সুটি মেরে বসে আছে উঠোনে। টহলদার বাহিনীর লোকেরা রাইফেল উঁচিয়ে জুতোর শব্দ তুলে বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাদের সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

বুঝলাম, এরা আসামী, বনের সংরক্ষিত জীবজন্তু হত্যার অপরাধে অপরাধী। টহলদার বাহিনীর লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে এসেছে।

সে-রাতে তো নয়ই, পরের দিনও এলো না এল্‌সা। ভারী দুশ্চিন্তায় পড়লাম। এ সময় দরকার ওকে চোখে চোখে রাখা। আদিবাসীদের চোখ এড়িয়ে বেঁচে-বর্তে থাকে তো ভালো। যতই বোঝাক জর্জ, ওদের কাজ ওরা করে যাবেই। সুতরাং···

সুতরাং একচমক দেখে আসাই ভালো। জর্জ আর আমি আবার গেলাম সেই পাহাড়ে। চিৎকার করে ডাকলাম—এ-ল্‌-সা···

কোনো সাড়া নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠলাম এক উঁচু জায়গায়। আবার ডাকলাম এলসার নাম ধরে। একটা খসখস শব্দ। নীচের ঝোপটা

হঠাৎ নড়ে উঠলো। এল্‌সা বেরিয়ে এলো ঝোপের আড়াল থেকে। তার সিংহটি এক দৌড়ে অদৃশ্য হলো জঙ্গলের আড়ালে।

মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকালো এল্‌সা, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর মাথা নীচু করে যে পথে তার সিংহ একটু আগে গেছে, সেই পথে পা বাড়ালো। ফিরেও আর তাকালো না আমাদের দিকে।

তা যাবি যা, ওদিকে কেন? ওদিকে আরো খানিকটা দূরে তাঁবু ফেলে রয়েছে একদল আদিবাসী। ওদের হাতে পড়লে…

সুতরাং বসেই রইলাম। অন্তত: সন্ধ্যের আগে আর একবার ওকে দেখে যেতে হবে। নইলে শান্তি নেই।

সন্ধ্যে হলো। একটু একটু করে অন্ধকার জমতে লাগলো আনাচে-কানাচে, গাছ-পাথরের ফাঁকে ফাঁকে। উঠে দাঁড়ালাম পাথরের আসন ছেড়ে। এল্‌সার নাম ধরে ডাকলাম। জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এল্‌সা। আস্তে আস্তে উঠে এলো আমাদের কাছে। একটু অবাক হলাম। তিনজনে গিয়ে উঠলাম গাড়িতে।

সে-রাতটা তাঁবুতেই কাটালো সে। পরদিন ভোর সকালে উঠে দিলো চম্পট।

জর্জ তার বন্দীদের নিয়ে চলে গেল ইসিওলোয়। টহলদার বাহিনীর কয়েকজনকে নিয়ে আমি রইলাম তাঁবুতে।

সন্ধ্যেবেলা মেঘ ডাকলো, বিদ্যুৎ চমকালো। দমকে দমকে শীতল বাতাস বয়ে নিয়ে এলো বৃষ্টির গন্ধ। আঃ, স্বস্তি! আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে, দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে—ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটি ·····এতোদিনে প্রাণমন জুড়োলো। রোদ্দুরের তেজ কমলো, আদিবাসীদের যার যার নিজের ঘর-বাড়িতে ফিরে যাবার সময় হলো। এল্‌সার বিপদও কাটলো। সব দিক থেকেই শান্তি।

তা এল্‌সা নিজেও কম সাবধানী নয়। লোকজন হৈ-হট্টগোল বড় একটা সে পছন্দ করে না। এ ক'দিন তাই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এক পাও নড়েনি। কি টহলদার বাহিনীর লোকজন, কি আদিবাসী—কাউকেই তার পছন্দ নয়, কারুর সামনেই সে বেরোয় না।

পাহাড়ী বৃষ্টি। একবার শুরু হলো তো থামার নাম নেই। চলছে তো চলছেই। শুকনো খটখটে রাস্তাঘাট কাদায় একাকার। এ বৃষ্টি যে না দেখেছে, তাকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না।

দেখতে দেখতে চারপাশে গজিয়ে উঠলো বুনো আগাছার ঝোপ। রঙ-

বেরঙের নাম-না-জানা কত বিচিত্র ফুলের গন্ধে বাতাস হয়ে উঠলো ভারী। কোত্থেকে যেন এসে জুটলো একদল বাবুই পাখী। উঠোনের বিরাট গাছটার ডালে বুনলো তাদের বাসা। সকাল হতে না হতেই কিচিরমিচির কিচিরমিচির। পাখীর ডাকে জেগে ওঠা আর কি!

লাল ঝুঁটিওলা বাবুইগুলোকে দেখতে ভারী সুন্দর। ভয়-ডর তাদের বিন্দুমাত্র নেই। একজোড়া পাখী ঠিক আমাদের তাঁবুর সামনের হেলে-পড়া ডালটায় বুনলো বাসা। দিনের মধ্যে কম করেও বার পঁচিশেক ঘর-বার করি আমরা। ভয় তো দূরের কথা, ভ্রূক্ষেপমাত্র তাদের নেই।

একটি একটি করে ঘাস বা শুকনো ডাল খুঁজে আনতো এক-একজন। ধীরে ধীরে বোনা হতো বাসা। কি নিপুণ ঠোঁটের কাজ! একেবারে ঠাস-বুনন আর কি। অবশ্য বাসা বাঁধার চেয়ে কিচিরমিচির ডাকেই ওদের আনন্দ। মনে মনে ভাবতাম—এতো ডাকাডাকির পরেও বাসা বাঁধার সময় ওরা পায় কোথায়!

একদিন সকালে উঠে দেখি, একটা বাচ্চা-বাবুই বাসা ভেঙে পড়েছে উঠোনে। তার ত্রাহি ত্রাহি চিৎকারে চারদিক মুখর। তাড়াতাড়ি বাসাসুদ্ধ তাকে তুলে দিলাম একটা ডালের ওপর। ভাবলাম, সন্তানের চেঁচামেচি শুনে মা হয়তো এক্ষুণি ছুটে আসবে। কিন্তু কোথায় কি! প্রায় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করেও মায়ের পাত্তা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটা বাসা ভেঙে পড়লো মাটিতে। কি করি, কি করি · হঠাৎ মতলবটা খেলে গেলো মাথায়। তাঁবুর সামনে দড়ি বেঁধে সারি সারি ঝুলিয়ে দিলাম বাসাগুলো। মহোল্লাসে সকলে মিলে শুরু করলো কলকাকলি। যেই না এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারি বাসার ফুটো দিয়ে, অমনি হলদে ঠোঁট করুণ স্বরে ডেকে ওঠে চিঁ চিঁ। বোধহয় বলতে চায়—বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও।

কিন্তু কি-ই বা দিই ওদের খেতে। এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম সন্ধান। তাঁবুর পাশে একটা মস্ত মাটির ঢিপি কার যেন পায়ের ধাক্কায় ভেঙে গেছে। পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে হাজারে হাজারে কাঠ-পিঁপড়ে। রাশিকৃত ডিম। সব ফেলে ওরা পালাচ্ছে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে।

ব্যস্, হয়ে গেলো! চিমটে দিয়ে একটা একটা ডিম তুলে এক একটা বাচ্চার মুখে ফেললাম। একদম ছোট বাচ্চাগুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ঝিনুকে দুধ খাওয়াবার মতো করে ডিম খাইয়ে দিলাম। সকলেরই পেট ঠাণ্ডা হলো। নীরবে-নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো সবাই।

রাতের অরণ্য আমার বরাবরই ভালো লাগে। ভেবে দেখুন—চারপাশে পাহাড়, শ্বাপদসঙ্কুল ঘন বন। মাঝখানে তাঁবুতে একা আমি। রাত একটু ঘন হতে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে বনভূমি। হায়না হাসে, সিংহ ডাকে, বাঘ গজরায়, হাতি চিঁ হিঁ হিঁ শব্দে বন কাঁপায়। আর এসব কিছুকে ছাপিয়ে বেজে চলে ঝিঁঝির একটানা সিম্ফনী—কি মজাদার তাই না!

শুধু এটুকুই নয়, মজা আরো আছে। দূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এক ফাঁকে কে যেন জ্বেলে দিয়ে যায় সারি সারি প্রদীপ। লালচে নয়, বেশ উজ্জ্বল রূপোলী আলো। জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে। ভগবানের এক আশ্চর্য সৃষ্টি জোনাকী। নিরীহ ভালো মানুষ গোছের এই পতঙ্গগুলোর এ এক অদ্ভুত জ্বলা-নেভার খেলা। একটা দুটো নয়—ঝাঁকে ঝাঁকে··· একশো দুশো, দশ হাজার জোনাকী একসঙ্গে কোনো অদৃশ্য নির্দেশে ফস্ করে জ্বলে ওঠে তারপরই আবার নিভে যায়। আবার জ্বলে, আবার নেভে—এমনি ভাবেই চলে সারারাত।

পরদিন জর্জ ফিরে আসার সময় এল্সার জন্মে নিয়ে এলো একটা জেব্রা। কাজ হলো। গাড়ি তাঁবুর সামনে থামতে না থামতে এসে হাজির হলো এল্সা। জেব্রাটা দেখে সে কি আনন্দ তার! এক লাফে গাড়িতে উঠে নিজেই খানিকক্ষণ টানাটানি করলো। শেষমেশ হতোদ্যম হয়ে নেমে এসে করুণ চোখে তাকালো জর্জ-এর সঙ্গী দুজনের দিকে। যেন বলতে চায়—দেখতেই তো পাচ্ছো, পারছি না। এসো না বাপু, অমনভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে একটু হাত লাগাও।

হাসতে হাসতে এগোলো তারা। জেব্রাটাকে নামিয়ে রাখলো মাটিতে। কিন্তু যার জন্মে রাখা, সে তখন গলা তুলে নদীর দিকে তাকিয়ে ডাকতে শুরু করেছে।

ও, এই তাহলে ব্যাপার! সতী-সাধ্বী রমণীর মতো স্বামীকে না খাইয়ে তুমি খাবে না! বেশ, খাওয়াও ওকে। আমরা তাঁবুর ভেতর যাচ্ছি।

পরদিন ২২শে নভেম্বর। রাতে একনাগাড়ে আধঘণ্টা বৃষ্টি হলো। নদীর জল বাড়লো। চিন্তিত হলাম। বেচারা কোথায় কিভাবে আছে—কে জানে! স্রোত ঠেলে এদিকে আসাও তো সোজা কথা নয়।

তা পরদিন সকালে এলো এল্সা। নদী সাঁতরেই এলো। কাছে আসতে দেখলাম, এক পায়ের হাঁটু জখম হয়েছে ওর। নোংরা মুছে ওষুধ লাগিয়ে দিলাম। গুটি-গুটি এল্সা গিয়ে উঠলো আমার বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের কটা দিন কখনো আমাদের সঙ্গে তাঁবুতে, কখনো তার সিংহের সঙ্গে

বনে-পাহাড়ে কাটিয়ে দিলো সে। আমরাও খানিকটা নিশ্চিন্তে রইলাম। একদিন টহল সেরে ফেরার পথে জর্জ তার জন্যে নিয়ে এলো একটা ছাগল। অন্য সময় হলে টানতে টানতে ছাগলটাকে নিয়ে সে যেতো জর্জ-এর তাঁবুতে। কিন্তু সেদিন আর টানাটানির মধ্যে গেলো না। সন্ধ্যে হতেই নদীর দিকে মুখ করে ডাকতে লাগলো বারবার। প্রত্যুত্তরে ওদিক থেকে ভেসে এলো তার সিংহের ডাক। ঝপাং করে নদীতে একটা শব্দ—সাঁতরে সে এলো এদিকে। তারপর সারারাত ধরে চললো দুজনের ভোজপর্ব।

তা চলুক, আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁবুর এতো কাছে বসে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকোনোটা অন্ততঃ আমাদের পক্ষে খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। একা এল্‌সা হলে অবশ্য অন্য কথা কিন্তু সুগ্রীব দোসর ··

সুতরাং পরদিন সন্ধ্যায় তাঁবু থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে এলাম মাংস। সে-রাতেও খুব তৃপ্তির সঙ্গে দুজনে মিলে আহারপর্ব সারলো।

মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। ভ্যালারে মজা! কোথাকার কে—রোজ রোজ তার জন্যে রেখে দিতে হবে খাবার! এল্‌সার কথা স্বতন্ত্র। তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাছাড়া, তার সিংহ-মহারাজের সাহসও দিন দিন বাড়ছে। পাহাড় ছেড়ে নদী ডিঙিয়ে সে উঠোন অবধি আসতে শুরু করেছে। কখন গটমট করে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে—বলা যায় না।

তবে একটা সান্ত্বনা এই—যা-ই করুক সে, আমাদের বিরুদ্ধে চট করে কিছু একটা করতে সাহস পাবে না। চোখের আড়ালে থেকে এ ক'দিনে আমাদের গতিবিধি সে একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছে। আমাদের সঙ্গে এক অলিখিত সন্ধিও তার হয়ে গেছে। সন্ধির শর্ত হিসেবে রোজ নিয়মিত খানিকটা মাংসের ভেট পেলেই সে শান্ত।

তা কি আর করা যায়! এল্‌সাকে চোখে চোখে রাখার জন্যে এই খেসারতটুকু নির্বিকারচিত্তে স্বীকার করে নিলাম।

একদিন বিকেলে বেড়াতে বেরোলাম এল্‌সাকে নিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের ওপর এক ফাঁকা জায়গায় চলে এলাম। এদিকটা বেশ নির্জন। আশেপাশে ঝোপ-ঝাড় বা বন নেই। যাকে বলে—একেবারে অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।

একপাশে পড়ে আছে এক বিরাট পাথরের চাঁই। মাঝখানে বলয়াকৃতি এক ফাটল। চাঁইটার কাছে এগিয়ে গিয়ে চারপাশে ঘুরে ঘুরে কি যেন শুঁকলো এল্‌সা, এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে নাক কোঁচকালো। বুঝলাম, গোলমেলে কিছু একটা আছে ওখানে। কি আছে দেখার জন্যে দু' পা এগিয়েছি

ফোঁস করে এক শব্দ। নিমেষে কোমরের খাপ থেকে পিস্তল বের করে রুখে দাঁড়ালো জর্জ, আমিও দাঁড়ালাম। ফাটলের আড়াল থেকে সমানে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন মহাপ্রভুটি—বিরাটাকৃতির এক গিরগিটি।

বাপরে বাপ! এতো বিরাট গিরগিটি এর আগে কখনো দেখিনি। মাথা থেকে লেজ অবধি পাঁচ ফুট তো হবেই। চওড়ায় প্রায় ফুট খানেক। রাগে-ক্রোধে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলো সে। শরীরটা ফুলে উঠলো বেলুনের মতো। লেজের ঝাপটায় মনে হলো, পাথরটা বুঝি ফেটেই যাবে। সরু লিকলিকে জিভ দাঁতের ফাক দিয়ে একবার বেরোলো, একবার ঢুকলো। তা রকম-সকম দেখে এল্‌সা তো হতবাক। এক পা দু'পা করে পেছোতে পেছোতে সে এসে দাঁড়ালো আমাদের গা ঘেঁষে। মনে মনে খুব একচোট হাসলাম। বেচারা বাচ্চা পেটে নিয়ে একেবারে ভীতুর শিরোমণি হয়ে উঠেছে। ঐ হতভাগা গিরগিটিটার হম্বিতম্বিই সার। সাহস বা শক্তি ওর বিন্দুমাত্র নেই। এল্‌সাকে দেখে নিজেই গেছে ঘাবড়ে। আত্মরক্ষার জন্যে লেজ-টেজ আছড়ে ওকে মস্ত ভয় দেখাচ্ছে।

ফেরার পথে এল্‌সার পাহাড়ী আস্তানার ঠিক ওপরকার এক বিরাট পাথরের ওপর উঠলাম। পেছনে অস্তায়মান সূর্যের রক্তাভায় রঞ্জিত দিগন্তপ্রসারী আকাশ—এল্‌সা দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে। ক্যামেরা সঙ্গে ছিল। দেরী না করে পর পর খানদশেক ছবি তুললাম। একটুও নড়লো না সে। পাকা অভিনেতার মতো বীরোচিত ভঙ্গিতে একভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। ছবি তোলা শেষ করে ফিরবো বলে সবে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ নীচের কোনো এক ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে এলো তার প্রিয়তমের ডাক। ব্যস্‌, এক ডাকেই খেল খতম। তারতর করে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে তার ডাক লক্ষ্য করে দৌড়লো এল্‌সা।

পরের কয়েকটা দিন কালে-ভদ্রে এল্‌সার দেখা পাওয়া গেলো। কখনো আধঘণ্টা, কখনো এক ঘণ্টার জন্যে এলো সে তাঁবুতে, তারপরই আবার চলে গেলো। বুঝলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে কর্তাটি তার বসে থাকে ধারে-কাছে কোনো ঝোপের আড়ালে। এল্‌সা তাঁবু থেকে বেরোলে এগিয়ে এসে সে তাকে সঙ্গ দেয়।

পয়লা ডিসেম্বর সকালের দিকেই চলে এলো এল্‌সা। সেদিন আর এক-আধ ঘণ্টা নয়, সারাটা দিন কাটালো আমাদের সঙ্গে। বিকেলের দিকে জর্জ আর আমার সঙ্গে বেরোলো সান্ধ্যভ্রমণে।

হাঁটতে হাঁটতে তিনজন এলাম এক পুকুরের কাছে। পুকুর অবশ্য এটা নয়,

বৃষ্টির জল জমে জমে পুকুরের চেহারা ধরেছে।

সে যা-ই হোক, বসলাম পুকুরের ধারে। এল্‌সা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। আমি তন্ময় হয়ে চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ জোরে শিস দিলো জর্জ। চমকে ফিরে তাকালাম। দেখি হেলতে-দুলতে একপাল মোষ এগিয়ে আসছে পুকুরের দিকে। পেছনে আসছে তাদের বাচ্চারা। হয়তো এটাই তাদের জল খাবার জায়গা।

এল্‌সাও ততক্ষণ দেখে ফেলেছে তাদের। এক ঝটকায় উঠে সামনের দু' পায়ে ভর করে গুড়িসুড়ি মেরে বসলো সে। ভাবখানা এমন, যেন এখনই এক লাফে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেবে সবকটাকে নিকেশ করে।

আরও কয়েক পা এগিয়ে এলো মোষগুলো। শেষবারের মতো নিজের অবস্থিতিটা খতিয়ে নিলো এল্‌সা। তারপরই দিলো এক লাফ।

ব্যস্‌, আর দেখে কে! হুড়োহুড়ি, ধস্তাধস্তি, ছোটাছুটি—সব মিলিয়ে যাকে বলে এক সত্যিকারের লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

বন-বাদাড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লো মোষের দল, এল্‌সা ছুটলো তাদের পেছন পেছন।

কি কাণ্ড আবার বাধিয়ে বসে··· আমরাও ছুটলাম। নাম ধরে বারবার ডাকলাম, ফিরে আসতে বললাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ফেরানো কি সম্ভব! রোখ চেপেছে তার। অসুস্থ শরীর নিয়েও ঐ মস্তসস্ত চেহারার দস্যুগুলোর সঙ্গে একবার না যুঝে সে ছাড়বে না।

একটু এগিয়ে দেখি, একটা ঝোপের মাত্র হাত পাঁচেক তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে এল্‌সা, ঝোপটা নড়ছে, ঝোপের গাছপালার শাসন ডিঙিয়ে দুটো মস্ত সিং উঁচু হয়ে আছে।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঘটলো এক কাণ্ড। প্রচণ্ড আলোড়নে ঝোপটাকে নাড়িয়ে বেরিয়ে এলো সেই মহারাজ, এল্‌সাকে লক্ষ্য করে শিং ছুঁড়লো। জর্জ আর ম্যাকেদ গেলো সেদিকে। হাততালি দিলো, তাড়া দিলো, ভ্যাবাচাকা খেয়ে মোষটা পেছন ফিরে দে ছুট। এল্‌সাও শান্ত মেয়েটির মতো ফিরে এলো আমার কাছে।

তাঁবুতে ফেরার পথে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে এলাম। নাঃ, কোথাও আর মোষের দলের চিহ্নমাত্র নেই। বাঁচা গেলো।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে জর্জ বেরোলো তার দলবল নিয়ে টহলদারীর কাজে। এবার অনেক দূরে যেতে হবে তাকে। ফিরতে তিন-চারদিন লাগবে।

তিনটে দিন এল্‌সা আর তাঁবু ছেড়ে বেরোলো না। সন্ধ্যে রাত হলেই সিংহ এসে ডাকাডাকি শুরু করতো। প্রত্যুত্তরে একটা সাড়াও দিতো না সে। তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি এল্‌সাকে নিয়ে, নদীর কাছাকাছি আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। ওপারের একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ডাকলো। প্রত্যুত্তরে ওপার থেকে সাড়া দিলো তার সিংহ। সাঁতরে নদী পার হয়ে চলে গেলো এল্‌সা।

একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। দেখো কাণ্ড! এখন যদি দুজনে এসে হাজির হয় আমার কাছে, খাবার চায়—আমি তো নিরুপায়। একফোঁটা মাংসও মজুত নেই ঘরে। কি করি!

তা সে-রাতটা নিরুপদ্রবেই কাটলো। পরদিন সকালে ফিরে এলো জর্জ। সঙ্গে সে এবার এনেছে একজোড়া ছাগল।

বর্ষাকালে পাহাড়ী এলাকায় এক নতুন বিপদ দেখা দেয়। মাংস এনে ঘরে রেখে দিলে চব্বিশ ঘণ্টা পরেই তাতে পচন ধরে। এদিকে রোজ রোজ বৃষ্টি-বাদল অগ্রাহ্য করে শিকার মেরে আনাও অসম্ভব। অগত্যা মাথা খাটিয়ে এক মতলব ঠাওরালাম। তাঁবুর অদূরে এক গাছের ডালে পাতা-টাতা দিয়ে ভালোভাবে মুড়ে শিকার ঝুলিয়ে রেখে দিতে শুরু করলাম।

ফল পাওয়া গেলো। একদিন কেন, সাতদিনেও কিছু হতো না মাংসের। এল্‌সা বা তার সিংহ এলে কেটে খানিকটা দিয়ে দিতাম তাদের। সব দিক থেকেই শান্তি।

একদিন সকালবেলা বেড়িয়ে এসে ঢুকছি স্টুডিওয়, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। একটা বুড়ো গিরগিটি লেজে ভর দিয়ে মাথা তুলে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে মাংসের ঝুলন্ত বস্তাটার দিকে।

শব্দ করে কাশলাম। অমনি লেজ গুটিয়ে সে দে চম্পট।

মনে মনে খুব একচোট হাসলাম। এই তো তোমাদের সাহসের বহর বাপু! এই সাহস নিয়েই সেদিন এল্‌সাকে ভয় দেখাচ্ছিলে। সাব্‌-বাশ!

একটু সরে গিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরেই আবার ফিরে এলো সে। এবার আর একলা নয়—সঙ্গে এসেছে তার ছেলে। উদ্দেশ্য, আমি যদি কিছু করি—দুজনে মিলে আমাকে তাহলে মজা দেখাবে।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এলো তারা। বস্তার কাছে এসে লেজে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর আছড়ে পড়লো বস্তার ওপর।

বেশ কয়েকবার চললো এই আছড়ে-পড়া পর্ব। পরম পরিতৃপ্তি সহকারে

খেলো তারা। নিঃসাড়ে আমি বেরিয়ে এলাম আমার গোপন জায়গা থেকে। এক পা এগিয়ে গিয়ে হাততালি দিলাম। বস্তা ছেড়ে ধপ করে মাটিতে পড়লো তারা, স্থির সম্মোহনী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর আমার তরফ থেকে কোনো রকম বিপদের সম্ভাবনা না দেখে আবার লেজে ভর করে উঠে দাঁড়ালো, আবার আছড়ে পড়লো বস্তার গায়ে।

॥ ২ ॥

দেখতে দেখতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হলো। আর খুব একটা দেরী নেই। দিন সাতেকের মধ্যেই বাচ্চা হবে এল্‌সার।

আগের চেয়ে আরো ভারী হয়েছে সে। নড়তে-চড়তে বেশ কষ্ট হয়। ওর জীবনধারণ পদ্ধতি যদি বনের আর পাঁচটা সিংহীর মতো হতো, তাহলে হয়তো এতোটা হতো না। স্বাভাবিক নিয়মে খানিকটা ছুটোছুটি করে হাত-পা খেলিয়ে ও হয়তো আরো সতেজ-সজীব থাকতো। এতোটা কাবু হয়ে পড়তো না।

সে যা-ই হোক—যা হয়নি, তা নিয়ে মাথাব্যথা নিরর্থক। আছি যখন কাছে, হাত-পা খেলানোর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। সুতরাং, রোজ বিকেল-বেলা নিয়ম করে ওকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া শুরু করলাম।

একটা নতুন ভাবনা এসে ভর করলো মাথায়। আচ্ছা, প্রসবের জন্যে কোন্ জায়গা বেছে নেবে এল্‌সা? যদি আমাদের তাঁবুতেই বাচ্চা হয়⋯ ⋯

জর্জকে বলে রাশীকৃত বই-পত্র আনালাম লাইব্রেরী থেকে। রাত জেগে একের পর এক সব পড়ে ফেললাম। বাচ্চা হলে কি করা উচিত, কি উচিত নয়—সব একেবারে কণ্ঠস্থ হয়ে গেলো। বাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার জন্যে একটা বোতল, এক টিন গ্লুকোজ এবং এক কৌটো দুধও আনিয়ে রাখলাম। বাচ্চাকাচ্চার সেবাযত্নের ব্যাপারে জ্ঞানগম্যি আমার একেবারেই নেই। ভয়ে-দুশ্চিন্তায় থাকি তাই জড়সড় হয়ে। ঘোরাফেরা করি, কাজকর্ম করি আর ভাবি—পারবো তো, পারবো তো সব সামলাতে!

সময় সুযোগ পেলেই এল্‌সার পেটে হাত দিতাম। দেখতাম, কোনো নড়া-চড়া টের পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কোথায় কি—একেবারে নট নড়ন-চড়ন! তবে কি আমরা তারিখ হিসেব করতে ভুল করলাম!

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি আর জর্জ চলে যেতাম

অনেক দূর। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের জলপ্রপাতগুলো এক আশ্চর্য মনোহর রূপ ধারণ করে। এল্‌সা আমাদের সঙ্গে আসতো না। গাড়ির ছাদে শুয়ে ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকতো আমাদের গমন-পথের দিকে।

এদিকে, তার সিংহ বেচারা রোজ রাতে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে ডাকের মহড়া দিয়ে যেতো। এল্‌সা ভ্রূক্ষেপও করতো না। গুটিসুটি মেরে বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতো।

এল্‌সার এরকম ব্যবহার একদিক থেকে খুবই ভালো। কোথায় যাবে বনে-বাদাড়ে—তার চেয়ে বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত থাকুক আমাদের কাছে। কিন্তু আবেক দিক থেকে দেখলে বিপদও একটা আছে। সে বেচারা ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে শেষমেশ তাঁবুতে ঢুকেই না হামলা বাধায়। সুতরাং .....

সুতরাং এল্‌সাকে একলা রেখে দিন তিনেক ইসিওলো থেকে ঘুরে আসাই সমীচীন। পরদিন সকালে উঠে রওনা দিলাম। ফিরলাম ষোলোই ডিসেম্বর।

ফিরে দেখি, তাঁবুর দরজায় আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে এল্‌সা। মুখ-চোখ শুকনো। হয়তো এই তিনদিনে তার খাবার বলতে কিছুই জোটেনি। আসার পথে মেরে আনা একটা ছাগল খেতে দিলাম তাকে। বুভুক্ষুর মতো পুরো ছাগলটাই বসে বসে খেলো সে। দু' দিন তাঁবু ছেড়ে বেরোলো না। তৃতীয় দিন অন্ততঃ বার পাঁচেক নদীর পারে গিয়ে ওপারের তার সেই প্রিয় পাহাড়টার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখলো। আবার ফিরে এলো তাঁবুতে।

আঠারোই ডিসেম্বর রাতটা কাটালো এল্‌সা আমার বিছানায়। বুঝলাম, সময় যতো এগিয়ে আসছে, আস্তে আস্তে ততো ঘরকুনো হচ্ছে এল্‌সা।

পরদিন একরকম জোর করেই আমাদের সঙ্গে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। হাঁটতে গিয়েই হলো যতো মুশকিল। দু' পা হাঁটে তো শুয়ে পড়ে মাটিতে, হাঁফায়। এক নাগাড়ে হাঁটার সামর্থ্য আর ওর নেই। শরীর ক্রমশঃই অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে কোনো লাভ নেই। ফেরার পথ ধরলাম। আমাদের সঙ্গে কয়েক পা এলো এল্‌সা। তারপর হঠাৎ গতি পরিবর্তন করে পাহাড়ের দিকে এগোলো।

সে-রাতে আর ফিরলো না সে। সকালে উঠে পাহাড়ের দিক থেকে তার চাপা অথচ করুণ ডাক শুনে তাড়াতাড়ি রওনা দিলাম। হয়তো এতোক্ষণে বাচ্চা হয়েছে এল্‌সার, হয়তো এসময় আমাদের সাহায্য তার দরকার।

আঁতিপাতি করে খুঁজলাম সম্ভাব্য জায়গাগুলো। কিন্তু কোথায় কি!

এল্‌সার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও!

বিকেলে আবার বেরোলাম। এবার সঙ্গে দুরবীন নিয়ে এসেছে জর্জ। ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় সে থামলো। আমার হাতে দিলো দুরবীন। দেখি, এক বিরাট পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এল্‌সা। পেটটা তার তেমনি ভরাট। বাচ্চা তাহলে হয়নি এখনো। জায়গাটা ভালোভাবে চিনে রাখার জন্যে এগিয়ে গেলাম। আমাদের দেখে এল্‌সা পাথরের ওপর থেকে নামলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। বুঝলাম, হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। হয়তো প্রসব-বেদনাও উঠেছে। না হলে ঘাড় ঘুরিয়ে বারবার পেট চাটছে কেন সে!

কাছে আসতে দেখলাম, অনুমান আমাদের সঠিক। ওর পেছনের পা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে ফিকে লাল রঙের রক্ত, মুখের রেখায় সুস্পষ্ট বেদনার ছাপ।

ম্যাকেদের সামনে এসে থামলো এল্‌সা। তার পায়ে মুখ ঘষলো। তারপর পরম ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লো মাটিতে।

পাশে বসে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলো সে। তারপর উঠে এগোলো পাহাড়ের কিনারা বরাবর।

বুঝলাম, এলসা চাইছে এখন একাকী থাকতে। এসময় আমরা থাকা মানেই তার বিরক্তির কারণ হওয়া। সুতরাং ফেরার পথ ধরলাম। কিছুদূর গিয়ে দুরবীনে চোখ রেখে আবার ফিরে তাকালাম। দেখি, পাথরের চাঁইটার ওপর শুয়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছে সে, পায়ের কাছটা চাটছে। এভাবেই চললো কিছুক্ষণ। হঠাৎ সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর খাড়াই বেয়ে নেমে ঘন জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

নাঃ, এ সময় আমাদের করণীয় আর কিছুই নেই। সুতরাং ফিরে চললাম। খানিক দূর এগিয়ে শুনি, তার সিংহ একতরফা ডাকাডাকি করছে। যার জন্যে এতো ডাক—সেই এল্‌সার কোনো সাড়া নেই।

সে-রাতটা এক রকম জেগেই কাটালাম। একের পর এক দুশ্চিন্তায় মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। শেষ রাতের দিকে দুশ্চিন্তা শতগুণ করে বড় বড় ফোঁটায় নামলো বৃষ্টি।

ভোরের দিকে বৃষ্টিটা একটু ধরতে জর্জ আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। এল্‌সার সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পেঁছিলাম গিয়ে সেই পাহাড়ের কাছে। এই পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে নেমেই এল্‌সা কাল জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিল।

আশেপাশে খুঁজলাম অনেক—এল্সার দেখা পাওয়া গেলো না। সেদিনের সেই মরা ছাগলটা পড়ে আছে একপাশে, পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এল্সার সিংহ টানতে টানতে এতোদূর অবধি হয়তো ছাগলটাকে নিয়ে এসেছিল এল্সার জন্যে, কিন্তু এল্সা তা মুখেও তোলেনি।

কি করি, কি করি ··ভারী দুশ্চিন্তায় পড়লাম। বাচ্চা হবার পর সিংহীরা সাধারণতঃ কারুরই কাছে ঘেঁষা পছন্দ করে না। এমনও শোনা যায়, মনের চরম বিরক্তিতে কোনো কোনো মা নিজের বাচ্চাদের মেরে ফেলে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে মনের কৌতূহল মনেই নিবৃত্ত করলাম। এল্সার খাদ্য হিসেবে জর্জ একটা চিতল হরিণ মেরে রেখে এলো সেই বিরাট পাথরটার ওপর।

সে-রাতটাও প্রায় বিনিদ্র কাটলো। এল্সার সিংহ এসে তাঁবুর চার পাশে ঘুরে ঘুরে খুব একচোট হাঁক-ডাক করে ফিরে গেলো। সকালে উঠে দেখলাম, তাঁবুর অনতিদূরে তার জন্যে রেখে যাওয়া খাবার অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। সে চলে গেছে সেই পাহাড়ের দিকে।

তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোলাম। পাথরের চাঁইটার কাছে গিয়ে দেখি, কালকের সেই চিতল হরিণটা নেই। টানতে টানতে সেটাকে সে নিয়ে গেছে অনেক দূর। হয়তো কোনো ঝোপের আড়ালে বসে পরমানন্দে এখনও সারছে তার নৈশাহার পর্ব। এসময় আমরা যাওয়া মানেই তার বিরক্তির কারণ।

ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ব্রেকফাস্ট ততক্ষণে তৈরী। বসে গেলাম ঘাসের ওপর। খেতে খেতে অভ্যাসবসে দুরবীনে চোখ রেখে দেখি, দূরে এক জায়গায় চক্কর দিয়ে উড়ছে একপাল শকুন, নজর তাদের মাটির দিকে। কি আছে ওখানে, কি থাকতে পারে! চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে উঠলাম। শকুনের অবস্থিতি অনুসরণ করে এগোতে গিয়ে দেখি—ও হরি! এ তো সেই সিংহের হরিণ টেনে এগোবার পথ।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সন্তর্পণে আরো খানিকটা এগোলাম। দুরবীনে চোখ রাখলাম। দেখি, চিতল হরিণটা পড়ে আছে ভূ-শয্যায়। কাল যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনই আছে। সিংহ তার এক ইঞ্চি মাংসও খায়নি। এতোক্ষণ হয়তো শিকার আগলে বসে ছিলো এল্সার অপেক্ষায়। এল্সা এলো না দেখে বিরক্ত হয়ে শকুনের হাতে হরিণের দায়িত্ব অর্পণ করে উঠে চলে গেছে। কিংবা কাছাকাছি কোথাও বসে নজর রাখছে হরিণের ওপর।

এগোলাম আরো খানিকটা। ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে সরু পথ। কয়েক

পা গিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি পেয়ে বসলো আমাকে। মনে হলো, কেউ যেন খুব কাছ থেকে সতর্ক-সজাগ দৃষ্টিতে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে যাচ্ছে। একটা ঘন ঝোপের পাশ কাটাতে গিয়ে অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হলো। ঝোপের ওপাশ থেকে ভেসে এলো এক ক্রুদ্ধ গর্জন এবং তারপরই একটা সরসর শব্দ—এল্‌সার সিংহ এতোক্ষণ ঝোপের আড়ালে বসে শিকারের ওপর নজর রাখছিল। আমাদের উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে চলে গেলো।

আর এগোলাম না সেদিন।

একটা বুনো শুয়োর মেরে তিন জায়গায় রেখে এলাম তার তিন তাল মাংস। ফিরে এলাম তাঁবুতে।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি, মাংসের ছিটেফোঁটাও কোথাও পড়ে নেই। হায়না এসে তার সদ্গতি করে গেছে।

খুঁজতে খুঁজতে দেখি, নদীর পাশে সিংহটার একসার পায়ের ছাপ। কিন্তু না, এল্‌সার ছাপ কোথাও নেই। অথচ হিসেবমতো এখানে আসা তার উচিত ছিলো। বৃষ্টি কদিন ধরে হচ্ছে না। পাহাড়ী নদীগুলো শুকিয়ে খটখট করছে। এ অবস্থায় তেষ্টা মেটাতে জল খেতে আসার একমাত্র জায়গা এই নদী। কিন্তু নদীতেও আসেনি এল্‌সা। ব্যাপারটা কি!

ফেরার পথে সেদিনও খানিকটা মাংস রেখে এলাম সেই বিরাট পাথরটার ওপর। তাঁবুর কাছেও রাখলাম কিছুটা। সকালে উঠে দেখি, তাঁবুর কাছের মাংস এল্‌সার সিংহ এসে খেয়ে গেছে। পাথরের ওপরের মাংসটুকু গেছে হায়নার পেটে। এল্‌সা যথারীতি বেপাত্তা।

এক, দুই, তিন, চার—হুঁ, চারদিন পুরো হলো—এল্‌সার দেখা নেই। কোথায় আছে, কেমন আছে—কে জানে! বাচ্চা হ্যাঁ, বাচ্চা নির্ঘাত হয়েছে। হয়তো কুড়ি তারিখেই হয়েছে। কিন্তু কোথায় আছে তারা, কেমন আছে!···

চব্বিশে ডিসেম্বর। জর্জ বেরিয়ে গেছে একটা ছাগল মেরে আনতে। আমি মনের দুঃখে বসে বসে খ্রীস্টমাস-ট্রি সাজাচ্ছি। দুঃখের কারণ—এল্‌সা। গত বছর এই দিনটিতে সে কাছে কাছে ছিলো, এবার নাই। মন কিভাবে ভালো থাকে—বলুন!

অথচ এবারকার উৎসব অন্যান্য বারের তুলনায় ভালো হবারই কথা। বহুদিনের সাধ আমার চুমকি-বসানো খ্রীস্টমাস-ট্রি। জর্জ শহর থেকে এবার তাই-ই নিয়ে এসেছে। গাছের অভাবে কখনো কখনো চুমকির সুতো ঝুলিয়ে দিয়েছি সিলিং থেকে, কখনো বা থালায় বালি রেখে তারই ওপর বসিয়ে দিয়েছি

মোমবাতি। এবার এসব ফাঁকি-টাকি নয়, একেবারে খোদ চুমকি-বসানো খ্রীস্টমাস-ট্রি। আনন্দ তো এবার বেশি হবারই কথা।

উঠোনটাকে যতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে সাজিয়ে ভেতরে গেলাম। পোশাক পালটে জর্জ, ম্যাকেদ, নুরু, ইব্রাহিম, ফাইফরমাশ খাটার সেই টোটো-ছোকরা এবং আমাদের পাচক ঠাকুরটির জন্যে আনা উপহারের জিনিসগুলো নিয়ে এলাম বাইরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে আনা দুধের টিন এবং খুচরো পয়সার ব্যাগটাও ঐসঙ্গে নিয়ে এলাম।

এসব করতে করতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। মোমবাতি কটা জ্বালিয়ে দিলাম। একে একে সকলে এসে হাজির হলো আমাদের উৎসব প্রাঙ্গণে। সকলেই যে যার ভালো জামাকাপড় পরে এসেছে, অবাক চোখে দেখছে সব সাজসজ্জা। এর আগে এই ধরনের উৎসব তারা আর কোনো দিন দেখেনি। অন্ধকারে চুমকিগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। সমগ্র পরিবেশ মুহূর্তে এক সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করলো। যীশুর পবিত্র জন্মলগ্নের কথা স্মরণ করে মনে এক আশ্চর্য পুলক অনুভব করলাম। উপস্থিত সকলকে বললাম এই উৎসবের তাৎপর্য। উপহার বিতরণের পালা শেষ হলো। এল্‌সার নাম করে সকলকে তিনবার আওয়াজ দিতে বললাম। বন কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠলো—'এল্‌সা কি—জয়।'

একটা কান্না যেন দলা পাকিয়ে রইলো গলার কাছে, বেদনার এক ক্ষীণ প্রবাহে বুকটা যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল। এল্‌সা··আমার আদরের এল্‌সা·· বেঁচে আছে তো! আচ্ছা দেখা যাক—হাতের কাছে পরীক্ষা করার জিনিস তো মজুত। দেখি, কি ফল দাঁড়ায়।

পাচককে তাড়াতাড়ি পুডিংয়ের থালাটা নিয়ে আসতে বললাম। নিজে গিয়ে নিয়ে এলাম ব্র্যাণ্ডির বোতল। থালা আনতে পুডিংয়ের ওপর ব্র্যাণ্ডি ছড়িয়ে দেশলাই জ্বেলে দিলাম। গলগল করে ধোঁয়া উঠলো। সেদিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম—নাঃ, ধোঁয়াটা নীল রঙের নয়!

তার মানে, এল্‌সা এখনও জীবিতই আছে। কিন্তু কোথায় আছে সে, কেমন আছে! বাচ্চারাই বা কেমন আছে তার!

রাতের খাওয়াটা তেমন জমলো না। জর্জ নিয়মমাফিক একটা মরা ছাগল উঠোনের গাছের ডালের সঙ্গে একটু উঁচু করে ঝুলিয়ে রাখলো। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অন্ততঃ আজকের এই উৎসবের দিনে এ খাবারের মালিক একমাত্র এল্‌সা। সে যদি আসে, তাহলেই দড়ি ঝুলিয়ে খাবার নামিয়ে দেওয়া হবে। আর কেউ এলে তাকে ফিরে যেতে হবে।

আর কারুর খবর জানি না, তবে একজন এলো। তাঁবুর চারদিকে ঘুরে ঘুরে

এল্সার উদ্দেশ্যে সে অনেকক্ষণ ধরে হাঁকডাক করলো। তারপর বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো।

আজ পঁচিশে ডিসেম্বর। সকালে উঠে যথারীতি বেরোলাম এল্সার অনুসন্ধানে। নদী পেরিয়ে গেলাম পাহাড় অবধি। পাথরের আনাচে-কানাচে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবার একচোট খুঁজলাম। অবশেষে যথারীতি হতোদ্যম হয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোলাম। নতুন আশায় বুক বেঁধে আবার খুঁজে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। ভয়-ডর ত্যাগ করে ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু হা হতোঽস্মি! এবারও যথারীতি নিরাশ হতে হলো।

ক্লান্ত শ্রান্ত বেদনাহত চিত্তে ফিরে এলাম তাঁবুতে। পা যেন আর চলছিল না। নিজের অলক্ষ্যে বারবার চোখের পাতা জলে ভারী হয়ে উঠেছিল। দেহটাকেই টানতে টানতে নিয়ে এলাম তাঁবুতে, মন পড়ে রইলো পাহাড়ে-জঙ্গলে।

দুপুরের খাবার সাজিয়ে বসেছি উঠোনের টেবিলে। সাদামাটা খাবার। চুপচাপ খাচ্ছি। হঠাৎ বাঁদিকের ঝোপটা নড়ে উঠলো। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি

দেখি, এল্সা এসেছে। তিন লাফে এগিয়ে এসে সে এক ধাক্কায় টেবিল উলটে দিলো, আমাকে আর জর্জকে মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী করলো, তারপর নিজেও শুয়ে পড়লো মাটিতে।

হৈচৈ পড়ে গেলো চারদিকে। এল্সা এসেছে -- এল্সা এসেছে! আশে-পাশের সকলে ছুটে এলো। কাউকে ছেড়ে কথা বললো না এল্সা। এক এক ধাক্কায় এক-একজনকে ভূতলশায়ী করে তার আনন্দের বহরটা জানিয়ে দিলো।

কি ভালোই যে লাগছিল! এতদিন পর আবার এল্সাকে দেখলাম, কাছে পেলাম। এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে!

তার শরীরের সেই ঢিলে-ঢালা ভাবটি আর নেই। আগের মতো সুন্দর-সাবলীল চেহারা আবার ফিরে পেয়েছে এল্সা। দুধের বোঁটাগুলোয় টান ধরেছে, বোঁটার চারদিকে দু ইঞ্চি পরিমাণ কালচে রঙের গোল দাগ। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে একটা বোঁটায় একটু চাপ দিলাম, এক ফোঁটা দুধও বেরোলো না। জর্জ তাড়াতাড়ি এনে দিলো খানিকটা মাংস, নিমেষে সবটুকু উদরস্থ করে ফেললো এল্সা। মনে মনে নানারকম কথা ভাবলাম—এই ভরদুপুরে রোদের এতো তাপ সহ্য করে এল্সা এলো কেন? আসলে ব্যাপারটা কি এই, এ সময় বাচ্চাদের একলা ফেলে রেখে আসা নিরাপদ—তাই সে

এলো! বুকেই বা এক ফোঁটা দুধ নেই কেন তার! এইমাত্র কি ও বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে এলো! অথবা···অথবা বাচ্চারা কি ইতিমধ্যেই মরে গেছে! দুধ কি সেজন্যেই আর নেই!

একতরফা প্রশ্ন। উত্তর পাবার আশা নেই। আর উত্তর যার দেবার কথা, সেই এল্‌সা তৎক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সেরে এক গামলা জল খেয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেছে নদীর দিকে, বালির ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেছে।

আহা বেচারা! হয়তো কত দিন ঘুমোয়নি, কত দিন কিছু খায়নি! ঘুমোক। এ সময় ওকে বিরক্ত করাটা ঠিক নয়।

গিয়ে ঢুকলাম তাঁবুতে। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই চোখে নামলো শান্তির ঘুম। ঘুম ভাঙলো তিনটে নাগাদ। ধড়মড়িয়ে উঠে বাইরে এসে দেখি—এল্‌সা নেই, চলে গেছে।

পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে গিয়ে পেঁছিলাম পাহাড়ে। ফল হলো না কিছু। চারপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও এল্‌সার দেখা মিললো না। তবু অন্যান্য দিনের মতো ততটা খারাপ হলো না মন। এল্‌সাকে নিয়ে আর আমাদের দুশ্চিন্তা নেই। সে আছে, বেঁচে আছে—বেশ বহাল তবিয়তেই আছে।

রাত একটু গভীর হতে শুনলাম তার সিংহের গর্জন। একতরফা ডেকে চললো সে, এল্‌সা সাড়া দিলো না।

এখন যেটুকু চিন্তা, তা তার বাচ্চাদের নিয়ে। কেমন আছে বাচ্চারা, মায়ের দুধ খেয়ে পেট ভরছে তো তাদের! চিড়িয়াখানার এক উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, গৃহপালিত সিংহীদের বাচ্চা হয় সাধারণতঃ অস্বাভাবিক। মায়ের দুধ পায় না তারা। ফলে জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। এল্‌সার এক বোনের বাচ্চাদের অবশ্য এমনই হয়েছিল। তারা বাঁচেনি। এল্‌সার বাচ্চা – তারাও কি বাঁচবে না!

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হলো খোঁজ। ডালপালা সরিয়ে পাথর উলটে আগাগোড়া জায়গাটা প্রায় চষে ফেললাম। ফল হলো না কিছু।

বিকেলে গেলাম আবার। আরো এক দফা খোঁজাখুঁজি হলো। এবারও যথারীতি নিষ্ফল হতে হলো। দেখা পেলাম না কারুর।

সন্ধ্যে নাগাদ তাঁবুর দিক থেকে এলো ফাঁকা আওয়াজের শব্দ। বুঝলাম, আমাদের নির্দেশমতো ইব্রাহিম আওয়াজ করে জানিয়ে দিলো, এল্‌সা তাঁবুতে ফিরেছে।

তাড়াতাড়ি ছুটলাম তাঁবুর দিকে। গিয়ে দেখি, সত্যি সত্যিই এসেছে

এল্সা। আমাদের দেখে দৌড়ে এসে হাতে মুখ ঘষতে লাগলো সে। দুধের বোঁটা তার তখনও শুকনো, ছোট হয়ে গুটিয়ে রয়েছে। ইব্রাহিম অবশ্য বললো যে এল্সা আসার সময় সে দেখেছে তার দুধের বোঁটা বেশ ভারী, ঝুলে পড়েছিল প্রায় হাঁটু অবধি।

শুধু তাই নয়, এল্সার সেদিনের ব্যবহারটাও যেন কেমন একটু অস্বাভাবিক ধরনের। ইব্রাহিমের কাছেই সব শুনলাম। আমাদের ফাঁকা আওয়াজ করে জানান দিতে সে যখন বন্দুকটা আনতে গেছে তাঁবুর ভেতরে, এল্সা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে ধরলো তার বন্দুক। এমন কি স্টুডিও থেকে এল্সার জন্যে খাবার আনতে গিয়েও এক বিপত্তি। কিছুতেই ইব্রাহিমকে সে দেবে না খাবার ছুঁতে। ভয়েই হোক বা যে কারণেই হোক, ইব্রাহিম আর এ ব্যাপারে অগ্রসর হলো না। তাকে নিরস্ত হতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে এল্সা এসে শুয়ে পড়লো গাড়ির ছাদে।

আমরা ফিরে এসে সব শুনে তো হতভম্ব। জর্জ তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলো তার খাবার। পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সবটুকু মাংসই সে খেলো। খেয়ে-দেয়ে আবার শুয়ে পড়লো মাটিতে। বাচ্চাদের কাছে ফিরে যাবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেলো না তার ভঙ্গিতে।

কিন্তু যাবো না বললেই তো আর হয় না। বাচ্চারা রয়েছে একলা, সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে···এ সময় প্রত্যেক মায়েরই উচিত বাচ্চাকে আগলে রাখা। এল্সারও তাই ফিরে যাওয়া দরকার।

এক রকম জোর করেই ঠেলে-ঠুলে তাকে তুললাম। এগোলাম যে পথে সে এসেছিল, সেই পথে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেলতে-দুলতে চললো এল্সা, খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো, কান খাড়া করে পাহাড়ের দিক থেকে শব্দ-টব্দ শোনার চেষ্টা করলো, তারপর আবার ফিরে চললো তাঁবুর দিকে।

অদ্ভুত তো! আসলে ইচ্ছেটা ওর কি! সে কি চায়, আমরা তার সঙ্গে তার আস্তানার খোঁজ না জেনে আসি। বেশ, তবে তাই-ই হোক। তার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা, তার সুখেই আমাদের শান্তি।

তাঁবুতে ফিরে আরো খানিকটা মাংস খেলো সে। বেশ চেটেপুটেই খেলো। খাওয়া শেষ করে একপা দু'পা করে এগোতে এগোতে উঠোন পার হয়ে হঠাৎ অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। এতোক্ষণে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো ব্যাপারটা। আমাদের অনুমানই ঠিক। অন্ধকার ঘন হবার অপেক্ষায় ছিলো এল্সা। আলো থাকলে তাকে অনুসরণ করে তার বাচ্চাদের দেখে আসা আমাদের পক্ষে খুব একটা অসম্ভব হতো না।

যাক গে বাপু, তবু নিশ্চিন্তি—বাচ্চাদের যত্ন-আত্তিরদিকে মন দিয়েছে এল্সা।

আদর্শ মায়ের মতোই কাজ করছে। তবু···তবু 'সেই চিড়িয়াখানার কর্তাব্যক্তিটি দিয়েছেন মনে এক ভয় ঢুকিয়ে···বাচ্চাদের নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত ঠিক পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না।

ঊনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ—এই তিনদিন এসে কাটিয়ে গেলাম ইসিওলোয়। আঠাশ তারিখে প্রায় সারাটা দিনই বনে-পাহাড়ে কাটালাম। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যেও এল্‌সা বা তার বাচ্চাদের দেখা পেলাম না।

পয়লা জানুয়ারী তাঁবুতে ফেরার পথে এক কাণ্ড। জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাবার সময় একদল গণ্ডারের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। শেষে একসময় পথ ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো তারা। গাড়ি ছাড়লাম।

সামনের একটা বাঁক পেরিয়েছি কি পেরোইনি, হঠাৎ পেছনে শুনি, মাটি-কাঁপানো দুপ-দাপ শব্দ। ফিরে দেখি, একপাল হাতী তাড়া করেছে আমাদের। তাড়াতাড়ি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল জর্জ। হাতির পালের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। আরো খানিকক্ষণ পরে তাঁবুতে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। উঃ, হাতিতে আমার ভয় সবচেয়ে বেশি।

এল্‌সা যেন আমাদের অপেক্ষাতেই ছিলো। গাড়ি থামাতে না থামাতে এক লাফে সে উঠে এলো গাড়ির ছাদে, তারপর সেখান থেকে আরেক লাফে গাড়ির পেছনে বাঁধা খোলা ট্রেলারের ওপর। ট্রেলারে যথারীতি রয়েছে তার খাবার -প্রমাণ আকৃতির এক দশাসই ছাগল।

গাড়ি থেকে নেমে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে তার দুধের বোঁটায় হাত দিলাম, টিপলাম। কিন্তু না, এক ফোঁটা দুধও বেরোলো না।

নাঃ, গতিক সুবিধের ঠেকছে না। হয়তো বাচ্চাকাচ্চা তার এতোদিনে আর বেঁচে নেই। বাচ্চা থাকলে মায়ের দুধের অবস্থা কখনো এরকম হয়। হায় রে, এতোদিনে একবার চোখের দেখাও দেখতে পারলাম না তাদের!

পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করলো এল্‌সা। রাত দুটো নাগাদ তাঁবু থেকে সে বেরিয়ে গেলো।

রাত থাকতে উঠলাম সেদিন ঘুম থেকে। ভোরের আলো একটু ফুটতে না ফুটতেই রওনা দিলাম। তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এসে পৌঁছলাম পাহাড়ে। ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ঘন জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছলাম এক ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটা জীবজন্তুর বাসস্থানের পক্ষে আদর্শ। বড় বড় পাথরের আড়ালে অসংখ্য গুহা, কয়েকটা গুহা আবার ঝোপে ঢাকা।

আশেপাশে আনকোরা পায়ের ছাপ কিছু নেই। আছে শুধু কয়েকটা রক্ত-

মাখা পায়ের ছাপ। তার মানে, প্রসব যন্ত্রণা ওঠার পর এতোদূর এসেছিল এল্সা, হয়তো এখানেই তার বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু তাই-ই বা সম্ভব কি করে? আমরা ঠিক এই জায়গাটা না হলেও এর আশেপাশে এসে অনেক বার খোঁজাখুঁজি করে গেছি। এল্সা বা তার বাচ্চারা যদি এখানেই থাকতো, তবে এক বারের জন্যেও কি তাদের দেখা পেতাম না!

হঠাৎ আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে মাত্র হাত পঞ্চাশেক দূরের এক ঘন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এল্সা। মাথা নীচু করে অনামনস্কের মতো কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর এগোলো না।

কয়েক মুহূর্ত এভাবেই কাটলো। তারপর কি মনে করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সে, জর্জ এবং আমার গায়ে মুখ ঘষতে লাগলো। এল্সার পেটের দিকে তাকিয়ে বুক থেকে এক বিরাট বোঝা নেমে গেলো। দুধের বোঁটাগুলো আজ বেশ পুরুষ্টু, বোঁটার চারপাশে তখনো ভিজে ভিজে। হয়তো এতোক্ষণ নিশ্চিন্তে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছিল সে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে এলো।

আদরের পালা শেষ হতে আবার ঝোপের দিকে ফিরে গেলো সে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে কান খাড়া করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন শুনলো। তারপর সেখানেই বসে পড়লো হাত পা ছড়িয়ে। মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে একবার তাকালোও না। ভাবখানা এমন, যেন বলতে চায় সে খবরদার, আমার এই একান্ত গোপনীয় ডেরার ধারে-কাছেও এসো না তোমরা। এলেই বিপদ।

পা টিপে টিপে পিছিয়ে এসে উঠলাম একটা উঁচু টিলার ওপর। উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলাম এল্সার গোপন ডেরা। কিন্তু না, ঝোপটা বড় বেশি রকম ঘন। তাছাড়া, ঠিক শেষ প্রান্ত অবধি দেখাও যায় না। সুতরাং, এল্সার ছেলেমেয়ের মুখ দেখা আর সেদিনকার মতো ভাগ্যে ঘটলো না। মনে মনে ভাবলাম—দেখো, কি বোকাই না আমরা! বাচ্চা হবার আগে ভাবতাম, আমাদের তাঁবুতেই হয়তো প্রসব করবে এল্সা। হয়তো অমন নিরাপদ জায়গা আর সে কোথাও পাবে না। কিন্তু না, ভুল—সবই ভুল। বন্যেরা বনে সুন্দর। আমাদের সঙ্গে শত বন্ধুত্ব সত্ত্বেও বনের আড়ালেই এল্সা অনেক বেশি নিরাপদ। বনই তার প্রিয় বাসস্থান।

থাক তবে, গোপন যা কিছু ওর, গোপনই থাক। যেদিন ও নিজে এনে দেখাবে বাচ্চাদের, সেদিনই নয় দেখবো। আগে থেকে অনর্থক তাড়াহুড়ো করে কাজ নেই। আমি বরং তাঁবুতে থাকি। এল্সার খাবারদাবারের

যোগাড় রাখি। না, শুধু যোগাড়ই নয়, খাবার ওর আস্তানা অবধি পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করি। খাবার খেতে রোজ যদি এতোদূর আসতে হয় ওকে, তাহলে তো অনর্থক সময় নষ্ট। ততক্ষণ বরং বাচ্চাদের কাছে থাকলে কাজ দেবে।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। বিকেলেই গেলাম খাবার নিয়ে। গাড়ির শব্দ শুনে ছুটে এলো এল্‌সা। খাবার দিলাম, জলের গামলাও একটা নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে, দিলাম। জল খেতে সে মুখ নীচু করেছে, অমনি গাড়ীতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিলাম আমরা।

শব্দ শুনে সে মুখ তুললো, খানিকটা অবাক হলো, কিন্তু এগোলো না। ওখানে দাঁড়িয়েই আমাদের চলে যেতে দেখলো।

পরদিন সকালেই চললাম আবার তার খাবার নিয়ে। জায়গামতো পৌঁছে গাড়ি থামালাম, এল্‌সা এলো না। নেমে ঘুরে ঘুরে ডাকাডাকি করলাম তার নাম ধরে, তবু সে এলো না। তার আস্তানা খুঁজতে গিয়ে নিরাশ হলাম—তার বাচ্চাকাচ্চা কেউ সেখানে নেই। গেলো কোথায় তবে এল্‌সা! নদীর ঢাল ধরে খানিকটা এগোলাম, দেখা পেলাম না তার। জর্জ একটু এগিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলো একটা ছাগল মারতে। মেরে বেরিয়ে আসার পথে হঠাৎ সে দেখা পেলো এল্‌সার। তেষ্টা পেয়েছে তার খুব। কালকের জলের সেই পাত্রটা উধাও। খাবার ভেবে অন্য কোনো সিংহ বোধহয় ওটা মুখে করে নিয়ে গেছে।

নতুন করে জল আনা হলো। জর্জ বসে বসে তাকে পুরো ছাগলটা খাওয়ালো। খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে আমরা ফিরে এলাম তাঁবুতে।

সেদিন বেলা পড়তে জর্জ ইসিওলোর দিকে রওনা দিলো। সে চলে যাবার একটু পরে এলো এল্‌সা। বিকেল অবধি আমার সঙ্গে কাটালো তাঁবুতে। সন্ধ্যে হতে রওনা দিলো জঙ্গলের দিকে।

একটু তফাতে থেকে আমিও চললাম তার পেছন পেছন। খানিক দূর এগিয়ে আমার চালাকি ধরতে পারলো এল্‌সা। মুখ ফিরিয়ে আমাকে আড়চোখে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে মাটিতে নখ আঁচড়াতে লাগলো। তারপর আচমকা দৌড়ে এসে এক গুঁতোয় আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ছাড়লো।

বুঝলাম, আমার এই গুপ্তচরবৃত্তিটা সে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না। অগত্যা ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁবুর পথ ধরলাম। আলগোছে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, সে-ও আসছে আমার পেছন পেছন।

তাঁবুতে পৌঁছে আরো খানিকটা মাংস দিলাম তাকে। বুঝিয়ে দিলাম

—তোমাকে অনুসরণ করার পেছনে কোনো বদ উদ্দেশ্য ছিলো না আমার। স্রেফ খানিকটা বাড়তি মাংস খেয়ে যেতে বলার জন্যেই তোমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম।

খেয়েদেয়ে আরাম করে আমার বিছানায় শুয়ে এক দীর্ঘ ঘুম দিলো সে। গভীর রাতে নিশ্চিন্ত মনে কখন যেন চুপিচুপি বেরিয়ে গেলো।

পরদিন থেকে আবার শুরু করলাম তার খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রায় দিনই দেখা হতো না তার সঙ্গে। যেদিন হতো, সেদিন ছলে-বলে-কৌশলে আমাকে দূর থেকেই বিদায় দিতো সে, তার ডেরার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দিতো না।

একদিন বিকেলে যাচ্ছি এল্‌সার খাবার নিয়ে, দেখি —সেই বিরাট পাথরের চাঁইটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত-দর্শন জানোয়ার। হায়না সে নয়, আবার পুরোপুরি সিংহের বাচ্চাও নয়। মাঝামাঝি গোছের চেহারা, দেখে সুবিধের মনে হলো না। ম্যাকেদ হাততালি দিলো, মুখে শব্দ করলো। আমাদের দিকে চোখ পড়তে সুড়সুড় করে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেলো সে জঙ্গলের দিকে।

দাঁড়িয়ে আছি, মনে মনে সাত-পাঁচ নানা রকম ভাবছি, এমন সময় এলো এল্‌সা। মেজাজ সেদিন তার মোটেই ভালো নয়। আমাদের সঙ্গের ছোকরা চাকরটার দিকে তাকিয়ে কয়েকবার সে ঘোঁৎঘোঁৎ করলো, ম্যাকেদ-এর সঙ্গেও তেমন একটা ভালো ব্যবহার করলো না।

দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া গোটা ছাগলটাই খাওয়ালাম তাকে। আশে-পাশের ঝোপের আড়াল থেকে কয়েকটা সিংহ গর্জন করলো। এল্‌সা খেতে খেতে বারবার চোখ তুলে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকালো চারদিকে। বুঝলাম, খুবই ঘাবড়ে গেছে সে।

মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। এইসব সিংহরা ওর আস্তানার খবর যদি ভুল-ক্রমেও জেনে ফেলে, তবেই মুশকিল। বাচ্চাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা আর সম্ভব হবে না। কাল থেকে আমাকেও খানিকটা সাবধান হতে হবে। এমনভাবে এল্‌সার আস্তানার এতো কাছে খাবার নিয়ে এসে তার বাচ্চার খবর আর পাঁচটা সিংহকে জানিয়ে দেওয়া এবার থেকে বন্ধ করতে হবে।

তবে হ্যাঁ, এসব ঝুট-ঝামেলায় না গিয়ে আর একটা কাজ করলে সমস্ত সমস্যাটারই সমাধান হয়ে যায়। এল্‌সার শত আপত্তি সত্ত্বেও নিজের চোখে মাঝে মাঝে গিয়ে বাচ্চাদের দেখে আসা সব দিক থেকে ভালো। বিপদের সময় প্রয়োজনবোধে যে কোনো রকম সাহায্য তাহলে আমাদের তরফ থেকে দিতে কোনো অসুবিধা হবে না।

ভেবে দেখলাম, এটাই সবচেয়ে ভালো মতলব। এগারোই জানুয়ারী দুর্গা দুর্গা বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাকেদ অসুস্থ। তার পরিবর্তে নিলাম টহলদার-বাহিনীর একজনকে। এ ছাড়া টোটো ছোকরা তো সঙ্গে রইলোই।

টহলদার-বাহিনীর লোকটিকে রাইফেল হাতে পথের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমি আর টোটো পাহাড় ডিঙিয়ে নদীর ঢাল বেয়ে এগোতে লাগলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের অভিযানের গোপনীয়তা পুরোপুরিভাবে রক্ষা করার জন্যে আগে থেকেই আমরা জুতো খুলে রেখে এসেছিলাম।

একটা উঁচুমতো জায়গায় এসে থামলাম। দুরবীনে চোখ রেখে চারপাশে পরীক্ষা করতে লাগলাম। একটা ঝোপের গাছগালা দেখে মনে হলো, এটাই হয়তো এল্‌সার সেই গোপন ডেরা। কিন্তু না, এল্‌সা বা তার বাচ্চাকাচ্চাদের চিহ্নমাত্র সেখানে চোখে পড়লো না।

হঠাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো আমার। কেমন যেন একটা বিপদ-বোধের সম্ভাবনা মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে দিলো। দুরবীন নামিয়ে ঘুরে তাকালাম, দেখি আমার সঙ্গের ছোকরাটির পেছনে ঠিক হাত দশেক দূরে ওত পেতে বসে আছে এল্‌সা। ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার আগে শিকার তাক করার যে ভঙ্গি, সেই ভঙ্গি তার বসার কায়দায়।

মুহূর্তে চিৎকার করে উঠলাম আমি। এল্‌সা লাফ দিলো। চকিতে ছেলেটি মাটিতে শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলো। এল্‌সা তার মাথা ডিঙিয়ে পড়লো গিয়ে কয়েক হাত দূরে।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটি। এল্‌সা গুটিগুটি এগিয়ে এলো আমার কাছে। আমার হাতে মুখ ঘষলো, পায়ে গাল ঘষলো। বুঝলাম, এটা তার দেখন-ভালবাসা, তার বাচ্চাদের এতো কাছে আজ আমাদের দেখে এতোটুকু খুশী হয়নি সে।

কিন্তু না, ধারণা আমাদের একেবারে ভুল। আদর-টাদর শেষ করে সামনের দিকে এগোতে লাগলো সে, পেছন ফিরে বারবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। একটু ইতস্ততঃ করে আমরা চললাম তার পেছন পেছন। ঘন জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে একটা জায়গায় এসে সে থামলো। দেখলাম, জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। এখান থেকে আর একটা পথ গিয়ে মিশেছে আমরা যে পথ ধরে এসেছি, সেই পথে। তার মানে, ভদ্রভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখালো সে। আমাদের এতোখানি ঘুরিয়ে এনে আবার ফেরার পথে তুলে দিলো।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। আর দেরী করা ঠিক নয়। তাছাড়া, এল্‌সাও

চায় আমরা চলে যাই। বেশ, ঠিক আছে—চলেই যাই তবে। ও যখন একান্তই চায় না, তখন অকারণ ওকে ঘাঁটিয়ে কি লাভ!

ফিরে এলাম তাঁবুতে। আমাদের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলো এল্‌সা। তারপর আবার ফিরে গেলো বাচ্চাদের কাছে।

পরদিন ইসিওলো থেকে ফিরে এলো জর্জ। এল্‌সার কথা জিজ্ঞেস করলো, বাচ্চাদের খবর জানতে চাইলো। সবই বললাম তাকে, কিছু বাদ দিলাম না। সব শুনে-টুনে সে বললো, আমাদের ওভাবে বাচ্চা দেখার চেষ্টা করাটা ঠিক হয়নি। অন্য কায়দায় যা কিছু করার করতে হবে।

বেশ, করো তোমরা তোমাদের অন্য কায়দা। ভালোই তো—যে কোনো কায়দা, এমন কি ভুল কায়দা করেও যদি বাচ্চাদের দেখতে বা দেখাতে পারো—আপত্তি নেই। আমি বরং খুশীই হবো তাতে।

॥ ৩ ॥

আমি তখন ইসিওলোয়। জর্জ তার দলবল নিয়ে আছে তাঁবুতে। একদিন বিকেলে সাহসে ভর করে কাছাকাছি এক পাথরের আড়ালে বসে উঁকি মারলো সে এল্‌সার ডেরায়।

স্পষ্ট দেখলো সে, এল্‌সা তার দুই বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে। মুখ তার ঢাকা পড়েছে পাথরের আড়ালে। সুতরাং জর্জকে যে সে দেখতে পায়নি, এ ব্যাপারে সন্দেহের আর কিছু নেই।

তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে এলো সে, এল্‌সার খাবার নিয়ে আবার গেলো পাহাড়ে। খাবার রেখে চুপচাপ বসে রইলো এক পাশে।

এল্‌সা কিন্তু এলো না। বসে থেকে থেকে একসময় ফিরে এলো জর্জ। মনে ভারী দুঃখ পেলো সে। ভাবলো, হয়তো তার সেই গোপন অভিযানের কথা জানতে পেরেছে এল্‌সা। হয়তো অভিমান করে সেজন্যেই এলো না। পরদিনও তার দেখা পাওয়া গেলো না। কালকের খাবার হায়নারা এসে ছিঁড়েখুঁড়ে টেনে নিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে অবশেষে এল্‌সা এলো। ক্ষিধেয় তার মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে। এদিকে তাঁবুতে ছাগলের সঞ্চয়ও শেষ। অগত্যা তাড়াহুড়োর মাথায় হাতের কাছে পেয়ে একটা ডিক-ডিকই মেরে দিলো জর্জ। অন্য সময় হলে এ খাবার সে মুখেও তুলতো না। কিন্তু সেদিন আর আপত্তি করলো না। চেটেপুটে নিমেষে নিঃশেষ করলো খাবার, নিজের ডেরায় ফিরে গেলো।

ইসিওলোয় বসে এসব খবর শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। পরের দিনই রওনা দিলাম। যাবার পথে কয়েকটা ছাগল মেরে সঙ্গে নিয়ে চললাম।

আমি পৌঁছতে জর্জ-এর ছুটি। সে রওনা দিলো ইসিওলোর দিকে। সানন্দে এল্‌সার দায়িত্ব তার হাত থেকে তুলে নিলাম নিজের হাতে। মন খুশীতে ভরে উঠলো।

কদিনের মধ্যে এল্‌সার একটা পরিবর্তন আমার চোখে ধরা পড়লো। জর্জ কিংবা আমার প্রতি তার ভালোবাসা আগের মতোই আছে, কিন্তু ম্যাকেদকে সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। অথচ মজা হলো এই, ম্যাকেদকে সে কিন্তু সেই বাচ্চা বয়স থেকে দেখে আসছে। বাচ্চা হবার কদিন আগে পর্যন্ত খেলাধুলো করেছে তার সঙ্গে, দৌড়-ঝাঁপ করেছে, শিকার করেছে। কিন্তু এখন এই হঠাৎ পরিবর্তন · কারণটা কি!

একদিন তাঁবুতে ফিরে আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুললো এল্‌সা। পেট ভরে খেয়েদেয়ে লাগালো এক লম্বা ঘুম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, সন্ধ্যে হলো—তবু পাহাড়ে ফেরার নাম নেই। অগত্যা নিরুপায় হয়ে সেই অন্ধকারেই তাকে নিয়ে বেরোতে হলো। সঙ্গে থাকলো টোটো ছোকরাটি। আমাদের পেছন পেছন সুবোধ বালিকাটির মতো অনেক দূর এলো এল্‌সা। তারপর হঠাৎ কি যে হলো তার! একছুটে আমাদের পাশ কাটিয়ে শ'খানেক গজ এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়লো সে। উদ্দেশ্য—আমাদের আর এগোতে দেবে না।

বেশ, ভালো। দেবে না এগোতে—এগোবো না। তুমি বাপু ফিরে যাও তোমার বাচ্চাদের কাছে, এখানে বসে অনর্থক আর সময় নষ্ট করো না।

ফিরে এলাম তাঁবুতে। পরদিন সকালেই এলো এল্‌সা। এদিনও বাচ্চাদের কাছে ফিরে যাবার তার কোনো লক্ষণ দেখলাম না।

মনে মনে ভাবলাম—দাঁড়াও, জব্দ করছি তোমাকে। থাকো বসে এখানে, আমরা এই ফাঁকে তোমার বাচ্চাদের দেখে আসি।

পেছনের দরজা দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরপথে অনেকখানি গিয়ে পাহাড়ের পথ ধরলাম। তার ডেরার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি প্রায়—এমন সময় কোত্থেকে যেন হাজির হলো সে।

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কাছে এসে হাঁটুতে মুখ ঘষলো এল্‌সা, অনেকক্ষণ ধরে আদর-সোহাগ জানালো। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো তার ডেরার দিকে।

তা যাবি যা, ঠিক পথে যা! তা নয়, এ ফাটলের ফাঁক দিয়ে, হেলে-পড়া

ঐ পাথরটার নীচ দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগোতে লাগলো সে। পায়ের কত জায়গা যে ছড়ে গেলো আমাদের, কতবার যে হোঁচট খেলাম! আমাদের দেরী হয়, তো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে সে। আমরা চলতে শুরু করলে আবার এগোয়। দুষ্টুমির চূড়ান্ত আর কি!

রাস্তা এতো খারাপ, মাঝে মাঝে মনে হয় আর বোধহয় পারবো না। রাজ্যের কাঁটাঝোপ পড়লো পথে। কোনোটা ডিঙিয়ে কোনোটার পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে মাটি শুঁকলো সে, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে কি সব দেখলো।

আরো অনেকখানি হাঁটার পর এসে পৌঁছলাম এক ফাঁকা জায়গায়। দেখি, জায়গাটা আমার খুবই চেনা—তাঁবুর থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে। আগে লুকোচুরি খেলতে হামেশাই এখানে আসতাম আমরা। ছুটোছুটি করতাম, খেলা করতাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতাম তাঁবুতে।

আজ আবার এখানে নিয়ে এলো এল্‌সা উদ্দেশ্যটা কি! লুকোচুরি খেলার ইচ্ছে এতোদিন পরে আবার চাগিয়ে উঠলো নাকি!

যা ভেবেছি, তাই। দেখি দূরের এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সে আড়ে আড়ে উঁকি মারছে।

কিন্তু না, সেদিন আর তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। অতোখানি পথ হেঁটে এমনিতেই শরীর ক্লান্ত। তার ওপর আবার খেলার ধকল—সহ্য হবে না। সুতরাং এল্‌সাকে হতাশ করে তাঁবর পথে পা বাড়ালাম। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

জর্জ ফিরে আসতে দুজনে বসলাম শলা-পরামর্শে। সে বললো, একটা ব্যাপারে চিন্তা এখনো মেটেনি। বাচ্চাদের দেখেছে সে ঠিকই, কিন্তু তারা আর পাঁচটা বাচ্চার মতো স্বাভাবিক চেহারার কিনা, সেটা খুঁটিয়ে দেখার সময় বা সুযোগ পায়নি। সুতরাং, ঠিক হলো—সুবিধেমতো একদিন গিয়ে সে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসবে।

তা ভাগ্য আমাদের ভালোই বলতে হবে। সুযোগ আসতে দেরী হলো না। সেদিন চোদ্দই জানুয়ারীর বিকেল। এল্‌সা তাঁবুতে বসে পরমানন্দে তারিয়ে তারিয়ে মাংস খাচ্ছে, আমি বসে তার খাবারের তদারক করছি, জর্জ গুটিগুটি বেড়িয়ে পড়লো পেছনের দরজা দিয়ে।

এল্‌সার ডেরায় পৌঁছে সন্তর্পণে উঁকি মারলো জর্জ। দুটো নয়, বাচ্চা মোট তিনটে। দুজন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, একজন বসে আছে জেগে। কড়মড় কড়মড় করে নিজের মাড়ি চিবোচ্ছে। জর্জ-এর দিকে তাকিয়ে রইলো সে একদৃষ্টে, কিন্তু কিছু দেখতে পেলো না বোধ হয়।

তার চোখ তখনও ঘোলাটে নীল রঙের। দূরের জিনিস ঐ চোখে ঠিক ভালো দেখা যায় না।

চারটে ছবি নিলো জর্জ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। ইতিমধ্যে বাকী দুজনেরও ঘুম ভাঙলো। পা টেনে টেনে হামাগুড়ি দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে খানিকটা এগোলো তারা। নিশ্চিন্ত হলো জর্জ—নাঃ, মোটামুটি সুস্থ সবলই হয়েছে বাচ্চা তিনটে।

তাঁবুতে ফিরে এসে আমাকে সব বলতে আমি তো যাকে বলে আনন্দে আত্মহারা। কি করবো কি করবো ভাবতে ভাবতে এল্‌সাকে আরো খানিকটা মাংসই খেতে দিলাম।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতে গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের পথে রওনা দিলাম। গাড়ির ছাদে শুয়ে রইলো এল্‌সা। গাড়ি থামিয়ে নেমে আমরা ইচ্ছে করেই অন্যদিকে এগোলাম। এল্‌সা এই সুযোগে নেমে চম্পট দিলো।

জর্জকে আবার ইসিওলোয় যেতে হলো। আমি রইলুম একলা। সকাল থেকেই সেদিন শুনলাম এল্‌সার সিংহের হাঁকডাক। নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে একটানা ডাকলো সে অনেকক্ষণ। এল্‌সা সাড়া দিলো না। বিকেলের দিকে এল্‌সা এলো তাঁবুতে। সামান্য খাবার খেলো। সন্ধ্যে হতে আবার ফিরে গেলো বনে।

এরপর দুদিন আর তার পাত্তা নেই। দুটো রাত তাঁবুর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সমানে ডাকাডাকি করে গেলো তার সিংহ। তৃতীয়দিন ব্রেকফাস্ট নিয়ে সবে বসেছি, হঠাৎ নদীর দিক থেকে শুনি এল্‌সার ভয়ঙ্কর গর্জন। ছুটে গেলাম খাবার ফেলে রেখে। গিয়ে দেখি, জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এল্‌সা, ঘন ঘন গর্জন করছে। দেখে মনে হলো, খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে।

আমাকে দেখে আর দাঁড়ালো না এল্‌সা। জল থেকে উঠে চলে গেলো বনের দিকে। আমি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না - কি ওর উদ্দেশ্য।

বিকেলে চা খাবার সময় ঘন্টাখানেকের জন্যে এলো সে। চটপট খাবারটুকু গলাধঃকরণ করলো। তারপর যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল, তেমনই তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

পরদিন সারা দিনমানে আর তার দেখা পাওয়া গেলো না। রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো এক অদ্ভুত শব্দে। উঠোনে রাখা গাড়িটার ওপর কোনো বিরাট চেহারার জানোয়ার এসে তার আক্রোশ ফলাচ্ছে। এ আবার কি রে বাবা! বাইরে কাঁটার বেড়ার আড়ালে রাখা আছে

কয়েকটা ছাগল। ছাগলের লোভেই কি এসেছে জানোয়ারটা! এই সব সাতপাঁচ ভাবছি, এমন সময় নদীর ওপার থেকে ভেসে এলো শ্রীমান সিংহের বিকট গর্জন। ব্যস্, অমনি যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লো। এদিকের শব্দ নিমেষে আরো বেড়ে গেলো।

নাঃ, আর তো চুপচাপ থাকা যায় না! গাড়ির উপর এমন আক্রমণ হলে গাড়িটার দশা তো শোচনীয় হবে! সুতরাং—যাহোক একটা কিছু করা দরকার।

তাঁবুর জানলার ফোকর দিয়ে বড় টর্চের আলো ফেললাম। আলো গিয়ে পড়লো জন্তুটার গায়ে। তাকিয়ে দেখি, সে আর কেউ নয়—আমাদের এল্‌সা। মৃদুস্বরে বললাম—ছিঃ এলসা, অমন করে না! ব্যস্ এক কথাতেই কাজ হলো। গাড়ি বাজানো ছেড়ে উঠোন পেরিয়ে এল্‌সা পাহাড়ের দিকে এগোলো।

পরদিন দোসরা ফেব্রুয়ারী। বিকেলে নদীর পাশে চেয়ার-টেবিলে বসে আমি আমার কাজে তন্ময় হয়ে রয়েছি, টোটো ছোকরাটি ছুটতে ছুটতে এসে বললো, এল্‌সা নাকি তাঁবুর পেছন দিকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত স্বরে ডাকাডাকি করছে। কাজকর্ম ফেলে ছুটলাম তক্ষুণি। ডাক অনুসরণ করে যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, সে-জায়গায় নদী অনেকটা সঙ্কীর্ণ। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটানা ডেকেই চলেছে এল্‌সা।

ঝোপ পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। এ কি স্বপ্ন, না সত্যি! এল্‌সা দাঁড়িয়ে আছে সপরিবারে।

তিনটে বাচ্চার মধ্যে একটা দাঁড়িয়ে আছে তার মায়ের কোল ঘেঁষে, আরেকটা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে নদীর পারে। গা বেয়ে টসটস করে তার গড়িয়ে পড়ছে জল। আর একজন দাঁড়িয়ে আছে ওপারে। করুণ সুরে সে তার মাকে ডাকছে। এল্‌সা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। চোখের দৃষ্টিতে একই সঙ্গে তার গর্ব এবং অসহায়তার অভিব্যক্তি।

একই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি স্তম্ভিত, হতভম্ভ। মাথা নীচু করে এল্‌সা এক চাপা গর্জন করলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো পারের কাছে দাঁড়ানো বাচ্চাটার কাছে। জিভ দিয়ে তার গা চাটলো। তারপর সাঁতার কেটে এগোলো ওপারের বাচ্চাটার দিকে। যেই না জলে নেমেছে সে, অমনি টলটলায়মান অবস্থায় ছুটতে ছুটতে এলো আর দুজন, ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। তারপর পাকা সাঁতারুর মতো জল কেটে মায়ের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে উঠলো তারা ওপারে।

ওপারে পৌঁছে এক বিরাট ডুমুর গাছের ছায়ায় তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে বসলো এল্‌সা। তার কোলের মধ্যে বসলো দুজন, একজন গেলো তার পিঠের কাছে। তারপর শুরু হলো উঁকিঝুঁকির পালা। পিঠের আড়াল থেকে, পায়ের ফাঁক দিয়ে আড়ে আড়ে আমার দিকে বারবার তারা উঁকি দিতে লাগলো। ভাবখানা এই, আমি যেন একটা দর্শনীয় কিছু. বিভিন্ন কোণ থেকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে ওরা ওদের কৌতূহল মিটিয়ে নিচ্ছে।

চাপা ধমক লাগালো এল্‌সা—উঁ ম্‌···আ! অর্থাৎ, আঃ, অতো লুকোচুরির দরকার নেই। ও আমাদের বন্ধু। ব্যস্‌, অমনি আড়ে আড়ে দেখার পালা বন্ধ হলো। তারা তাদের মায়ের লেজ এবং কান নিয়ে শুরু করে দিলো খেলা। কখনো বা মাটিতে ডিগবাজি খেলো, ডুমুর গাছের শিকড়কে কি না কি ভেবে আঁচড়ালো কামড়ালো। আমার কথা আর তাদের মনেও থাকলো না।

কি মনে করে উঠলো এল্‌সা। জলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্ত। একটি বাচ্চা এলো তার পেছন পেছন। মা জলে নামলে সে-ও নামবে—এমন এক ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হাজির হলো টোটো ছোকরাটি। তাকে পাঠিয়েছিলাম এল্‌সার খাবার আনতে। খাবার নিয়ে সে ফিরে এসেছে।

ব্যস্‌, আর যায় কোথায়! তাকে দেখে রাগে গরগর করতে লাগলো এল্‌সা, কান খাড়া করলো। তাড়াতাড়ি ইশারায় চলে যেতে বললাম ছেলেটাকে। খাবার রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লো।

সে চলে যেতে নিশ্চিন্ত হলো এল্‌সা। কান আবার তার ঝুলে পড়লো। ধীরে ধীরে নদী সাঁতরে এপারে এলো সে। পেছন পেছন এলো তার সেই নির্ভীক বাচ্চাটি। এপারে এসে মাকে খাবার আগলে বসতে দেখে সে আবার গিয়ে নামলো জলে। সাঁতরে চললো ওপারের দিকে। উদ্দেশ্য, আর দুজনকে পথ দেখিয়ে এপারে নিয়ে আসা।

তা শুধু সাহস থাকলেই তো হবে না, সাঁতারের কৌশলটুকুও জানা চাই। কোথায় বেশি জল, কোথায় কম জল—তা ঐটুকু বাচ্চা জানবে কি ভাবে? নদীর মাঝ-বরাবর গিয়ে তার তো অবস্থা কাহিল। জল ওখানে গভীর: হাবুডুবু খেতে লাগলো সে। এল্‌সা ঘাড় ঘুরিয়ে তার ঐ অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে খাবার ছেড়ে উঠলো, এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। ঘাড় কামড়ে ধরে বাচ্চাটাকে জলে কয়েকটা চুবনি দিলো। বোঝালো—বেশি সাহস করার এই ফল, এই শাস্তি। তারপর বকা-ঝকা শেষ করে সাঁতরে এপারে এনে তুললো তাকে।

ততক্ষণে ওপার থেকে আর একজনও নেমে পড়েছে জলে, সাঁতারে এদিকে আসছে সে। এপারে দাঁড়িয়ে এল্‌সা তাকে দেখলো। সাহায্যের জন্যে এবার আর সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো না। বাচ্চাটা হাবুডুবু খেতে খেতে উঠলো এসে পারে। তৃতীয় বাচ্চাটা জলে নামলো না। ওপারে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো মায়ের দিকে।

মা তখন তার মেতেছে এক নতুন খেলায়। আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে সমানে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে আমার হাত চাটছে, পা চাটছে। অর্থ পরিষ্কার। তার বাচ্চাদের কাছে বোঝাচ্ছে—আমি তাদের বড় আপনার জন, আমাকে ভয় করার কিছু নেই।

তা বাচ্চা দুটো বোধহয় বুঝলো তাদের মায়ের কথা। গুটিগুটি এগিয়ে এলো আমার দিকে, মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। একবার ভাবলাম হাত বাড়িয়ে ওদের একটু আদর করি। কিন্তু পরমুহূর্তেই এক জীব-বিশারদের সাবধানবাণী মনে পড়তে মনের ইচ্ছে মনে চেপে রাখলাম। তিনি বলেছিলেন, বাচ্চারা নিজের ইচ্ছেয় এগিয়ে এসে ধরা না দেওয়া পর্যন্ত ওদের ছুঁতে নেই।

এই সব যখন চলছে এপারে, ওপারে চলছে তখন আর এক নাটক। বেচারা তিন নম্বর জলের কাছে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে সমানে ডেকেই চলেছে।

এল্‌সার বোধহয় চমক ভাঙ্গলো। উঠে বসে সে তাকালো তার দিকে। এগিয়ে গেল নদীর পার অবধি। নদীটা যেখানে সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ সেখানে গিয়ে সে ডাকলো তাকে। ফল বিশেষ কিছু হলো না। জলের দিকে তাকিয়ে সে-বেচারা সমানে কুঁই-কুঁই করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে আর দুটি বাচ্চাও এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের গা ঘেঁষে। এল্‌সা আর দাঁড়ালো না। ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। দেখাদেখি বাচ্চা দুজনও নামলো। চার হাতে পায়ে খলবল খলবল করে জল কাটতে কাটতে এগিয়ে চললো তারা মায়ের পেছন পেছন।

ওপারে গিয়ে শুয়ে পড়লো এল্‌সা, একে একে তিনজনেরই গা চাটতে লাগলো। তিন নম্বরটি ততক্ষণে সকলকে কাছে পেয়ে ভারী খুশী। আনন্দে-আহ্লাদে গড়াগড়ি খেতে লাগলো সে।

চাপা গলায় এল্‌সা বাচ্চাদের কত কি-ই না বললো। উত্তরে তারাও বললো কত কথা। কিছুই বুঝলাম না আমি। ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখলাম। তারপর বাকী খাবারটুকু খেয়ে যাবার জন্যে এল্‌সাকে ডাকলাম।

সাড়া দিলো এল্‌সা। উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে নামলো জলে। পিছু পিছু ওরা তিনজনও এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
এপারে উঠে একে একে তিনজনেরই গা চেটে দিলো সে। তারপর এগিয়ে এসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো আমার পায়ের কাছে। উঠে আমার গাল চাটলো, হাত চাটলো, গলা জড়িয়ে ধরলো দু হাতে। বাচ্চারা দূর থেকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো মায়ের এই মজাদার কাণ্ডকারখানা।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালো এল্‌সা। গিয়ে বসলো তার খাবারের কাছে। বাচ্চা তিনজনও এগিয়ে এলো। মায়ের দেখাদেখি তারাও দাঁত বসালো মাংসে। কিছুক্ষণ ছাল-চামড়া নিয়ে নিষ্ফল টানা-হ্যাঁচড়া করে তারা আবার মেতে উঠলো তাদের নিজেদের খেলায়।
মনে মনে হিসেবটা করে ফেললাম। এক মাস সতেরো দিন বয়েস হলো ওদের। তিনজনেরই চেহারা বেশ ভালো। চোখের মণির ওপরকার সেই নীল আবরণটা এখনও কাটেনি, তবু সবকিছু দেখতে বোধহয় খুব একটা অসুবিধে হয় না। এল্‌সার মতো তাদের গায়ের চামড়ায় অতো ঘন ফুটকি নেই। রঙও তার মতো অতোটা ঘন নয়। তবু সব মিলিয়ে দেখতে ওরা সুন্দরই হয়েছে। কিন্তু মুশকিল এই, তিনজনের মধ্যে কে মেয়ে, কে ছেলে—সেটা বোঝার উপায় নেই। একেবারে হালকা রঙের বাচ্চাটা বাকী দুজনের চেয়ে অনেক বেশি সজীব, অনেক বেশি চঞ্চল। মা-ঘেঁষাও সে একটু বেশিরকম। ঘুরে-ফিরে কেবলই ফিরে আসে মার কাছে, কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে, মায়ের গায়ে গাল ঘষে সোহাগ-আদর জানায়। মা-ও তাদের কম সহ্যবতী নয়। বাচ্চাদের শত অত্যাচারেও এতোটুকু রাগ করে না।
খেতে খেতে এল্‌সা বার কয়েক তাকালো আমার দিকে। চোখে তার আমন্ত্রণের দৃষ্টি। এগিয়ে গেলাম কয়েক পা। আমাকে আসতে দেখে বাচ্চারা ছাটছুট পালালো।
ধীরে ধীরে বিকেল পড়ে এলো। বাচ্চাদের নিয়ে এল্‌সা গিয়ে বসলো এক ঝোপের আড়ালে। চকাস চকাস শব্দ শুনে বুঝলাম, বাচ্চাদের সে দুধ দিচ্ছে।
নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলাম তাঁবুতে। এসে দেখি, এল্‌সা আমার আগেই এসে বসে আছে উঠোনের এক পাশে। বাচ্চা তিনজনকেও নিয়ে এসেছে সঙ্গে।
পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলাম তাকে। টোটোকে নদীর পার থেকে

ওর অর্ধভুক্ত খাবারটুকু নিয়ে আসতে বললাম। নিয়ে এলো সে। দেখে যারপরনাই খুশী হলো এল্‌সা। ছেলেটা চলে যেতে উঠে এসে বসলো খাবারের সামনে। বাচ্চারাও এলো। আমি এসে ঢুকলাম তাঁবুতে। কিন্তু না, এসময় আমার তাঁবুতে ঢোকাটা এল্‌সার ঠিক মনঃপুত হলো না। পেছন পেছন সে-ও এসে ঢুকলো তাঁবুতে। জামার প্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চললো বাইরে।

বসলাম এসে ঘাসের ওপর। আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো এল্‌সা, বাচ্চারা এসে তার দুধ চাটতে লাগলো।

হঠাৎ শুরু হয়ে গেলো দক্ষ-যজ্ঞ। একটা দুধের বোঁটা নিয়ে দুটো বাচ্চার মধ্যে লেগে গেলো তুমুল ঝগড়া। চাপা ধমক দিয়ে এল্‌সা চিৎ হয়ে শুলো। তিনজন আলাদা আলাদা তিনটে বোঁটায় মুখ দিয়ে শান্ত হলো।

কোল থেকে কিন্তু মাথা তুললো না এল্‌সা। একইভাবে শুয়ে সে আরামে চোখ বুজলো। মাঝে মাঝে একটা হাত তুলে আমার গালে-মুখে ঘষতে লাগলো।

বড় শান্তিতে কাটলো সেই সন্ধ্যাটি। একটু পরে গোল থালার মতো চাঁদ উঠলো আকাশে। ঝোপে-ঝাড়ে-অন্ধকারে জ্বলে উঠলো হাজার হাজার জোনাকীর আলো! সমস্ত প্রকৃতি নীরব, নিঝুম। মুক্ত আকাশের নীচে আমরা মাত্র পাঁচটি প্রাণী—আমাদের স্বভাব আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা। তবু আমরা একে অপরের বন্ধু, পরস্পরের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। কত লোক বলেছিল আমাকে—বাচ্চা হবার পর এল্‌সা হয়তো ভীষণ হবে, ভয়ঙ্কর হবে। তার আদিম বন্যতা হয়তো আবার ফিরে পাবে সে। কিন্তু কোথায় কি! আমাদের এল্‌সা একই রকম আছে। আগের মতোই সে আমাকে ভালোবাসছে, আদর-সোহাগ জানাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাকে তার নতুন আনন্দের অংশীদার করে সে-ও খুশী হচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে। আমাদের এল্‌সা নিজেই তার উদাহরণ, তার সঙ্গে আর কারো তুলনা মেলে না।

সেদিনের সন্ধ্যার সেই স্মৃতি আমার বুকে আজও চিরজাগরূক হয়ে আছে। পরদিন সকালে উঠে দেখি, সব ভোঁ-ভোঁ—এল্‌সা বা তার বাচ্চাদের চিহ্নমাত্র তাঁবুর আশেপাশে কোথাও নেই। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি হয়েছে, পায়ের ছাপ-টাপও তাই ধুয়ে মুছে গেছে।

বিকেলে চা খাবার সময় সে এসে হাজির। একাই এসেছে, সঙ্গে বাচ্চাদের কাউকে আনেনি। তাড়াতাড়ি খাবার এনে দিলাম। খেতে লাগলো সে। টোটোকে এই ফাঁকে ওর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নতুন আস্তানার খোঁজ

আনতে পাঠালাম।

আধ ঘণ্টাটাক পরে ফিরে এলো সে। এল্‌সার খাওয়াও তখন প্রায় শেষ। বাকী খাবারটুকু খেয়ে সে গিয়ে উঠলো গাড়ির ছাদে। আমরা দুজন তার পায়ের ছাপ ধরে এগোলাম।

গাড়ির ছাদ থেকে এক লাফে নেমে আমাদের সঙ্গী হলো এল্‌সা। আমিও এটাই চাইছিলাম। সে যাতে আরামে-আয়েশে এখানে সময় নষ্ট না করে বাচ্চাদের কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যায়—সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।

খানিক দূর এগিয়ে পাহাড়ের পথ ধরলাম। এক জায়গায় এসে থামলো এল্‌সা, একটু ইতস্তত করলো। তারপর ধীরে ধীরে নামতে লাগলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। টোটোকে এক ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করতে বলে আমি একাই এগোলাম তার সঙ্গে।

আরো একটু এগিয়ে এল্‌সা থামলো। আমি তার পিঠ চাপড়াতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিলাম। এল্‌সার চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর, কান খাড়া, একটানা গর-র-র-র শব্দ করে সে যেন আমাকে শাসাচ্ছে।

তার মানে, আমাকে এখন আর দরকার নেই তার। চলে যেতে বলছে সে আমাকে। অতএব ফিরে চললাম। খানিক দূর এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, একটা বাচ্চার সঙ্গে সে খেলায় মেতেছে। পাথরের এক বিরাট ফাটলের আড়াল থেকে আর একটা বাচ্চা গুটিগুটি বেরিয়ে আসছে।

সবই ভালো, সবই সুন্দর। কিন্তু হঠাৎ আমার ওপর রেগে যাবার কারণটা কি! কালকের অতো ভাব-ভালোবাসা—সবই কি বিফলে গেলো! সাতপাঁচ নানারকম ভাবতে ভাবতে ফিরে গেলাম টোটোর কাছে। দুরবীনে চোখ রেখে তাকালাম। দেখি, তৃতীয় বাচ্চাটি ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে তার গোপন জায়গা থেকে। মায়ের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে তারা মেতে উঠেছে খেলায়।

দেখলাম, খেলাধুলোর ফাঁকে ফাঁকে সেই হালকা হলুদ রঙের বাচ্চাটি বারবার এসে বসছে মায়ের কোল ঘেঁষে। মা পরম যত্নে তার গা চেটে সোহাগ জানাচ্ছে।

চৌঠা ফেব্রুয়ারী সকালে ইসিওলো থেকে ফিরে এলো জর্জ। বাচ্চাদের খবর শুনে সে তো ভীষণ খুশী। ঐ পরিশ্রান্ত শরীরে তখনই আমাকে নিয়ে চললো পাহাড়ের দিকে।

পাহাড় বেয়ে উঠছি, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। একপাল বেবুন তারস্বরে ডাকতে শুরু করেছে। বুঝলাম, কাছাকাছি কোথাও আছে এল্‌সা। বেবুনদের এতো ডাকাডাকির অর্থ সে।

নাম ধরে ডাকলাম। নদীর পারের বিরাট ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর গর-র-র-র করতে করতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে শুরু করে দিলো পায়চারি।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বাচ্চারা রয়েছে ঐ ঝোপের আড়ালে। আমাকে বা জর্জকে আর এক পাও এগোতে দিতে সে নারাজ। সুতরাং ফিরে এলাম। দুদিন পর তাকে পাহাড়ের ওপর দেখা গেলো। আমরা যেন তাকে দেখিনি, এমন ভঙ্গি করে নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে এগোলাম। গলার স্বর শুনে ফিরে তাকালো এল্‌সা। কয়েক পা এগিয়ে এলো। তারপর পথের মাঝখানে আড় হয়ে শুয়ে আমাদের পথরোধ করলো।

তার চোখের দৃষ্টি স্থির, ভাবলেশহীন। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকাচ্ছে ফাটলটার দিকে, কান খাড়া করে কি যেন শোনবার চেষ্টা করছে, তারপর চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে আমাদের।

অর্থ পরিষ্কার। আমরা যে অযাচিতভাবে তার বাচ্চা দেখি, সেটা সে একেবারেই চায় না। সময় হলে নিজেই সে নিয়ে আসবে তাদের, জর্জকে দেখাবে।

তা সময় হতে হতে দু হপ্তা হলো। একদিন সকালে সপরিবারে এলো সে তাঁবুতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দুজনেই তখন ইসিওলোয়। তার আসা তাই নিষ্ফলে গেলো।

আমাদের কাউকে না দেখে ম্যাকেদকেই সে খানিকক্ষণ সঙ্গ দিলো। গা-হাত-পা চেটে দিলো তার। দুপুর অবধি রইলো তাঁবুতে। ম্যাকেদ এক ফাঁকে একটা বাচ্চাকে আদর করতে যেতে বাচ্চাটা হুঙ্কার দিয়ে তিন লাফে দৌড়ে পালালো। বাকী দুজন তার কাছেও ঘেঁষলো না।

বিকেলের দিকে খাবার খেতে একলাই এলো এল্‌সা। বসে বসে খানিকটা মাংস খেলো। তারপর কি মনে হতে হঠাৎ ছুটে পালালো।

এল্‌সা চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই পৌঁছলাম আমি। গাড়ি থেকে নামতে দৌড়ে এসে ম্যাকেদ এক নিঃশ্বাসে আগাগোড়া ঘটনাটা আমাকে জানালো। বললো, হালকা রঙের বাচ্চাটার সে নাম পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছে। ওটা মেয়ে নয়, ছেলে। নামও তাই হওয়া উচিত ছেলেদের মতো—জেসপা। জিজ্ঞেস করলাম, জেসপা কথাটা এলো কোত্থেকে? মানেই বা কি? সে বললো, কথাটা বাইবেল থেকে নেওয়া। মানে ঠিক কি—সে বলতে পারে না।

ভেবেচিন্তে দেখলাম, বাইবেলে জেসপা বলে কোনো শব্দ নেই। প্রায়

সমগোত্রীয় উচ্চারণের একটা শব্দ আছে—জাফ্‌তা, অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক মুক্ত। উচ্চারণে রকমফের হোক, ক্ষতি নেই। নামটা ভালো। সুতরাং জেসপাই হলো তার নাম। কিন্তু আর দুজন···কি নাম দেওয়া যায় তাদের? তক্ষুণি অবশ্য কিছু ঠিক করা গেলো না। পরে যখন জানলাম, বাকী দুজনের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, তখন ছেলেটির নাম রাখলাম গোপা। সোয়াহিলী ভাষায় 'গোপা' শব্দটার অর্থ ভীরু, নম্র। মেয়েটির জন্যে তেমন জুতসই কোনো নাম খুঁজে না পেয়ে তার নাম রাখলাম ছোটো এল্‌সা—সংক্ষেপে, ছোটো।

পরদিন বিকেলের দিকে এলো এল্‌সা। আমাকে দেখে সে ভারী খুশী। দেখলাম, ক্ষিধেয় মুখ তার একেবারে শুকিয়ে গেছে। খাইয়ে দাইয়ে শান্ত করে তাকে তাঁবুতে রেখে আমি একলাই বেরোলাম বেড়াতে। উদ্দেশ্য, আমাকে বেরোতে দেখে যাতে তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে যায় এল্‌সা। তা উদ্দেশ্য সফল হলো। মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে দেখি, এল্‌সা উধাও।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হলো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। চাদরে গলা অবধি ঢেকে শুয়ে আছি বিছানায়, উঠতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ শুনি, নদীর দিক থেকে এল্‌সা ঘন ঘন ডাকছে।

তক্ষুণি ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এলাম। ছুটলাম ডাক লক্ষ্য করে। গিয়ে দেখি, সাঁতরে এপারের দিকে আসছে এল্‌সা। তার পাশে পাশে আসছে জেসপা। বাকী দুজন সামান্য তফাতে থেকে প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে।

ডাঙায় উঠে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এলো এল্‌সা, পা চেটে আদর জানালো। তারপর শুয়ে পড়ে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা হুঙ্কার ছাড়লো। জেসপা ছুটতে ছুটতে চলে এলো আমার পায়ের গোড়ায়। বাকী দুজন একটু দূরে-দূরে থাকলো।

তাড়াতাড়ি একটা ছাগল এনে দিলাম। টানতে টানতে ছাগলটা নিয়ে এল্‌সা গেলো পাশের এক ঝোপের আড়ালে। সেখানে বসে চারজন পাক্কা দুটি ঘণ্টা ধরে গোটা ছাগলটা খেলো। আমি বালির ওপর ঠায় বসে রইলাম।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কত কথা এল্‌সার। ছেলেমেয়েদের কত কি-ই না বোঝালো সে। চুপচাপ সব শুনলাম, বুঝলাম না কিছু। বাচ্চারা কখনো একটা হাড় চুষলো, কখনো বা মাকে শুইয়ে ফেলে দুধ খেলো। তা এল্‌সারও বলিহারি! ছেলেমেয়েদের এক এক টুকরো মাংস দিতে কি-ই বা

হয় ওর! মুখে চিবিয়ে নরম করেও তো দিতে পারে ওদের! কিন্তু না, সে-সব ওর অভিধানে লেখা নেই। নিজের পেটটাই চিনেছে ও, খাবার সময় বাচ্চাদের কথা আর তার মনে থাকে না। বড় স্বার্থপর এল্‌সা, বড় নিষ্ঠুর। তু মাস তিনদিন বয়েস হলো বাচ্চাদের। দেখলাম, ম্যাকেদ-এর কথাই ঠিক। জেসপা ছেলে। বাকী তুজনের একজন ছেলে, আরেকজন মেয়ে। তাদের নাম তখনই ঠিক করে ফেললাম।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে দেখি তিনি চলেছেন। গাড়ি চলাচলের রাস্তা ধরে সোজা পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছেন। সঙ্গে চলেছে তার সন্তান-বাহিনী। তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে এগোলাম তাদের পেছন পেছন। আশা, খানকয়েক ছবি তুলবো সকলের। কিন্তু না, ক্যামেরা দেখেই রুখে দাঁড়ালো এল্‌সা। কান-টান সোজা করে লেজ মাটিতে আছড়ে যাকে বলে একদম মারমুখী ভঙ্গি। ভালোয় ভালোয় এক পা এক পা করে পিছিয়ে এসে ঢুকলাম তাঁবুতে। থাক বাপু, দরকার নেই। ছবি তোলার সময় ভবিষ্যতে অনেক পাবো। এখনই এই নিয়ে গোল পাকিয়ে লাভ নেই।

পরের ক'দিনও এলো এল্‌সা, কিন্তু একলা। সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কাউকেই আনলো না। বেশ অন্তরঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, ভাব-ভালোবাসা আগের মতোই আছে তার। শুধু স্বভাবের একটু যা হেরফের হয়েছে। আমাদের এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করতে এখন তার সৌজন্যে বাধে, খেলা-ধূলোও সে প্রায় ভুলতে বসেছে এবং সর্বোপরি চালচলনে তার ফুটে উঠেছে এক গাম্ভীর্য। আগের মতো সেই চপল-চঞ্চল এল্‌সা আর নেই। মনে মনে ভাবতাম, এখানে আসার সময় বাচ্চাদের সে কোথায় রেখে আসে! সে ফিরে না যাওয়া অবধি তাদের কি ডেরা থেকে বেরোতে নিষেধ করে আসে! কিংবা ডেরার অবস্থিতি কি বেশ নিরাপদ জায়গায়! এল্‌সার বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্ন নিতান্তই একতরফা। জবাব পাবার আশা কম। নেহাত নিজের থেকে যখন কিছু জানতে পারবো, তখনই পাবো এসবের সঠিক জবাব, তার আগে নয়।

উনিশে ফেব্রুয়ারী জর্জ তাঁবুতে আসতে আমি ফিরে চললাম ইসিওলোয়। লর্ড উইলিয়াম পার্সি এবং তাঁর স্ত্রী এসে রয়েছেন সেখানে। সপরিবার এল্‌সাকে একবার তাঁরা দেখতে চান। তাঁদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। চরাচর এ-ধরনের পরিদর্শকদের আমরা তফাতেই রাখি। কিন্তু এই তুজনের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম খাটে না। ওঁরা এল্‌সার ছেলেবেলা থেকে তার সম্বন্ধে যাবতীয় খবর জানেন। এল্‌সা-বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ আমাদের চেয়ে এতোটুকু কম নয়। সুতরাং সদলবলে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে জর্জ-এর মুখে শুনলাম, সে নাকি এর মধ্যে আরো একদিন বাচ্চাদের দেখেছে। ভোর সকালে এল্‌সার জল খাবার গামলা থেকে চকাস চকাস শব্দ উঠতে সে বেরিয়ে দেখে, গামলার চারপাশ ঘিরে সপরিবারে এল্‌সা। কিছুক্ষণ পরে জল খাওয়া শেষ হতে তারা যে যার চলে গেলো।

সে বললো, একটু আগে বাচ্চাদের নিয়ে নদী পেরিয়ে এপারে আসার চেষ্টায় ছিল এল্‌সা। আমাদের গাড়ির শব্দ শুনে কি মনে করে আবার গিয়ে ঢুকেছে জঙ্গলে।

সঙ্গে সঙ্গে গেলাম সেদিকে। এল্‌সার নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম। জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে। কিন্তু জল ভেঙে এপারে আসতে খুব একটা ইচ্ছে বোধহয় তার হলো না। লোভ দেখিয়ে এপারে আনার উদ্দেশ্যে জলের ধার ঘেঁষে রেখে দিলাম একটা ছাগল।

উঁহু, রেখে দিয়ে আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবো—সেটি চলবে না! অগত্যা, একটু সরে এসে অতিথিদের নিয়ে তাঁবুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। চকিতে জলে নামলো এল্‌সা, তার বাচ্চারাও নেমে পড়লো টপাটপ। এপারে এসে ছাগলটাকে কামড়ে ধরে সে আবার ফিরে গেল ওপারে। ঘাসের ওপর খাবার রেখে চারজন গোল হয়ে বসলো।

দুরবীনে চোখ রেখে তাদের প্রতিটি ভঙ্গি আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম। লর্ড এবং তাঁর স্ত্রী তো ভারী খুশী। তখনকার মতো খুশী মনেই সকলে এসে ঢুকলাম তাঁবুতে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যে হলো। ওপার থেকে ভেসে এলো এল্‌সার ক্রুদ্ধ গর্জন। তাড়াতাড়ি নদীর পারে গিয়ে জোরালো টর্চের আলো ফেললাম। দেখি, মস্ত এক কুমীর এসে কামড়ে ধরেছে ছাগলটার একখানা পা। অন্যদিক থেকে আরেকখানা পা শক্ত থাবায় ধরে এল্‌সা সমানে গর্জন করে চলেছে। হৈ-হৈ করে উঠলাম আমরা, হাততালি দিলাম। ছাগলের মায়া ছেড়ে কুমীরটা সরসর করে নামলো গিয়ে জলে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ওপারে গিয়ে দেখি, কুমীরটা লোভে লোভে পরে আবার ফিরে এসেছিল। এল্‌সার অন্যমনস্কতার সুযোগে চুপিচুপি অভুক্ত খাবারটুকু নিয়ে জলে নেমেছে।

ভাগ্যিস এল্‌সা ওর সঙ্গে যুঝতে যায়নি! ডাঙায় যা-ই হোক না কেন, জলে কুমীরের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। মস্তানী না দেখিয়ে এল্‌সা বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য এই বুদ্ধিটুকু ওর বরাবরের। কুমীরের সঙ্গে লড়তে গিয়ে চিরদিন ও নিজেকে সংযত রাখে। ঝোঁকের মাথায় হুটহাট

করে কিছু একটা করে বসে না। এক একটা কুমীর লম্বায় দশ থেকে বারো ফুট। সাধারণতঃ নদীর জল যেখানে গভীর, সেখানেই দল বেঁধে থাকে ওরা। এল্‌সা সযত্নে সে সব জায়গা এড়িয়ে চলে। অগভীর জায়গা দিয়ে নদী পার হয়। কিভাবে যে সে কুমীরের অবস্থিতি বুঝতে পারে— ভগবান জানেন !

আমরা অবশ্য এখানকার অধিবাসীদের কায়দা খাটিয়ে নদীতে কুমীরের অবস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতাম। কায়দাটা শিখিয়েছিল ম্যাকেদ। নদীর পারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে মুখ করে তিনবার 'ইঁয় ইঁয় ইঁয়' বলে শব্দ করতাম। কি যাদু ছিল সেই শব্দে, জানি না। আশেপাশে চারশো গজের মধ্যে কোনো কুমীর থাকলে একে একে তারা সকলে চলে আসতো ডাঙার কাছে, জলের ওপরে নাক উঁচু করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমরা একটু নড়াচড়া করলে তারাও চঞ্চল হয়ে ডুব দিতো জলে।

বারিংগো হ্রদে মাছ ধরতে গিয়ে কৌশলটা জর্জ-এর খুব কাজে লাগতো। দুজন সঙ্গীকে সে দাঁড় করিয়ে দিতো হ্রদের দু দিকে। এদিক থেকে একজন ইঁয় ইঁয় করতো। কুমীরগুলো ভেসে উঠতো এদিকে। তৎক্ষণাৎ ওদিকের লোকটিও একই রকম শব্দ করতো। সঙ্গে সঙ্গে এপার ছেড়ে তারা চলে যেতো ওপারে। মনের সুখে জর্জ এপারে ছিপ ফেলতো।

সে যাই হোক, সেদিন বিকেলে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে বসেছি উঠোনে. এল্‌সা এসে হাজির। একাই এসেছে। সঙ্গে বাচ্চাদের কাউকে আনেনি। অতিথিদের দেখে সে এতোটুকু অবাক হলো না। এগিয়ে গিয়ে যথারীতি তাদের পায়ে মুখ ঘষে আদর-আপ্যায়ন করলো। আমরা কয়েকটা ছবি নিলাম তার। আমাদের সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কাটিয়ে সে চলে গেলো। ছবি-টবির ব্যাপারে বরাবরই এল্‌সার অনাগ্রহ। বাচ্চা হবার পর সেটা বরং একটু প্রকট হয়েছে। আজ আপত্তি করলো না দেখে একটু অবাকই হলাম।

পরদিন সে আসতে লেডি উইলিয়াম বসে পড়লেন তাঁর রং-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে। আমি গিয়ে এল্‌সার কাছে বসে গায়ে হাত বোলাতে লাগলাম। দুবার চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালো এল্‌সা, চলে যাবার লক্ষণ দেখালো না। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি উঠলাম। গিয়ে ঢুকলাম তাবুতে। যেই না চোখের আড়াল হয়েছি, অমনি এক লাফে সে গিয়ে পড়লো লেডির সামনে। দু হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে দিল কয়েকটা ঝাঁকুনি। তারপর ছবি আঁকার সব সরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে এগোলো পাহাড়ের দিকে। এল্‌সার এ-ধরনের ব্যবহারের সঙ্গে লেডি অভ্যস্ত ছিলেন, তাই বাঁচোয়া। নইলে অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করে সে এক বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হতো।

পরদিন চা খাবার সময় নদীর ওপারে দেখলাম এল্‌সাকে। আজ আর সে একলা নয়, সঙ্গে তার তিনটি বাচ্চাই রয়েছে। আমাদের দেখে সাঁতরে সদলবলে এপারে এলো সে। তাড়াতাড়ি একটা ছাগল এনে দিলাম। টানতে টানতে ছাগলটা নিয়ে সে অদৃশ্য হলো ঝোপের আড়ালে। বাচ্চারাও গেলো তার পেছন পেছন।

খাওয়া শেষ করে তারা চারজন এলো নদীর পারে। ঘাড় নীচু করে জল খেতে লাগলো। আমরা দূর থেকে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম এই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য।

সামনের দু'পা মুড়ে ঘাড় এগিয়ে দিয়ে তারা মুখ রেখেছে জলে, চকাস চকাস শব্দে জিভে জল টানছে। নিস্তরঙ্গ জলে উঠছে এক মৃদু অথচ মনোরম কম্পন। বাঃ, অপূর্ব, চমৎকার!

তেষ্টা মিটিয়ে তারা তারপর নামলো জলে। শুরু হলো তাদের 'জলকেলি'। জলের গা ঘেঁষে রয়েছে এক মস্ত বড় পাথর। ডাঙ্গায় উঠে এক একজন উঠছে সেই পাথরের ওপর, তারপর ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। দেখে মনে হলো, কোন ওস্তাদ সাঁতারুদলের নানারকম জলক্রীড়া দেখছি আমরা।

তা সৌভাগ্যই বলতে হবে বাচ্চাদের। প্রকৃতি তাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন এই মনোহর সুন্দর পরিবেশ। চারপাশে পাহাড়ের সারি, মাঝখানে কবতোয়া নদী। নদীর পার ঘেঁষে অজস্র ঝোপ-ঝাড়। ঝোপের আড়ালে আড়ালে কত নাম-না-জানা জীব-জন্তুর বাস। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, গুহায় গুহায় রয়েছে গিরগিটি, সাপ। নদীর পারে খাঁড়িতে আছে অজস্র কচ্ছপ। রোদ উঠলে ডাঙায় উঠে তারা রোদ পোয়ায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন এক এক খণ্ড পাথর পড়ে রয়েছে ইতস্ততঃ।

আর কুমীর তো আছেই। এসব জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একমাত্র তারাই যেটুকু সাংঘাতিক। নদীতে এলিয়ে-পড়া অসংখ্য অ্যাকাসিয়া, ডুমুর বা পাম গাছের ছায়ায় তারা চুপচাপ বিশ্রাম নেয় বক-ধার্মিকের মতো। ডাঙায় শিকার এলেই হয়ে ওঠে চঞ্চল। আস্তে আস্তে ভেসে উঠে দেখে একবার শিকারকে, তারপর নিমেষে পারে উঠে কামড়ে ধরে তার পা, টানতে টানতে নিয়ে নামে জলে।

মুখপোড়া হনুমান থেকে শুরু করে বেবুন, গিরগিটি, সম্বর, চিতল হরিণ, শুয়োর—সকলেরই বাস এই অঞ্চলটায়। মাঝে-মধ্যে জল খেতে গণ্ডার কিংবা বুনো মোষও আসে। আর আসে একদল পাখী। রঙে-রূপে বিচিত্র তাদের গড়ন। মাছরাঙা, দোয়েল, কাঠ-ঠোকরা, বুলবুলি, ময়না,

টিয়া—অজস্র, অসংখ্য।

বড় বড় বেলে-হাঁসও আসে কখনও সখনও। বেলে হাঁসের মাংসের স্বাদ অপূর্ব। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝোপের সবুজ পাতার আড়াল দিয়ে যখন তারা হেঁটে বেড়ায় খাবারের সন্ধানে, দেখতে ভারী সুন্দর লাগে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে অবাক করে ফিন পাখীর দল। কালেভদ্রে এ অঞ্চলে আসে তারা। ছোট ছোট পা, গায়ে হলুদের ওপর নীল ডোরাকাটা পালক। সব সময় কেমন একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। একটু তাড়া দিলেই বালির ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে ঢোকে ঝোপের আড়ালে।

লর্ড উইলিয়ামস্ এবং তাঁর স্ত্রী গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি আর জর্জ বেরোলাম এল্সার সন্ধানে। বেশিদূর যেতে হলো না। দেখি, ওপারে ডাঙায় দাঁড়িয়ে চাপা গর্জন করে চলেছে এল্সা, জলের ওপর ঘাড় তুলে একটা কুমীর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

জর্জ ঘাড় থেকে বন্দুক নামালো। আমি তাকে নিষেধ করলাম—এ অবস্থায় গুলি করলে কুমীরটা মরবে ঠিকই, কিন্তু মাঝখান থেকে বাচ্চারা শব্দ শুনে ভয় পেয়ে যাবে। বরং তাকে বললাম চটপট তাঁবু থেকে এল্সার জন্যে খানিকটা মাংস নিয়ে আসতে।

গামলায় করে মাংস নিয়ে ফিরে এলো জর্জ। এল্সাকে ডাকলাম। বাচ্চাদের নিয়ে নিরাপদ এক জায়গা দিয়ে নদী পেরিয়ে এপারে এলো এল্সা। হাঁটতে হাঁটতে আমরা সকলে এলাম তাঁবুর বাইরের উঠোনে। জর্জ একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বালালো।

ভেবেছিলাম, এতো জোরালো আলো দেখে বাচ্চারা হয়তো ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু না, একটুও অবাক হলো না তারা। হয়তো, এটাকে একটা বড় ধরনের চাঁদ ভেবে এ ব্যাপারে ওরা খুব একটা আগ্রহ দেখালো না।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। জর্জ আলো নিভিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলো অন্ধকারে। খাওয়াদাওয়া সেরে এল্সা সপরিবারে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে। খানিকক্ষণ পরে ওপার থেকে ভেসে এলো তার সিংহের ডাক।

একদিন, ভোরের আলো তখনো ভালোভাবে ফোটেনি, এল্সার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। গেলাম বাইরে। দেখি, জল সাঁতরে ওপারের দিকে যাচ্ছে এল্সা।

আমার ডাক শুনে সে আবার ফিরলো। ঘাড় ঘুরিয়ে বাচ্চাদের ডাকলো। বাচ্চারা এপারে এসে আমার চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো। কাছে এলো না। তা না আসুক, আপত্তি নেই। আমাকে যে তারা এতোদিনে চিনতে পেরেছে—এটাই যথেষ্ট।

রকমসকম দেখে এল্‌সা কিন্তু খুব একটা খুশী হতে পারলো না! চাপা স্বরে বারবার ধমকালো সে বাচ্চাদের। নিজে আমার পায়ের গোড়ায় এসে শুয়ে পড়ে তাদেরও কাছে আসতে বললো। কিন্তু এলো না তারা। অগত্যা আমার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা ত্যাগ করে সে গিয়ে নামলো জলে। পেছন পেছন নামলো বাচ্চারা।

বেলা দশটা নাগাদ আবার ফিরে এলো সে। আগাগোড়া রাস্তাটা শুঁকতে শুঁকতে এলো। ঝোপঝাড়, গাছপালা—কিছুই বাদ দিলো না। তাঁবুটা এক চক্কর ঘুরে সে এগোলো সকালের সেই জায়গায়। আশেপাশের ঝোপঝাড়, শুকনো ডালপালা সরিয়ে কি যেন দেখলো। মাঝে মাঝে কয়েকটা হুঙ্কার দিলো। তারপর নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেলো। দেখলাম, ওপারের ঝোপঝাড়ও তন্নতন্ন করে খুঁজছে এল্‌সা। কি খুঁজছে, তা সে-ই জানে। খোঁজা শেষ করে সে চলে গেলো পাহাড়ের দিকে। খানিকক্ষণ পরে ভেসে এলো তার একটানা ক্রুদ্ধ গর্জন।

কি হলো এল্‌সার! কি খুঁজছে সে! তবে কি ওর বাচ্চারা হারিয়ে গেছে! অনুমানই সার, এগিয়ে গিয়ে যে দেখবো, সে সাহস হলো না। যেভাবে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ছে এল্‌সা—আমাদের দেখে কি করতে কি করে বসে—কে জানে!

তুপুর নাগাদ আমাদের প্রশ্নের জবাব মিললো। ইব্রাহিম ধরে নিয়ে এলো তিনজন আদিবাসীকে। কাঁধে তাদের ধনুক, হাতে বিষ-মাখানো তীর। প্রশ্ন করে জানলাম, বনে নাকি ওরা এসেছিল একটা হারিয়ে-যাওয়া ছাগল খুঁজতে। আসলে ছাগল-টাগল সব বাজে কথা। এসেছিলো ওরা শিকারের খোঁজে। বাচ্চারা ওদের দেখে ঘাবড়ে গেছে, হয়তো গিয়ে লুকিয়েছে কোথাও। এল্‌সা তাই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের।

তুদিন আর এলো না এল্‌সা। তিনদিনের দিন ভোরবেলায় আমরা সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম টানার জলপ্রপাত দেখতে। এই জলপ্রপাতটি সত্যিকারের এক দর্শনীয় বস্তু। পথ ভারী তুর্গম। তাছাড়া জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছেই। ইচ্ছে থাকলেও তাই সকলে গিয়ে দেখে আসতে পারে না।

দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। অহো, কি দেখিলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে প্রবল বেগে প্রায় চারশো ফুট নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলের রাশি! গুঁড়ো গুঁড়ো জল চারপাশে ছিটকে পড়ছে তুষার কণার মতো! একটানা একটা গুমগুম শব্দ উঠছে জলের!

টানা নদীর উৎপত্তি এই জলপ্রপাত। প্রবল স্রোতে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে নদী। আঁকাবাঁকা পথে এগোতে এগোতে একসময় উধাও হয়ে

গেছে পাহাড়ের আড়ালে ! একপাশে জল খানিকটা এগিয়ে এসে সৃষ্টি করেছে এক নিস্তরঙ্গ জলাশয়। একদল জলহস্তী জলাশয়ের জলে খেলে বেড়াচ্ছে। কি কুৎসিত দেখতে এই বিরাটাকৃতির জানোয়ারগুলো ! ওরাও যে খেলাধুলো করে বেড়ায়, কারো কোনো ক্ষতি করে না—এ না দেখলে বিশ্বাস করা দায়।

অবশ্য দেখতে খারাপ হলে কি হবে, গলার স্বর কিন্তু এদের বেশ ভরাট। চেলোর একেবারে খাদে যে সুর, সেই সুরেই এদের গলা বাঁধা।

তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি, এল্‌সা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে আছে উঠোনে। ইশারায় সকলকে চুপচাপ থাকতে বললাম। কথাবার্তার শব্দে বাচ্চারা ভয় পায়। কখন আবার এদিক-ওদিক পালিয়ে যায়, কে জানে ! দু মাস দশদিন বয়েস হলো ওদের। এল্‌সার ধমক-ধামক খেয়ে ইতিমধ্যে ওরা খানিকটা বুঝমান হয়ে উঠেছে। মায়ের দুধ এখন আর পায় না। মাংস-টাংস খেয়েই পেট ভরায়। সেদিনই দেখলাম এক কাণ্ড। এল্‌সাকে বসে থাকতে দেখে একটা বাচ্চা এগিয়ে গিয়ে যেই না মুখ দিয়েছে দুধের বোঁটায়, অমনি হাতের এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে এল্‌সা এক লাফে চড়ে বসলো গাড়ির ছাদে। বাচ্চাটা অনেকক্ষণ হতবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো গাড়ির কাছে। পেছনের দু'পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির বনেট আঁচড়ালো, কত কাকুতি মিনতি করলো। এল্‌সার মন গললো না। সে একইভাবে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বসে রইলো তার জায়গায়।

বাচ্চাটা অনেকক্ষণ আচড়ে-কামড়ে, কেঁদে-ককিয়ে শেষবেলা ক্ষান্ত দিলো। গিয়ে তার ভাইবোনের সঙ্গে খেলায় মাতলো।

এল্‌সা তার জায়গায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তাদের দিকে। খেলতে খেলতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো তারা। অমনি এক লাফে গাড়ির ছাদ থেকে নেমে এল্‌সা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এলো। চোখ পাকিয়ে সকলকে শাসন করে সে আবার গিয়ে উঠলো উচ্চাসনে।

এরপর দুদিন এল্‌সা একাই এলো তাঁবুতে। দুদিনই এলো ঠিক বিকেলের চা খাবার সময়। এসে সোজা উঠে পড়লো আমাদের চায়ের টেবিলে, কাপ-টাপ এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। এর আগেরবার এল্‌সার ছেলেবেলার কাণ্ডকারখানা দেখতে এসে লেডী উইলিয়ামস্ অভিযোগ করেছিলেন - বাসনপত্র সব কেন পলিথিনের কিনেছি আমি। সে প্রশ্নের জবাব সেবার দিতে পারিনি, এবার দিলাম। এল্‌সার ভালোবাসার বহর দেখিয়ে বললাম—এই জন্যেই পলিথিনের বাসনকোসনের

আমি ভক্ত।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা এল্‌সা আবার সপরিবারে হাজির। এদিন তার বাচ্চাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমাদের কথাবার্তা বা একটা গেলাস-বাটির শব্দে একটুও চম্‌কালো না তারা। যেমন খেলা করছিল, তেমনি করতে লাগলো।

আসলে, আমাদের ওরা চিনে গেছে। আমাদের কোনো কিছুতেই ওরা আর অবাক হয় না। হয়তো এতোদিনে বুঝতে পেরেছে, আমরা ওদের পরিবারের যথার্থ বন্ধু, আমাদের তরফ থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশঙ্কা ওদের নেই।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। খেতে শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে এল্‌সা তার বাচ্চাদের নিয়ে রেখে এলো একশো গজ দূরের এক ফাঁকা জায়গায়। তারপর ফিরে এসে খাওয়ায় মন দিলো।

বাচ্চারা নিজেদের মনে খেলে বেড়ালো সেখানে। মায়ের খাওয়ার সময় তাকে আর অযথা বিরক্ত করতে এলো না।

সে-রাতে একটানা বৃষ্টি হলো। সাধারণতঃ এমন বৃষ্টি হলে জর্জ-এর তাঁবুতে এসে ঢুকতো এল্‌সা, সারারাত সেখানেই কাটাতো। সেদিনও সে এলো। তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের কত ডাকলো—বাচ্চারা এলো না। বৃষ্টি দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না। উঠোনময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো তারা। এল্‌সা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে নিজেও গিয়ে যোগ দিলো তাদের খেলায়।

জলের মধ্যে তাদের ছুটোছুটির শব্দ শুনতে শুনতে সবে দু'চোখ বুজে এসেছে, হঠাৎ শুনি এক নতুন শব্দ। আমাদের অতিথিদের তাঁবুর দিক থেকেই যেন এলো শব্দটা, কি যেন একটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, লর্ডদের তাঁবুটা ভেঙে পড়েছে। ওঁরা দুজন ভেজা ত্রিপলের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

জর্জকে ডেকে এগিয়ে গিয়ে হাত লাগালাম। বৃষ্টিতে ভিজে খুঁটি সোজা করে পেরেক পুঁতে তাঁবু ঠিক করলাম। এল্‌সা এবং তার বাচ্চারা খেলা থামিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগলো আমাদের কাণ্ড-কারখানা। হাতুড়ির শব্দে বাচ্চারা চমকে চমকে উঠলো। এল্‌সা মৃদু স্বরে তাদের সান্ত্বনা দিলো, বোঝালো—ঘাবড়াবার কিছু নেই, এটাও এক ধরনের খেলা।

বাকী রাতটুকু তাঁবুর বাইরে কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে চলে গেলো এল্‌সা। বলা বাহুল্য, বাচ্চাদেরও সঙ্গে নিয়ে গেলো।

সকালের দিকে রোদ উঠলো। কালকের যাবতীয় ভেজা জামাকাপড়

শুকিয়ে লর্ড এবং লেডী উইলিয়ামস্‌-এর সঙ্গে দুপুর নাগাদ ইসিওলোর দিকে রওনা দিলাম। জর্জ একলা রইলো তাঁবুতে। বৃষ্টি যেভাবে শুরু হয়েছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা কদিন ভালো থাকে—কে জানে! সুতরাং ভালো থাকতে থাকতে ওঁদের ইসিওলোয় পৌঁছে দিয়ে অমনি দিন কয়েক ওখানে কাটিয়ে আসা যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ।

॥ ৪ ॥

দুদিন পর ফিরে এসে জর্জকে ছুটি দিলাম। সে চলে গেলো ইসিওলোয়। এবার এসে একটা নতুন ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। আমার ওপর এল্‌সার বিশ্বাস আগের চেয়ে বরং খানিকটা বেড়েছে। কিন্তু জর্জ-এর সাঙ্গো-পাঙ্গোদের সে যেন ঠিক বরদাস্ত করে উঠতে পারছে না। সময়ে-অসময়ে আমার তত্ত্বাবধানে বাচ্চাদের রেখে সে নিশ্চিন্তে চলে যায় বনে-বাদাড়ে, ফিরে এসে আবার তাদের দায়িত্ব বুঝে নেয়।

পর পর ক'রাত হলো বৃষ্টি। তা বৃষ্টিও বৃষ্টি—আকাশ ফুটো করে জল পড়ছে তো পড়ছেই। বজ্র-বিদ্যুতের বিরাম নেই। সব মিলিয়ে দুর্যোগই বলা চলে।

জর্জ-এর তাঁবু খালি। ভেবেছিলাম, ঝড়-বাদলের কটা রাত এল্‌সা তার বাচ্চাদের নিয়ে জর্জ-এর তাঁবুতেই কাটাবে। তার নিজের ইচ্ছেও সেরকমই ছিলো। কিন্তু হলে কি হয়! এখন তো আর সে একলা নয়—চারজন। বাকী তিনজনের ইচ্ছেই এখন তার ইচ্ছে। তারা চায় না তাঁবুতে ঢুকতে, উঠোনে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ছুটোছুটি করেই তারা রাত কাটায়। অগত্যা এল্‌সাকেও মেনে নিতে হয় তাদের সিদ্ধান্ত।

তবে হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে খেলা করুক আর যা-ই করুক, এল্‌সার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কিন্তু একদিকে। খেলা করতে করতে সে ঘুরে-ফিরে আসে তাঁবুর কাছে, বাচ্চাদের ডাকে, নিজে ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়ে তাঁবুতে। ভাবখানা এমন—যেন না জেনে-শুনেই সে ঢুকে পড়েছে! বাচ্চারাও আসুক, এসে একবার দেখে যাক—কি হাতি-ঘোড়া আছে এখানে! কখনো আবার আমার পিঠের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সে বাচ্চাদের ডাকতো, আমার কাছে তাদের এগিয়ে আসতে বলতো। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হতো না। আমার এবং বাচ্চাদের মধ্যে যে ব্যবধান—তা শত ছল-চাতুরীতে কমানো যেত না।

বোকা—একেবারেই বোকা! এই কদিন হলো ওরা দেখেছে পৃথিবীর আলো। শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ এতো তাড়াতাড়ি বুঝবে কিভাবে! তাছাড়া, তুমি এল্‌সা—তুমিও তো কম দোষী নও! এখন যতই যা করো, আসল অপরাধী তো তুমিই। জন্ম হবার পর পাঁচ-ছ' সপ্তাহ বাচ্চাদের আমাদের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দাওনি, এখন গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি লাভ।

তা চেষ্টা ছাড়লো না এল্‌সা। একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি বসে আছি তাঁবুতে, এল্‌সা এসে ঢুকলো। আমার পেছনে শুয়ে পড়ে মৃদুস্বরে বাইরে অপেক্ষমান বাচ্চাদের সে ডাকলো—দুধ খেয়ে যেতে বললো।

বাচ্চারা এলো না। আমার দিকে করুণ চোখে তাকালো এল্‌সা—বলতে চাইলো, তুমি কিছু একটা করো। অন্ততঃ ওদের ভেতরে আসার বন্দোবস্তটুকু করো। কিন্তু না, আমি নড়লাম না। প্রথমতঃ, অভিমান আমারও মনে আছে। দ্বিতীয়তঃ, উভয়সঙ্কট অবস্থা আমার—আমি উঠে বেরিয়ে গেলে হয়তো বাচ্চারা তাঁবুতে ঢুকতে পারে, কিন্তু তাতে এল্‌সার উদ্দেশ্য সফল হবে না। সে চায়, আমাকে এবং তার বাচ্চাদের কাছাকাছি দেখতে, উভয়ের মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক স্থাপন করাতে।

সবচেয়ে গোল বাধতো বিকেল নাগাদ। রোদের তেজ পড়ে এলে রাশি রাশি ডাঁশ এসে ছেঁকে ধরতো এল্‌সাকে। অসহায়ের মতো সে তখন মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতো, আমার সাহায্য প্রার্থনা করতো। আমি চড়-চাপড় মেরে ডাঁশগুলোকে তাড়িয়ে দিতাম, এল্‌সার কষ্ট লাঘব হতো। এক একটা চড় মারতাম, বাচ্চারা দূর থেকে গুঁড়ি মেরে মারমুখী ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে। ভাবতো, ওদের মায়ের ওপর আমি হয়তো নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছি, মায়ের তরফ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তারা আমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় কি! এল্‌সার ভাবগতিক দেখে তাদের নিরাশ হতে হতো। মানুষের হাতের চড় খেয়েও যে তাদের মা খুশী হতে পারে, আনন্দে-কৃতজ্ঞতায় লেজ নাড়তে পারে—চোখে দেখেও একথা বিশ্বাস করতে বোধহয় তাদের মন চাইতো না।

একদিন এল্‌সা, জেসপা এবং ছোটো এসে জল খাচ্ছে তাঁবুর সামনে। গোপা দূরে দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে। দূরে কেন—না জলের গামলার ফুটখানেক দূরে বসে আছি আমি—আর কি সে আসতে পারে! দু'-একবার মুখ ফিরিয়ে ডাকাডাকি করে অবশেষে এল্‌সা নিজেই গেলো, মাথা নীচু করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কি সব যেন বললো, তারপর নিয়ে এলো তাকে জলের গামলার কাছে। অনিচ্ছাসত্ত্বে জলে মুখ দিয়ে আমার

দিকে আড়চোখে কয়েকবার তাকালো গোপা। মায়ের দিকে চোখ ফেরালো। তারপর আবার জল খেতে লাগলো।

জেসপার স্বভাবটা একেবারে অন্যরকম। ভয়ডরের ধার সে ধারে না। ভীষণ সাহসী। সব সময় যেন একটা বেপরোয়া ভাব তার চালচলনে।

একদিন···চার মা-ছেলেমেয়ে মিলে তাঁবুর সামনে বসে বসে একটা গোটা ছাগল প্রায় শেষ করলো। পেট সকলের দমসম। এদিকে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। এল্‌সা তার বাচ্চাদের ডেকে এগোলো পাহাড়ের দিকে। গোপা আর ছোটো চললো তার পেছন পেছন। জেসপা গেলো না। সে তখনো ছাগলের অবশিষ্ট ঠ্যাংটা দু হাতে চেপে আপন মনে গ-র-র-র করেই চলেছে।

খানিক দূর এগিয়ে হুঁশ হলো এল্‌সার---তাইতো, জেসপা তো এখনো এলো না! ছুটে এসে ধমকালো সে জেসপাকে, মারবে বলে থাবা তুললো। জেসপা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে কামড় বসালো মাংসে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে চললো এল্‌সা।

জর্জ ফিরে আসতে আমি আবার ছুটলাম ইসিওলোয়। কাজকর্ম সেখানেও কিছু কিছু থাকে। তাঁবুতে দিনের পর দিন বসে থাকলে আমার চলবে কেন!

অবশ্য এদিকের ব্যাপারে আমি এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। এল্‌সা বা বাচ্চারা এখন তাঁবুর ধারেকাছে চোখের সামনেই থাকে। তাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আমাদের আর অসুবিধা হয় না। সবই ভালো, সুন্দর। শুধু গোলমাল যা কিছু—এল্‌সার স্বামীটিকে নিয়ে।

দোষ যে আমাদের একেবারে নেই, তা-ও নয়। বাবা তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশবে, খেলাধুলো করবে, আনন্দ-ফূর্তি করবে—এটাই নিয়ম। কিন্তু আমাদের জন্য সেটুকুও সে করে উঠতে পারে না। রাগে তাঁবুর আশেপাশে এসে সারারাত গজরায়, আর সুযোগ পেলেই এল্‌সাদের জন্য রাখা খাবার চুরি করে নিয়ে পালায়।

তা এটুকুতেই তার আশা মিটলে নয় কথা ছিলো। সামান্যে সন্তুষ্ট হবার পাত্র সে নয়। একদিন এক লাফে গাড়িতে উঠে গাড়ির ভেতর থেকে এল্‌সার জন্যে আনা একটা ছাগল সে নিয়ে যাবেই যাবে। হৈ হৈ করে চার দিক থেকে তাড়া দিতে সে-যাত্রা সে পালালো। সন্ধ্যেবেলাই আবার ফিরে এলো। এল্‌সা আর তার বাচ্চারা উঠোনে বসে তখন খাচ্ছে সেই ছাগলটা। হঠাৎ সে এসে হাজির। আচমকা তাকে দেখে ঘাবড়ে গেলো

এল্‌সা। খাবার ফেলে বাচ্চাদের নিয়ে সে লুকোলো গিয়ে তাঁবুর পেছনে। জর্জ এবং ম্যাকেদ বেরোলো টর্চ নিয়ে। হাততালি দিলো, হৈ হৈ করলো। পাশের এক ঝোপের আড়াল থেকে এক প্রবল হুঙ্কার ছেড়ে সে ছুটলো পাহাড়ের দিকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এল্‌সা আবার তার গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে খাবারে মন দিলো।

পরদিন ঘটলো আরেক ঘটনা। নদীর দিক থেকে এল্‌সার হাঁকডাক শুনে জর্জ গিয়ে দেখে, বিরাট এক কুমীর ডাঙায় শুয়ে এল্‌সার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে আর লেজ আছড়াচ্ছে। গুলি ছুঁড়লো জর্জ। কুমীরটা মরলো। লম্বায় সে মোট বারো ফুট দু ইঞ্চি। এই ক্ষুদে দৈত্যের পাল্লায় পড়লে এল্‌সার যে কি দশা হতো, বলা মুশকিল!

এদিকে ইসিওলোয় আমাদের বাড়ি ঘিরে তখন জমে উঠেছে আর এক নাটক। একদিন বিকেলে বারান্দার সিঁড়িতে বসে তাকিয়ে আছি দূরের পাহাড়ের দিকে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে, আকাশ লালে লাল। যেন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ফাগ ওড়াচ্ছে পরী-অপ্সরীরা।

হঠাৎ চমক ভাঙলো। বৈঠকখানা থেকে থপ থপ করতে করতে কেউ যেন গিয়ে ঢুকলো জর্জ-এর শোবার ঘরে। আমার ঘরে বালিশের নীচে রাখা আছে রিভলবার। কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আমার ঘর। কিন্তু সাহসে কুলোলো না। এখান থেকে উঠে যাবো যে ঘরে—ভাবতেও কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগলো। পায়ের শব্দটা একেবারে নতুন। পরিচিত কোনো শব্দই এর সঙ্গে মেলে না। একইভাবে বসে বসে ঘামতে লাগলাম। অবশেষে সাতপাঁচ নানারকম ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারলাম জর্জ-এর শোবার ঘরের দরজায়।

নাঃ, ঘরে কেউ নেই। ক্যাম্প-খাটের তলা থেকে শুরু করে ঘরের সিলিং—সর্বত্র দৃষ্টি ঘোরালাম। কিছুই নজরে এলো না। হঠাৎ কলঘরের আধভেজানো দরজটার দিকে চোখ গেলো। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দরজা একটু ঠেললাম। একটা প্রবল ঝটাপটির শব্দ হলো। একলাফে তিন পা পেছিয়ে এলাম। চোখের নিমেষে খোলা দরজা-পথে বেরিয়ে এলো এক শজারু। বর্শাফলকের মতো গায়ের কাঁটাগুলো খাড়া করে, তীরবেগে সে বেরিয়ে গেল খোলা দরজা-পথে। হতবিহ্বল অবস্থায় তার গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ফেটে পড়লাম অট্টহাসিতে। শজারু স্বভাবতঃ একটু ভীরু প্রকৃতির। কারো কোনো ক্ষতি এরা করে না। অথচ কি ঘাবড়েই না গিয়েছিলাম আমি!

ইসিওলোয় এইসব ছোটোখাটো জন্তুজানোয়ারই ছিল আমার নিত্যসঙ্গী।

বাইরে উঠোনে এক বিরাট গামলায় রাখা থাকতো জল। দিনের বেলায় নাম-না-জানা পাখীরা এসে জল খেতো, মাথা ডুবিয়ে চান করতো। বেজি, কাঠবেড়ালি—এরাও আসতো দল বেঁধে। রাতে আসতো চিতল হরিণ, সম্বর, জেব্রা এবং চিতা। একদিন এক হাতিকেও দেখা গেলো। শুঁড় ডুবিয়ে এক চুমুকে অতবড় গামলার সবটুকু জল নিঃশেষ করে সে হেলতে দুলতে চলে গেলো বনের দিকে।

তা রাতদিন বসে বসে যে ওদের কাণ্ডকারখানাই দেখতাম—তা নয়। অন্য কাজও করতে হতো আমাকে। রোজ আমার নামে চিঠি আসতো পাঁজা পাঁজা। এল্‌সার কাহিনী পড়ে মুগ্ধ স্তাবকের দল পাঠাতো চিঠি। প্রতিটি চিঠির জবাব দিতে দিতে আমার তো প্রাণ ওষ্ঠাগত।

সকলেই আসতে চায় আমাদের তাঁবুতে, এসে কদিন থেকে এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের দেখে যেতে চায়। কি বিপদ, বলুন দেখি! হাজার হলেও এল্‌সা আমাদের একান্ত নিজস্ব। ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যুরিস্ট এসে তাকে দেখে যাবে—এটা জর্জ বা আমার কারুরই মনঃপুত নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের মনের কথাটি জানিয়ে তাই সকলকে জবাব লিখতে হতো। চিঠির দৈর্ঘ্য অনিবার্য কারণেই বেড়ে যেতো।

তড়িঘড়ি ইসিওলোর কাজকর্ম শেষ করে রওনা দিলাম। কদিন সমানে বৃষ্টি হয়েছে। নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় জলের তলায়। কোথাও জল এক ফুট, কোথাও কাদা এক কোমর। গাড়িতে চড়বো কি—গাড়ি ঠেলেই পাই না কূল! নুরু, ইব্রাহিম আর আমি—তিনটি মাত্র প্রাণী, হাত তো আমাদের মোটে ছ'খানা।

তিনটে নদী যা-ও বা কষ্টেসৃষ্টে পেরোলাম, চতুর্থ বা শেষ নদীটার কাছে এসেই হলো মুশকিল। পাহাড়-ধোওয়া জলে নদী হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। এ নদী পার হতে যাওয়া মানে জেনেশুনে বিপদকে কোলে টেনে নেওয়া। সুতরাং নিরুপায় হয়ে বসে রইলাম পারে, কখন জল কমে—সেই অপেক্ষায়।

তা বসে তো রয়েছি, এদিকে পায়ে পায়ে সন্ধ্যে যে নেমে এলো—এখন উপায়! অত বড় তাগড়া জোয়ান আমাদের সঙ্গী দুটি—দেখি, তারাও মক্কার দিকে মুখ করে বসে গেছে নমাজ পড়তে।

নুরুকে দেখে বড় মায়া হলো। আহা বেচারা এই সেদিন উঠলো অসুখ থেকে, এখন আবার আমার সঙ্গে জল-কাদা ঠেলছে, বৃষ্টিতে ভিজছে! ছ'মাস এখানে ছিলো না সে, অসুখ হতে দেশে চলে গিয়েছিলো। আফ্রিকার কালাজ্বর—পৃথিবী বিখ্যাত অসুখ। ভগবানের কৃপায় সুস্থ হয়েই ফিরে

এসেছে। কিন্তু আসার পর থেকে হয়েছে এক নতুন গোলমাল। ওর ধারণা—এল সাই ওর অসুখের কারণ, ওর ওপর তার কু-নজর পড়েছে। অথচ দেখুন—সেই এত্তোটুকু বয়েস থেকে এল্‌সার সঙ্গে সঙ্গে আছে ও। বলতে গেলে, একরকম কোলে-পিঠে করেই মানুষ করেছে এল্‌সাকে। এখন সেই এল্‌সাই তার চোখের বালি। অদৃষ্ট আর কাকে বলে!

তা আমারও জেদ চেপে গেছে। অন্য সময় হলে হয়তো ওকে ইসিওলোয় রেখে আসতাম। কিন্তু এখন একরকম জোর করেই নিয়ে চলেছি সঙ্গে। এল্‌সার ব্যাপারে ওর মনের খুঁতখুঁতুনিটা মেটানো একান্ত দরকার।

নদীর ধারে গাড়িতে বসে কথায় কথায় ওর শরীর খারাপের প্রসঙ্গ উঠলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এল্‌সাকে দোষ দিলো সে। আমি নানা কথা বলে তাকে বোঝালাম। সবশেষে এল্‌সার বাচ্চার কথা বললাম। শুনে বোধহয় একটু ধাতস্থ হলো নুরু। অসুখের ব্যাপারে আর কথা তুললো না।

রাত বাড়তে বৃষ্টি কমলো। নদীর জলও নামতে নামতে একেবারে আগের অবস্থায় পৌঁছলো। এবার স্বচ্ছন্দে গাড়ি পার করে নিয়ে গেলাম ওপারে। তাঁবুতে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর চারটে বাজলো।

বিকেলবেলা বেরোলাম দল বেঁধে। উদ্দেশ্য, নুরুকে এল্‌সার বাচ্চাদের দেখাবো। নদীর দিকে কিছুদূর এগিয়েছি, থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের ডানপাশের ঝোপটার আড়াল থেকে ভেসে এলো এল্‌সার গলার স্বর। বোধহয় বাচ্চাদের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলছে।

ডাকতে হলো না। আমাদের গায়ের গন্ধ এল্‌সার চেনা। এক লাফে বেরিয়ে এলো সে ঝোপের আড়াল থেকে। নুরুকে এতোদিন পর দেখে সে যারপরনাই খুশী হলো।

অবশ্য নুরুও কম খুশী হয়নি। এল্‌সাকে জড়িয়ে ধরে কত আদরই না করলো সে! আমি দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম। বুক থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেলো। এল্‌সাকে সে যে ভালো মনে নিতে পেরেছে—এটাই যথেষ্ট। কু-নজর টু-নজরের কথা আর ক'দিন পরে ও নিজের থেকেই ভুলে যাবে।

তা এতো আদর-তোয়াজ নুরুর—সবই বিফলে গেলো। হাঁটতে হাঁটতে সেই যে ঝোপের আড়ালে চলে গেলো এল্‌সা, আর বেরোলো না। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

সন্ধ্যে পড়তে মনের আশা পূর্ণ হলো। সপরিবারে তাঁবুতে এলো এল্‌সা। নুরু তাড়াতাড়ি একটা ডে-লাইট এনে রাখলো উঠোনে। ব্যস্, অমনি শুরু হয়ে গেলো বাচ্চাদের খেলা। ছুটোছুটি করে, এ-ওর গায়ে পড়ে

মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে সে এক তুলকালাম কাণ্ড। চোখ জুড়িয়ে গেলো সকলের। সবচেয়ে বেশি খুশী হলো মুরু। এল্‌সাকে নিয়ে নিজেও সে নেমে পড়লো উঠোনে।

পর পর খানকতক ছবি নিলাম ওদের। এবার আর বাচ্চাদের বা এল্‌সার তরফ থেকে ছবির ব্যাপারে কোনো আপত্তি উঠলো না।

ভেবে-চিন্তে দেখলাম, ছবি নেবার উপযুক্ত সময় বিকেলে বা সন্ধ্যা। বিকেলে ওরা খেলতে যায় নদীর পারে। জায়গাটা ভারী মনোরম। খেলাধূলোর বেশ প্রশস্ত পরিবেশ। টানা বালির চর। একটা গাছ এক জায়গায় হেলে পড়েছে জলে, চারপাশে ছোট ছোট কাঁটা-ঝোপ, ছোট ছোট নুড়ি-পাথর—সব দিক থেকেই সুন্দর। আমি আর জর্জ ক্যামেরা নিয়ে লুকিয়ে থাকতাম কাছাকাছি এক ঝোপে। ওরা জানতো, বুঝতো —আমরা কাছেই আছি। তবু রুখে দাঁড়াতো না বা খেলা বন্ধ করতো না। আমরাও জুত করে একের পর এক ছবি তুলতাম।

দোসরা এপ্রিল জর্জ চলে গেলো ইসিওলোয়। আমি রইলাম তাঁবুতে। ক'দিনে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বাচ্চারা বয়েসের তুলনায় যেন একটু বেশি লাজুক হয়ে পড়েছে। আমার কাছে ঘেঁষতে তারা যারপর-নাই লজ্জা পায়। এমন কি, খেতে দিয়ে আমি কাছে বসে থাকলে তারা ভুলেও এগিয়ে আসে না। দূরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে করুণ চোখে খাবারের দিকে চোখ তুলে তাকায়। অগত্যা আমি উঠে ঢুকি গিয়ে তাঁবুতে, তারা অমনি এগিয়ে আসে।

এদিকে দেখা দিলো এক নতুন মুশকিল। উঠোনে ফেলে-রাখা অভুক্ত মাংস রোজ রাত্তিরে চুরি হয়ে যায়। কে না কে যেন এসে নিয়ে যায় টেনে। একে বর্ষাকাল, ছাগল-টাগল এমনিতেই দুর্লভ। এ-অবস্থায় মাংস চুরি · সাবধান হওয়া দরকার। একটা উপায় বের করতে হবে।

তা ইব্রাহিমই বাতলালো উপায়টা—উঠোনে না ফেলে রেখে মাংস তাঁবুতে এনে রাখুন, শিকল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখুন। ব্যস্, মানুষ-সমান উঁচু কাঁটাঝোপের বেড়া টপকে মাংস চুরি করা কোনো জন্তুর আর সাধ্যে কুলোবে না।

অতএব সে-ব্যবস্থাই হলো। রোজ অভুক্ত মাংসটুকু টানতে টানতে নিয়ে আসতাম তাঁবুতে, শিকল দিয়ে আচ্ছাসে বেঁধে রাখতাম খুঁটির সঙ্গে। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে শুনতাম নানারকম পায়ের শব্দ। উঠোনে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে তারা যে যার ফিরে যেতো। পরদিন এল্‌সা এলে সেই মাংস এনে দিতাম তাকে।

তা এমনিভাবেই চলছিল। একদিন হলো এক মজা। এল্‌সারা খাওয়া-দাওয়া সেরে খেলা করছে উঠোনে, আমি অভুক্ত মাংসটুকু টানতে টানতে নিয়ে চলেছি তাঁবুর দিকে—হঠাৎ জেসপা চঞ্চল হয়ে উঠলো। খেলাধুলো থামিয়ে সে গুঁড়ি মেরে বসলো মাটিতে। তারপর প্রচণ্ড বেগে আমাকে লক্ষ্য করে দিলো এক লাফ।

চকিতে পাশ কাটালাম, ডানদিকে কয়েক পা সরে এলাম। ততক্ষণে এল্‌সাও দিয়েছে লাফ, চোখের নিমিষে আমার এবং জেসপার মাঝখানে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জেসপা শূন্য থেকে মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে দিলো এক কড়া ধমক, বুঝিয়ে দিলো—আমি তাদের বন্ধু। খাবার টেনে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গিয়ে আমি তাদের উপকারই করছি। জেসপা যেন আর কখনো এই ধরনের ছেলেমানুষি না করে।

জেসপা কিন্তু মায়ের বকুনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলো না। চুপচাপ তাঁবুর বাইরে সে বসে রইলো সারাক্ষণ। এদিকে এল্‌সাও তার ছেলের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁবুর দরজা ছেড়ে এক পা'ও নড়লো না। আমার এবং জেসপার মাঝখানে একভাবে বসে আমাকে পাহারা দিতে লাগলো।

নাঃ, কাজটা এল্‌সা বোধহয় ভালো করলো না! এমনভাবে জেসপার ইচ্ছেয় বাধা দিয়ে সে আমার প্রতি তার হিংসের আগুনটাকে নিজের অজানতেই বোধহয় উসকে দিলো। অবশ্য হিংসে করেই বা করবে কি জেসপা! ঐটুকু একটা বাচ্চা, নখে এখনো ধার ওঠেনি, দাঁতে জোর নেই—বড়জোর আমাকে ধরে একটু আঁচড়ে-টাঁচড়ে দেবে। এ ছাড়া আর কি করার সাধ্য তার!

কিন্তু তবুও আমি চাই, আমাদের মধ্যে একটা সন্ধি-গোছের কিছু হয়ে যাক। বড় হয়ে এই রাগ যদি সে মনে জিইয়ে রাখে, তবেই বিপদ। আমি চাই ধীর-সুস্থির হয়ে থাকতে। ওকে রাগাতেও চাই না, আবার পোষ মানাতেও চাই না। ঠিক মাঝামাঝি একটা অবস্থা...না রাগ, না আপোস...এরকম ভাবেই কাটাতে চাই আমার জঙ্গলের জীবন।

তা এল্‌সারও মনের ইচ্ছে বোধহয় এমনই। সে-ও চায় একটা মিল-মিশ করে থাকতে। সেই ঘটনার পরে তার ভাব-ভঙ্গি দেখে ভারী মজা পেয়েছি। ঘটনাটায় আমি যে খুব একটা খুশী নই, একথা যেন সে বুঝতে পেরেছিলো। তাই এরপর থেকে যখনই সে আসতো তাঁবুতে, আমাদের দু'জনকে চোখে চোখে রাখতো। হয়তো খেলা করছে ওরা উঠোনে, দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে আমি কয়েক পা এগিয়ে গেছি, অমনি এল্‌সা ছুটে আসতো আমার কাছে, দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে গতিরোধ

করতো। যেন বলতে চাইতো—যথেষ্ট হয়েছে বাপু, আর নয়। এবার মানে মানে পেছিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও। আগে বাড়িয়ে আদিখ্যেতা দেখাতে গিয়ে আবার নতুন কোনো গণ্ডগোল পাকিয়ে বোসো না।

হয় তাঁবু, নয় পাহাড়ের সেই চিরকেলে আস্তানা—এই-ই এল্সার বসবাসের জায়গা। একদিন হয়েছে কি, বিকেলে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে আমি আর নুরু গেছি পাহাড়ে। উদ্দেশ্য, বিরাট আকাশের পটভূমিতে এল্সার কয়েকটা ছবি নেবো। যত ছবিই নিই না কেন সূর্যের দিকে ক্যামেরার মুখ করে ছবি তুলতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

কিন্তু আমার ভালো লাগলেই তো হবে না। যার ছবি তুলবো, তারও সম্মতি থাকা চাই। ক্যামেরা ঠিক করে আছি দাঁড়িয়ে, হঠাৎ দেখি, এল্সা নেমে আসছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। হায় রে কপাল! নামার আর সময় পেলি না তুই!

খানিকক্ষণ পরে সামনের একটা টিলার ওপর উঠলো সে। ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছি—হঠাৎ দেখতে পেলো সে আমাদের। মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো, তড়বড় করে নেমে ঢুকলো জঙ্গলে।

জেদ চেপে গেলো আমার। নাঃ, আজ আর ছাড়ান-ছুড়িন নেই। ছবি আজকে তুলবোই তুলবো। দেখি, কতক্ষণ জঙ্গলে বসে থাকতে পারে বদমাশটা!

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা টনটন করতে লাগলো। দিনের আলো ম্লান থেকে ম্লানতর হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেলো। আকাশে জ্বলে উঠলো দু-একটা নক্ষত্র। দূরে জঙ্গলের অন্ধকারে হাজার হাজার জোনাকী শুরু করলো তাদের জ্বলা-নেভার খেলা। এমন সময় হেলতে-দুলতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো এল্সা। নিশ্চিন্ত মনে উঠে গিয়ে বসলো টিলার ওপর।

অগত্যা নিষ্ফল চিত্তে ফেরার পথই ধরলাম।

॥ ৫

সেদিন ঘুম ভাঙলো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে। পাখীর ডাকের বদলে গাড়ির ডাক। অবাক হয়ে এলাম বাইরে। দেখি, একখানা ল্যাণ্ডরোভার এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে।

গাড়ি থেকে নামলো দুজন অপরিচিত লোক। বললো, জর্জ তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। গডফ্রে উইন এবং সাংবাদিক ডোনাল্ড ওয়াইসকে নিয়ে সে আজই এসে পৌঁছচ্ছে প্লেনে। (তাঁবু থেকে মাইল কুড়ি দূরে আছে এক ছোট বিমানবন্দর।) আমি যেন মাননীয় অতিথিদের যাবতীয় বন্দোবস্ত করে রাখি।

খবর শুনে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! কেউ আসবে ভাবতেই আমার শরীরে যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসে। এল্‌সা মোটে সহ্য করতে পারে না অজানা লোকজনদের। আগে যেটুকু বা পারতো, এখন বাচ্চাকাচ্চা হওয়ায় সেটুকুও গেছে। লোকজন দেখলেই ওর যেন ক্ষ্যাপামি বেড়ে যায়। সুতরাং বলে দিলাম, তারা গিয়ে বিমানবন্দরে জর্জ-এর সঙ্গে দেখা করে যেন বলে, তাঁবু থেকে মাইল দশেক দূরের কোনো ডাকবাংলোয় জর্জ যেন ওঁদের থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। আমি সেখানে গিয়েই আদর-অভ্যর্থনা যা কিছু করার করবো।

ওরা চলে গেলো। মনের খুঁতখুঁতুনি তবু আমার কমলো না। কে জানে, ওদের কথায় কর্ণপাত না করে জর্জ যদি অতিথিদের সোজা এনে তাঁবুতেই তোলে!

সুতরাং ওদের পেছনে পেছন ইব্রাহিমকেও যেতে হলো। বলে দিলাম, পথে জর্জদের গাড়ি দেখলে থামিয়ে ও যেন আমার মনের কথা ওদের বুঝিয়ে বলে।

কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হলো না। ওঁরা এলেন। অগত্যা হাসি-হাসি মুখ করে এগিয়ে গিয়ে স্বাগত জানালাম। পোশাক পালটে বিশ্রাম নিতে বললাম।

বলে-কয়ে ঢুকেছি গিয়ে রান্নাঘরে, এমন সময় তাঁবুর পেছন দিক থেকে ভেসে এলো এল্‌সার চাপা গর্জন। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, তার সঙ্গে বাচ্চারাও হাজির। হয়তো গাড়ির শব্দ শুনে কৌতূহলের বসে চলে এসেছে ওরা। এল্‌সা ধমকে-ধামকে আবার ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

পোশাক পালটে অতিথিরা এসে বসেছেন উঠোনে, জর্জ একটা মরা হরিণ টানতে টানতে নিয়ে এগোলো নদীর দিকে। নদীতে হেলে-পড়া তালগাছের গুঁড়ির সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে আসবে সে হরিণটা। এল্‌সারা এসে খাবে। অতিথিরা দূর থেকে তাদের দেখতে পাবেন।

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে আমি তাঁদের বললাম, তাঁরা যেন ফিরে গিয়ে কাগজে এমন কিছু না লিখে বসেন—যাতে দলে দলে লোকের অহেতুক আগমনে এল্‌সাকে বিরক্ত হতে হয়। তা তাঁরা দুজনেই অতি সমঝদার

ভদ্রলোক। আমি কথা শেষ করার আগেই মিঃ উইন একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। সেদিক থেকে যেটুকু যা করার আমরা করবো।'

দিনটা বেশ ভালোই কাটলো। হাসি-গল্পে কখন যে দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো টের পাইনি। টের পেলাম এলসাকে দেখে। হেলতে-দুলতে বন থেকে বেরিয়ে এসে সে একলাফে উঠে বসলো গাড়ির ছাদে।

সাহস করে এগিয়ে গেলাম মিঃ উইনকে নিয়ে। আমার দেখাদেখি তিনিও এল্‌সার গায়ে হাত বোলালেন, আদর করলেন – এলসা আপত্তি করলো না। পরদিন সকালে উঠে তাঁরা চলে গেলেন। আমি তাঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম – হায় রে, এলসার ব্যবহার এতো সুন্দর হবে—একথা যদি আগে জানতাম, তাহলে হয়তো ওঁদের আদর-আপ্যায়নে আরো যত্ন নিতে পারতাম। চাই কি, তাঁবুতে দিন দুয়েক কাটিয়ে যাবার কথাও অসঙ্কোচেই বলতে পারতাম।

সন্ধ্যেয় উঠোনের একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম এক ছাগল। এল্‌সা এলো খানিকক্ষণ পরে। খেতে খেতে বাচ্চাদের ডাকলো, আর একদফা চেষ্টা করলো তাদের ভয় ভাঙাতে। কিন্তু না, তার সব চেষ্টাই নিষ্ফলে গেলো। তারা এলো না। দূরে দাঁড়িয়ে একবার আমার দিকে, একবার তাদের মায়ের দিকে চোখ পিট পিট করে তাকাতে লাগলো। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে আমি গিয়ে ঢুকলাম তাঁবুতে।

৮ই এপ্রিল জর্জ ফিরে গেলো ইসিওলোয়। আমি একা রইলাম তাঁবুতে। এল্‌সা এলো। ছাগল এনে দিলাম তাকে। খেলো না সে। দুবার গন্ধ শুঁকে নাক-মুখ কুঁচকে চুপচাপ বসে রইলো। বাচ্চারাও একই রকম ভাব দেখালো। অবাক হলাম যারপরনাই। ম্যাকেদকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, ছাগলটা কদিন থেকে অসুখে ভুগছিল। গন্ধ শুঁকেই এল্‌সা বুঝতে পেরেছে তা। তাই মাংসে আর মুখ ছোঁয়ায়নি।

সুতরাং নতুন খাবার এনে দেওয়া হলো তাদের। এবার আর শোঁকাশুঁকি নয়, পরম পরিতৃপ্তি সহকারে চেটেপুটে খেলো তারা সবটুকু। মায়ের চেয়ে আজ বাচ্চারাই খেলো বেশি। দিনে দিনে বড় লোভী হয়ে উঠেছে ওরা। এতো লোভ ভালো নয়। এইতো--এক্ষুণি মাংস খেলো একপেট, এখন আবার ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে মায়ের দুধের বোঁটা নিয়ে।

নাঃ, মাকে বিশ্রাম নিতেও দেবে না দুষ্টুগুলো! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাদের মজা!

পা টিপে টিপে এগোলাম। আমার দিকে চোখ পড়তে দুধের বোঁটা ছেড়ে

যে যার এদিক-ওদিক পালালো। পাশে বসে এল্‌সার গায়ে-মাথায় হাত বোলালাম। এল্‌সা পরম শান্তিতে আমার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলো। দেখো কাণ্ড! এই যে আমি এতো আদর করছি—চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে আছে এল্‌সা, গররর গররর করে একটানা সুখের আওয়াজ করেই চলেছে! আমি সভ্য-দুনিয়ার রক্তমাংসের মানুষ, এল্‌সা অসভ্য জঙ্গলের এক ভয়ঙ্কর জীব। অথচ কই—একবারও তো আমার সঙ্গে ভয়ঙ্কর আচরণ করছে না সে! আমার আদরটুকু চোখ বুজে উপভোগ করছে, পরম নির্ভয়ে শিশুর মতো কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। একা এল্‌সা বলে নয়, বনের প্রতিটি জীব-জন্তুই হয়তো এই রকম। ভালোবাসা দিলে প্রতিদানে তারাও ভালোবাসা দেয়, দিতে জানে। তব্, ওরা নাকি জানোয়ার—ওরা অসভ্য, বর্বর, ভয়ঙ্কর!

সে রাতে বিছানায় শুয়ে শুনলাম ওর সিংহের ঘন ঘন ডাক। নদীর ওপার থেকে একটানা হাঁকডাক করছে সে। এল্‌সা গেলো না। বাচ্চাদের নিয়ে শুয়ে রইলো আমার তাঁবুর সামনে।

পরদিন সন্ধ্যে উৎরে গেলে সে এলো। সঙ্গে গোপা আর ছোটো। জেসপা নেই। খেতে দিলাম। তিনজন চটপট মন দিলো খাওয়ায়। জেসপার জন্যে মনটা বড় আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। কিন্তু উপায় নেই। রাত ঘনিয়ে আসছে, চারদিকে পিচ-কালো অন্ধকার—কোথায় যাবো এখন তার খোঁজে! এল্‌সাকে ডেকে দেখিয়ে দিলাম দূরের জঙ্গল। কাজ হলো। গোপা আর ছোটোকে রেখে সে এগোলো জঙ্গলের দিকে। ওরা দুজন তখন খাওয়ায় এতো মগ্ন, এল্‌সা কোন্ দিকে গেলো, কেন গেলো—সেটুকু ভাবারও বুঝি অবসর পেলো না। সে চলে যাবার পর মিনিট পাঁচেক ওরা খাবার আঁকড়ে বসে থাকলো। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হতে নিজেরাও ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো তারা। নাঃ, এবারও জেসপা সঙ্গে নেই। আবার খাবার নিয়ে বসলো তিনজন। মনটা আবার উসখুস করতে লাগলো। এল্‌সাকে আবার পাঠালাম জঙ্গলের দিকে। কিন্তু না, এবারও নিষ্ফল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এলো সে একলা।

ফিরে এসে খাবার নিয়ে তো বসলো, কিন্তু লেজ অমন খাড়া করে রেখেছে কেন! এগিয়ে গেলাম। দেখি, লেজে এক মস্ত কাঁটা ফুটে রয়েছে। বোধহয় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই লেজ মাটিতে রাখতে পারছে না।

গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আচমকা একটানে তুলে ফেললাম কাঁটাটা। চমকে উঠে এল্‌সা এক হুঙ্কার ছাড়লো। পরমূহূর্তেই লেজের দিকে তাকিয়ে

সে নিশ্চিন্ত হলো। পরম কৃতজ্ঞচিত্তে আমার হাত চাটতে লাগলো।
কিন্তু না, হাত চাটো, আর পা-ই চাটো---আমার মনে শান্তি নেই। জেসপা যে এলো না এখনো! প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটলো—কোথায় গেলো জেসপা!

হঠাৎ কাছাকাছি এক ঝোপের আড়াল থেকে শুনলাম এক পরিচিত স্বর—উঁম্। এই তো এসে গেছে জেসপা! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো যেন। ধীরে ধীরে পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম বেড়ার কাছে।

আমাকে সরে যেতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো জেসপা, মাংসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে পেট পুরে খেলো, তারপর উঠোনের একপাশে এসে শুয়ে পড়লো। দেখলাম, আজ দূরত্বটা একটু কমেছে। আমার থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে এসে সে শুয়েছে।

কিন্তু আমার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ুক বা কমুক, তা নিয়ে আমার বিশেষ মাথা-ব্যথা নেই। আসল দুশ্চিন্তা আমার অন্য ব্যাপারে। রাত-বিরেতে এই যে একা একা এখানে-সেখানে যাওয়া, এটা মোটেই সুবিবেচনার কাজ নয়। অল্প বয়েস, কায়দা-কানুন এখনো তেমন রপ্ত হয়নি ওর। কখন সামনে পড়বে এক হায়না---একা বেরোবার সুখ বুঝিয়ে ছাড়বে।

ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁবুর কাছাকাছি ওকে রাখার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। কি করি···কি করি ··হঠাৎ মতলবটা মাথায় খেলে গেলো। তাঁবুর ভেতর থেকে নিয়ে এলাম গাড়ির চাকার এক অকেজো টিউব। ছুঁড়ে দিলাম তার সামনে। ব্যস্, নতুন খেলায় মেতে উঠলো জেসপা। গোপা এবং ছোটোও এসে তার সঙ্গে যোগ দিলো।

সে-রাতেও বৃষ্টি হলো খুব। ভোরবেলা উঠে দেখি, জর্জ-এর তাঁবুতে এল্সা ছাড়াও বাচ্চাদের একজনের পায়ের ছাপ। দেখে অবাক হলাম। এই প্রথম তাঁবুতে পদধূলি পড়লো এল্সার বাচ্চার। ঘটনাটা যেমন চমকপ্রদ, তেমনই আনন্দদায়ক।

পরের রাতে হলো আরেক মজা। রোজকার নিয়মানুসারে ঘুমোতে যাবার আগে তাঁবুর চারপাশের কাঁটাবেড়ার দরজাটা নুরু-ইব্রাহিমদের আটকে দেওয়ার কথা। কিন্তু সে-রাতে ভুলই হোক কি যে-কোনো কারণেই হোক---বেড়া তারা আটকালো না। এল্সা উঠোনে অনেকক্ষণ ধরে পায়চারী করে শেষমেশ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো আমার তাঁবুতে। ধাক্কা দিয়ে আমাকে নামিয়ে গুটিসুটি মেরে নিজেই শুয়ে পড়লো বিছানায়। খানিকক্ষণ পরে তার নাক ডাকতে লাগলো।

বাইরে অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে জেসপাও একসময় ঢুকে পড়লো তাঁবুতে। পেছনের পায়ে ভর করে উঁচু হয়ে শুঁকলো বিছানাটা। তারপর কি মনে করে শুয়ে পড়লো মেঝেতে। গোপা আর ছোটো বাইরেই রইলো।

কিন্তু না, এভাবে তো চলতে পারে না। আমি থাকবো ঠায় দাঁড়িয়ে, মশার কামড় খাবো—আর এল্‌সা মজাসে আমার বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাবে—এটা আবার কোন্ দিশি ভদ্রতা! জর্জ-এর তাঁবুতে গিয়ে যে শোবো, তার উপায় নেই। তার অনুপস্থিতিতে তাঁবু পাহারা দিতে ম্যাকেদ আর ইব্রাহিমকে ওখানে শুতে হয়। তাহলে·? তাহলে আর কি? নান্যোপায়ঃ—কায়দা করে ওদের তাঁবু থেকে বের করা ছাড়া করণীয় আর কিছুই নেই। চুপি চুপি টর্চ নিয়ে এলাম বাইরে। দূরের ঝোপ লক্ষ্য করে বারবার টর্চের আলো ফেললাম আর শিস দিতে লাগলাম। এতক্ষণে হয়তো হুঁশ হলো এল্‌সার। বোধহয় ভাবলো, গোপা আর ছোটো হারিয়ে গেছে, আমি তাদের খুঁজছি। এক ছুটে জেসপাকে নিয়ে এলো সে বাইরে, কাছের ঝোপটার দিকে দৌড়ে গেলো, মুখ তুলে একবার হুঙ্কার ছাড়লো। সুযোগ বুঝে আমি গিয়ে ঢুকলাম তাঁবুতে, দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলাম। আমার কারচুপি ধরতে এল্‌সার বেশি দেরী হলো না। দরজা বন্ধ হতেই সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো দরজার ওপর, নখ দিয়ে অবিরাম আঁচড় কাটতে লাগলো। অবশেষে সেখানে খুব একটা সুবিধে করতে না পেরে গিয়ে পড়লো আমার গাড়িটাকে নিয়ে। বনেটের ওপর ধপাস ধপাস পড়লো তার থাবার ঘুঁষি, ওপরের ক্যানভাসে চললো অবিরাম আঁচড়ানি। আর থাকতে পারলাম না, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, 'না এল্‌সা, অমন করে না।' কাজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে থামলো সে। এসে শুয়ে পড়লো বেড়ার আড়ালে।

পৌনে চার মাস বয়স হলো বাচ্চাদের। এই বয়সে সাধারণ নিয়মে ওদের অনেক কিছু করা উচিত। শিকার করে আনা থেকে শিকার পাহারা দিয়ে রাখা—এসবই এখন তাদের দায়িত্ব। আমাদের কাছে খাবারের যোগানের জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকার দিন ওদের ফুরিয়েছে।

তাহলে···এখন কি আমাদের করণীয়? এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের ছেড়ে আমাদের কি এবার চিরদিনের জন্য চলে যাবার সময় হলো?

না, হয়নি এখনো সময়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তো নয়ই। দিনকতক হলো, জনা দুয়েক আদিবাসীকে ও অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে সবাই উদ্দেশ্য তাদের পরিষ্কার। খরার দিন আবার এগিয়ে আসছে। আগে

থেকেই ওরা এদিককার খোঁজখবর নিতে শুরু করে দিয়েছে। আবার আসবে ওরা দলে দলে, শত নিষেধ সত্ত্বেও আসবে। সুতরাং এ অবস্থায় এল্‌সাকে ছেড়ে যাওয়া মানে তাকে এবং তার বাচ্চাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে যাওয়া। থাক বাপু। যেমন আছি, ভালোই আছি। খরা শেষ হলে বরং এ-বিষয়ে যা ভাবার ভাববো।

তবে হ্যাঁ, বাচ্চারা ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা চালাক-চতুর হয়ে উঠেছে। কদিন ধরে দেখছি, উঠোনের অ্যাকাসিয়া গাছটার গুঁড়িতে ওরা নখের আঁচড় কাটতে শুরু করে দিয়েছে। আঁচড়ও আঁচড়—প্রায় মিনিট পনেরো ধরে একনাগাড়ে চলে তাদের নখ শানানোর ব্যায়াম। গাছের ছালবাকল উঠে গেলে তবে ওরা ক্ষ্যামা দেয়।

এল্‌সার ব্যাপারেও একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। বাচ্চা হবার আগে এল্‌সার মলে থাকতো অসংখ্য কৃমি। সিংহের পেটে কৃমি থাকা ভালো। কিন্তু বাচ্চা হবার পর আর কৃমির চিহ্নমাত্র দেখতাম না। বাচ্চারাও বেশ পরিষ্কার পায়খানা করতো। সুতরাং যথারীতি উদ্বিগ্ন হলাম। বাচ্চাদের বয়েস সাড়ে ন মাস হতে দুশ্চিন্তা কাটলো। দেখলাম—চারজনেরই পায়খানায় আবার কৃমি পড়ছে।

আরও একটা পরিবর্তন দেখলাম এল্‌সার ব্যবহারে। আগে সময়ে-অসময়ে তাঁবুর ভেতরে কিংবা গাড়ির চালে সে পেচ্ছাব করে দিতো। বাচ্চা হবার পর সে অভ্যাস তার পালটালো। তাঁবু বা গাড়ির চাল যথারীতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই থাকতো।

শুধু চেহারার আদলটুকু ছাড়া বাচ্চাদের সব কিছুই আলাদা। জেসপার গায়ের রং ফিকে-হলুদ। একেবারে মাপা চেহারা তার। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ। আর দুজনের চেয়ে সে একটু বেশি ছটফটে। ভয়-ডর তার নেই বললেই চলে। সব ব্যাপারেই এক অদম্য কৌতূহল। এদিকে মমটাও তার ভারী স্নেহাতুর। মাকে কাছে পেলো তো ভালো, না পেলেও ক্ষতি নেই। ভাই-বোনকে জড়িয়ে ধরে আদরের কি ঘটা তার!

এল্‌সা খেতে বসলেই হতো মজা। দৌড়ে এসে জেসপা মায়ের দেখাদেখি মাংসে বসাতো কামড়। লাভ হতো না কিছু। চামড়া ভেদ করে দাঁত মাংস অবধি পৌঁছতো না। অগত্যা বিফল মনোরথ হয়ে মায়ের কোল ঘেঁষে সে বসে পড়তো।

গোপাও কিছু কমতি যায় না! শান্ত-শিষ্ট, ভীরু প্রকৃতির হলে কি হবে, সময় সময় ভাইয়ের দেখাদেখি সে-ও ভারী চঞ্চল হয়ে উঠতো। তাকে দমিয়ে রাখে সাধ্য কার! গায়ে হলদের ওপর ঘন কালো বুটি, চোখের রঙ

একটু ঘোলাটে—তা দেখতে সে-ও কম সুন্দর নয়। জেসপার তুলনায় তার চেহারাও ছিলো ভালো। তবে হ্যাঁ, দাদার মতো অতটা বুদ্ধি তার ছিলো না। যা কিছু করতো, একটু ধীরে-সুস্থে ভেবে চিন্তে করতো। অতোটা দুঃসাহসীও সে নয়। সব ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে যাবার অভ্যেস তার ছিলো না। চারদিক দেখে নিরাপদ মনে হলে তবেই সে এগোতো, নয়তো নয়।
আর ছোটো একেবারে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি। তার প্রতিটি ভাব-ভঙ্গি, হাঁটা-চলা, মুখ তুলে তাকানো, আচার-ব্যবহার—সব মনে পড়িয়ে দিতো এল্‌সার বাচ্চা-বয়েসের কথা। দেখতাম, আর অবাক হতাম। আশ্চর্য, এল্‌সার মতো এ-ও কি আমাদের ঘরের মেয়েটি হয়ে থাকবে!
দু ভাইয়ের মতো অতো শক্তি-সামর্থ্য তার ছিলো না। ছিলো যা, তা হলো দুষ্টু-বুদ্ধি। ভায়েরা খেলতো—সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েদেখতো। যেই না ওরা একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, অমনি গিয়ে দিতো একজনকে ধাক্কা। কোনমতে ধাক্কা সামলে উঠে সে করতো ওকে তাড়া! অমনি ছুটে এসে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াতো।
একদিন সন্ধ্যেবেলা ওরা তিনজন শুয়ে আছে উঠোনে। আমি বাহাদুরি করে পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালার চেষ্টা করছি। হঠাৎ এক কাণ্ড! ভস করে জ্বলে উঠলো তেল, দাউ দাউ করে প্রায় ফুট তিনেক উঁচুতে উঠলো আগুনের শিখা। ঘাবড়ে গিয়ে ইব্রাহিমকে ডাকলাম। ইব্রাহিম এসে আগুন নেভালো। বাচ্চারা আগাগোড়া ঘটনাটি দেখলো, কিন্তু অবাক হলো না বা ভয় পেলো না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো তাদের এই নতুন চাঁদামামার কাণ্ড।
সে রাতে ঘুমোবার আগে তাঁবুর কাছে শুনলাম এক প্রচণ্ড দাপাদাপির শব্দ। চিঁহি চিঁহি করে কে যেন ডাকলো। কে ডাকলেন? গণ্ডার, না মোষ? যাক গে বাবা, মরুক গে! যার যেমন খুশি, ডাকুক। আমার কি! বালিশের নীচে রয়েছে রাইফেল, এল্‌সারাও ঘুমোচ্ছে জর্জ-এর তাঁবুতে—আমার আর চিন্তা কিসের!
ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো সকালে। চা না খেয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সুতরাং শুয়েই রইলাম। হঠাৎ বাইরে শুনি বাসন-কোসনের ঝনঝন শব্দ। কি হলো....কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে এদিকে...
ঘরে এসে ঢুকলো টোটো। হাত তার শূন্য। চায়ের ট্রের বদলে চোখ-মুখ ভরে নিয়ে এসেছে সে একরাশ উৎকণ্ঠা। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকটা ওঠানামা করছে হাপরের মতো। হাঁফাতে হাঁফাতে আমাকে সে যা বললো

তার সারমর্ম এই—চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমার তাঁবুতে ঢোকার মুখে দেখে—একটা মোষ প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে তার দিকে। সবকিছু ফেলে তাই সে তাড়াতাড়ি এসে ঢুকে পড়েছে তাঁবুতে।

চা খাওয়া মাথায় উঠলো। এক লাফে নামলাম বিছানা থেকে। রাইফেল বাগিয়ে বাইরে এলাম। কিন্তু কোথায় কি—সব ভোঁ-ভাঁ। মোষ-মহারাজ টোটোকে তাড়া দিয়ে আর দাঁড়ায়নি। উঠোনে একগাদা পায়খানা করে রেখে চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। বাঁচা গেলো! তবুও ভালো—তিনি আবার শিং নাড়তে নাড়তে বেড়া ডিঙিয়ে তাঁবুর পথ ধরেননি! বেড়া থাকায় তাঁবুটা অনেকখানি নিরাপদ হয়েছে বলা যায়।

নিরাপত্তার এ কায়দাটার শিক্ষা পেয়েছিলাম অবশ্য এক হর্ণবিল পাখীর কাছ থেকে।

'বর্ণ ফ্রি' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন—একবার এক গোখরোর কবল থেকে কিভাবেই না আমাদের বাঁচিয়ে ছিলো এল্সা! উঃ, ভাবলে আজও শিউরে উঠি। গাছের কোটর থেকে জর্জ-এর মাথায় গোখরোটা আরেকটু হলে ছোবল দিয়েছিল আর কি!

তা সেই থেকেই আমরা সাবধান। গাছের পাশ দিয়ে যখন হাঁটি, দেখে-শুনে হাঁটি। কোথায় কোন্ গর্তের মধ্যে মশায়রা বসে আছেন ফণা তুলে—কে জানে!

অন্যদের কথা জানি না, তবে এই সাপটি ছিলো একটু ভয়ঙ্কর ধরনের। একবার এল্সার বাচ্চাদের খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গেছি সেই গাছটার কাছে, হঠাৎ পেছনে শুনি শব্দ—ফোঁস ফোঁস। চমকে পেছন ফিরলাম। আমাদের থেকে হাত পাঁচেক দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘাড় উঁচু করে তিনি দুলছেন আর ফোঁস ফোঁস করছেন।

সন্তর্পণে পকেট থেকে রিভলবার বের করলো জর্জ, চোখের নিমেষে গুলি ছুঁড়লো—ফল হলো না। গুলিটা গোখরোর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। কুণ্ডলী খুলে মুহূর্তের মধ্যে সে-ও লাগালো ছুট, গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে।

কদিন পরে আবার একদিন গেছি সেই গাছটার কাছে। গিয়ে দেখি, ফুটো প্রায় বন্ধ। মাঝখান দিয়ে আগাগোড়া এক দীর্ঘ ফাটল। মাটি, শুকনো লতা-পাতা এবং এক ধরনের লালা দিয়ে ফাটলের দু ধার বন্ধ।

টর্চ ফেললাম: আলো ফাটলের ভেতর গিয়ে পড়লো। দেখলাম, এক হর্ণবিল সেখানে বসে আছে স্থিরভাবে।

ও হরি! গোখরোকে ভাগিয়ে দিয়ে তুমি এসে জুটেছো এখানে; ডিমে তা দিচ্ছো! বাচ্চাদের নিরাপদে রাখবার জন্যে ফোকর বন্ধ করে রেখেছো!

বেশ বাবা, বেশ! জিন্দা রহো! কাজের কাজ করেছ বটে একখানা! কিন্তু গোখরোটা—তার কি সমাচার! কোথায় আছে সে? পরিবার-পরিজন তো তারও আছে, না কি?

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। পনেরো গজ দূরের আর এক মোটা-সোটা গাছের কোটরে তাদের দেখা মিললো। গাছের নীচে মাটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল তার বাচ্চাটি। আমাদের পায়ের শব্দে চমকে ফণা তুললো সে। তারপর সুড়সুড় করে গাছ বেয়ে উঠে গিয়ে ঢুকলো কোটরে। শ্রী ও শ্রীমতী হর্ণবিল সপুত্রক পাঁচ হপ্তা রইলো তাদের দখল-করা বাসায়। তারপর একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে ফুড়ুৎ। যাবার সময় তারা কোটরের আবরণ খসিয়ে দিয়ে যেতে ভুললো না।

এদিকে বাচ্চারা এতোদিনে পাঁচ মাসে পড়লো। এই কটা মাস বাচ্চাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টা করে এল্‌সা হতাশ হয়েছে। লাভ কিছু হয়নি।

তা হবেই বা কিভাবে—যা কাণ্ড-কারখানা ওদের! এখন আবার নতুন এক কায়দা শিখেছে। সন্ধ্যে নাগাদ আসবে সকলে দল বেঁধে। ইব্রাহিম জ্বালিয়ে দেবে পেট্রোম্যাক্স। বাবুরা আলোকিত উঠোনের এক কোণে বসে মজাসে খাবে খাবার। তারপর পেট ঠাণ্ডা করে শুরু করবে খেলা। খেলা শেষ হলে এগোবে জঙ্গলের দিকে।

বেশ বাপু, ভালো। জঙ্গলেই যাও আর পাহাড়ে যাও, সুখে স্বস্তিতে থেকো—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি দিনরাত। তেমন তেমন বুঝলে মাঝে-মধ্যে দু'চারটে শিকার-টিকারও কোরো। পাঁচ মাসে পড়লে তোমরা, হাত-পা হয়েছে তোমাদের, বাবার তরফ থেকেও এখন আর ভয়-ডরের কোনো কারণ নেই—সুতরাং আমাদের ইসিওলোয় ফিরে যাবার পথে এখন আর কোনো বাধা নেই।

শুরু হলো তাঁবু গুটানো। ইব্রাহিম একে একে সমস্ত জিনিসপত্র তুলতে লাগল গাড়িতে, আমি উঠোনের বেঞ্চিতে বসে মনোযোগ দিলাম চিঠির বাণ্ডিলে।

'বর্ণ ফ্রি'র বিমুগ্ধ পাঠকরা দেশ বিদেশ থেকে পাঠিয়েছেন চিঠি। ইসিওলো থেকে জর্জ বাণ্ডিল বেঁধে সব পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। এতো চিঠি…সব চিঠিরই উত্তর দিতে ইচ্ছে করে…কিন্তু সময় কোথায়!

চিঠি পড়ছি…হঠাৎ জঙ্গলের আড়াল থেকে একছুটে বেরিয়ে এলো এল্‌সা, অতর্কিতে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। চিঠির গোছা পড়ে গেলো হাত থেকে, আমি হলাম ধরাশায়ী। বাচ্চারা কাগজগুলো দেখে কি মজাই

না পেলো। আঁচড়ে-কামড়ে থাবায় চেপে অনেকক্ষণ ধরে খেললো। ইস্, চিঠির লেখকরা যদি হাজির থাকতেন এ সময়—স্বচক্ষে দেখে যেতেন, তাঁদের চিঠি-চাপাটি এল্সার পরিবার-পরিজনের কাছে কি প্রশংসাই না পাচ্ছে!

এল্সার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে একে একে কুড়িয়ে তুললাম সব ক'খানি চিঠি। অবশ্য, এজন্যে প্রযত্নও কম করতে হলো না। খাবার দিয়ে আগে ওদের ভোলাতে হলো!

টোটো এসে বললো, গাড়ী তৈরী। গোছগাছ সব হয়ে গেছে। শুধু আমি গিয়ে উঠে বসলেই হয়।

এল্সার দিকে তাকালাম। সে আর তার বাচ্চারা খাবার ঘিরে বসে আছে, আমাদের দিকে মন নেই। সুতরাং, এই সুযোগ ···

উঠলাম গিয়ে গাড়িতে। গাড়ি ছাড়লো। চকিতে চোখ ফেরালো এল্সা, আমার দিকে তাকালো। দৃষ্টিতে তার প্রচ্ছন্ন বেদনা, অভিমানের নীরব আকুতি। যেন বলতে চায়—আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো তোমরা! কেন যাচ্ছো? কোথায় যাচ্ছো? কার ওপর রেখে যাচ্ছো আমাদের?

চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো। একটা কান্না এসে দলা পাকিয়ে রইলো গলার কাছে। নীরবে রুমালে চোখ মুছলাম। তাকালাম এল্সার দিকে। না, এল্সা আর বসে নেই। সে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে। পেছন পেছন চলেছে তার বাচ্চারা।

অর্ধভুক্ত খাবার পড়ে আছে উঠোনের একপাশে। চারপাশের নিঃসীম শূন্যতা যেন দু'হাত তুলে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, বলছে—যেয়ো না ···যেয়ো না · যেয়ো না······

॥ ৬ ॥

কিন্তু ইসিওলোয় মন টি'কলো না। পাঁচদিন মোটে রইলাম সেখানে। ছ'দিনের দিন জর্জকে নিয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে, গাড়ি ছাড়লো। তারিখটা আঠাশে এপ্রিল, উনিশশো ষাট।

জঙ্গলে পৌঁছে মালপত্র নামাচ্ছি, এল্সা এসে হাজির।

ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে, গালে মুখ ঘষলাম। প্রত্যুত্তরে এল্সাও জানালো তার আদর-সোহাগ। আসার পথে মেরে-আনা হরিণটা নামিয়ে

দিলাম গাড়ি থেকে। টানতে টানতে সেটাকে নিয়ে সে জঙ্গলে ঢুকলো। ব্যস, সেই যে ঢুকলো—চব্বিশটি ঘণ্টা আর তার পাত্তা নেই। এ যেন একেবারে বামাল সমেত উধাও!

মন খারাপ হয়ে গেল। এলাম কত দূর থেকে তোকে দেখতে···দু'দণ্ড থাক. খা, ঘুমো—তা না, উধাও! ঠিক আছে, থাকো জঙ্গলে, যা খুশি করো—আমি আর ডাকছি না তোমাকে। দেখি, ক'দিন না এসে পারো তুমি!

পরদিনই এসে হাজির এল্‌সা। বিকেলের দিকে একা একাই এলো। খাবার খেলো, ঘুমোলো। তারপর ভোর রাতে উঠে চলে গেল।

তা এ আবার কিরকম কায়দা বাপু! দু-দুটো দিন এলি—বাচ্চাদের একবারও সঙ্গে আনলি না! ওদের দেখতে কি এতোটুকু ইচ্ছে হয় না আমাদের!

ইচ্ছাপূরণ হলো সেদিনই বিকেলে। নদী পেরিয়ে সপরিবারে এল্‌সা এলো দুপুর নাগাদ। খাবার দিলাম। বসে বসে খেলো তারা সবটুকু। তারপর শুরু করলো খেলা।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আকাশ কালো করে এলো বৃষ্টি। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকালো, বাতাস ছুটলো। এল্‌সা এসে ঢুকলো তাঁবুতে, বাচ্চারা বাইরে বসে ভিজতে লাগলো।

কত ডাকলো এল্‌সা, কত গজরালো—তারা এলো না। অবশেষে বৃষ্টি একটু ধরতে তাঁবু থেকে বেরোলো সে। চারজনে মিলে আবার শুরু করলো খেলা।

খেলা থামলো দু ঘণ্টা পরে। বৃষ্টি থামলো। জর্জ আবার খাবার দিলো তাদের। গোগ্রাসে গোটা ছাগলটা গিললো তারা। খাওয়া শেষ করে হাড়-চামড়া ইত্যাদি অভুক্ত জিনিস বালি খুঁড়ে পুঁতে দিলো এল্‌সা। বাচ্চারা তাকে সাহায্য করলো। বুঝলাম, এ কায়দাটা এল্‌সা সবে ক'দিন ধরে শেখাতে শুরু করেছে বাচ্চাদের। বাচ্চারাও মনোযোগী ছাত্রের মতো নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখার কৌশলটি রপ্ত করছে।

বেশিদিন থাকবো বলে আসিনি এবার। কয়েকটা দিন থাকবো, বাচ্চাদের খানকতক ছবি তুলবো—এমনই মনের ইচ্ছে।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই যদি উপায় হতো—তাহলে তো আর ভাবনার কিছু থাকতো না। এল্‌সা যে এবার তাঁবুর বাইরে এতো বেশি সময় কাটাবে—একথা কি একবারও ভেবেছি!

সারাটা দিন শুধু টই-টই। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে নদীর পারে ঘুরছে তো ঘুরছেই। ছবি তোলার তেমন যে একটা লাগসই সুযোগ পাবো—তা আর

ভাগ্যে হয়ে উঠছে না।

ভাবলাম, দাঁড়াও—চালাকী আমরাও কিছু কম জানি না। তোমরা যদি থাকো ডালে ডালে, আমরা তবে পাতায় পাতায়। তোমাদের ছবি নেবোই নেবো।

সেদিন ভোর সকালে উঠে সঙ্গে এক পেল্লাই হরিণ নিয়ে চললাম পাহাড়ের দিকে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে এল্‌সা হাজির। সঙ্গে এসেছে জেসপা। গাড়ি থেকে হরিণ নামাতে যেটুকু দেরী—দুজনে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো খাবারের ওপর।

গোপা আর ছোটোও এলো। একটু দূর থেকে আগাগোড়া ব্যাপারটা দেখে গুটিগুটি পায়ে তারা এগিয়ে এলো। চারজনের শুরু হলো ভোজ। ক্যামেরা বাগিয়ে আমি গিয়ে উঠলাম কাছের এক বিরাট চাঁইয়ের ওপর।

কিন্তু না, এভাবে মাথা নীচু করে ওরা খাবে, আর এই অবস্থায় ওদের ছবি নেবো—এটা ঠিক ভালো দেখায় না। একটুখানি মুখ তুললে ছবিটা চমৎকার হয়। জর্জকে ইশারায় সব বললাম। জর্জ হাততালি দিল, এল্‌সা মুখ তুললো। তুলেই তার চোখ পড়লো আমার দিকে। হাতে ক্যামেরা দেখে সে মুহূর্তে বুঝে নিলো আমার মতলব। ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে মুখ নীচু করলো।

নাঃ, সুবিধে হলো না। ঠায় বসে রইলাম পাথরের ওপর। খাওয়া শেষ করে তারা উঠলো। শুরু হলো খেলাধুলো। এই ফাঁকে কয়েকখানা ছবি নিলাম।

খেলা সাঙ্গ হতে এল্‌সা ধরলো তাঁবুর পথ। পেছন পেছন এগোলো বাচ্চারা। আমরাও চড়ে বসলাম গাড়িতে।

তাঁবুতে ফিরে আরেক দফা ভোজপর্ব। ছোট একটা ছাগল উদরসাৎ করলো তারা। খাওয়া শেষ করে শুরু হলো খেলা! মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে, নীচু গাছের ডালপালা লাফ দিয়ে ধরে কি মজাই না পেলো সকলে! এল্‌সার পিঠে পিঠ রেখে একপাশে বসে আগাগোড়া খেলার দৃশ্যটি চোখের ক্যামেরায় ধরে রাখলাম।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো এল্‌সা! আমাকে ঠেলে উঠে পড়লো। বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে ঢুকলো এক ঝোপের আড়ালে। ভারী অবাক হলাম। হলোটা কি—হঠাৎ এতো সতর্কতা!

মিনিটখানেক যেতেই কৌতূহল মিটলো। কাছের জঙ্গলের আড়াল থেকে ডেকে উঠলো কয়েকটা হাতি। এগিয়ে দেখি, চারটে হাতি চলেছে নদীর দিকে জল খেতে। বাতাস উলটো দিকে বইছে, আমাদের উপস্থিতি তাই

ওরা টের পায়নি। খানিকক্ষণ পরে জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে তারা আবার ফেরার পথ ধরলো। এল্সাও গুটিগুটি বেরিয়ে এলো তার গোপন আশ্রয় থেকে।

একদিন হলো এক অদ্ভুত কাণ্ড। জর্জ গেলো তার টহলের কাজে, ক্যামেরা ঘাড়ে করে আমিও বেরিয়ে পড়লাম এল্সাদের ছবি তুলতে। সঙ্গে নিলাম টোটো ছেলেটিকে।

নদীর পারে দেখা পেলাম তাদের। টোটোর হাত থেকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাকে ফিরে যেতে বললাম তাঁবুতে। বলার উদ্দেশ্য একটাই—এল্সা ওকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না।

ক্যামেরা ঠিকঠাক করে বসেছি, হঠাৎ নামলো ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এসে ছেয়ে ফেললো আকাশ। বেগতিক দেখে পলিথিনের মোড়কে ক্যামেরা ঢেকে ফেললাম।

এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ হবার নয়। একটু পরেই মেঘ কেটে যাবে, রোদ উঠবে। সুতরাং গিয়ে দাঁড়ালাম এক গাছের নীচে। শিস দিয়ে ডাকলাম এল্সাকে। মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে খুশী মনে এগিয়ে এলো এল্সা। আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে এসে হঠাৎ তার হাবভাবটা পালটে গেলো। শান্ত সুন্দর মুখে মুহূর্তে ফুটে উঠলো ক্রোধের চিহ্ন। কান খাড়া হলো, চোখ কুঁচকে গেলো। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিতে আমার পেছন দিকের কিছু একটা জিনিসের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

ঘাড় ফেরালাম। দেখি, টোটো একটা ছাতা নিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে এদিকে। বৃষ্টি দেখে হয়তো ভেবেছে, আমার কষ্ট হবে। তাই তাঁবু থেকে ছাতা নিয়ে আসছে আমার কষ্ট লাঘব করতে।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঘটে গেলো ঘটনাটা। দু হাতে কয়েকবার মাটি আঁচড়ালো এল্সা, তারপর তীর বেগে ছুটলো টোটোর দিকে। চিৎকার করে উঠলাম আমি—না এল্সা, না! কাজ হলো। থামলো এল্সা। ফিরে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে।

হাতের ইশারায় টোটোকে ফিরে যেতে বললাম। আহা বেচারা! ছাতা নিয়ে এসেছে আমার উপকার করতে—আরেকটু হলে এল্সার হাতে প্রাণ দিতে হতো। বোকাটা জানেও না সেই চিরাচরিত প্রবাদ—উপকারীকে বাঘে খায়!

টোটো চোখের আড়াল হতে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম এল্সার কাছে। পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বোলালাম, কানের কাছে মুখ নিয়ে অন্ততঃ বার-পঞ্চাশেক টোটো নাম জপ করলাম! কি বুঝলো সে—সে-ই জানে।

আমার পা চাটতে চাটতে দুবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করলো।

তা সে কিছু বুঝুক চাই না বুঝুক—জেসপা ততক্ষণে অনেক কিছু বুঝে গেছে। তার ধারণা হয়েছে, তার মায়ের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছি আমি, কানের কাছে মুখ নিয়ে হাজারো কুমন্ত্রণা দিচ্ছি। ব্যস্, আর যায় কোথায়। লেজ তুলে কান খাড়া করে প্রবল বিক্রমে ছুটে এলো সে আমাকে লক্ষ্য করে। ঘাড় ফিরিয়ে এল্সা রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, চাপা হুঙ্কার ছাড়লো— গুটিগুটি পায়ে পেছু হটতে লাগলো জেসপা। ভাই বোনের কাছে গিয়ে মাটিতে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে। বৃষ্টি আর সেদিন ধরলো না। আরো মেঘ এসে জমা হলো আকাশে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরঝর হলো। ক্যামেরা ব্যাগস্থ করে তাঁবুর পথ ধরলাম। এল্সারাও এলো পেছন পেছন। সবচেয়ে আগে আমি, তারপর এল্সা, তার পেছনে ছোটো, ছোটোর পেছনে গোপা। জেসপা রইলো সবশেষে। হাঁটতে হাঁটতে যতবার পেছন ফিরে তাকালাম, চোখাচোখি হলো তার সঙ্গে। তার দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ। এতোখানি পথ একসঙ্গে হেঁটে এসেও তার মন বদলায়নি। তখনকার রাগ এখনো বুকের মধ্যে পুষে রেখেছে। তাঁবুর কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে টোটোকে ডাকলাম। বললাম, এল্সার খাবার উঠোনে বের করে রেখে সে যেন তাঁবুতে গিয়ে ঢোকে। ভুলেও যেন আর উঠোন-মুখো না হয়।

তা-ই করলো সে। খাবার বের করে উঠোনে রেখে তাঁবুতে ঢুকে চেঁচিয়ে আমাকে জানান দিলো। নিশ্চিন্তে ওদের নিয়ে উঠোনে এলাম।

জর্জ ফিরে এলো পরদিন সকালে। বিকেলে চা খেয়ে সে আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। কাঁধের ঝোলায় ক্যামেরা প্রস্তুত। কালকের প্রযত্নটুকু বৃষ্টির দৌলতে বিফলে গেছে, আজ একবার নতুন করে চেষ্টা করতে হবে। পাহাড়ে পৌঁছে কত ডাকাডাকি করলাম এল্সাকে, কত শিস দিলাম। সে এলো না। দেখতে দেখতে দিনের আলো নিভে এলো। বিফল মনোরথ হয়ে বুক খালি করে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এখানে আর বেশিক্ষণ কাটানো ঠিক নয়, এবার ফিরতে হবে।

শেষবারের মতো তাকালাম চারদিকে। দেখি আমাদের থেকে মাত্র হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়ে আছে এল্সা। বেশ গম্ভীর, রাশভারী চেহারা। মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘ। হয়তো বুঝেছে—কি মতলবে আবার এতোদূর অবধি এসেছি আমরা।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সে। পায়ে মুখ ঘষলো, হাত চাটলো, তারপর হঠাৎ যেমন এসেছিলো তেমনই হঠাৎ উধাও

হয়ে গেলো। এগিয়ে দেখি, একটু আগে সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো. সেখানে রয়েছে আর এক প্রস্থ পায়ের ছাপ। ছাপগুলো তার সিংহের। পরদিন বিকেলে গেলাম আবার সেখানে। একাই গেলাম। জর্জ বেরিয়েছে টহলে। এই পথ দিয়েই ফিরবে। ফেরার পথে আমাকে নিয়ে যাবে। দুরবীনে চোখ রাখলাম। দেখি, এল্‌সা দাঁড়িয়ে আছে দূরে এক পাথরের ওপর। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের উপত্যকার দিকে। নাম ধরে ডাকলাম। ঘাড় ফেরালো সে। শূন্য দৃষ্টিতে আমাকে দেখলো একবার, তারপর আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলো।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চমক ভাঙলো ইঞ্জিনের শব্দে। দেখি জর্জ আসছে। আমার কাছে এসে থামতে আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির মুখ ঘোরালো জর্জ।

হঠাৎ একটা শব্দ.. জর্জ ব্রেক কষলো। দেখি, গাড়ির পেছনে বাধা ট্রেলারে উঠে বসেছে এল্‌সা, জর্জ-এর শিকার-করে-আনা দশটা গিনি ফাউলের একটাকে নিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বা রে দুষ্টু, বাঃ! তখন অত করে ডাকলাম, শিস দিলাম—ঘাড় ঘুরিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে একবার তাকালে শুধু; এখন গিনি-ফাউলের গন্ধে একেবারে গাড়িতে এসে উঠেছো! লোভী কোথাকার! আমাদের খাবারে ভাগ বসাতে চাও! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমার মজা!

গাড়ি থেকে নেমে একটা গিনি-ফাউল তুলে ছুঁড়ে দিলাম তার বাচ্চাদের দিকে। মুহূর্তে টনক নড়লো এল্‌সার। এক লাফে ট্রেলার থেকে নেমে ছুটলো সে সেদিকে। বাচ্চারা কিছু বোঝার আগেই পাখীটাকে চেপে ধরলো থাবায়। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে জর্জকে ইশারা করলাম। জর্জ গাড়ি ছাড়লো। যেই না ইঞ্জিনের শব্দ কানে গেছে অমনি চঞ্চল হলো এল্‌সা। অর্ধভুক্ত গিনি-ফাউলটাকে ছেড়ে ছুটতে ছুটতে এসে উঠলো গাড়ির ছাদে। গাড়ি থামালো না জর্জ, বরং গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।

ভেবেছিলাম, খানিক দূর এসে নিজের স্বার্থে নিজেই নেমে যাবে এল্‌সা। বাচ্চাদের একা ফেলে এসেছে ওখানে, সন্ধে ঘনিয়ে আসছে—এমতাবস্থায় তার বাৎসল্য-স্নেহ বোধহয় উথলে উঠবে।

কিন্তু কোথায় কি! প্রায় মাইলখানেক এসেও নামার নাম করলে না সে। অগত্যা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে নীচ থেকে ছাদে মুহুর্মুহু খোঁচা দিলাম, জর্জও কয়েকবার আচমকা ব্রেক কষলো। শেষে আর থাকতে না পেরে নামলো সে, ছুট লাগালো বাচ্চারা যেখানে আছে, সেদিকে।

তাঁবুতে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চা জলখাবার নিয়ে বসেছি, সদলবলে এল্‌সারা

এসে হাজির। বুঝলাম, কিসের লোভে এসেছে তারা। জর্জ এনে দিলো ছুটো গিনি-ফাউল। একটাকে নিয়ে পড়লো এল্‌সা, বাকীটার দায়িত্ব নিলো তার ছেলেমেয়েরা।

তা চালাক হয়েছে বটে ছোটো। ভায়েরা কত কষ্ট করে ছাড়ালে পাখীটার পালক, ছোটো বসে বসে দেখলো। যেই না সে-কাজ শেষ, অমনি তৎপর হলো সে। এক কামড়ে বিরাট এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে লুকোলো সে মায়ের পেছনে। গোপা-জেসপা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

মুখের মাংসটুকু মায়ের পাশে বসেই শেষ করলো ছোটো। তারপর পা টিপে টিপে আবার এগিয়ে এলো ভায়েদের কাছে। ভায়েরা ততক্ষণে পাখীটার ছুখানা ঠ্যাং নিয়ে খুব কসরত করছে। ছোটো আড়চোখে তাদের একবার দেখলো, তারপর নির্বিকারচিত্তে অবশিষ্ট মাংসটুকু থাবায় চেপে ধরে শুরু করলো হম্বি-তম্বি। কখনো জেসপার দিকে ফিরে, কখনো গোপার চোখে চোখ রেখে সে কি তর্জন-গর্জন তার! গতিক সুবিধের নয় দেখে জেসপা আর গোপা ধীরে ধীরে সরে এলো, উঠোনের একপাশে বসে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো ছোটোর দিকে।

দেখে মনে বড় মায়া হলো। উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে একটা ছাড়ানো পাখী এনে দিলাম তাদের। মুহূর্তের মধ্যে গপগপ করে পুরো পাখীটাই উদরসাৎ করলো তারা।

গিনি-ফাউল যে ওদের এতো প্রিয় তা এই প্রথম জানলাম। এল্‌সা যখন ছোটো ছিলো, মরা গিনি-ফাউল তার সামনে দিলেও সে খেতো না। খেলার জিনিস ভেবে সেটাকে নিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করতো, তারপর ফিরে এসে তার জন্যে রাখা ছাগলের মাংসে দাঁত বসাতো।

সে-রাতটা তাঁবুর চৌহদ্দির মধ্যেই কাটিয়ে দিলো এল্‌সা। বাচ্চারাও মায়ের কাছছাড়া হলো না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, সিংহ মহারাজটির একপ্রস্থ পায়ের ছাপ বেড়ার চারপাশ ঘুরে জঙ্গলের পথ ধরেছে। এল্‌সা তার জায়গা ছেড়ে বেরোয়নি।

পরের দিন এল্‌সা তাঁবুর আশেপাশে ঘুরঘুর করে কাটালো। বাচ্চারা খেলা করে বেড়ালো উঠোনে। বিকেলে জর্জ-এর গাড়ির শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো সবাই, এগিয়ে গেলো রাস্তার দিকে। গাড়ি থেকে জর্জ কয়েকটা গিনি-ফাউল নামিয়ে দেওয়ামাত্র শুরু হয়ে গেল মহোৎসব।

তাঁবুতে ঠায় বসে থেকে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল। জর্জ আসতে বেড়াতে বেরোলাম। কিছুদূর এগিয়ে দেখি, এল্‌সার সিংহ একপ্রস্থ

আনকোরা পায়ের ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে রাস্তার ধুলোয়। অতএব, আর এগোনো সমীচীন নয় ভেবে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

এসে দেখি, খাওয়া বন্ধ করে চিন্তিত ভাবে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে এল্‌সা, কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে অর্ধভুক্ত খাবার টানতে টানতে সে গিয়ে ঢুকলো বেড়ার আড়ালে। পেছন পেছন গেলো বাচ্চারা। কয়েক মিনিট পর ভেসে এলো তার সিংহের বন-কাঁপানো ডাক। সারারাত বেড়ার ওপাশ থেকে ডাকের মহড়া দিয়ে গেলো সে।

পরদিন সকালে রওনা দিলাম ইসিওলোর দিকে। বলা বাহুল্য, এল্‌সার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নুরু আর ইব্রাহিমকে রেখে গেলাম।

ইসিওলোয় পৌঁছে খবর শুনে আমি তো স্তম্ভিত। গত কয়েকদিনের মধ্যে লণ্ডন থেকে বার তিনেক ট্রাঙ্ককল এসেছে আমার নামে। আবারও নাকি আসবে।

ভেবে দেখুন—চার হাজার মাইল দূরে ইংল্যাণ্ড। আমি আমার ঘরে বসে চার হাজার মাইল দূরের কারুর সঙ্গে কথা বলবো—বিজ্ঞান কি সুবিধেই না করে দিয়েছে! দূরকে নিকট করতে তার আর জুড়ি নেই।

পরদিন সকালেই বাজলো টেলিফোন। রিসিভার কানে তুললাম—হ্যালো, হ্যালো · বিলি কলিন্স বলছি ··আপনাদের নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে পেরে আমি কৃতার্থ আগামী সপ্তাহে যে কোনো একটা দিন ঠিক করে আমাকে জানিয়ে দেবেন যাবো, এল্‌সাকে দেখে আসবো গিয়ে।

দিনক্ষণ ঠিক হলো। নাইরোবি থেকে একখানা উড়ো-জাহাজ ভাড়া করে রাখলাম তাঁর জন্যে অন্যান্য সব বন্দোবস্ত ঠিকঠাক করে দুদিন আগে আমরা রওনা দিলাম। তাঁর অভ্যর্থনার যাতে কোনোরকম ত্রুটি না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। আর, সম্ভব হলে এল্‌সাকেও এ দুদিন তাঁবুর কাছে কাছে রাখতে হবে।

কার মুখদেখে যে রওনা দিয়েছিলাম সেবার—মাঝপথে টায়ার গেলো। সারিয়ে-টারিয়ে এগোতে এগোতে সন্ধে। সুতরাং আর এগোলাম না। একটা ফাঁকা-মতন জায়গা দেখে তাঁবু ফেললাম।

রাতে কিছু মালুম হয়নি, হলো পরদিন সকালে। ঘুম থেকে উঠে দেখি—গা-হাত-পা জামা-টামা কালিতে কালিময়। কি ব্যাপার—না, জায়গাটায় ঘাস-টাস পুড়ে কালো হয়ে আছে। প্রকৃতির খেয়ালে কদিন আগে হয়তো হয়ে গেছে এক দাবানল, কদিন পরে তার জের পোয়াচ্ছি আমরা।

আর কালক্ষেপ না করে তাঁবু গুটোলাম, রওনা দিলাম। তাঁবুতে পৌঁছে

আমি গিয়ে ঢুকলাম কলঘরে, জর্জ বাইরে দাঁড়িয়ে দুটো ফাঁকা আওয়াজ করলো। উদ্দেশ্য—আমরা যে পৌঁছেছি, সেটা এল্‌সাকে জানিয়ে দেওয়া। প্রত্যুত্তরে নদীর দিক থেকে চাপা গর্জন করে উঠলো এল্‌সা। তাকিয়ে দেখি সপরিবারে সে জল খাচ্ছে। আমরা এসে পৌঁছেছি তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে সে। তবে এ নিয়ে আর বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আমরা আসবো, আমরা যাবো ; আবার আসবো, আবার যাবো—এটাই স্বাভাবিক, একথা সে এতোদিনে বুঝতে পেরে গেছে।

জলটল খেয়ে ধীরেসুস্থে সে এলো। এসে আমার হাত-পা চেটে আদর-সোহাগ জানালো। তারপর একলাফে ব্রেকফাস্ট টেবিলে উঠে শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। কয়েক হাত দূরে বসে জেসপা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলো তার মায়ের কাণ্ড-কারখানা। তারপর ভাইবোনেদের নিয়ে সে খেলায় মাতলো। জর্জ এনে দিলো তাদের খাবার, সকলে খেলো। সন্ধ্যে হতে এল্‌সা বাচ্চাদের নিয়ে ঢুকলো গিয়ে বেড়ার আড়ালে। রাত বাড়তে শোনা গেলো তার সিংহের নিস্ফল ডাকাডাকি। চুপচাপ শুয়ে রইলো এল্‌সা। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ঢুকলো গিয়ে জর্জ-এর তাঁবুতে। খানিকক্ষণ মেঝেয় বসে থেকে মশারী তুলে শুয়ে পড়লো জর্জ-এর বিছানায়।

সকালে উঠে ম্যাকেদ, ইব্রাহিম আর রাঁধুনে পাচকটিকে নিয়ে রওনা দিলাম। মিঃ কলিন্স-এর আজ আসার কথা। আদর-অভ্যর্থনা যেটুকু করার—আমারই করা উচিত।

সঙ্গে নিলাম তাঁবু খাটানোর যাবতীয় সরঞ্জাম। নাইরোবি থেকে হাওয়াই জাহাজ কখন এসে পৌঁছবে—জানি না। রাত হয়ে গেলে মুশকিল। এই বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাতে ফেরা ঠিক নয়। প্রয়োজনবোধে বিমান-বন্দরের কাছাকাছি কোনো জায়গায় রাতটুকু কাটিয়ে দিতে হবে। তাঁবুর বন্দোবস্ত সেজন্যেই।

রাত থাকতে বেরিয়েছি। আগে কোনদিন এ সময় এ রাস্তায় আসিনি। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। জন্তু-জানোয়াররা বেরিয়ে পড়েছে খাদ্যের সন্ধানে। হাতি, জেব্রা, চিতল হরিণ, জল হরিণ, সম্বর, দাঁতালো শুয়োর, ইম্পালা, গজলা হরিণ, জিরাফ—কত কি-ই যে দেখলাম! দেখে মনে হলো, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে একের পর এক দেখছি আমরা বিচিত্র সব ছবি। সামনে দিগন্তবিস্তৃত বনভূমি যেন বিরাট এক প্রেক্ষাপট, প্রকৃতির কোলে লালিত জীবগুলি যেন এই বিচিত্র নাটকের নায়ক-নায়িকা—তারা আসছে যাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে—কোনো অদৃশ্য নির্দেশক পর্দার আড়ালে থেকে নিয়ন্ত্রিত করছে তাদের।

তা কেবল জীব-জন্তুই নয়, পাখীও আছে। অস্ট্রিচ, গিনি-ফাউল, বনমোরগ, কাঠঠোকরা, দোয়েল—আরো কত নাম-না-জানা পাখী। তাদের কলকাকলিতে দিনের বন্দনা, আচার-আচরণে নির্ভয়-নির্ভীক ভাব।

আঃ, ফেরার সময় যদি এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়। সঙ্গে মাননীয় অতিথিটি সুদূর ইংল্যাণ্ডে বসে এসব দৃশ্য কল্পনাও করতে পারেন না, দেখলে তিনি যথার্থই খুশী হবেন।

দুপুর নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। জায়গাটা ঠিক পুরোপুরি বিমানবন্দর নয়, তবু উড়োজাহাজ ওঠা-নামার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা এখানে আছে।

কোনো একসময় পঙ্গপাল তাড়াবার জন্যে ঝোপঝাড় কেটে ছোটখাটো এক রানওয়ে তৈরী করা হয়েছিল। কালেভদ্রে দু-একখানা উড়োজাহাজ এখানে নামে। আপাততঃ জায়গাটা স্থানীয় গ্রামবাসীদের গরু ছাগলের এক নির্ভরযোগ্য চারণক্ষেত্র।

লোকজন ডেকে যতটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে ফেললাম চারপাশ। বেলা তিনটে নাগাদ পূব দিকের আকাশে কালো ফোঁটার মতো দেখা গেলো বিমানখানা। তিনটে বেজে দশ মিনিটের সময় শূন্যে কয়েকটা চক্কর মেরে জাহাজ মাটি স্পর্শ করলো। মিঃ কলিন্স নামলেন।

আগে থেকেই রানওয়ের আশেপাশে ভিড় জমতে শুরু হয়েছিল। জাহাজ নামতে গ্রাম উজাড় করে লোকজন এলো। বেশির ভাগই মুসলমান। ছেলে-বুড়ো-মধ্যবয়েসী—সকলে অবাক চোখে দেখতে লাগলো আমাদের অতিথি এবং তাঁর সঙ্গী হাওয়াই-জাহাজের চালকটিকে।

তাড়াতাড়ি চায়ের বন্দোবস্ত করা হলো। সঙ্গে সামান্য জলখাবার। খেয়ে পাইলট ভদ্রলোকটি আর দাঁড়ালেন না। তাড়াতাড়ি উঠলেন গিয়ে বিমানে। সন্ধ্যের আগেই তাঁকে অনেকখানি পথ যেতে হবে—নিদেনপক্ষে পাহাড়-টাহাড়গুলো দিন থাকতেই টপকাতে হবে।

মিঃ কলিন্স-এর উৎসাহ বড় বেশি। কাল সারারাত কেটেছে তাঁর প্লেনে, আজও এইমাত্র নামলেন তিন ঘন্টার পাড়ি জমিয়ে—তবু এতোটুকু ক্লান্তি নেই। বললেন দিন থাকতে যতোটা এগোনো সম্ভব, এগোই। সন্ধ্যে হলে নয় একটা খোলা-মেলা জায়গা দেখে তাঁবু খাটনো যাবে।

সুতরাং কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—তাই-ই হলো। সন্ধ্যে অবধি যতটা সম্ভব এগোলাম। তারপর একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে তাঁবু গাড়লাম। রাতের খাবার খেয়ে কলিন্স ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি ঠায় জেগে রইলাম।

অচেনা-অজানা জায়গায় তাঁবু খাটিয়েছি, সঙ্গে জর্জ নেই—কখন গটমট

করতে করতে একপাল হাতি এসে উপস্থিত হয়—কে বলতে পারে। আর আর সব জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে হাতিতে আমার বড় ভয়।

তা রাতটা নিরাপদেই কাটলো। ভোরবেলায় তাঁবু গুটিয়ে আবার শুরু হলো যাত্রা। ভাগ্য ভালো— কাল আসার পথে যা বা যেমনটি দেখেছিলাম, আজও তাই দেখলাম। সব দেখেশুনে কলিন্স তো একেবারে হতবাক। যাবার পথে এক ফাঁড়িতে দেখা হলো টহলদার-বাহিনীর একজনের সঙ্গে। আমার হাতে একখানা চিরকুট দিয়ে সে বললো, মিঃ অ্যাডামসন যেন আগামীকাল অতি অবিশ্যি বন-অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করেন। কি একটা মামলার ব্যাপারে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

তাঁবুতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন ব্রেকফাস্ট খাবার সময়। জর্জ আগে থেকেই টেবিল সাজিয়ে বসেছে উঠোনে। আমরা পৌঁছতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলো সে।

সবে চুমুক দিয়েছি কাপে, তাঁবুর পেছন দিক থেকে এল্‌সা ডেকে উঠলো। আনন্দে ভরে গেলো মন। যাক বাপু, মুখ রক্ষা হলো তাহলে! কলিন্স-এর ভাগ্যটা নেহাত ভালোই বলতে হবে।

একটু পরে ছুটতে ছুটতে এলো এল্‌সা। পেছন পেছন এলো তার বাচ্চারা। উঠোনে এসে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো সে, মুখ তুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের মাননীয় অতিথিটিকে দেখলো, তারপর এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঘষতে শুরু করে দিলো।

ওঃ, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো আমার! সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছি, কলিন্সকে এল্‌সা কিভাবে নেবে, কিরকম আচরণ করবে তাঁর সঙ্গে। সে-দুশ্চিন্তা থেকে আমাকে মুক্তি দিলো এল্‌সা। কারুর পায়ে মাথা ঘষার অর্থই হলো—এল্‌সা তার সঙ্গে সন্ধি করলো।

ম্যাকেদ এনে দিলো একটা ছাগল। টানতে টানতে সেটাকে নিয়ে এল্‌সা গিয়ে বসলো আমার তাঁবুর পাশে। বাচ্চারাও গেলো তার পেছন পেছন। জর্জ-এর তাঁবুর পাশে নতুন একটা তাঁবু খাটানো হলো। মানুষ-সমান উঁচু কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো তাঁবু। কলিন্স-এর টুকিটাকি জিনিসপত্র এনে রাখলাম তাঁবুতে। তাঁকে অভয় দিয়ে বললাম, কোনো চিন্তা নেই। স্রেফ নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন। তেমন তেমন নাক ডাকতে পারলে বুনো হাতিও লেজ তুলে দৌড়ে পালাবে।

হাতি নয়, এল্‌সাই যে সে রাতে ঘটাবে এক কাণ্ড—তা কি তখন জানতাম! ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলো চেঁচামেচির শব্দে। বেরিয়ে দেখি, এল্‌সা পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে কলিন্স-এর বিছানায়, জর্জ আর কলিন্স—দুজনে

উঠে-পড়ে লেগেছে তাকে বিছানা থেকে নামাতে। কলিন্স বললেন, ভোরের দিকে দুখানা লোমশ হাতের আলিঙ্গনে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন, এল্‌সা মশারী সরিয়ে এসে শুয়েছে তাঁর পাশে, দুহাতে তাঁকে পাশবালিশের মতো আঁকড়ে ধরেছে।

তা সাবাস বটে কলিন্সকে! এল্‌সাকে ঐ অবস্থায় দেখেও তিনি ঘাবড়ে যাননি, হৈচৈ চেঁচামেচি করে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তোলেননি। তার ভয়ঙ্কর আদরের চোট তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছেন, শেষে আর থাকতে না পেরে জর্জকে ডেকেছেন।

তা ডাকডাকি-হাঁকাহাঁকিতে এল্‌সা বিছানা ছেড়ে উঠলো। যেন কিছুই হয়নি —এমন একটা ভঙ্গি করে গুটিগুটি বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। তারপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেলো পাহাড়ের দিকে।

একটু পরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে জর্জও বেরোলো—সেই মামলার ব্যাপারে আজই তার যাবার কথা। সারাটা দিন আমি আর কলিন্স তাঁবুতেই কাটালাম। বিকেলে চা খাওয়ার সময় জর্জ এলো।

সে বললো, আসার পথে তাঁবু থেকে খানিকটা দূরে সে একপাল হাতি দেখে এসেছে। কলিন্স যদি রাজী থাকেন···

রাজী মানে! আলবত রাজী, একশোবার! আফ্রিকার জঙ্গলই তো দেখতে এসেছেন তিনি, তাঁবুতে বসে থাকতে নয়।

সুতরাং বেরোলাম। তাড়াতাড়ি চাটুকু গলাধঃকরণ করে গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। গাড়ি ছাড়লো।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ি থামাতে বললাম। নেমে পড়লাম সকলে। দূরে সেই বিরাট পাথরটার ওপর শুয়ে আছে এল্‌সা, পেছনে অস্তায়মান সূর্য—এ অবস্থায় কয়েকখানা ছবি তুললে দারুণ হবে।

কলিন্স নিলেন খানকতক ছবি। কাছে গিয়ে এল্‌সাকে ডাকলাম, উঠতে বললাম—সে উঠলো না। একই ভাবে শুয়ে রইলো। বাচ্চাদেরও দেখতে পেলাম না ধারে-কাছে। অগত্যা প্রাকৃতিক পরিবেশে এল্‌সা এবং তার পুত্র-কন্যাদের ছবি তোলার বাসনা ত্যাগ করে হাতির পালের ছবি তোলাই সমীচীন বোধ করলাম।

গাড়ির দিকে এগিয়েছি সবে কয়েক পা, হঠাৎ কলিন্স বললেন—দেখুন, দেখুন! ফিরে তাকালাম। দেখি, এল্‌সা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার বাচ্চারাও এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। সকলে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

দুষ্টুমি আর কি! প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম এখানে এই মুহূর্তটির

জন্মে—এতোক্ষণ তোমাদের হুঁশ হলো না, এখন ফিরে যাচ্ছি—উঠে দাঁড়িয়ে মজা করছো! করো তোমাদের মজা, আমরা আর ফিরছি না। আমাদের বরং হাতিই ভালো।

তা হাতিরও দেখা পাওয়া গেলো না। সেই কখন দেখে গেছে জর্জ, কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে—এখনও কি আর তারা বসে আছে আমাদের জন্মে! কলিন্সকে তাদের পায়ের ছাপ দেখিয়ে দিলাম। অগত্যা সেই ছাপেরই ছবি নিলেন তিনি খানকতক। ফিরে চললাম আবার এল্‌সার কাছে।

ততক্ষণে দিনের আলো পড়ে এসেছে। এই আলোতে ছবি তোলা আর সম্ভব নয়। অগত্যা দুরবীনে চোখ রেখে দেখতে লাগলাম এল্‌সার কাণ্ড-কারখানা। বাচ্চাদের নিয়ে সে তখন মেতে উঠেছে খেলায়। একে ধাক্কা দিচ্ছে তো ওর লেজ কামড়ে ধরছে—সে এক সত্যিকারের মজাদার দৃশ্য।

ডাকলাম তাকে। সে এলো। ছুটতে ছুটতে এসে উঠে বসলো গাড়ির ছাদে। গায়ে হাত বোলালাম তার, আদর করলাম। প্রত্যুত্তরে এল্‌সা ঘোঁৎঘোঁৎ করে সোহাগ জানালো। বাচ্চারা তখনো সমানে ছুটোছুটি করেই চলেছে। এল্‌সা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তাদের দিকে, নজরে নজরে রাখলো। তারপর অন্ধকার একটু বেশি ঘন হতে একলাফে গাড়ির ছাদ থেকে নেমে ছুটলো তাদের দিকে।

এই অবসরে আমরাও চড়ে বসলাম গড়িতে। গাড়ি ছাড়লাম। তাঁবুতে ফিরে প্রথমেই এল্‌সাদের জন্মে খাবার তৈরী করে রেখে দিলাম। তারপর নিজেরা বসলাম চায়ের কাপ নিয়ে।

একটু পরেই এলো এল্‌সা। বলা বাহুল্য স্বজন-পরিবৃত হয়েই এলো। এসে আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নয়, সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো খাবারের ওপর। সে-রাতেও আবার সেই কাণ্ড। বেচারা কলিন্স—কি চোখেই যে দেখেছে ওঁকে এল্‌সা! ভোরবেলায় গুটিগুটি কখন ঢুকে পড়েছে তাঁবুতে, মশারী সরিয়ে উঠেছে গিয়ে ওঁর বিছানায়। তারপর পরম বন্ধুর মতো ওঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছে তার শরীরের সমস্ত ভার।

তা ওজন তো নেহাত কম নয়—তিনশো পাউণ্ড! আমাদের মাননীয় অতিথিটি ব্যায়ামবীর কিংবা ভারোত্তোলক নন। পারবেন কেন তিনি!

প্রথমে খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি ডেকেছেন জর্জকে। জর্জ ঠেলে নামিয়েছে এল্‌সাকে। চেঁচামেচি শুনে আমি এসে দেখি, কলিন্স বসে আছেন বিছানায়, তাঁর ঘাড়ের কাছে দু জায়গায় আঁচড়ের দাগ। এল্‌সার আদরের ঠ্যালায় বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাড়াতাড়ি মলম-টলম এনে লাগিয়ে

দিলাম। ম্লান হেসে তিনি বাইরে এলেন।

পরের রাতে তাকে তাকে রইলাম। অনেক রাত অবধি কলিন্স-এর তাঁবুতে বসে গল্প-সল্প করলাম। এল্‌সা এলো না। ভাবলাম—যাক, নিশ্চিন্ত। আজ আর আসবে না ও। গিয়ে শুয়ে পড়ি এবার।

শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে এসে তাঁবুতে ঢুকলাম। মশারী খাটিয়ে শোবার আয়োজন করছি, শুনি হৈ হৈ চিৎকার। ছুটে গেলাম কলিন্স-এর তাঁবুর দিকে। দেখি, কলিন্স দাঁড়িয়ে আছেন, এল্‌সা পেছনের দু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে গালে মুখ ঘষছে।

আর সহ্য হলো না। এ কি আদিখ্যেতা বাপু! লোকটাকে রাতে স্বস্তিতে দু দণ্ড ঘুমোতে পর্যন্ত তুমি দেবে না হতভাগী! হাতের কাছে পেলাম একটা বেত। সপাসপ ঘা কতক বসিয়ে দিলাম। মার খেয়ে শিক্ষা হলো ওর। তাঁবু থেকে বেরিয়ে সে গেলো উঠোনে, বাচ্চাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ খেলাধুলো করলো। তারপর চলে গেলো পাহাড়ের দিকে।

পরদিন ভোরবেলায় উঠেই শুরু হলো শলা-পরামর্শ। জর্জ, আমি আর কলিন্স অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম। শেষে ঠিক হলো, তাঁবু ছেড়ে আজই আমরা রওনা দেবো। হয়তো সত্যিসত্যিই এল্‌সার মনে অসৎ উদ্দেশ্য কিছু নেই, তবু এভাবে একটা লোককে রাতের পর রাত বিব্রত করা—এর মধ্যে সততাও তেমন কিছু দেখা যায় না। তাছাড়া, কাল রাতে আমার হাতে মার খেয়েছে সে, আজ আবার কোন্ মূর্তিতে তাঁবুতে আসে—কে জানে! বিপদ আসুক চাই না আসুক—বিপদ সম্পর্কে আগে থেকেই সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে তাঁবু গুটোলাম। গাড়িতে উঠে বসলাম সকলে। গাড়ি ছাড়লো। জর্জ-এর শরীরটা ভালো নয়। সকাল থেকেই জ্বর জ্বর ভাব। হয়তো ম্যালেরিয়া। তবু জ্বর সারা অবধি অপেক্ষা করার আর ফুরসত হলো না।

পথে তেমন কিছু চোখে পড়লো না। একবার শুধু দু-দুটো হাতি রাস্তার মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাদেরও দাঁড় করিয়ে রাখলো ঘণ্টা দুয়েক। পথে দুবার টায়ার পালটাতে হলো, একবার ট্রেলারের একটা চাকা খুলে গেলো! এইসব নানা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে ইসিওলোয় এসে পৌঁছলাম মাঝরাত নাগাদ। স্নান-টান সেরে খাবার তৈরী করে খেতে রাত প্রায় কাবার। বেচারা কলিন্স-এর কথা ভেবে দুঃখ হলো সবচেয়ে বেশি। আহা! আগাগোড়া যাত্রাটায় তাঁর বড় বেশিরকম ধকল গেলো! কি কুক্ষণেই যে বেরিয়েছিলেন উনি লণ্ডন ছেড়ে!

পরদিন দুপুর নাগাদ বন-অধিকর্তার দপ্তর থেকে সংবাদ নিয়ে এলো একজন প্রহরী। কি সমাচার—না সেই মামলাটার ব্যাপারে জর্জকে কাল আবার যেতে হবে, শত কাজ ফেলেও যেতে হবে।

ম্যালেরিয়া রইলো শিকেয় তোলা। জর্জ রওনা হলো। তাঁবুতে পৌঁছতে এল্‌সা এসে হাজির। সঙ্গে বাচ্চারাও এসেছে। চারজনেরই চোখ-মুখ শুকনো। সেদিন মার খেয়ে সেই যে পালিয়েছে এল্‌সা—আমরা এখানে আসা অবধি আর তাঁবুর ত্রিসীমানা মাড়ায়নি।

তাড়াতাড়ি জর্জ এনে দিলো তাদের খাবার, হুমড়ি খেয়ে পড়লো চারজন। এই ফাঁকে পা টিপে টিপে পেছোতে পেছোতে গাড়িতে উঠে জর্জ গাড়ি ছেড়ে দিলো।

॥ ৭ ॥

দশদিন পর জুন মাসের পয়লা তারিখ আবার ইসিওলো ছাড়লাম। তাঁবু থেকে মাইল ছয়েক আগে জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম এক দৃশ্য। গাছে গাছে, ডালে ডালে বসে আছে দলকে দল শকুন, ঘাড় তুলে কি যেন দেখছে।

কি দেখছে ওরা, কি! জর্জকে গাড়ির গতি কমাতে বলে দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি থামলো। চমকে তাকিয়ে দেখি, বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একদল হাতি—সব মিলিয়ে সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন। আমাদের গাড়ির শ'খানেক গজ দূরে কি ভেবে হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়ালো, তারপর শুঁড় তুলে কান নেড়ে কুতকুতে চোখে দেখতে লাগলো আমাদের।

আর কালক্ষেপ না করে জর্জ একলাফে উঠে পড়লো গাড়ির ছাদে। হাতের রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো সামনের দিকে। ভাবখানা এই পরিস্থিতি ঘোরালো হলে সে আর ভাবনা-চিন্তার মধ্যে যাবে না। একের পর এক গুলি ছোঁড়ার মহড়া দেবে।

ইব্রাহিমদের গাড়িও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ম্যাকেদ আর মুরু। তাদের হাতেও উদ্যত রাইফেল।

আমি কিন্তু নামলাম না। চুপচাপ গাড়িতেই বসে রইলাম। এমন দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না। একটা-দুটো নয়—প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা দৈত্যাকৃতি হাতি, সঙ্গে গুটি দশেক বাচ্চা—আহা, অপূর্ব! অতুলনীয়!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কি ভেবে যেন তারা ফিরলো, গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে। সকলে গেলো না—দলছুট হয়ে কটা হাতি ঠায় দাঁড়িয়েই রইলো! শুঁড় তুলে কান নেড়ে কত ভয়ই না তারা দেখালো আমাদের। আমরা নড়লাম না।

জর্জ বললো, এই ফাঁকে সে গিয়ে একবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবে। কিসের দিকে তাকিয়ে শকুনগুলো ওভাবে ঘাড় তুলে বসে আছে—সেটা একবার সে যাচাই করে দেখে আসবে।

ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে সে এগোলো গুটিগুটি। আমি এবার বেরিয়ে এলাম আসন ছেড়ে। উঠলাম ছাদের ওপর। কে জানে, বলা যায় না—কখন কি বিপদের মুখে পড়ে যায় তারা! বিপদের তেমন কিছু থাকলে এখান থেকে আগে নজরে পড়বে আমার, জর্জদের সাবধান করে দিতে পারবো।

একটু পরে ফিরে এলো তারা! বেশিদূর যেতে হয়নি। খানিকটা গিয়েই ওরা এক বিরাট চিতল হরিণের অর্ধভুক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। আশেপাশের মাটিতে রয়েছে সিংহীর একপ্রস্থ পায়ের ছাপ। হয়তো এতক্ষণ বসে সে শিকারের সদ্‌গতি করছিল, হাতির দল দেখে পরম বিরক্তিতে উঠে চলে গেছে।

সিংহীর পায়ের ছাপ···এল্‌সা নাকি! এতোদূরে এসে সে করে গেছে শিকার! নাঃ, বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, হরিণটাও বিরাটাকৃতির। কম করে চারশো পাউণ্ড ওজন হবে তার! এল্‌সা নিজে তিনশো পাউণ্ড—তার পক্ষে এতো বড় জন্তুটা মারা কি সম্ভব!

যাক গে, কাল আবার আসা যাবে'খন এখানে, বিচার-বিবেচনা যা করার—তখনই করা যাবে। এখন মানে মানে এগোনো যাক। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো প্রায়···তাঁবু এখনো ছ মাইলের পথ।

কিন্তু এগোবো বললেই তো এগোনো যায় না। এগোই কি ভাবে—দুই দৈত্য এখনো দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝখানে, ওরা না সরলে কিভাবে যাই! আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে ঠিক করলাম, ওরা যেমন দাঁড়িয়ে আছে, থাকুক। আমরা দুটো গাড়ি ওদের দু'পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যাই। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গিয়ে চট করে তেমন কিছু করার সাহস ওদের হবে না। এই ফাঁকে আমরাও পগার পার।

তাই-ই হলো। ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে হঠাৎ জোরে ছুটিয়ে দেওয়া হলো গাড়ি। ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পীডোমিটারের কাঁটাটা ষাটের ঘর ছুঁয়ে গেলো। আমরা এগিয়ে চললাম।

তাঁবুতে পৌঁছে জর্জ নিয়মমাফিক দুটো ফাঁকা আওয়াজ করে এল্‌সাকে

আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে দিলো। ঝটপট উঠোনে আমি একটা এরিয়াল খাটিয়ে ফেললাম। সঙ্গে এবার ট্রানজিস্টর সেটটা এনেছি। নাইরোবি বেতার কেন্দ্র থেকে আজ রাতেই আমার এল্‌সা-সম্পর্কিত নাতিদীর্ঘ তথ্যমূলক আলোচনার টেপটা বাজানো হবে।

সে রাতে আর এল না এল্‌সা। পরদিন সকালে উঠে আমরা ছুটলাম কালকের সেই জায়গায়। হরিণের খুব সামান্য অংশই আজ অবশিষ্ট রয়েছে। সিংহীর পায়ের ছাপটাপগুলোও হাতির পায়ের চাপে প্রায় মুছে গেছে তবু যে কটা আছে, তা দেখে বোঝা যায়—কোনো বাচ্চা-সিংহও এখানে এসেছিল। যতদূর মনে হয়, বাচ্চাটা আমাদের জেসপা। তার পায়ের ছাপের সঙ্গে এই ছাপের অনেকাংশে মিল।

ফেরার পথে পাহাড়ের ওপর সপরিবার এল্‌সার দেখা পেলাম। আমাদের দেখে তার সে কি আনন্দ। দৌড়ে এসে এক ধাক্কায় জর্জকে করলো সে ধরাশায়ী, দু হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার গলা। বাচ্চারা দূরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখতে লাগলো মায়ের এই অদ্ভুত কাণ্ড।

ফিরে এলাম তাঁবুতে। পেছন পেছন তারাও এলো। খাবার দিলাম। খাবার নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি শুরু হলো চারজনের মধ্যে। ছোটো তার স্বভাব-সুলভ কূটবুদ্ধিতে ভাই দুজনকে হার মানালো। ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে সময় নষ্ট করে, ফাঁক বুঝে থাবা মেরে ছোটো নিয়ে যায় বিরাট এক খাবলা মাংস। হিসেবেমতো তারই ভাগে পড়লো বেশি। বাকী দুজন মারপিট করেই সময় কাটালো।

খেয়েদেয়ে শান্ত হয়ে এবার বিশ্রামের পালা। ওদেরও পেট ঠাণ্ডা, আমাদেরও। আমরা বসে আছি উঠোনের এক পাশে, ওরা চারজন শুয়ে আছে একটু দূরে। হঠাৎ উঠে বসলো জেসপা, গুটিগুটি এগিয়ে এসে আমার স্যাণ্ডেলটা আঁচড়াতে লাগলো।

দেখে যারপরনাই অবাক হলাম—বাব্‌বাঃ, এই ক'দিনে দেখি খুব সাহস বেড়েছে! কাছে তো এগিয়ে এসেছোই, উপরন্তু স্যাণ্ডেলও আঁচড়াতে শুরু করেছো! থাক বাপু, স্যাণ্ডেলের ওপর অত তেজ না দেখালেও চলবে। তোমাদের নখ আজকাল বেশ ধারালো হয়েছে। স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে গেলে আমার খালি পায়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

পা সরিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম, চুকচুক শব্দ করে ডাকলাম—জেসপা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো আমার হাতের দিকে। অবশেষে আড়চোখে আমাকে একবার দেখে সে ফিরে গেলো ভাইবোনদের কাছে।

সন্ধ্যে হতে এল্‌সা উঠে বসলো গাড়ির ছাদে। বাচ্চারা গা এলিয়ে শুয়ে

রইলো মাটিতে। রাত একটু ঘন হতে সকলে এসে ঢুকলো বেড়ার আড়ালে। চাপা স্বরে এল্‌সা বাচ্চাদের সঙ্গে কত কথাই না বললো। কি বুঝলো বাচ্চারা—কে জানে! মায়ের দুধ খেতে শুরু করলো সবাই। বাপরে বাপ—ক্ষিধেই বটে। সারাদিনে দু-দুটো ছাগল খেলো চারজন; এখন আবার বাচ্চারা শুরু করলো দুধ খাওয়া! কতটুকু খেলে যে তোমাদের পেট ভরবে, তা বাপু তোমরাই ভালো জানো!

সকালে উঠে সব ভোঁ-ভাঁ। না আছে এল্‌সা, না তার বাচ্চারা। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোলাম। দেখি, ছ মাইল পথ ঠেঙিয়ে তারা চলে গেছে সেই জঙ্গলে। হরিণটা যেখানে ছিলো, সেখানে গিয়ে একচক্কর ঘুরপাক খেয়েছে, তারপর আবার ফিরে এসেছে পাহাড়ের দিকে।

ও, এই তাহলে ব্যাপার! তোমরাই করেছো এই শিকার! সাবাশ এল্‌সা, সাবাশ তোমার বাচ্চাদের! চারশো পাউণ্ডের এক বিরাট হরিণ মেরে যথার্থই তোমরা তোমাদের শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছো।

মাংসের ছিটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই, পড়ে আছে শুধু হরিণের দুটো শিং। তাই-ই নিয়ে এলাম সঙ্গে। এল্‌সা এবং তার সাড়ে পাঁচ মাসের বাচ্চাদের প্রথম সমবেত শিকারের স্মারক হিসেবে এটাই নয় রইলো আমার কাছে!

পাহাড়ে এল্‌সার সঙ্গে দেখা করতে যাবার মধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চ ছিল। ছোট ছোট ঝোপে-ঝাড়ে ছাওয়া মনোরম এক উদ্যান-গোছের, পাথরের আড়ালে-আবডালে অসংখ্য গিনিপিগ। গায়ের রঙ তাদের ধূসর, দুই চোখের দৃষ্টিতে অপার কৌতূহল। পাথরের ফাঁক থেকে, ঝোপের আড়াল থেকে কেবল উঁকি-ঝুঁকি, কেবল আড়ে-ঠাড়ে দেখা—ঈশ্বর জানেন, ওদের এই অনন্ত কৌতূহল কবে নিবৃত্ত হবে!

চট করে অবশ্য ওদের চোখে পড়ে না। গায়ের রঙ ধূসর, পাহাড়-মাটির সঙ্গে মিশে থাকে, পায়ের শব্দে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। দূরে দূরে থাকে, ভুলেও কাছে ঘেঁষে না। মাঝে-মধ্যে এক-আধজন একটু বেশিরকম সাহস দেখায়। লোকজন দেখেও পাথরের ওপর সটান শুয়ে সেই বীর পুঙ্গবরা রোদ পোয়ায়।

এ ছাড়া আছে সজারু আর কাকাতুয়া! সজারু অবশ্য কালেভদ্রে দু-একটা চোখে পড়ে, কিন্তু কাকাতুয়ার সংখ্যা অজস্র, অগুণতি। গাছের ডালে বসে তারা দোল খায়, শিস দিয়ে গান করে। কিন্তু মানুষের সাড়া পেলেই গান-টান সব উধাও। চটপট গিয়ে ঢোকে গাছের কোটরে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা এল্‌সাদের সঙ্গে আমি আর জর্জ বেরিয়েছি বেড়াতে।

সামনে এল্‌সা-জেসপা, পেছনে গোপা আর ছোটো, মাঝখানে আমরা দুই দেবা-দেবী। কিন্তু না, এভাবে দলছুট হয়ে এগোনোটা জেসপার ঠিক যেন পছন্দ হলো না। হয় আমাদের যেতে হবে একদম সামনে, নয়তো একেবারে পেছনে। এমন মধ্যপন্থা চলবে না।

ব্যস, শুরু হলো তার তর্জন-গর্জন। আমাদের দিকে পেছন ফিরে কয়েকবার সে গোঁ গোঁ করলো, একবার তেড়েও এলো। রকম-সকম দেখে ভারী বিরক্ত হলো এল্‌সা। থাবা তুলে তার পিঠে মারলো এক চড়। শান্ত ছেলেটির মতো এগোতে লাগলো জেসপা।

সে রাতে রান্নার জন্যে ছাড়িয়ে রাখা একটা গিনি-ফাউল উধাও হলো রান্নাঘর থেকে। চোর আর কেউ নয়, স্বয়ং এল্‌সার মহামহিম শ্রীযুক্ত স্বামী সিংহ মহারাজটি।

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এসে দেখি, উঠোনের একপাশে এক ঝোপের আড়ালে জড়সড় হয়ে বসে আছে এল্‌সা। বাচ্চারা রয়েছে তার গা ঘেঁষে। সকলের চোখে-মুখেই কেমন যেন একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব।

ভয়···সাতসকালে এতো ভয়ের কি হলো! হাতি নেই, মোষ নেই—কি দেখে এতো ঘাবড়ে গেলো এল্‌সা! চিন্তিত মনে এসে ঢুকলাম জর্জ-এর তাঁবুতে। দেখি, চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে চোখ বুজে একমনে রেডিওতে সকালের খবর শুনছে জর্জ।

ও হরি! এই তাহলে ব্যাপার! রেডিও শুনে তোমাদের ভয়! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

চাবি ঘুরিয়ে শব্দ বাড়িয়ে দিলাম। ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে এসে ঢুকলো এল্‌সা। অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো যন্ত্রটার দিকে, কান খাড়া করে কয়েকবার গোঁ গোঁ করলো। গতিক সুবিধের নয় দেখে রেডিও বন্ধ করে দিলাম।

এতোদিন আছি তাঁবুতে, রেডিও কখনো সঙ্গে রাখিনি। এবার নেহাত নিজের গলা শুনতে পাবো—তাই এনেছি যন্ত্রটা। আচমকা এমন একটা জিনিসের শব্দে এল্‌সারা যে এতোটা ঘাবড়ে যাবে—একথা আগে ভাবিনি। পিঠ চাপড়ে দিলাম এল্‌সার, যন্ত্রটা দেখিয়ে মৃদুস্বরে তাকে সান্ত্বনা দিলাম। কি বুঝলো সে—সে-ই জানে। তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে রেডিওর সংবাদ-ঘোষকের নিষ্ফল অনুসন্ধান করলো কিছুক্ষণ। তারপর হতাশ হয়ে ফিরে গেলো বাচ্চাদের কাছে।

অনেকে অনেকবার আমার কাছে জানতে চেয়েছেন—কোন্ শব্দে এল্‌সা কিরকম আচরণ করে। যাহোক করে মামুলিগোছের একটা কিছু উত্তর দিয়ে

সযত্নে প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে গেছি। মনে মনে ভেবেছি, এ আবার কি ধরনের প্রশ্ন! এর মধ্যে জানারই বা কতটুকু কি আছে!

কিন্তু আজ রেডিওর শব্দে এল্সার এই ভাববৈষম্য দেখে আমি নিজেও যারপরনাই অবাক হলাম। সেদিন যে-কবার চালালাম রেডিও, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো এল্সা। প্রত্যেকবারই তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালো তাঁবুর চারপাশ। তারপর যথারীতি বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো বাচ্চাদের কাছে।

অবশ্য একথা ঠিক—রেডিও সম্বন্ধে এরকম মনোভাব বেশিদিন থাকেনি তার। ধীরে ধীরে রেডিওর ব্যাপারে সে বা তার বাচ্চারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। পরে এমনও হতো উঠোনে খেলে বেড়াচ্ছে তারা, আমরা রেডিও খুলে শুনছি কোন অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান—তারা ভ্রূক্ষেপমাত্র করতো না।

শত হলেও এল্সা বনের জীব। বনের আর পাঁচটা জীবজন্তুর শব্দ সে যতটা বুঝতো, আমরা ততটা নয়। শুধু তাই নয়, আমাদের কথাবার্তা শুনে সে বুঝতে পারতো, কিরকম মেজাজে আমরা আছি। সাধারণতঃ জোরে জোরে কথা বলা সে ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারতো না। ক্ষীণ মৃদুস্বরে কথাবার্তা বললেই সে সন্তুষ্ট হতো সবচেয়ে বেশি।

রেডিওর সেই প্রথম দিনের ঘটনার পরের রাতে শব্দ-সম্বন্ধে আমাকেও একবার ধৈর্যের পরীক্ষায় বসতে হলো। রাতে ঘুম আসছে না, চুপচাপ শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছি—হঠাৎ নদীর দিকের জঙ্গল থেকে ভেসে এলো দুদ্দাড় শব্দ। শুনেই চিনলাম—একপাল হাতি এসেছে জল খেতে। ব্যস, শুরু হলো শব্দের অর্কেস্ট্রা—শুঁড়ভর্তি জল নিয়ে জল ছেটানোর শব্দ, চিঁ-হি-হি ডাকের শব্দ, ডালপালা ভাঙার শব্দ—ঘুম আমার মাথায় উঠলো। সব শব্দকে ছাপিয়ে নদীর ওপার থেকে ভেসে এলো এল্সার সিংহের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। সকালে উঠে দেখি, নদীর দিকের জঙ্গলটা আর জঙ্গল নেই। দোমড়ানো-মোচড়ানো রাশি রাশি গাছপালা পড়ে আছে মাটিতে—যেন ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ হয়ে গেছে এখানে। নরম মাটিতে হাতির পায়ের চাপে তৈরী হয়েছে এক একটা গড়খাই—সব মিলে একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

সেদিন দুপুর নাগাদ রওনা হলাম ইসিওলোর দিকে। একনাগাড়ে ন'দিন থেকে ষোলোই জুন আবার তাঁবুর পথ ধরলাম।

তা ফিরতে গিয়ে তো রীতিমতো এক কাণ্ড! আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি! জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছি, হঠাৎ দু' দুটো হাতি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো রাস্তায়, আমাদের গাড়ির সঙ্গে গোঁত্তা খেতে খেতে সামলে নিলো নিজেদের। প্রাণপণে ব্রেক চাপলো জর্জ, প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে

গাড়ি থামলো। আমার তো ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ, প্রাণ উঠে এসেছে গলার কাছে। নেহাত বরাতজোর—রক্ষে পেলাম তাই সে-যাত্রা। আমরা যেমন ওদের দেখে ঘাবড়ে গেছি, ওরাও হয়তো আমাদের দেখে তেমনি ঘাবড়ে গেলো। থতমত খেয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকলো গিয়ে জঙ্গলে, আমরাও এই ফাঁকে পাঁই-পাঁই করে ছুটিয়ে দিলাম গাড়ি।

তাঁবুতে পৌঁছে এল্সাকে আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে দিতে একটা ফাঁকা আওয়াজ করলাম। মিনিট কুড়ি পরেই এল্সা হাজির। সঙ্গে রয়েছে বাচ্চারা। আদর-আপ্যায়নের পর্ব শেষ হতে তাকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ হলো। মাথায়, চিবুকের কাছে এবং ডানদিকের চোয়ালে তিনটে ক্ষত। চোয়ালের ক্ষতটা একটু বেশি। তাড়াতাড়ি মলম নিয়ে এলাম। মলম লাগাতে দিলো না সে। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালো। বুঝলাম, অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে তার, তাই মলম লাগাতে দিচ্ছে না। অগত্যা ঔষধ-পর্ব শিকেয় তুলে খাবার এনে দিলাম। চারজনেই সমান ক্ষুধার্ত। একটা ছাগলে হলো না, আরো একটা এনে দিতে হলো।

দুশ্চিন্তাটা কিন্তু মন থেকে গেলো না। জখম হয়েছে এল্সা কোত্থেকে হলো। কে বা কারা তাকে জখম করলো!

সুতরাং পরদিন ভোর সকালে উঠে ওদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে এগোলাম। নদী পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে এসে পৌঁছলাম আরেক পাহাড়ে। এ পাহাড়টার নাম দিয়েছি আমরা 'পর্বত গুম্ফা'। জায়গায় জায়গায় অসংখ্য গুহা, নামটা তাই সুসার্থক। দেখলাম, পায়ের ছাপ গিয়ে শেষ হয়েছে এক গুহায়। জায়গাটা চিনে ফিরে এলাম।

এদিকের এই পাহাড়ী অঞ্চলটা অনুপ্রবেশকারীদের এক পছন্দসই ঘাঁটি। খেয়াল-খুশিমতো যখন-তখন তারা দল বেঁধে ঢুকে পড়ে এদিকে, ইচ্ছেমতো জীবজন্তু শিকার করে ফিরে যায়। কে জানে, হয়তো এদেরই কারুর বল্লমের ঘায়ে জখম হয়েছে এল্সা।

তবে হ্যাঁ, একটা বিষয়ে সান্ত্বনা এই—কোনো এক জায়গায় বেশিদিন ঘাঁটি গেড়ে থাকে না সে। মুহুর্মুহুঃ জায়গা বদল করে। এমনও দেখা গেছে—সকালে সে যেখানে ছিলো, বিকেলে আর সেখানে নেই। আবার, বিকেলের আস্তানা সন্ধ্যে হতে বদলে গেছে।

ফিরে এলাম তাঁবুতে। দেখি, সপরিবারে আমাদের অপেক্ষায় তাঁবুর দোরে বসে আছে এল্সা। চোখের দৃষ্টিতে তার উদ্বেগের ছাপ! কাছে গিয়ে আদর করলাম, তার গায়ে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। প্রত্যুত্তরে এল্সাও তার নরম থাবার আদর আমার গালে বোলাতে লাগলো।

কিন্তু এতো আদিখ্যেতা জেসপার সহ্য হবে কেন! আস্তে আস্তে পেছোতে পেছোতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, কান খাড়া করে চোখ কুঁচকে দেখলো আমাকে খানিকক্ষণ, তারপর গুঁড়ি মেরে বসে পড়লো মাটিতে। ভাবখানা এমন—মায়ের উঠে যাবার অপেক্ষায় যেন সে রয়েছে। মা উঠলেই প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ঘাড়ে, আমাকে খুব একচোট শিক্ষা দিয়ে দেবে।

মনে মনে মৃদু হেসে এল্‌সার আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে আমি উঠলাম। জেসপার চোখে চোখ রেখে এক পা এক পা পেছোতে পেছোতে গিয়ে ঢুকলাম তাঁবুতে। একটু পরে এক বিরাট দড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দড়ির একটা দিক ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে! থপ করে দড়িটা থাবায় চেপে হুঙ্কার দিলো জেসপা, দাঁতে কামড়ে ধরে টানতে লাগলো। শুরু হলো 'টাগ-অফ-ওয়্যার'। কিন্তু বেশিক্ষণ এ খেলা চালানো গেলো না। নদীর দিকের জঙ্গল কাঁপিয়ে ভেসে এলো একপাল হাতীর পায়ের শব্দ। এল্‌সা অমনি বাচ্চাদের নিয়ে ঢুকলো বেড়ার আড়ালে।

পরদিন সকালে উঠোনে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি, হঠাৎ রান্নাঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো নুরু। কি ব্যাপার!—না, দেখুন এসে, কি কাণ্ড! গিয়ে দেখি সত্যিই এক কাণ্ড। দৈত্যের মতো চেহারার চার-চারটে হাতি দাঁড়িয়ে আছে রান্নার তাঁবুর একটু দূরে, নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাইনি। হাতিরা সাধারণতঃ নিরামিশাষী বলেই জানতাম, ডিম ভাজার শব্দে তারা যে আকৃষ্ট হতে পারে—এ খবর জানা ছিলো না।

তা কোনো গোলমাল করলো না তারা। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো, তেমনি নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করলো। আমাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

এদিকে, বন্যার পর হয়েছে এক কাণ্ড। খাল-বিল ঘেঁটিয়ে কুমীরের দল এসে আস্তানা গেড়েছে নদীতে। প্রায় রাতেই অবস্থা চরমে উঠতো। এল্‌সা রাতের খাবার নদীর পারে টেনে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে গুটিগুটি উঠে আসতো দু-একটা কুমীর। ব্যস্‌, আর যায় কোথায়! শক্ত থাবায় খাবার চেপে ধরে এল্‌সা শুরু করতো তর্জন-গর্জন। টর্চ-রাইফেল সমেত আমরা বেরিয়ে আসতাম। আমাদের পায়ের শব্দে মহারাজদের টনক নড়তো, খাবারের মায়া ছেড়ে নামতো গিয়ে জলে।

মাঝে মাঝে কয়েকটা কুমীরকে মারার চেষ্টা করিনি, তা নয়। কিন্তু কুমীর মারার এক মস্ত অসুবিধে হলো এই—জলের বাইরে ওদের চোখ দুটোই শুধু নজরে আসতো। চোখ ছাড়া শরীরের বাকী অংশটুকু থাকতো জলে

ডোবানো। তাছাড়া, বিপদবোধ সম্পর্কে ওদের এমনই সচেতনতা—বন্দুকের নল তুললেই ওরা টুপ করে ডুব দিতো জলে। কতবার যে ওদের পাল্লায় পড়ে আমাদের বোকা বনতে হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

বিশে জুন বাচ্চাদের বয়েস ছ মাস হলো। তাদের জীবনের অর্ধবার্ষিকীর এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে জর্জ একটা গিনি-ফাউল শিকার করে আনলো। পিঠ থেকে পাখীটা নামিয়ে সবে সে রেখেছে উঠোনে—ছোটো অমনি এক লাফে এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে সেটাকে কামড়ে ধরে ছুটে পালালো। ভাইয়েরা তাড়া করলো তাকে, পেছন পেছন দৌড়োলো। কিন্তু না, ছোটো ততক্ষণে পগার পার। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলো তারা, মায়ের কোলের কাছে শুয়ে পড়লো।

মা-ও দুষ্টু কম নয়। নিমেষে চিত হয়ে শুয়ে চার হাত-পায়ে সে জড়িয়ে ধরলো দুজনকে। অনেকক্ষণ হুটোপাটি করে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পেরে অবশেষে জেসপা মায়ের লেজটাই কামড়ে ধরলো। এবার কাজ হলো। তাদের ছেড়ে মা এগিয়ে এলো আমার দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার গলা।

জেসপা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে · কই, আমি তো তার মতো তার মায়ের লেজ কামড়ে দিচ্ছি না, আলিঙ্গনমুক্ত হবার জন্যে হুটোপাটি করছি না! এমনি ভাবেই চললো খানিকক্ষণ। হঠাৎ যেন হুঁশ হলো তার—নাঃ, এখানে থাকা আর সমীচীন নয়, এই অদ্ভুত দু'পেয়ে জন্তুটার রকমসকমই আলাদা!

ধীরে ধীরে এগোলো সে নদীর দিকে। গোপা তাকে অনুসরণ করলো। এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছোটোও এগোলো সেই দিকে। সবশেষে গেলো এল্‌সা।

বললাম—না এল্‌সা, না—শুনলো না সে আমার কথা। জেসপার নেতৃত্বে সকলে নেমে পড়লো নদীতে, সাঁতরে ওপারের দিকে এগোতে লাগলো।

বিকেলের দিকে সকলে আবার ফিরে এলো। এল্‌সা বড় ক্লান্ত। বাচ্চাদের তালে তাল দিতে তাকে হয়তো অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছে। আমার কোলে মাথা রেখে সে চোখ বুজলো। রকম-সকম দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগলো জেসপা, ধারালো নখে আমার ডান পায়ের পাতা আঁচড়াতে লাগলো। নীরবে সহ্য করলাম খানিকক্ষণ, এল্‌সার ঘুম ভাঙবে বলে পা টেনে সরিয়ে নিতে পারলাম না। অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। চোখের পলকে জেসপা করলো এক কাণ্ড। খ্যাঁক করে আমার হাত কামড়ে ধরে তর্জনীর নীচে ধারালো দাঁতের দাগ

বসিয়ে দিলো। সঙ্গে সব সময় সালফানিলামাইড-পাউডার মজুত রাখি, তাই রক্ষে। খানিকটা পাউডার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে ক্ষত শোধন করে নিলাম। এল্‌সা আধবোজা চোখে আগাগোড়া ঘটনাটাই দেখলো, ভুলেও তার আরামের জায়গাটি ছেড়ে মাথা তুললো না। একই ভাবে শুয়ে রইলো সে।

সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে তখন পাহাড়ের আড়ালে। কে যেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কোটি কোটি আলোর মশাল। দিগন্তে লেগে আছে অস্তগামী সূর্যের হলুদ-লাল দীপ্তি, পা টিপে টিপে চোরের মতো নেমে এলো মসীকৃষ্ণ ঘন অন্ধকার।

হঠাৎ দেখি, ছোটোর কান খাড়া হয়ে উঠেছে, নদীর দিকে তাকিয়ে সে কি যেন দেখছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। আবছা অন্ধকারে তার দর্শনীয় বস্তুটি নজরে এলো,—দেখি, নদীর পার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট হাতি, শুঁড় তুলে চারপাশে জল ছিটোচ্ছে। সুতরাং আর উঠোনে থাকা সমীচীন নয়। যদিও হাওয়া এখন উত্তর-মুখো—নদীর দিক থেকে শন শন বেগে ছুটে আসছে এদিকে, তবু হাওয়ার ভরসায় থাকা যায় না। দিক পালটাতে কতক্ষণ!

গিয়ে ঢুকলাম তাঁবুতে। এল্‌সারা বসলো বেড়ার আড়ালে। জেসপার হালচাল দেখে একটু অবাক হলাম। অন্য সময় হলে উঠোন থেকে এটুকু আসতে আমার দিকে তাকিয়ে সে কয়েকবার গজরাতো। আজ টুঁ শব্দটি করলো না।

কি যে চায় জেসপা, কি ওর মতলব···ভগবান জানেন। বাচ্চাদের ব্যাপারে শাসন-বাঁধন আমাদের কিছু নেই। ওরা ওদের মতন থাকুক—আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে এতোটা সহ্য করা যায় না। কোনো কথাই ওরা শোনে না, যা খুশি তাই করে। মনে আছে, ছোটো-বয়েসে খেলার ছলে থাবার ঘা মারলে এল্‌সাকে যেই বলতাম—না এল্‌সা, না—অমনি সে থাবা গুটিয়ে নিতো। কিন্তু এতো অবাধ্য জেসপা, কথা তো শোনেই না, ভয় দেখালেও ভয় পায় না। ছোটো আর গোপার অবশ্য এতোটা সাহস এখনও হয়নি। আমাকে এড়িয়ে চলতেই তারা অভ্যস্ত। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার—আমি যে ওদের আপন জন, এটুকু হয়তো এতোদিনে ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে। বন্ধুত্ব না হোক, আপোস একটা আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে।

সে-যাত্রা পাঁচদিন তাঁবুতে কাটিয়ে ফিরে এলাম ইসিওলোয়। এসে শুনি, শিকারের দল নিয়ে জর্জকে সামনের মাসে তিন সপ্তাহের জন্য যেতে হবে

উত্তরের জঙ্গলে। এই তিন সপ্তাহ একা এখানে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর। তাছাড়া গাড়িটাও তিন সপ্তাহের জন্য আটক থাকবে তার সঙ্গে। সুতরাং, এমতাবস্থায় আমার পক্ষে এই একুশটা দিন তাঁবুতে কাটিয়ে আসাই বাঞ্ছনীয়।

পয়লা জুলাই অবধি ইসিওলোয় থাকলাম। জর্জ আগেই চলে গেছে টহলধারীর কাজে। কথা আছে, দোসরা জুলাই কাজ সেরে ওখান থেকে তাঁবুতে আসবে সে, আমিও যেন ঐদিনই গিয়ে পৌঁছোই।

সুতরাং ২ তারিখ ভোরে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছুটলো জঙ্গলের পথে। হিসেবমতো, পথেই জর্জ-এর থাকার কথা। কিন্তু কোথায় জর্জ। সাতপাঁচ নানারকম ভাবতে ভাবতে এগোলাম। তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছতে একটা পোড়া গন্ধ এসে নাকে লাগলো। দমকে দমকে বাতাস বয়ে নিয়ে এলো রাজ্যের ধোঁয়া।

ধোঁয়া পোড়া গন্ধ ··ব্যাপারটা কি। তাঁবুর যত কাছে আসি, ধোঁয়া তত বাড়ে। সামনে চোখ চলে না। দম আটকে আসে।

অবশেষে পৌঁছলাম। পৌঁছে যা দেখলাম—আমি তো হতভম্ব! কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হলো না। দেখি, তাঁবুর আশেপাশের ঝোপঝাড়, গাছপালা পুড়ে ছাই। উঠোনের অ্যাকাশিয়া গাছ দুটো ঝলসে গেছে। চারপাশের এই বীভৎস নারকীয়তার মাঝখানে তাঁবুর সবুজ ত্রিপলের ছাউনিটুকুই একমাত্র ব্যতিক্রম। একটু পরে জর্জ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। দুপুরের খাবার খাচ্ছিলো সে, খেতে খেতে উঠে এসেছে।

সে যা বললো, তার সারমর্ম এই—তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হতে দুদিন আগে তাঁবুতে পৌঁছে সে দেখে, তাঁবু এবং তার সংলগ্ন গাছপালা-ঝোপঝাড় দাউ দাউ করে জ্বলছে। কথা নেই, বার্তা নেই—ডজনখানেক আদিবাসী জ্বলন্ত মশাল হাতে হৈ হৈ করতে করতে তাঁবুতে এসে চেয়ার-টেবিল ভেঙে, তাঁবুর খুঁটি উপড়ে এক জায়গায় জড় করে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। আশে-পাশের আধ বর্গমাইল জায়গা তাদের আক্রোশের কবল থেকে রেহাই পায় না। ক্রোধে-হিংসায় তারা তাঁবু-সংলগ্ন ইব্রাহিমের সাধের ফসলের ক্ষেতটাও নষ্ট করে দিয়ে যায়।

পুরনো তাঁবুর আর অবশিষ্ট বলতে কিছুই ছিলো না। আগুন একটু কমতে বন-বিভাগের অধিকর্তার দপ্তর থেকে নতুন একপ্রস্থ তাঁবুর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এলো জর্জ। নতুন উদ্যোমে আবার নতুন তাঁবু খাটানো হলো।

এল্‌সাকে নিয়েই জর্জ-এর চিন্তা ছিলো সবচেয়ে বেশি। বেশ কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করতে রাত এগারোটা নাগাদ সপরিবারে এসে হাজির হলো

সে। এখানে আসার পথে জর্জ তার জন্য মেরে এনেছিল একটা ছাগল। বুভুক্ষুর মতো গোটা ছাগলটা তারা খেলো। এল্‌সা এসে শুয়ে পড়লো জর্জ-এর তাঁবুতে। বাচ্চারা বেড়ার আড়ালে গুটিসুটি মেরে রইলো। এল্‌সার শরীরের কয়েক জায়গায় ক্ষত। মলম-টলম লাগিয়ে দিলো জর্জ। রাত থাকতে উঠে এল্‌সা তার বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেলো। তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পাহাড়ে গিয়ে জর্জ দেখলো—সেই বিরাট পাথরটার ওপর শুয়ে আছে এল্‌সা, বাচ্চারা খেলা করে বেড়াচ্ছে তার আশেপাশে।

জর্জ এগোলো। আগের রাতে কোত্থেকে এসেছে এল্‌সা, সেটাও জানা দরকার। এগোতে এগোতে এক জায়গায় দেখি, এল্‌সাদের পায়ের ছাপের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী আদিবাসীদের পায়ের ছাপ মিশে একাকার হয়ে গেছে। তার মানে, শয়তানরা হয়তো এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের শিকার করার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিল।

ক্ষিধে আমারও পেয়েছিল, কিন্তু জর্জ-এর মুখে এসব বৃত্তান্ত শোনার পর খাবার আর গলা দিয়ে নামতে চাইলো না। যাই হোক, টহলদার-বাহিনীর তিনজনকে জর্জ পাঠিয়ে দিলো অপরাধীদের পাকড়াও করে আনতে। ঘণ্টা দুয়েক পর ছ'জনকে নিয়ে তারা ফিরলো। অপরাধের প্রাথমিক পর্যায়ের শাস্তিস্বরূপ তাদের দিয়ে তাঁবুটা আগের মতো সুন্দরভাবে তৈরী করিয়ে নেওয়া হলো। রাশিকৃত কাঁটাগাছ কেটে এনে তাঁবুর চৌহদ্দি ঘিরে দু-মানুষ সমান উঁচু বেড়া বানালো তারা।

সে-রাতটা এল্‌সা তাঁবুতেই কাটিয়ে গেলো। ভোরের দিকে বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেলো সে। তারা রওনা হয়ে যাবার পর আধঘণ্টাও কাটেনি, হঠাৎ শুনি পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসছে তার ভয়ার্ত হুঙ্কার। কি হলো এল্‌সার · এতো ডাকাডাকি কিসের···নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছি মনে মনে—হঠাৎ নদী পার হয়ে ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় সে এসে ঢুকলো তাঁবুতে। সঙ্গে তার বাচ্চারা নেই। পিঠের কয়েক জায়গা তার ছড়ে গেছে, রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

মলম লাগিয়ে ক্ষতস্থানগুলো যে একটু বেঁধে দেবো, সে সুযোগটুকুও দিলো না সে। তাঁবুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ সমানে গর্জন করলো, তারপর ব্যস্তসমস্তভাবে এগোলো পাহাড়ের দিকে। জর্জও রাইফেল হাতে তাকে অনুসরণ করলো।

নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে এল্‌সা, হয়তো কোনো শত্রুর সঙ্গে তাকে যুঝতে হয়েছে। পিঠের ক্ষতগুলো দেখে অনুমান করা যায়, কোনো সিংহের সঙ্গে একটু আগে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে গেছে। কোনোক্রমে তাকে

এড়িয়ে সে ফিরে এসেছে তাঁবুতে, কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে আনতে পারেনি। তারা হয়তো বেগতিক দেখে চম্পট দিয়েছে।

পাহাড়ে পৌঁছে খোঁজাখুঁজি চললো অনেকক্ষণ। বাচ্চাদের হদিশ মিললো না। সমানে ডেকে চললো এল্‌সা। একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন শুঁকলো সে, কিন্তু না—সেখানে বাচ্চা বা তাদের পায়ের ছাপের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

এল্‌সাকে রেখে জর্জ ফিরে এলো তাঁবুতে। সঙ্গে নুরুকে নিয়ে আবার বেরোলো। পাহাড়ে পৌঁছে দেখে, এল্‌সা নেই। নদীর পাড় ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে সে জঙ্গলে ঢুকেছে।

তল্লাশী চললো আরো অনেকক্ষণ। লাভ হলো না কিছু। বাচ্চাদের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। কোথায় গেলো ওরা···কোথায়!

খানিকক্ষণ পরে এল্‌সা বেরিয়ে এলো জঙ্গলের আড়াল থেকে। তার চোখে তখনো উদ্বেগ, এতোক্ষন জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি করেও সে বাচ্চাদের কোনো হদিশ করতে পারেনি।

নুরুকে ফিরে আসতে বলে জর্জ আর এল্‌সা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অন্যদিকে এগোলো। কিছুদূর গিয়ে জর্জ দেখে—নরম মাটিতে একজোড়া সিংহ-দম্পতির একপ্রস্থ পায়ের ছাপ। ব্যাস্, আর যায় কোথায়! এতোক্ষণ এল্‌সা চলছিল আগে আগে, জর্জ তার পেছন পেছন। এবার হলো ঠিক উলটো—জর্জকে এগিয়ে দিয়ে এল্‌সা চললো তার পেছন পেছন।

পাহাড়টা ঢালু হতে হতে যেখানে গিয়ে মিশেছে উপত্যকায়, সেখানে এসে থামলো এল্‌সা, এক বিরাট পাথরের কাছে গিয়ে কি যেন শুঁকলো। পাথরের ওপাশ থেকে উঁকি মারলো গোপা, ছোটো উঁকি দিলো তার ঘাড়ের পাশ থেকে।

মাকে দেখে কি আনন্দই না তাদের! এক লাফে পাথর ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা মায়ের পিঠে, শুরু হলো তিনজনের আদর-অনুরাগের পালা।

তা আদরই হোক আর যা-ই হোক—জেসপা কোথায়! দুজনকে পাওয়া গেলো, খানিকটা নিশ্চিন্তি, কিন্তু জেসপাকে না পাওয়া অবধি তো মনে শান্তি নেই।

জর্জ ফিরে এলো তাঁবুতে। চা খেতে খেতে আমাকে বললো তাদের অভিযানের কথা। জেসপাকে পাওয়া যায়নি শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি চাটুকু শেষ করে জর্জ-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছেছি, খোঁজাখুঁজি করছি—এল্‌সা এসো হাজির।

আমাকে দেখে কি খুশীই না হলো সে! দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরে গালে মুখ ঘষতে লাগলো। দেখলাম, তার লোমের পরতে পরতে অসংখ্য ডাঁশ। ডাঁশ বেছে দিতে গিয়ে বুকে এবং ডান গালে দুটো ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়লো। সঙ্গে মলম ছিলো, লাগিয়ে দিলাম।

আমাকে দেখে গোপা আর ছোটো তো লজ্জায় অস্থির। এক ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকোলো তারা, মাঝে মাঝে উঁকি মেরে আমাকে দেখতে লাগলো। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এল্‌সাকে ছেড়ে আমরা অন্যদিকে এগোলাম। ওরা দুজন ফিরে এলো মায়ের কাছে।

হাঁটতে হাঁটতে উপত্যকা পেরিয়ে গিয়ে উঠলাম 'জোম পাহাড়ে'। এদিকটায় কালে-ভদ্রে আসে এল্‌সা, তবু চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে এতোদূর অবধি আসতে হলো। তন্নতন্ন করে সম্ভাব্য জায়গাগুলো খুঁজলাম, জেসপার হদিশ পাওয়া গেলো না। অবশেষে হতোদ্যম হয়ে ফেরার পথ ধরলাম। তাঁবুর কাছাকাছি পাহাড়টার কাছ থেকে এল্‌সা আমাদের সঙ্গী হলো। সঙ্গে চললো তার দুই বাচ্চা।

দুই কোথায়! এ তো দেখি তিনজন! জেসপাও কখন যেন এসে জুটেছে দলে। বীরোচিত ভঙ্গিতে মায়ের পাশে পাশে সে এগোচ্ছে!

এল্‌সার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো না, জেসপার পুনরাবির্ভাবে সে এতটুকু অবাক হয়েছে। নিস্পৃহভাবে কোনোদিকে না তাকিয়ে সে এগোতে লাগলো। দেখলাম, তার মুখ-চোখের সেই উদ্বিগ্ন ভাবটি এখন আর নেই। মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে এক নির্মল প্রশান্তি।

দেখো কাণ্ড! প্রায় বারো ঘণ্টা হতে চললো—সমানে খুঁজে বেড়াচ্ছি জেসপাকে। তাঁবুর কাছাকাছিই ছিলো সে এতোক্ষণ ঘাপটি মেরে! বারোটি ঘণ্টা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে এখন বীরত্ব দেখাচ্ছে, নাক উঁচু করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে!

নদীর পারে এসে থামলো এল্‌সা, বাচ্চারাও থামলো। নিশ্চিন্তে জল খেতে লাগলো তারা। আমরা ঘুরপথে ফিরে এলাম তাঁবুতে—বাবুরা আসছেন, খাবার তৈরী করে রাখতে হবে তো!

এদিকে জর্জ-এরও রয়েছে ফেরার তাড়া। তাঁবুতে ফিরে কোনোমতে চারটি নাকে-মুখে গুঁজে সে বেরিয়ে পড়লো। ইসিওলোয় ফিরতে হবে তাকে, শিকারের দল নিয়ে বেরোবার তোড়জোড় করতে হবে।

এই ভর সন্ধ্যেয় তাকে যেতে দেবার একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না আমার। রাত-বিরেতে যেতে হবে এতোখানি পথ। কত জন্তুর মুখোমুখি হতে হবে, কত জানোয়ারের পাশ কাটাতে হবে। কিন্তু উপায় নেই, যেতে তাকে

হবেই। স্থতরাং আপত্তি করে ফল হলো না।

জর্জ-এর গাড়িও ছাড়লো, পাহাড়ের দিক থেকে অমনি শুরু হলো গর্জন। দুটো সিংহ ডাকছে। ডাক শুনে বুঝলাম, এরা আমাদের অপরিচিত। ডাকের লক্ষ্য—এল্‌সা।

তা এল্‌সার ততক্ষণে খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠেছে। বাকী খাবারটুকু উঠোনে ফেলে রেখে সে গিয়ে ঢুকেছে বেড়ার আড়ালে, সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে বাচ্চাদের।

সকালবেলা উঠে দেখি, ডাকতে ডাকতে নদী ডিঙিয়ে তাঁবুর কাছাকাছি চলে এসেছিল সেই দুই সিংহ প্রবর। তারপর হতাশ হয়ে নদীর জল খেয়ে ফিরে চলে গেছে।

বলিহারি বিপদ বাপু! সকলে যেন চক্রান্ত করে এল্‌সার পেছনে লেগেছে। কিছুতে তাকে দুদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না। উভয় সঙ্কট আর কাকে বলে—ডাঙায় সিংহ, জলে কুমীর। সিংহদের সঙ্গে তা-ও বা যেটুকু রফা করা যায়, কুমীরদের সঙ্গে সেটুকুও হবার সম্ভাবনা নেই। ওরা যেন ওত পেতেই আছে—সুযোগ পেলেই ঠ্যাং কামড়ে এল্‌সাকে টেনে নিয়ে যাবে জলে।

এইতো সেদিন—ওপারে রয়েছে এল্‌সা, এপার থেকে আমি ডাকলাম। টপাটপ চারজন নেমে পড়লো জলে। সাঁতরে মাঝ নদী বরাবর এলো, তারপরই উর্ধ্বশ্বাসে পেছন ফিরে দে ছুট। একদমে গিয়ে উঠলো তারা ডাঙায়। দেখি, জলের নীচে থেকে একটা রোঁয়াওঠা মাথা একবার ভেসে উঠেই আবার জলের তলায় মিলিয়ে গেল।

এক ঘন্টা ঠায় ওপারেই বসে কাটালো এল্‌সা। ভুলেও এদিকে আসার চেষ্টা করলো না। মনে মনে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। যাই হোক—এটুকু জ্ঞানগম্যি ওদের অন্ততঃ হয়েছে, ঝোঁকের মাথায় চটপট কিছু করে বসার অভ্যেস ওরা ছেড়েছে।

একঘন্টা পর সঙ্কীর্ণতম স্থানটি দিয়ে নদী পেরিয়ে সে এপারে এলো। বাচ্চারাও এলো তার পেছন পেছন। সকলে বসে পড়লাম বালির ওপর। এল্‌সা তার বাচ্চাদের গা চাটতে লাগলো।

নদীর পারে বসে দেখলাম পায়ে পায়ে নেমে আসা সন্ধ্যার রূপ। আকাশের পূবদিক থেকে কে যেন একটা কালো চাদর বিছোতে এগিয়ে এলো পশ্চিম দিকে। গোল থালার মতো চাঁদ উঠলো আকাশে।

এল্‌সার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আমি তন্ময় হয়ে দেখছি প্রকৃতির এই মনোহারী রূপ, হঠাৎ চমক ভাঙলো। দেখি, বাচ্চারা একদৃষ্টে তাকিয়ে

আছে নদীর দিকে, কান খাড়া করে মাটিতে লেজ আছড়ে কি যেন একটা কিছু পর্যবেক্ষণ করছে।

তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। দেখি, জল ছেড়ে অর্ধেক শরীর ডাঙায় তুলে জুলজুল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে এক কুমীর, রোঁয়া-ওঠা ধূসর রঙের মাথাটা জলের ওপর স্থির নিশ্চল হয়ে আছে।

খুব সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে তুলে নিলাম রাইফেল। নিশানা ঠিক করার দরকার হলো না, তুলেই ট্রিগার টিপলাম। গুলি গিয়ে লাগলো তার মাথার মাঝখানে, কুমীরটা মরলো।

ভেবেছিলাম, শব্দ শুনে বাচ্চারা হয়তো ভয় পাবে, চমকে যাবে। কিন্তু না, এতোটুকু চমকালো না তারা। আর পাঁচটা সাধারণ ঘটনার মতো এটাকেও সহজ ভাবে নিলো। আনন্দে-কৃতজ্ঞতায় এল্‌সা আমার হাত চাটতে লাগলো।

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে জেসপার ব্যবহারে এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমাকে সে কেন জানি না, হঠাৎ মন দিয়ে বসলো। আগের মতো দূরে দূরে থাকা, কি তীক্ষ্ণ নখে পা আঁচড়ানো—এসব আর সে মনে রাখলো না। সময়-সুযোগ পেলেই এগিয়ে এসে তার মায়ের মতো আমার পা চাটতে শুরু করতো, মাঝে মাঝে দু হাতে জড়িয়ে ধরতো গলা। এমন কি, অভুক্ত মাংসটুকু টানতে টানতে বেড়ার আড়ালে নিয়ে যেতে দেখেও সে আর এতোটুকু অবাক হতো না। বাধ্য ছেলেটির মতো চুপচাপ বসে তাকিয়ে দেখতো আমার কাণ্ড-কারখানা।

বিকেল হলেই উঠোনে বসতো খেলার আসর। মা তার মানমর্যাদা-সম্ভ্রম নিয়ে শুয়ে থাকতো মাঝখানে, বাচ্চারা তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে খেলতো। দুষ্টুর শিরোমণি জেসপার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। মা শুয়ে আছে, থাক —তোরা বাপু নিজেদের মনে খেলাধুলো কর্, তা নয়, সেটি চলবে না—মাকেও তাদের সঙ্গে বাঁদর-নাচ নাচতে হবে।

গুটিগুটি পেছন দিক থেকে এগিয়ে আসতো জেসপা, খপ করে দু হাতে চেপে ধরতো মায়ের লেজ। কত টানাটানি করতো এল্‌সা, কত হাত-পা ছুঁড়তো। কে শোনে কার কথা। কিছুতেই লেজ ছাড়বে না সে। অগত্যা উঠে বসতে হতো এল্‌সাকে, জেসপাকে বুকের নীচে চেপে ধরে দু-একটা ধমক-ধামক দিতে হতো। উপায়ান্তর না দেখে জেসপাও অগত্যা সন্ধি করতো। সন্ধির শর্ত হিসেবে গা-হাত-পা চেটে মায়ের মন ভোলাতো। এতোদিনে তাঁবুর ভীতিও কাটলো বাচ্চাদের। খেলাধুলো সাঙ্গ হতে মায়ের সঙ্গে গুটিগুটি ঢুকতো গিয়ে তারা তাঁবুতে। গোপা আর ছোটো মায়ের

পাশে শুয়ে পড়তো। জেসপা শুতো না। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত টহল দিয়ে বেড়াতো আর হাতের নাগালে যা যা পেতো, সব টেনে মাটিতে নামাতো। সবকিছুতেই ওর সমান কৌতূহল, সবকিছুতেই সমান আগ্রহ। বিয়ারের বোতলের বাক্সটা নাড়িয়ে দেখতে সে যেমন মজা পেতো, তেমনই মজা পেতো শুকনো খাবারের টিনগুলো নিয়ে খেলতে। একদিন সকালে টোটো এসে বললো আমার আরাম-কেদারার স্পঞ্জের গদিটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে নদীর জলে। গিয়ে দেখার দরকার হলো না। অনুমানে বুঝলাম, জেসপার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গদিটাকে টুকরো টুকরো হতে হয়েছে।

একদিন সে সোজা গিয়ে ঢুকলো রান্নার তাঁবুতে। জ্বলন্ত চুল্লি থেকে আরম্ভ করে গুঁড়ো মশলার প্যাকেট—সবই একবার করে শুঁকলো, তারপর বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।

তাঁবু এবং তার আশপাশের জমি পুড়ে গিয়ে আর যাই হোক—একটা মস্ত সুবিধে হলো। বিছের হাত থেকে সকলে রেহাই পেলাম। ওঃ, বিছেও কি বিছে! এক একটা অ্যাত্তো বড়! কামড়ালে আর রক্ষে নেই—পনেরোটি দিন যন্ত্রণায় সমানে ছটপট করতে হবে। কয়েক বছর আগে পাহাড়ী বিছের কামড়ে আমাদের টেরিয়ার কুকুরটার তো যাই যাই দশা! আমাকেও একবার দিয়েছিল হুল ফুটিয়ে। পনেরোটা দিন কি কষ্টই না সয়েছি! পনেরো দিন পর বিষের ক্রিয়া আপনাআপনি নিস্তেজ হয়ে আসতে তবে শান্তি। সচরাচর দু রকম বিছে দেখা যায় আমাদের অঞ্চলে। এক রকমের বিছে প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বা, রং কুচকুচে কালো—দেখলেই কেমন একটা বিশ্রী অনুভূতি হয়। আর এক রকম লম্বায় ছোট। অতোটা কালো নয়। কিন্তু বিষ এগুলোরই বেশি।

শুধু বিছে নয়, ব্যাঙের হাত থেকেও নিস্তার পেলাম আগুনের দৌলতে। ওরা অবশ্য ক্ষতি-টতির ধার-কাছ দিয়ে যেতো না। থপ থপ করে লাফাতে লাফাতে যেখানে-সেখানে যার-তার ওপর চড়ে বসতো। তাঁবুতে থাকাকালীন এল্‌সার মাথায় কতদিন যে ওরা চড়ে বসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আর, আমার জন্যে ত্রিপলের বাথটবে স্নানের জল ঢাললে তো কথাই নেই। লাফাতে লাফাতে টবে নেমে মনের সুখে শুরু করে দিতো তাদের উদাত্ত সঙ্গীত।

একদিন সকালে ম্যাকেদের নজরে পড়লো, তাঁবু থেকে মাইলখানেক দূরের জঙ্গলের মাথায় চক্কর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে একপাল শকুন। কি ব্যাপার! এতো শকুন কেন! এগোলো সে। দেখে, এক গণ্ডারের দেহাবশিষ্ট তীর-বিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে ঝোপের আড়ালে। তার আশেপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে অনুপ্রবেশকারীদের পায়ের ছাপ।

ঠিক নজর রেখেছে ওরা।. দেখেছে, জর্জ নেই—ম্যাকেদকে নিয়ে আমি একলা রয়েছি তাঁবুতে, অমনি ঢুকে পড়েছে। কি যে করি ওদের নিয়ে…

আটই জুলাই রাতে তাঁবুর আশেপাশে বসে গেলো রীতিমতো এক যন্ত্রসঙ্গীতের আসর। কত রকম বাদ্যি-বাজনা—এল্‌সার সিংহের ঘোঁত-ঘোঁতানি, এক চিতাবাঘের খক্‌খক্ শুকনো কাশি, হায়নার হাসি, হাতির ডাক – সব মিলিয়ে সে-এক তুলকালাম কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যায় উঠোনে বসে এল্‌সার গা থেকে বেছে দিচ্ছি ডাঁশ, হঠাৎ খুব কাছাকাছি যেন তার সিংহ ডাকলো। ব্যাস্, এক ডাকেই খেল খতম। এল্‌সা ভয়ে জুজু। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে একছুটে আমার হাত ছাড়িয়ে সে ঢুকলো গিয়ে তাঁবুতে, সারারাতে বেরোবার নামও করলো না। ভোরের আলো ফুটতে চারদিক দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে বেরোলো। বলা বাহুল্য, সিংহটি ততক্ষণে চলে গেছে।

সকাল নটা নাগাদ বাচ্চাদের নিয়ে আবার ফিরে এলো সে। দেখে যারপরনাই অবাক হলাম। সচরাচর এ সময় সে বড় একটা আসে না। উঠোনে দাঁড়িয়ে ছাগলের খোঁয়াড়ের দিকে তাকিয়ে ঘাড় তুলে সমানে ঘোঁতঘোঁত করতে লাগলো। মনের ভাব বুঝতে দেরী হলো না। ম্যাকেদকে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরী করে দিতে বললাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা চলে গেলো।

পরপর দুদিন সারা দিনমানে দেখা পেলাম না তাদের। তিনদিনের দিন সন্ধ্যে উৎরে যাবার পর তারা এলো। দেখলাম, কি যেন একটা আশঙ্কার ছাপ এল্‌সার চোখে-মুখে, কোনো অনাগত বিপদের সম্ভাবনায় সে যেন বার বার চমকে চমকে উঠছে। চতুর্থ দিন অর্থাৎ পনেরোই জুলাই দেখলাম, শুধু গোপা আর ছোটোকে নিয়ে সে এসেছে, সঙ্গে জেসপা নেই।

জেসপা নেই · কোথায় গেলো সে! এলো না কেন! জেসপা···জেসপা ···জেসপা···জেসপা · প্রায় বার পনেরো-কুড়ি মন্তর পড়ার মতো এল্‌সার কানে জেসপার নাম জপ করলাম। কাজ হলো, খাবার ফেলে নদীর দিকে এগিয়ে গেলো সে, ঘাড় উঁচু করে ডাকতে লাগলো।

আমি আর এগোলাম না। রাত-বিরেতে কোথায় যেতে কোথায় যাবো, কার সামনে পড়বো—ঠিক নেই। তাঁবুতেই বসে রইলাম চুপচাপ। একসময় এল্‌সার ডাক মিলিয়ে গেলো দূরের জঙ্গলে।

হঠাৎ···এক প্রবল হুঙ্কার, তারপরই আরেকটা, আরো একটা, আরো আরো·· চমকে উঠলাম। সিংহ একটা নয়, দুটো—তিনটেও হতে পারে। এল্‌সার শেষ ডাক যেদিক থেকে ভেসে এলো, ওরাও ডাকছে সেই দিকে। এল্‌সাকে কি ওরা আক্রমণ করলো!

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ম্লান কুয়াশার মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। শনশন করে বইছে বাতাস। নদীর পাশের বালিয়াড়ি যেন এক ধুলো-মাটির টানা পথ। যতদূর চোখ চলে—এল্‌সার চিহ্নমাত্র নেই। এখন উপায়··

চিন্তায় ছেদ পড়লো। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে একটা সড়সড় শব্দ—ছুটতে ছুটতে এল্‌সা এসে দাঁড়ালো উঠোনে। আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলো। দেখলাম, ডান কানটা তার জখম হয়েছে, খানিকটা মাংস কেউ যেন খুবলে নিয়েছে কানের পাশ থেকে। গলগল করে বেরিয়ে আসছে তাজা লাল রক্ত।

ছোটো আর গোপাও এসে হাজির হলো একটু পরে। তাদের চোখের দৃষ্টিতে ভয়মিশ্রিত বিস্ময়। যেন সবকিছু দেখে তারা ঘাবড়ে গেছে, অবাক হয়ে গেছে।

তা অবাক আমিও কিছু কম হইনি। আগেও অনেকবার জখম হয়েছে এল্‌সা, দুষ্টুমি করতে গিয়ে বা অন্য জন্তুর সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবারকার মতো কোনোটা নয়। এতো রক্ত···উঃ, মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো।

তাঁবুর ভেতর থেকে সালফানিলামাইড পাউডারের শিশিটা নিয়ে বাইরে এলাম, এগিয়ে গেলাম এল্‌সার দিকে—প্রবল আপত্তিতে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়তে লাগলো সে। না, কিছুতেই সে আমাকে ওষুধ লাগাতে দেবে না।

এদিকে, বাচ্চারাও তখন খেতে খেতে উঠে গেছে—অর্ধভুক্ত খাবার টেনে নিয়ে রেখেছি বেড়ার আড়ালে—ক্ষিদে পেয়েছে ওদের অবশ্যই। সুতরাং, এনে দিলাম খাবার। মুখ ফিরিয়ে দেখলো একবার এল্‌সা, এগোলো না।

বাচ্চারা টানতে টানতে খাবার নিয়ে গেলো ঝোপের আড়ালে, নিশ্চিন্তে বসে গপাগপ খেতে লাগলো।

এল্‌সার কাছে গিয়ে বসলাম, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। আরামে চোখ বুজলো সে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মাথা নাড়তে লাগলো। তারপর একসময় উঠে বাচ্চাদের নিয়ে রওনা দিলো জঙ্গলের দিকে।

সারাটা রাত দুশ্চিন্তায় ছটফট করলাম, দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। ভোর হতে না হতে নুরু আর ম্যাকেদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এল্‌সার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে গিয়ে পৌঁছলাম পর্বত-গুম্ফায়।

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তাদের দেখা পাওয়া গেলো। জেসপা ফিরে এসেছে! এল্‌সার গায়ে মাথা রেখে শুয়ে আছে গোপা আর ছোটে', জেসপা মায়ের গা চেটে দিচ্ছে।

রক্ত তখনো বন্ধ হয়নি। চুঁইয়ে চুঁইয়ে চোয়াল বেয়ে নামছে রক্তের ক্ষীণ ধারা। মাছি ভনভন করে উড়ে বেড়াচ্ছে ক্ষতস্থান ঘিরে, এল্‌সা ঘাড় নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে।

বড় বে-জায়গায় জখম হয়েছে এল্‌সার। জিভ দিয়ে একটু যে চাটবে—তারও উপায় নেই। চোয়ালের ঐ জায়গায় জিভ পৌঁছয় না। চাটতে পারলে আপনা-আপনি রক্ত পড়া বন্ধ হতো।

আর একদফা চেষ্টা করলাম ওষুধ লাগাতে, পারলাম না। ঘাড়টাড় নেড়ে এমন কাণ্ড করলো এল্‌সা—জোরজার করতে সাহস পেলাম না। ফিরে চললাম তাঁবুর দিকে। মন দুশ্চিন্তায় ভরে রইলো···শরীরের এমন অবস্থায় ও যদি আদিবাসীদের তীরের মুখে পড়ে—কি উপায় হবে তাহলে! খাবারের লোভেও কি পাহাড় ছেড়ে একবার তাঁবুতে আসবে না!

আসার সময় একটু ঘুরপথে এলাম। উদ্দেশ্য, কাল রাতের যুদ্ধক্ষেত্রটা স্বচক্ষে একবার দেখে যাওয়া। জঙ্গলের কাছাকাছি নদীর মাঝবরাবর এক নাতি-প্রশস্ত চর। তাঁবু থেকে আধমাইলের পথ। দেখলাম, চরের বালিতে কয়েকটা সিংহের অসংখ্য পায়ের ছাপ। এল্‌সার ছাপও রয়েছে জায়গায় জায়গায়। তবে সিংহের সংখ্যা ঠিক কজন—তা বোঝা গেলো না।

সন্ধ্যে নাগাদ এলো এল্‌সা। এবার আর মলম বা পাউডার নয়—নতুন এক কায়দা ধরলাম। এল্‌সার মাংসের সঙ্গে তিনটে ট্যাবলেট মিশিয়ে দিলাম। হিসেবমতো পনেরোটা ট্যাবলেট খেতে হবে তাকে। তাহলে আর জায়গাটা সেপটিক হবে না।

তা জেসপার কাণ্ড-কারখানা দেখে হাসি পেলো খুব। এ অবধি যা যা ঘটেছে, সবকিছুই তার জন্যে, খোদ নাটের গুরুটি স্বয়ং সে। অথচ এখন···

এখন যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না। শান্তশিষ্ট-লেজবিশিষ্ট হয়ে আমার গা চেটে খাতির জমাচ্ছে।

রাতের বরাদ্দ খাবারটুকু খেয়ে এল্‌সারা কিছুক্ষণ তাঁবুতে কাটালো। তারপর কি মনে করে এগোলো জঙ্গলের দিকে। সে চলে যাবার খানিকক্ষণ পরে নদীর দিক থেকে শুরু হলো এক অচেনা সিংহের ডাকাডাকি।

পরদিন বিকেলের দিকে এলো এল্‌সা। বাচ্চারা সকলেই তার সঙ্গে আছে। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। জেসপা আমার পিঠে মুখ ঘষে আদর জানালো। আদরের মাত্রাটা আজ যেন একটু বেশি। এল্‌সা উঠে এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে শুয়ে পড়লো আমার পিঠ ঘেঁষে।

সন্ধ্যের দিকে নুরু ফিরলো একপাল ছাগল নিয়ে। ছাগলের সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল দেখে তাকে সকালেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ট্রেলারের দরজা খুলে তাদের নামালো নুরু। এল্‌সাদের দেখে যেন ভূত দেখলো তারা। ব্যা-ব্যা করে ডেকে নেচে-কুঁদে পায়খানা-পেচ্ছাপ করে সে এক রীতিমতো হৈচৈ কাণ্ড! বাচ্চারাও অবাক হলো খুব। এই প্রথম তারা জ্যান্ত ছাগল চোখে দেখলো।

রাত একটু বেশি হতে উঠলো এল্‌সা। বাচ্চাদের নিয়ে নদী পেরিয়ে চলে গেলো ওপারে।

আমরা যে যার শুয়ে পড়লাম। সবে দু চোখের পাতা জুড়ে এসেছে—হঠাৎ চমকে উঠলাম। উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো সিংহ, এল্‌সাদের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসের টুকরোগুলো নিয়ে তারা ছেঁড়াছিঁড়ি শুরু করেছে।

বলতে গেলে, সারাটা রাত জেগেই কাটালাম। ভোর তিনটে নাগাদ উঠোন ছেড়ে তারা জঙ্গলের পথ ধরলো। সকালে উঠে পায়ের ছাপ দেখে বুঝলাম—দুজনের মধ্যে একজন সিংহ, আরেকজন সিংহী। এরা দুজনেই আমাদের অপরিচিত। এই প্রথম দেখলাম ওদের পায়ের ছাপ।

পরের কটা দিন এল্‌সা আর তাঁবু-মুখো হলো না। এই দুই অচেনা সিংহ-সিংহীর অবস্থিতি হয়তো সে টের পেয়েছে। ভয়ে ভয়ে তাই এলো না। খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু ফল হলো না। দেখতে দেখতে তিনদিন কাটলো। চারদিনের দিন বড় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। কি হলো এল্‌সার! কোথায় গেলো! আদিবাসীদের হাতে পড়লো না তো!

বোঝার ওপর শাকের আঁটি—বিশে জুলাই সন্ধ্যের একটু আগে দেখি, জঙ্গলের এক জায়গায় শূন্যে চক্কর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে কটা শকুন। শকুন .. তবে কি এল্‌সার বড় রকমের কিছু অমঙ্গল হলো!

আর নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না তাঁবুতে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে—একবার

সরেজমিনে জায়গাটা দেখে আসা ভালো।

রওনা হলাম। গিয়ে দেখি আশেপাশে প্রায় আধমাইলটাক জায়গা আদিবাসীদের পায়ের ছাপে বোঝাই। জন্তু-জানোয়ার মেরে গাছে গাছে তারা চামড়া টানা দিয়ে রেখেছে—শকুনগুলো সেজন্যেই উড়ছে।

এক সপ্তাহ আগে তীরবিদ্ধ গণ্ডারটাকে দেখে আমি আর কালক্ষেপ করিনি। বন-অধিকর্তার দপ্তরে খবর পাঠিয়ে বলেছিলাম, তিনি যেন অবিলম্বে কয়েকজন টহলদার পুলিশ পাঠিয়ে দেন। জর্জ-এর অনুপস্থিতিতে তারা কাছাকাছি থাকলে মনে তবু খানিকটা বল পাই। তা সেদিন তাঁবুতে ফিরে দেখি ডজনখানেক পুলিশ হাজির। দেখে ভারী খুশী হলাম। যার যার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, এল্‌সাকে দেখামাত্র তারা যেন পরপর তিনটে ফাঁকা আওয়াজ করে আমাকে জানান দেয়।

পরদিন সকালেই যে যার বেরিয়ে গেলো। চা-টা খেয়ে আমরাও বেরোবো বেরোবো করছি, হঠাৎ তাঁবুর মাইলখানেক দূরে পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো পরপর তিনটে ফাঁকা আওয়াজের শব্দ।

তার মানে, এল্‌সাকে কেউ না কেউ দেখেছে। কোথায় দেখেছে···ছুটলাম আওয়াজ লক্ষ্য করে। বাহিনীর একজনের সঙ্গে দেখা হলো। সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো অদূরে ঝোপের আড়ালের এক জায়গা।

এগোলাম। দেখি, এক বিরাট পাথরের নীচে ছায়ায় শুয়ে আছে এল্‌সা। বাচ্চারা তার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমাদের আসতে দেখেও সে উঠলো না। একই ভাবে শুয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে।

এমন তো সচরাচর হয় না! লোকজন বিশেষত অপরিচিত লোকজন দেখামাত্র চঞ্চল হয়ে ওঠে এল্‌সা। আজ সঙ্গের তিনজন পুলিসকে দেখেও চুপচাপ শুয়ে রইলো—ব্যাপারটা কি!

কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলাম তাকে। ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে, পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। কানের ঘা-টা তখনো শুকোয়নি, পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে চোয়াল বেয়ে। মাঝে মাঝে যখন ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ছে, যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠছে তার মুখের রেখায়।

এছাড়াও আছে—সারাটা শরীর তার ছেঁকে ধরেছে ডাঁশে। ছোটোর গায়েও অজস্র ডাঁশ। এল্‌সাকে যদিও বা তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া গেলো—ছোটোকে নিয়ে হলো মুশকিল। কিছুতেই সে দেবে না গায়ে হাত ছোঁয়াতে।

সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম খানিকটা হরিণের মাংস। ঝোলা-থেকে বের করে দিতে যেটুকু সময় লাগলো—বাচ্চারা সব চেটেপুটে শেষ করলো মুহূর্তের

মধ্যে। এল্‌সা চোখ তুলে একবার দেখলো, তারপর মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে। জেসপা এগিয়ে এসে আমার হাত চেটে দিলো। এল্‌সাকে ডাকলাম, তাঁবুতে ফিরে যেতে বললাম—শুনলো না সে। পরম ক্লান্তিতে চোখ বুজলো।

ফিরে এলাম তাঁবুতে। মন ভালো লাগছিল না। ঐ অবস্থায় রেখে এলাম এল্‌সাকে—কখন কি বিপদ ঘটে কে জানে!

তা চিন্তার শেষ হতে সময় লাগলো না। দুপুরের খাওয়া খেয়ে বসেছি এসে উঠোনে, অমনি নদীর দিক থেকে ছুটে এলো এল্‌সা। এসে এক ধাক্কায় আমাকে করলো ভূতলশায়ী। উঠে ধুলোটুলো ঝেড়ে দেখি, বাচ্চারাও এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। জেসপা ব্যস্তসমস্তভাবে মায়ের গা চেটে দিচ্ছে।

বুক থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেলো। তাড়াতাড়ি এনে দিলাম তাদের খাবার। খেয়েদেয়ে উঠোনেই শুয়ে রইলো এল্‌সা, বাচ্চারা তার আশেপাশে ঘুরে খেলা করতে লাগলো।

রাত একটু ঘন হতে তারা রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে, আমিও গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে শুনি, উঠোনের চারপাশে কে বা কারা যেন মৃদু-মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলাম। দেখি, এক চিতা চোরের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে বেড়ার কাছে। আচ্ছা! এই তাহলে ব্যাপার! এল্‌সাদের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসটুকু রয়েছে বেড়ার আড়ালে, ঠিক গন্ধ পেয়েছো তুমি! লোভে লোভে ছুটে এসেছো। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমার মজা!

চিৎকার করে ডাকলাম নুরুকে, ম্যাকেদকেও ডাকলাম। ওরা বেরিয়ে এলো আলো হাতে। চিতা ভাগলো।

নাঃ, এভাবে আর পারা যায় না! বন ঝেঁটিয়ে জন্তু-জানোয়ার আসছে তাঁবুতে—সকলের জন্য মজুত রাখতে হবে খাবার! কাঁহাতক পারা যায়! বরং এবার থেকে এক কাজ করি—এল্‌সাদের খাবার যোগানোর ভার এলসার ওপরই ছেড়ে দিই। মনের সুখে শিকার-টিকার যা করার করুক ওরা, নিজেদের পেট নিজেরাই কষ্টে-সৃষ্টে ভরাক। আমাদের আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই।

আর জর্জ-এরও বলিহারি! এতোদিনে তার ফিরে আসার কথা। কেন জানি না, সে থাকলে তাঁবুর এতো কাছে আসতে জন্তু-জানোয়ারগুলো সাহস পায় না। দূরে দূরে থাকে, দূর থেকেই ফিরে যায়। তিন সপ্তাহ পরে আসবে বললো—একটি মাস পার হয়ে গেলো। ব্যাপারটা কি!

ব্যাপার আর কিছুই না—বাবুদের খেয়াল। শিকারী-দল বনের অজস্র জন্তু-

জানোয়ার দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি, তিন সপ্তাহের প্রোগ্রাম বাড়িয়ে এক মাসের করেছে। তাদের আর কি—ভোগান্তি যতো আমার! পরদিন সকালে জর্জ হাজির হতে এসব কাহিনী তার মুখ থেকেই শুনলাম। এল্‌সার কথা বললাম তাকে, নতুন সিংহ-সিংহীর কথাও বললাম। অবশ্য না বললেও জানতে তার খুব একটা অসুবিধে হতো না—নদীর দিক থেকে সে-রাতভোর সেই সিংহদম্পতি প্রবল বিক্রমে হাঁকডাক করলো। জর্জ বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলো তাদের তর্জন-গর্জন।

এরাই যে এল্‌সার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী—তা আর বুঝতে বাকী রইলো না। হয়তো এদেরও বাচ্চা আছে (একদিন এই দম্পতির পায়ের ছাপের পাশে পাশে একজোড়া বাচ্চার পায়ের ছাপ আমাদের নজরে এসেছে।), ঘরবাড়িও আছে হয়তো ধারে-কাছে কোথাও। এল্‌সা হয়তো ভুলক্রমে কোনোদিন চলে গিয়েছিলো ওদের এলাকায়—রেষারেষির সূত্রপাত সেই থেকেই।

একদিন আমি আর জর্জ বেড়িয়ে ফিরছি পাহাড় থেকে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের ঠিক সামনে এল্‌সার চলাচলের পথে অ্যাকাশিয়া গাছে পাতা রয়েছে এক ফাঁদ—আদিবাসীদের শিকার ধরার নবাবিষ্কৃত কায়দা। কায়দাটা নিঃসন্দেহে মারাত্মক। গাছের ডালে সরু লতায় বাঁধা এক গাছের গুঁড়ি, লম্বায় দু ফুট, চওড়ায় ফুটখানেকের মতো। মাটির দিকে লম্বমান যে মুখ, সেই মুখে গাঁথা রয়েছে এক তীক্ষ্ণ বর্শার ফলা। গুঁড়িটার ওজন কম করে বিশ-বাইশ সের। গাছের ওপর ডালপাতার আড়ালে অস্ত্রটি বাগিয়ে বসে থাকে একজন আদিবাসী। যেই দেখে, শিকার গুঁড়ির ঠিক নীচবরাবর এসেছে—অমনি লতার বাঁধন খুলে দেয়। ব্যস্‌, পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেঁথে যায় ফলা, নিমেষে শিকার ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। নুরুকে গাছে তুলে নামালাম অস্ত্রটা। বর্শার ফলা খুলে গুঁড়িটা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম। ফিরে এলাম তাঁবুতে।

সে-রাতে সব মিলিয়ে পাঁচটা সিংহ এলো তাঁবুর আশেপাশে। বিভিন্ন কোণ থেকে তাঁবু জরীপ করে খানিকক্ষণ হাঁক-ডাকের পর তারা বিদায় নিলো।

পরদিন নদীর পার বরাবর এগিয়ে মাইল পাঁচেক দূরের এক জঙ্গলে পৌঁছলাম। আগাগোড়া পথটা সেই সিংহ-দম্পতি এবং তার বাচ্চাদের পায়ের ছাপে বোঝাই। তবু ভালো, এদিকের এই জঙ্গলে ভুলেও এল্‌সা আসে না।

এক বাওবাব গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, হঠাৎ শুনি—শুকনো পাতার ওপর খস্‌খস্‌ পায়ের শব্দ। টোটো সাহস করে এগোলো কয়েক পা। দেখে, এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল্‌সার মতো

দেখতে এক সিংহী তার তিনটি বাচ্চা নিয়ে ঢুকলো গিয়ে জঙ্গলে।

এল্‌সা···এখানে! ডাকলাম নাম ধরে, সাড়া পেলাম না। আশপাশের সম্ভাব্য স্থানগুলো খুঁজে দেখা হলো—এল্‌সা বা তার বাচ্চাদের হদিশ পেলাম না।

ফেরার পথ ধরলাম এবার। সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি, হঠাৎ জর্জ-এর ডাকে হুঁশ হলো। তার কথায় তাকিয়ে দেখি, বালির ওপর আমাদের এ-জঙ্গলে আসার পায়ের ছাপের পাশে পাশে এক সিংহের আনকোরা একপ্রস্থ পায়ের ছাপ। আমাদের অনুসরণ করতে করতেই হয়তো সে এগোচ্ছিল।

পরদিন সকালে উঠে আবার এলাম এদিকে। দেখি, আশেপাশে পাঁচশো গজের মধ্যে সেই সিংহ-দম্পতি এবং তার বাচ্চারা অজস্র পায়ের ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে।

ছাপ অনুসরণ করে এগোলাম। এক শুকনো জলাশয়ের কাছে এসে ছাপগুলো আবার এগিয়েছে পাহাড়ের দিকে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে সিংহী এবং বাচ্চাদের রেখে সিংহটি রওনা দিয়েছে নদী বরাবর, তারপর নদী ডিঙিয়ে উঠেছে গিয়ে ওপারে।

ওপারের বালিতে পায়ের দাগগুলো এখনো ভিজে। তার মানে, সদ্য সদ্যই এসেছে সে। হয়তো ধারে-কাছে আছে কোথাও ঘাপটি মেরে। সুতরাং সাহসে ভর করে আর এগোনো সমীচীন নয়।

বসে পড়লাম বালির ওপর। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিলো নুরু। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি ঘোরালাম। হঠাৎ অদূরে এক গাছের মাথায় কিচিরমিচির শব্দে বিরাট সোরগোল তুললো একপাল বেবুন। তাদের শব্দ ছাপিয়ে ভেসে এলো এক সিংহের ডাক।

কি ভাগ্যি আর এগোইনি! এখানেই ওত পেতে বসে ছিলো সে—কি মতলব ছিলো তার মনে, সে-ই জানে। নেহাত বেবুনগুলো চেঁচামেচি করে তার গোপন খবর ফাঁস করে দিলো তাই রক্ষে। নইলে সে যাত্রা আমাদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়তো সে।

ডাক শুনে বুঝলাম, সিংহটি আমাদের খুব একটা অপরিচিত নয়। তাঁবুর আশেপাশে অনেকবার শুনেছি তার ডাক। ম্যাকেদ ডাক শুনে বলতো—সিংহটার ম্যালেরিয়া হয়েছে, গলার স্বর তাই ঘড়ঘড়ে। হয়তো ম্যাকেদের কথাই ঠিক। সত্যি মিথ্যে যাচাই করার সামর্থ্য যখন নেই—তখন তার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি!

একটু অবাক হলাম। সচরাচর বেলা এগারোটায় কোনো সিংহকে কখনো

ডাকাডাকি করতে শুনিনি। এ সিংহটা ডাকলো কেন তবে। কাকে ডাকলো! একটু অপেক্ষা করতে প্রশ্নের জবাব পেলাম। পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো এক সিংহীর ডাক—জড়ানো গলায় নেহাত সাড়া দিতে হবে বলেই সে যেন সাড়া দিলো।

জড়ানো গলা ··এল্‌সা নয়তো! গেলাম সেদিকে। কিন্তু কোথায় কি! এল্‌সার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

হলোটা কি ওর! এমন করে পালিয়ে বেড়ানো, কথা নেই বার্তা নেই—হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া—কারণটা কি! একটা কারণ হতে পারে এই—তাঁবুতে থেকে সেই দুর্দান্ত সিংহীটার সঙ্গে রোজ রোজ খটামটি, এটা তার আদৌ পছন্দ নয়। বরং তার চেয়ে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত সিংহটিকে স্বামীপদে বরণ করে তার সঙ্গে বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো মন্দের ভালো। এ-কারণটা বাদ দিলে, বিকল্প একটাই থাকে—এল্‌সা মারা গেছে। কানের পাশের সেই ক্ষতটা সেপটিক হয়ে গিয়ে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।

ফেরার পথ ধরলাম। দেখি, জঙ্গলের পাশে একটা ফাঁকা-মতন জায়গা শকুনেরা ছেঁকে ধরেছে। দ্রুত এগোলাম। অজানা বিপদের আশঙ্কায় বুক টিপটিপ করতে লাগলো। কাছে যেতে নিশ্চিন্ত হলাম—না, এল্‌সা নয়। একটা বাচ্চা হরিণের মৃতদেহ পড়ে আছে মাটিতে। শকুনের দল তার গলিতপ্রায় মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

পরের দুদিন কখনো হেঁটে, কখনো গাড়িতে এল্‌সার অবস্থানের সম্ভাব্য অঞ্চলগুলো টহল মেরে বেড়ালাম। দুপুরের খাবার গাড়িতে বসেই খেলাম। কিন্তু না, সব নিষ্ফল। এতো পরিশ্রম, এতো প্রযত্ন—সব বৃথা গেলো। এল্‌সার দেখা পেলাম না।

প্রায় মাইল পনেরো দূরে নদীর প্রশস্ত বালিয়াড়ির বুকে দেখলাম কয়েকটা বাচ্চা-সিংহের পায়ের ছাপ। এ বাচ্চারা যে এল্‌সার—একথা হলফ করে বলা গেলো না। তাছাড়া, এতোদূর আসবে তারা জল খেতে—একথা ভাবতেও অবাক লাগলো।

দিনে আট ঘণ্টা একনাগাড়ে খোঁজাখুঁজি চালালাম। এল্‌সার সম্বন্ধে যতটুকু না জানতাম, তার দশগুণ বেশি জানলাম অনুপ্রবেশকারীদের সম্বন্ধে। জায়গায় জায়গায়, খেয়াল-খুশিমতো ফাঁদ পেতে রেখেছে তারা, গাছের ডালে ডালে রোদে শুকোতে টানা দিয়ে রেখেছে জন্তু-জানোয়ারের চামড়া। ভাবগতিক তাদের এমন—যেন বিস্তীর্ণ এলাকাটা তাদেরই সাম্রাজ্য, ইচ্ছেমতো যা-খুশি-তাই করতে তাদের কারুর মতামতের দরকার হয় না। সব দেখেশুনে গজগজ করতে লাগলো জর্জ। বললো, এবার ফিরে গিয়ে

সে সমগ্র এলাকা জুড়ে স্থায়ী টহলদারী-ঘাঁটি বানাবার জোর চেষ্টা চালাবে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ইসিওলোয় ফিরে গেলো জর্জ। আমি রইলাম তাঁবু আগলে। ম্যাকেদ, ইব্রাহিম এবং নুরুকে নিয়ে এল্সার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলাম। ফল কিছু হোক না হোক, ক্ষতি নেই। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি রাখা চলবে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে দেখি, পাহাড়ের দিক থেকে এক সিংহ তাঁবুর দিকে এগিয়েছে। জর্জ-এর গাড়ির চাকার দাগের পাশে আঁকা রয়েছে তার পায়ের ছাপ। এগোলাম বন-বাদাড় ভেঙে, এক জায়গায় পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি, মাটির ওপর একসার সবুট পায়ের ছাপ। বলা বাহুল্য জর্জ-এর জুতোর ছাপ অন্য রকম। তার জুতোর ছাপ হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারতাম।

তার মানে, জর্জ চলে যেতেই অনুপ্রবেশকারীর দল আবার ফিরে এসেছে। এতোদিনে তাকে তাকে ছিলো, খোঁজ খবর রাখছিল। যেই দেখেছে রওনা হয়েছে সে, অমনি ফিরে এসেছে দল বেঁধে। ঠিক আছে, এসেছো বেশ করেছো। যে ক'দিন টহলদারী-ঘাঁটি না বসে—হাত পাকিয়ে নাও। পরে আর এ-সুবিধে হবে না। তখন তেমন কিছু গোলমাল পাকাতে এলে জেলের ঘানি টানতে হবে।

ঘোরাঘুরি সারাদিনে কম হয়নি। তাছাড়া আদিবাসীদের পায়ের ছাপ দেখে মনটাও দমে গেছে। সুতরাং আর এগোলাম না। একটু বিশ্রামের আশায় বসে পড়লাম মাটিতে। ম্যাকেদ ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে লাগলো। মনে আর বল বলতে কিছু নেই। যেটুকু যা আশা-ভরসা নিয়ে বেরিয়েছিলাম সকালবেলা, এখন তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। নতুন করে আরেক দফা খোঁজখবর চালাতে যে বেরোবো—সে উৎসাহটুকুও পাচ্ছি না। এতো জায়গা খুঁজলাম, এতো পরিশ্রম করলাম—সব বিফলে গেলো। যেন এল্সা বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো।

আচ্ছা, যদি বেঁচে থাকে এল্সা—কিভাবে দিনযাপন করছে সে! চোয়ালের কাছে তার সেপটিক হয়ে যাওয়া অতোবড় এক দগদগে ঘা—কিভাবে করছে সে শিকার! বাচ্চারাই বা কি খাচ্ছে। এতোদিন একনাগাড়ে উপোস দিচ্ছে—একথাও তো বিশ্বাস করতে মন চায় না।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তাকালাম ম্যাকেদের দিকে, বললাম, 'এল্সাকে তুমি ভালোবাসো, ম্যাকেদ?'

'কিভাবে বাসবো?' ম্লান হাসলো সে, 'চোখের সামনে না দেখতে পেলে কি কাউকে ভালোবাসা যায়?'

ম্যাকেদের কথায় চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো আমার। অন্য দিকে তাকিয়ে হাতের উলটো পিঠে চোখের জল মুছলাম।

ব্যস, আর যায় কোথায়! চোখের জল দেখে যেন ক্ষেপে গেলো সে, গলার স্বর সপ্তমে তুলে বলতে লাগলো, 'ব্যস্, অমনি কান্না শুরু করে দিলেন! মৃত্যু ছাড়া কোনো কথাই কি আপনায় মনে আসে না! একবারের জন্যেও কি অন্যরকম কিছু ভাবতে পারেন না! ভগবান বলে ওপরে একজন আছেন। তাঁর ওপর একটু-আধটু বিশ্বাস রাখুন। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার যোগান তিনি। জীবও তাঁর দেওয়া, আহারও তিনিই যোগান। দেখবেন, খাইয়ে-পরিয়ে সুস্থ-সবল রেখে একদিন না একদিন তিনি ঠিক এল্‌সাকে পাঠিয়ে দেবেন আপনার কাছে।'

একটু যেন উৎসাহ পেলাম তার কথায়, মনের কন্দরে কে যেন আবার উসকে দিয়ে গেলো আশার নিভু-নিভু শিখাটিকে। নতুন উদ্যমে আবার পরদিন থেকে শুরু করলাম অনুসন্ধান-পর্ব।

কিন্তু কোথায় কি! রোজই ভাবি-দেখা পাবো তার, বন-জঙ্গল ঝোপ-ঝাড় পাহাড়-পর্বত চষে বেড়াই, পাই না দেখা। দিন যায়, রাত আসে, আবার দিন, আবার রাত—আসে না শুধু সে।

আরো দুদিন কাটলো নিষ্ফল অন্বেষণে। তৃতীয় দিন, অর্থাৎ এল্‌সার নিরুদ্দেশের ষোড়শ দিবসে সারাদিনের পরিশ্রমের পর তাঁবুতে ফিরে উঠোনের অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছি বিয়ারের গ্লাস হাতে, এমন সময়...

এমন সময় শুকনো পাতার ওপর একটা খসখস শব্দ · কে যেন অতি সন্তর্পণে চুপিসাড়ে এদিকে আসছে! চোখ তুলে তাকালাম, অন্ধকারে কিছু নজরে এলো না। হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগে পেছন থেকে এক ধাক্কা—ছিটকে পড়লাম চেয়ার থেকে, হাতের গ্লাস মাটিতে পড়লো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতবিহ্বল। উঠে বসতে না বসতে আরেক ধাক্কা, এবার আর বুঝতে বাকী রইল না-- কে এসেছে।

উঠে বসলাম। ততক্ষণে আলো নিয়ে এসেছে ম্যাকেদ। এল্‌সা এসে বসলো আমার গা ঘেঁষে। দেখি, তার কানের ঘা প্রায় শুকিয়ে উঠেছে, একটু রোগাটে হয়েছে সে, চালচলনে বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব -- সব মিলিয়ে সুস্থই আছে আমাদের এল্‌সা সুন্দরী।

তবে হ্যাঁ, খিদে পেয়েছে তার খুব। একটা বিরাট ছাগলের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে ইব্রাহিম যেই নিয়ে এলো বাইরে, অমনি উঠে তড়িঘড়ি সেদিকে এগোলো এল্‌সা। চিৎকার করে উঠলাম আমি, না এল্‌সা, না। অমনি থামলো সে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাইরের মস্ত খুঁটিটার সঙ্গে

শিকলে খাবার বেঁধে দিলো ইব্রাহিম, সে এগিয়ে গেলো !

যাক বাবা, নিশ্চিন্ত ! ম্যাকেয়ের কথাই ঠিক। ভগবান বলে সত্যিসত্যিই একজন আছেন। জীবজগতের সুখ-দুঃখের খবর তাঁর মতো আর কেউ রাখে না। সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁর যতখানি, সকলকে খাইয়ে-পরিয়ে সুস্থ রাখবার দায়িত্বও তাঁর ততখানি। তিনিই স্থিতি, তিনিই প্রলয়। তিনিই শিব, তিনিই রুদ্র। শতকোটি প্রণাম তাঁকে।

তা একদিকের চিন্তা নয় মিটলো—কিন্তু আরেক দিক থেকে নতুন এক চিন্তা যে এসে বাসা বাঁধলো মনে ! সে-চিন্তা দূর করে কে !

বাচ্চাদের এখনো দেখলাম না—তাদের খবর কি ! কেমন আছে তারা ! কোথায় আছে ! এল্‌সাই বা আসার সময় তাদের সঙ্গে নিয়ে আসেনি কেন !

সব চিন্তার ইতি ঘটিয়ে পরদিন সকালে সপুত্রকন্যা এসে হাজির হলো এল্‌সা। আমাকে দেখে কুঁই-কুঁই করে কত অনুযোগই না করলো জেসপা—আমি ছাই তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

অবশ্য একটা জিনিস বুঝলাম—তারা সকলে ক্ষুধার্ত। খাবার চাই। সুতরাং খাবার এলো। বুঝে-শুনে ইব্রাহিম আজ দিয়েছে এক দশাসই ছাগল। টানতে টানতে সেটাকে নিয়ে এল্‌সা গেলো নদীর পারে, শুরু হলো চারজনের ভোজপর্ব।

একটু দূরে বালির ওপর বসে আগাগোড়া ভোজ,দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করলাম আমি। একসময় উঠে এল্‌সার মাংসে মিশিয়ে দিলাম কটা ট্যাবলেট। ঘা শুকোতে এখনও যেটুকু বাকি—এই ট্যাবলেটেই তা শুকিয়ে যাবে।

একটা জিনিস দেখে ভারী অবাক হলাম—এতোদিন বনে-পাহাড়ে কাটালো ওরা, প্রয়োজনে রোজকার খাবার ওদের নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হয়েছে—তবু চারজনের কারুরই শরীরে এতোটুকু আচড়-কামড়ের দাগ নেই। অবাক কাণ্ড ! শিকার করতে গিয়ে অন্ততঃ একটু-আধটু তো লড়তে হয়ই। এ যেন একেবারে বিনা যুদ্ধে রাজ্যলাভ।

তা এ কদিন একনাগাড়ে বনে থেকে বাচ্চাগুলো একটু বেশি রকম জংলী হয়ে পড়েছে। বনের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ওরা এই বয়সেই যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে উঠেছে। যে কোন শব্দেই ওরা চমকে চমকে উঠছে, মুখ তুলে মুহুর্মুহু চারদিক জরিপ ক'র নিচ্ছে, তারপর বিপদের কোনো রকম সম্ভাবনা নেই দেখে আবার খাওয়ায় মন দিচ্ছে।

খাওয়া শেষ হতে শুরু হলো তাদের খেলা। ঘণ্টাখানেক ধরে একনাগাড়ে দাপাদাপি করে বেড়ালো তিনজন, তারপর রোদের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে

না পেরে বসলো গিয়ে এক পাথরের আড়ালে। এল্‌সাও গিয়ে বসলো তাদের পাশে। একটু পরেই যে যার ঘুমে ঢলে পড়লো।
ম্যাকেদকে এই সুযোগে চুপিচুপি রওনা করিয়ে দিলাম। বললাম, এল্‌সার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সে যেন তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণটা বিশদভাবে জেনে আসে।
ম্যাকেদ চলে গেলো। এল্‌সার ঘায়ে মলম লাগিয়ে যত্ন করে বেঁধে দিলাম আমি। ঘুমের ঘোরে এবার আর প্রতিবাদ করার সুযোগ পেলো না সে। দিনের আলো ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে উঠলো গিয়ে বন-পাহাড়ের মাথায়। আমি তাঁবুর পথ ধরলাম।
ম্যাকেদও ফিরে এসেছে ততক্ষণে। সে বললো, পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এল্‌সার আস্তানা সে দেখে এসেছে। ঘন জঙ্গলের আড়ালে পাহাড়ের এক মস্ত গুহা। গুহায় এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের পায়ের ছাপ ছাড়াও দু-দুটো অচেনা সিংহের পায়ের ছাপ দেখা গেছে।
এতোক্ষণে আগাগোড়া ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। এই সিংহযুগলের সাহায্য নিয়েই এতোদিন বেঁচে-বর্তে সুস্থ শরীরে দিন কাটিয়েছে এল্‌সা। বাচ্চাদেরও পেট ভরে খাইয়েছে। গায়ে আঁচড় কামড়ের দাগ না থাকার এটাই অন্যতম প্রধান কারণ।
কিন্তু সবই নয় হলো, একটা হিসেব যে মিললো না। সিংহীদের তিন বছর অন্তর অন্তর বাচ্চা হয়—এই চিরসত্য তো এল্‌সার বেলায় খাটলো না। তার বাচ্চাদের বয়েস এখন সবে সাড়ে সাত মাস, শিকার-টিকার করতে এখনো তারা ভালোভাবে অভ্যস্থ হয়নি—এমতাবস্থায় নিজের দায়িত্ব ভুলে আবার মা হতে চাইছে এল্‌সা!
কি ওর মতলব—কে জানে! হয়তো ভেবে দেখেছে ও—বাচ্চাদের খাবার যোগাবার দায়িত্ব যখন আমাদের, তখন নিশ্চিন্তে মা হবার পথে ওর আর বাধা কিসের।
যাকগে, মরুকগে—যা খুশি তাই ভাবুক ও। আমরা আর কদিন! যে-মুহূর্তে দেখবো. শিকার করতে শিখেছে বাচ্চারা—আমাদের আর চিন্তার কিছু নেই, সে-মুহূর্তে পাট তুলবো, জঙ্গলের এখান থেকে বিদায় নেবো।

॥ ৯ ॥

সেদিন রাত নটা নাগাদ সদলবলে তাঁবুতে এসে হাজির হলো এল্‌সা। চারজনেরই চোখ-মুখ শুকনো—ক্ষিধে পেয়েছে সকলের, খাবার চাই।

খাবার···আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি—কি করা যায়।

টোটো আর ম্যাকেদকে নিয়ে চললাম নদীর দিকে। সকালের খাবার পুরো খায়নি ওরা। বেশির ভাগ মাংসই পরে আছে ঝোপের আড়ালে। এই রাত্তিরে নতুন করে ছাগল-টাগল ছাড়িয়ে দেবার ঝঞ্ঝাট না করে সকালের খাবারের অবশিষ্টটুকুই এনে দেওয়া সমীচীন।

ম্যাকেদ চললো আগে আগে। এক হাতে তার একটা হ্যারিকেন, আরেক হাতে তেলচুকচুকে একখানা বেতের ছড়ি। টোটো চলেছে তার পেছন পেছন। হাতে তার গ্যাসবাতি। সকলের শেষে আমি। আমার হাতে চিমনিঢাকা ছোট্ট এক লণ্ঠন।

চলছি···চলছি···চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছি—হঠাৎ চোখের নিমেষে ঘটে গেলো ঘটনাটা। ম্যাকেদের হাতের হ্যারিকেনের চিমনি ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো মাটিতে, ক্ষুরের শব্দে মাটি কাঁপিয়ে পীচ-কালো রঙের এক বিশালাকৃতি দৈত্য প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমাকে করলো ধরাশায়ী।

চোখে অন্ধকার দেখলাম। কোন্ অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে যেন হঠাৎ থামলাম, চোখ মেললাম—দেখি, এল্সা আমার হাত চেটে দিচ্ছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চিৎকার করে ডাকলাম সকলকে। আমার থেকে হাত পাঁচেক দূরে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা টোটো গোঙাতে গোঙাতে সাড়া দিলো। রান্নাঘরের দিক থেকে ভেসে এলো ম্যাকেদের কণ্ঠস্বর।

একটু পরে উঠে বসলো টোটো। ঘটনার বিবরণ তার মুখ থেকে যা শুনলাম, তা হলো এই—যেতে যেতে হঠাৎ ম্যাকেদ একলাফে পথের পাশে সরে গিয়ে এক মোষের মাথায় সপাসপ বসিয়ে দিলো ছড়ির কয়েক ঘা। অমনি ক্ষেপে গেলো সে। ম্যাকেদের হ্যারিকেন শিঙের গুঁতোয় ভেঙে টোটোকে ধরাশায়ী করে আমার দিকে শিঙ উঁচিয়ে এগোলো। আমাকে এক ধাক্কায় ভূতলশায়ী করে ঢুকলো গিয়ে জঙ্গলে। শব্দ-টব্দ শুনে দৌড়ে এলো এল্সা, মোষটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো অনেক দূর, তারপর ফিরে এসে আমার গা চাটতে লাগলো। টোটোর তেমন কিছু চোট লাগেনি। শুধু কপালের ডান দিকটা ফুলে উঠেছে গোল হয়ে। যেটুকু যা আঘাত—সব গেছে একলা আমার ওপর দিয়ে। ডান হাতটা কেটে গেছে, উরুর এক জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, পায়ের পাতা মাটিতে রাখতে পারছি না। সে এক যাচ্ছেতাই অবস্থা।

এই মোষটা এ অঞ্চলেই থাকে। কদিন আগে টোটোর হাত থেকে বাসনপত্র ধাক্কা মেরে ফেলে সে তার শক্তির নামমাত্র পরিচয় দিয়েছিলো,

আজ আমাদের তিনজনকেই একেবারে ভেলকি দেখিয়ে ছাড়লো।
এল্‌সা সময়মতো এসে পড়েছিলো, তাই বাঁচোয়া। নইলে কোথাকার জল কোথায় গড়াতো—ভগবান জানেন! তেড়ে গিয়ে কারুর উদ্দেশ্যে যখন ওরা শিং ছোঁড়ে তখন আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না। শিঙে সুবিধে না হলে চার পায়ের সাহায্য নেয়। ক্ষুরের চাপে হাড়গোড় ভেঙে দিয়ে তবে ওদের শান্তি।
ভাগ্যিস্ আমার ওপর আক্রমণের চোটটা উরু আর হাতের ওপর দিয়ে গেছে! পেটের উপর একখানা পা চাপিয়ে একটিবারের জন্য তেমন তেমন একটি মোচড় দিলে আমাকে আর এ জীবনে উঠে বসতে হতো না।
খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এলাম তাঁবুতে। সারাটা রাস্তা এল্‌সা আমার সঙ্গ দিলো। বাচ্চারা তখনো বসে আছে উঠোনে। মাকে অমনভাবে ছুটে যেতে দেখেও কেন যে তারা এগোয়নি—এটাই এক বিস্ময়।
ম্যাকেদ বসে বসে হাত-পা নেড়ে ইব্রাহিমদের বলছিলো সেই লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ, সুযোগ বুঝে যথারীতি খানিকটা বাহাদুরি নিচ্ছিলো। আমাকে আসতে দেখে সে থামলো। তাড়াতাড়ি ওষুধপত্র এনে পরিচর্যার ব্যবস্থা করলো।
যন্ত্রণায় সারাটা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। হাঁটু অবধি ডান পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে উঠলো। হাতটাও ফুলে উঠলো ধুকস হয়ে। কপাল ··এরই নামই কপাল! আজ দীর্ঘ ষোলো দিনের অনুপস্থিতির পর এল্‌সাদের কাছে পেয়ে সকালে ভাবছিলাম—আহা, আমার মতো সুখী লোক সারা পৃথিবীতে বুঝি আর দুটি নেই! চব্বিশ ঘণ্টাও কাটলো না—সুখ অসুখ হলো।
তবে হ্যাঁ, মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ালাম—আমার মতো সৌভাগ্য কজনেরই বা আছে! কোনো রক্তমাংসের চিত্রতারকা বা বিশিষ্ট লোকজন নয়—স্বয়ং বনের এক মোষ আমার শরীরে এঁকে দিলো তার ক্ষুরের অটোগ্রাফ—এ কি কম ভাগ্যের কথা!
পরদিন সকালে উঠে দেখি—আহা, রঙের সে কি বাহার! রামধনুর সাত রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে আমার উরু আর হাতের ক্ষতস্থান। টনটনানি এতোটুকু কমেনি। ফুলোও একই রকম আছে। সব মিলিয়ে সে এক যথার্থ অসহায় অবস্থা।
তিনদিন লাগলো ব্যথা-ফুলো কমতে। রামধনুর রঙ মিলিয়ে যেতে লাগলো মোট পনেরো দিন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—নাঃ, আর কোনদিন ভুলেও রাত-বিরেতে সাহস করে বেরোবো না। ঢের শিক্ষা হলো। মোষের

বদলে হাতি হলে আর দেখতে হতো না।

দেখতে দেখতে আগস্ট এসে গেলো। এই ক'মাসে বাচ্চারা, বিশেষ করে জেসপা যেন একটু বেশি দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। চোখের সামনে জ্যান্ত ছাগল দেখলে আর রক্ষে নেই—ছুটোছুটি করে, তর্জন-গর্জন করে সে গিয়ে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেই পড়বে।

অথচ এল্‌সা—এতো বড় হলো সে, তিনটি বাচ্চার মা হলো—ছাগল মেরে ছাল ছাড়িয়ে দিলে তবেই সে তার দিকে নজর দেয়, সামনে দিয়ে ছাগল হেঁটে গেলেও মুখ তুলে তাকায় না।

একদিন সন্ধ্যের ঘটনাই বলি। ছাগল চরিয়ে এনে মুরু তাদের ট্রাক-বন্দী করার ব্যবস্থা করছে, রান্নাঘরের দোরগোড়ায় বসে জেসপা অবাক হয়ে শুনছে রান্নার ছ্যাঁৎ-ছোঁৎ শব্দ—হঠাৎ ছাগলের গন্ধে চঞ্চল হয়ে উঠলো সে, পাঁই পাঁই করে দিলো ছুট। ইব্রাহিম বসেছে তার সান্ধ্য প্রার্থনায়—চোখ বুজে নমাজ পড়ছে। জেসপার ছোটার দৌলতে তার জলের কুঁজো উলটে জল ছড়িয়ে পড়লো ঘরময়। প্রার্থনা অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়তে হলো তাকে।

ততক্ষণে ট্রাকের দোর খুলে একে একে ছাগল ওঠাতে শুরু করেছে মুরু। হাঁপাতে হাঁপাতে জেসপা এলো বাইরে। আমি চিৎকার করে উঠলাম—না জেসপা, না। থমকে দাঁড়ালো সে, নাক তুলে বাতাসে ঘ্রাণ নিলো। তারপরই আবার ছুটলো ট্রাকের দিকে।

ভাগ্য ভালো—শেষ ছাগলটি তুলে ততক্ষণে দোর বন্ধ করে দিয়েছে মুরু, এল্‌সাও বেগতিক দেখে একলাফে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে জেসপার সামনে—হতচকিত হয়ে সে থামলো। তার অতো সাধের দৌড়টা বিফলে গেলো।

কিন্তু অতো সহজে দমে যাবার পাত্র জেসপা নয়। একটুকাল চুপ করে বসে থেকে সে উঠলো, মাকে নিয়েই পড়লো এবার। মায়ের চারদিক ঘুরে খেলা করতে করতে একসময় জলের গামলাটা উলটে দিলো তার গায়ে। ভিজে-টিজে এল্‌সা একসা। রাগে গজগজ করতে করতে সুযোগ বুঝে একসময় দুই থাবায় চেপে ধরলো সে জেসপাকে। রগড় দেখে আমরা হো হো হাসিতে ফেটে পড়লাম। হাসির শব্দ শুনে এল্‌সা চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালো, তারপর জেসপাকে ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে বসলো উঠোনের একপাশে। তার চোখের দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন অসন্তুষ্টির চিহ্ন—জেসপাকে শিক্ষা দেবার অমন এক বিশিষ্ট সুযোগ, আমরা হেসে লঘু করে দিলাম, কাজটা আমাদের উচিত হয়নি।

এগিয়ে গেলাম এল্‌সার কাছে—ক্ষমা চাইতে। আমার দিকে রোষ-কষায়িত

দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে সে গিয়ে উঠলো গাড়ির ছাদে।
পায়ে পায়ে এগোলাম। ধীরে ধীরে তার পিঠে হাত বোলাতে লাগলাম। এবার আর অসন্তুষ্টি নয়, অভিমান। অভিমানী চোখে সে তাকালো আমার দিকে। যেন বলতে চাইলো : দিলে তো সব পণ্ড করে!
আকাশে চাঁদ উঠলো, তারা ফুটলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম তার পাশে। এল্‌সার রাগ পড়লো। প্রতিদানে আমার গালে মুখ ঘষে সে ভালোবাসা জানালো।
পরদিন সকালে জর্জ এসে হাজির। সঙ্গে সে এনেছে একদল টহলদার পুলিস। জঙ্গলের জায়গায় জায়গায় ঘাঁটি বসাবার ব্যবস্থা সে এবার প্রায় পাকাপাকি করেই এসেছে। উত্তর সীমান্ত প্রদেশ পুলিসে পুলিসে ছেয়ে যাবে। কিছু গুপ্তচরও নিয়োগ করা হবে। অনুপ্রবেশকারীদের যাবতীয় গুপ্ত খবর আগেভাগেই তারা এসে জানিয়ে দেবে আমাদের।
আফ্রিকার প্রায় সমস্ত সংরক্ষিত জঙ্গলেই গুপ্তচর-প্রথার প্রচলন আছে। বন-বিভাগ এদের সাহায্য ছাড়া বলতে গেলে একরকম অচল। এই বিশাল বনের কোথায় কোন গোপন স্থানে বসে অনুপ্রবেশকারীরা কি মতলব ভাঁজছে—তা জানার জন্যে গুপ্তচরদের সাহায্য অপরিহার্য। সঠিক খবরের বিনিময়ে এরা পুরস্কার বেশ ভালোই পেয়ে থাকে।
অথচ এতো সতর্কতা সত্ত্বেও, অনুপ্রবেশকারীদের দমিয়ে রাখা যায় না। তাদের কাজ তারা ঠিকই করে যায়। ধরাও পড়ে। শাস্তি—অপরাধের মাত্রাভেদে এক থেকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু কি যায় আসে তাতে! কারাদণ্ড বরং এদের কাছে বেশী লোভনীয়—কারাগারে আর যা-ই হোক না কেন, দুবেলা পেট পুরে খাবার তো মেলে!
পুলিস ঘাঁটি বসতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। যাক বাপু, এতোদিনে ঝামেলা মিটলো। এল্‌সা বা তার বাচ্চাদের ছেড়ে এখন আর যেতে কোনো বাধা নেই। বনে-পাহাড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়তে থাকুক ওরা, এল্‌সাও নিজের মতন থাকুক, আমরা তাঁবু গুটিয়ে ফিরে যাই ইসিওলোয়। কালে-ভদ্রে কখনো-সখনো আসবো যখন, ওদের দেখে যাবো। এতোদিনের সম্প্রীতি জিইয়ে রাখতে ওরা যদি কাছে এগিয়ে আসে—খাবার দেবো, যত্ন-আত্তি করবো। তারপর আবার ফিরে আসবো ইসিওলোয়। ব্যস্ মিটে গেলো ঝামেলা।
কিন্তু না, ঝামেলা মেটার নয়, মিটলো না। মানুষ ভাবে এক—হয় আরেক। পরদিন সকালে এক গুপ্তচরের মুখে শুনলাম অদ্ভুত এক সংবাদ—অনুপ্রবেশকারীর দল নাকি এবার এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের

মারতে অস্ত্র শানাচ্ছে। আমরা তাঁবু ছেড়ে চলে গেলেই ওরা তৎপর হবে। এল্‌সা মরলে চিরদিনের জন্যে তাঁবু ছাড়বো আমরা। ওদের কাজের বাধা সৃষ্টি করতে এখানে আর বসে থাকবো না। সুতরাং, এল্‌সার পরিবারকে যেন-তেন-প্রকারেণ ওরা খতম করবেই করবে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেলো ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে, কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লো। সকলকে হাতকড়া বেঁধে চালান করে দেওয়া হলো সদরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তবে হ্যাঁ, সাময়িকভাবে ঝামেলা মিটলেও বরাবরের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো না। ক'মাস ধরে রোদের তেজ বাড়ছে তো বাড়ছেই—ছিটেফোঁটা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা নেই। আবার অনাবৃষ্টি, আবার খরা, আবার দলে দলে আদিবাসীর অনুপ্রবেশ, তাদের স্বচ্ছন্দ শিকার—নতুন ঝঞ্ঝাট। এল্‌সাকে ছেড়ে চলে গেলে খাদ্যের অন্বেষণে কোথায় কখন সে কার মুখোমুখি পড়ে যায়, কি বিপদ ডেকে আনে—কে জানে! সুতরাং, আরো কটা মাস নিয়ম করে আমাদের আসা-যাওয়া-পর্ব চালু রাখতে হবে।

অবশ্য এক দিক থেকে ভেবে দেখলে এই নিয়মের একটা খারাপ দিকও আছে। আমাদের তত্ত্বাবধানে থেকে বাচ্চারা আস্তে আস্তে ঘরোয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, বনের স্বাভাবিক জীবনের শিক্ষা তারা গ্রহণ করতে পারছে না।

না পারুক, ক্ষতি নেই। আগে জীবন রক্ষা, তারপর শিক্ষা গ্রহণ। আগে বেঁচে-বর্তে থাক ওরা—পরে নয় বনের নিয়মকানুন শিখবে।

একদিন সন্ধেবেলা ঘটলো এক কাণ্ড। এল্‌সা-গোপা-জেসপাকে ছেঁকে ধরেছে ডাঁশে, তিনজন জর্জ-এর তাঁবুতে ঢুকে মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে—হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে কি খেয়াল হলো তাদের কে জানে। এল্‌সা উঠে পড়লো জর্জ-এর খাটে, আর দুজন উঠলো গিয়ে পাশের খাটটায়। হয়তো ভাবলো—মেঝের চেয়ে খাটে শুয়ে গড়াগড়ি দিলে ডাঁশের কবল থেকে বোধহয় দ্রুত মুক্তিলাভ ঘটবে। রগড় দেখে না হেসে পারলাম না। হে ভগবান! এমন ঘরমুখো আরামপ্রিয় স্বভাব যাদের—তারা আবার ফিরে যাবে বন্য-জীবনে! অসম্ভব!

ইতিমধ্যে এক নতুন অতিথি এসে জুটলো—প্রিয়দর্শন সুন্দরী এক গন্ধগোকুল। ভারী শান্ত স্বভাব তার, ভারী কর্মকুশল। রোজ রাতে আমাদের পাত-কুড়োনো খাবার খেয়ে সে চম্পট দেয়। একদিন বাসন-কোসনের ঝন্‌ঝন্ শব্দে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলো জর্জ-এর। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে দেখে—পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বাটি থেকে মাখন চুরি করে

খাচ্ছে সে। টর্চের আলো দেখেও সে এতোটুকু ঘাবড়ালো না। নির্ভয়ে চেটেপুটে বাটির মাখনটুকু খেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো তাঁবু থেকে। ভাগিস্, এল্সারা কেউ নেই তাঁবুতে! থাকলে আজ জ্যান্ত ফিরতে হতো না।

এল্সার ব্যাপারে একদিন একটা নতুন জিনিস নজরে এলো। কি খেয়াল হতে ওকে হাঁ করিয়েছি, দেখি—নীচের চোয়ালের তুটো শ্বদন্ত ওর পড়ে গেছে। কৃমি-সংক্রান্ত গোলমাল হবার পর থেকেই ওর দাঁতে এক ধরনের কালো ছোপ ধরতে শুরু করেছিলো, দাঁত পড়ে গিয়ে তার চূড়ান্ত হলো। বোঝার ওপর শাকের আঁটি– শিকার করার যেটুকু বা সম্ভাবনা ছিলো, গেলো।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই কেন জানি না, ভারী চঞ্চল হয়ে উঠলো এল্সা। বাচ্চাদের নিয়ে অনেকবার ঘর-বার করলো! তারপর রাত একটু ঘন হতে সদলবলে রওনা দিলো জঙ্গলের দিকে।

গভীর রাতে তাঁবুর বাইরে উঠোনে ভীষণ এক হুটোপাটির শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো আমার। একসঙ্গে কয়েকটা সিংহ গর্জন করে উঠলো, প্রত্যুত্তরে এল্সাও ছাড়লো এক হুঙ্কার। আর একদফা হুটোপাটির শব্দ হলো। কারা যেন দৌড়ে চলে গেলো জঙ্গলের দিকে, কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে।

ভোর সকালে উঠে বেরোলাম। পায়ের ছাপ দেখে বুঝলাম, সেই সিংহ-দম্পত্তির সঙ্গে এল্সার বেশ একচোট খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধশেষে তারা তুজন ধরেছে জঙ্গলের পথ, এল্সা নদী পার হয়ে উঠেছে গিয়ে পাহাড়ে। খোঁজ খোঁজ···খুঁজতে খুঁজতে চলে এলাম সীমানা অবধি। নাঃ, এল্সার দেখা পাওয়া গেলো না।

অগত্যা তুটো ফাঁকা আওয়াজই করলাম। কিছুক্ষণ পর অনেক দূর থেকে সাড়া দিলো এল্সা। মিনিট দশেক কাটতে জেসপাকে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এসে হাজির।

একটু পরে আর তুজন বাচ্চাও এলো। দেখলাম, এল্সার ডান হাতটা বেশ জখম হয়েছে, রক্ত ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। যন্ত্রণায় মুহুর্মুহু চমকে উঠছে সে।

ওষুধপত্র সব রয়েছে তাঁবুতে! এদিকে সন্ধ্যেও ঘনিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। রওনা দিলাম তাঁবুর দিকে। আমরা পা চালিয়ে হাঁটি, তো এল্সারা পড়ে পেছিয়ে। এমনভাবে হাঁটলে রাত দশটা বেজে যাবে তাঁবুতে ফিরতে। কি করি···কি করি···

তা আমাদের আর কিছু করতে হলো না, যেটুকু যা করার করলো ডাঁশের দল। ভনভন ভনভন করে উড়তে উড়তে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরলো

এল্‌সা আর জেসপাকে। ত্রাহি ত্রাহি শব্দে যন্ত্রণা ভুলে তাঁবুর দিকে ছুটলো এল্‌সা। জেসপা খানিকক্ষণ আমার গায়ে পিঠ ঘষলো, মাটিতে গড়াগড়ি খেলো, তারপর উঠে সে-ও চোঁ-চাঁ ছুটলো মায়ের পেছন পেছন।

তাঁবুতে ফিরে রাজ্যের অবসাদ যেন পেয়ে বসলো আমাকে! সারাদিনে পরিশ্রম কম হয়নি, ক্লান্তিতে পা টনটন করছে, বারবার দু চোখের পাতা বুজে আসছে। সে যাহোক, ওষুধ-টষুধ লাগিয়ে এল্‌সার ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলাম, ব্রাশ ঘষে গা থেকে ডাঁশ তাড়িয়ে দিলাম। সে-রাতে সে আর কিছু খেলো না। খাবারের চারদিকে বাচ্চাদের বসিয়ে দিয়ে সে গিয়ে উঠলো গাড়ির ছাদে। রাত নটা বাজতে নেমে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে, বাচ্চারাও গেলো তার পেছন পেছন। খানিকক্ষণ পর পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো তার সিংহের ডাক।

তিনদিন পর ঘা শুকোলো। এ ক'দিন রোজ বিকেলের দিকে আসতো এল্‌সা, ঘা পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে দিতাম। শুকোতে তাই এবার দেরী হলো না।

এবার একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম বাচ্চাদের আচার-আচরণে - এল্‌সার শাসনে তারা যেন প্রায় সময়ই তটস্থ। মায়ের সঙ্গে দৌড় ঝাঁপ, ছুটোছুটির পরিমাণটাও এবার দেখলাম আগের চেয়ে একটু কমেছে।

এই তো সেদিন এল্‌সা লাফ দিলো এক চিতল হরিণ লক্ষ্য করে, হরিণটা মুহূর্তে অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে ছুটতে লাগলো। এল্‌সা শূন্য থেকে মাটিতে নামতে নামতে সে পগার পার। ফিরে এলো এল্‌সা হতাশ হয়ে। বাচ্চারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটা দেখলো, কিন্তু এক পাও এগোলো না।

এল্‌সাকেও সাবাশ! খেলাধুলো করুক আর যা-ই করুক—বাচ্চাদের প্রতি সব সময় তার সতর্ক দৃষ্টি। হয়তো নদীর পারে খেলা করছে বাচ্চারা, এল্‌সা কড়া নজরে রেখেছে তাদের—ভুল করেও কেউ যেন জলের কাছে না চলে যায়। নদীতে একটু যেই কাঁপন উঠলো—অমনি কান খাড়া হলো তার, এগিয়ে গিয়ে সরেজমিনে পরীক্ষা করে এলো চারপাশ। কুমীরে এল্‌সার বড় ভয়। সেদিন খেলার ছলে জর্জ নদীতে ছুঁড়ে দিলো বেতের ছোট্ট লাঠিটা। বাচ্চারা অমনি ছুটলো সেদিকে। এল্‌সা ছুটে গিয়ে ধমক দিলো তাদের, জলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলো। এগিয়ে গিয়ে আগে ভালোভাবে পরীক্ষা করলো লাঠিটা, তারপর নিজেই জলে নামলো। সাঁতরে লাঠিটা নিয়ে এসে বাচ্চাদের দিলো।

বারোই আগস্ট আমার নাইরোবিতে যাবার কথা। এগারো তারিখ রাতে

এল্‌সা এলো। খাবার-টাবার খেয়ে খানিকক্ষণ সে বসে রইলো উঠোনে, তারপর সদলবলে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে। একটু পরে বন কাঁপিয়ে ভেসে এলো এক অচেনা সিংহের ডাক।

পরদিন সকালে জর্জ তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে পৌঁছে গেলো পাহাড়ে। গিয়ে দেখে, এল্‌সার পায়ের ছাপের পাশাপাশি রয়েছে এক সিংহের পায়ের ছাপ, বাচ্চাদের ছাপও রয়েছে আশেপাশে। কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরাঘুরি করে তারা সকলে গেছে পর্বত-গুম্ফায়। বাকী রাতটুকু সেখানেই কাটিয়েছে।

অবশ্য কাটিয়েছে মানে একেবারে শুয়ে-বসে কাটায়নি। তাদের থাকার জায়গার একটু দূরেই পড়ে আছে এক গণ্ডারের তীরবিদ্ধ দেহাবশেষ। পাঁচজনে মিলে মনের সুখে সেই মাংস খেয়েছে।

নাইরোবি থেকে ফিরতে ফিরতে আঠারো তারিখ হলো। একটু বেশি রাত করেই সেদিন খেতে বসলাম। এল্‌সারাও খেতে বসলো উঠোনে। এমন সময় তাঁবুর পেছন দিকের জঙ্গলের আড়াল থেকে দু-দুটো সিংহ হঠাৎ ডাকাডাকি শুরু করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে খাবার ছেড়ে উঠলো এল্‌সা, দৌড়ে তাদের ডাক লক্ষ্য করে ছুটলো। বাচ্চারা বসে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে একসময় রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে।

এল্‌সা ফিরে এলো মিনিট পঁয়তাল্লিশেক পর। এসে বাচ্চাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাকতে ডাকতে আবার ছুটলো পাহাড়ের দিকে।

সে-ও রওনা দিয়েছে, অমনি রান্নাঘরের পেছন থেকে উঠলো এক বিকট গর্জন—হু ম্‌-ম্‌-ম্‌। টর্চের আলো ফেললো জর্জ, আলো সোজা গিয়ে পড়লো এক বিশালকায় সিংহের উজ্জ্বল দুই চোখে। তড়িঘড়ি সে ছুট লাগালো।

এদিকে এল্‌সার ডাকও ততক্ষণে থেমেছে। তার মানে, বাচ্চাদের দেখা সে পেয়েছে। যাক বাবা, সব দিক থেকে শান্তি। এখন গিয়ে মানে মানে বিছানায় গা ঢেলে দেওয়া যাক।

শুতে না শুতে দু চোখ জুড়ে নেমে এলো ক্লান্তির ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি খেয়াল নেই – জর্জ-এর প্রচণ্ড সোরগোলে উঠে বসলাম। বাইরে এসে দেখি, ম্লান চাঁদের আলোয় উঠোনের সীমানা ঘেঁষে আমাদের থেকে মাত্র হাত পঁচিশেক দূরে বসে আছে এক সিংহী। জুলজুল করে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাঁবুর দিকে।

জর্জ একটা ফাঁকা আওয়াজ করলো। সিংহীটা ভ্রূক্ষেপমাত্র করলো না।

এদিকে আওয়াজ শুনে হলো এক নতুন বিপদ। ডান দিকের এক ঝোপের আড়াল থেকে গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করে দিলো এক সিংহ। আধঘণ্টা ধরে চললো তার ডাকের মহড়া, তারপর বোধকরি ক্লান্ত হয়েই তারা যে যার পথ দেখলো।

পরদিন বিকেলে এল্‌সা এসে হাজির। দলবল সমেত সে ঢুকে পড়লো তাঁবুতে। জেসপা ছুটোছুটি করে নাগালের মধ্যে যা যা পেলো, সব মাটিতে টেনে নামিয়ে ছত্রখান করে দিলো।

বোতল গড়িয়ে দিয়ে, বাসনকোসন টান মেরে মেঝেয় নামিয়ে কি আনন্দই না হলো তার! একটা পিচবোর্ডের খালি বাক্স পড়েছিলো একপাশে। নিমেষে সেটাকে টেনে ছিঁড়ে শতকুচি করলো সে। সে-রাতটা তাঁবুতেই কাটালো সবাই। ভোরে উঠে বাচ্চারা প্রস্তুত—বেরোবে তারা। কিন্তু এল্‌সার ভাবগতিক অন্য রকম, সে শুয়ে-বসে সকালটুকুও তাঁবুতে কাটিয়ে দিতে চায়। জর্জ গিয়ে তাকে ঠেলা দিলো, উঠে এক ধাক্কায় জর্জকে ধরাশায়ী করে আবার শুয়ে পড়লো সে মেঝেয়। আমি গেলাম। চোখ পিটপিট করে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে, তারপর উঠে এক ধাক্কায় আমাকেও চিৎপটাং করে আমার বুকের ওপর এক পা রেখে গাল চাটতে লাগলো।

এতোক্ষণে তার ক্রিয়াকাণ্ডের মানে বুঝলাম—মেজাজ তার শরীফ, আমাদের সঙ্গে আজ সকালে সে আগেকার মতো খেলায় মাততে চায়। তা বেশ তো, খেলতে চাও—বাইরে চলো, এখানে কি!

বাইরে এলাম। খানিকক্ষণ খেলাধুলো করে চলে গেলো সে। এলো আবার বিকেলে—চারটের সময়। হঠাৎ কেন জানি না, জেসপার সমস্ত আগ্রহ গিয়ে পড়লো জর্জ-এর রাইফেলটার ওপর। টানা-হেঁচড়া করে জর্জ-এর হাত থেকে ওটাকে সে ছিনিয়ে নেবেই নেবে। অবশেষে শক্তিতে এঁটে উঠতে না পেরে সে এক মতলব খাটালো। রাইফেল ছেড়ে ভাই-বোনের সঙ্গে গিয়ে খেলায় মাতল। খেলা দেখতে দেখতে যেই না জর্জ একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, অমনি একছুটে এসে টেবিলের ওপর থেকে রাইফেল নিয়ে সে দিলো দৌড়।

ছুটে গিয়ে রাইফেলের একদিক চেপে ধরলো জর্জ। কিছুতেই ছাড়বে না জেসপা। অগত্যা এল্‌সাকে আসতে হলো। জেসপাকে সে লাগালো এক ধমক, রাইফেল ছেড়ে জেসপা কাঁচুমাচু মুখে বসলো গিয়ে উঠোনের একপাশে।

ছেলেকে বিমর্ষ দেখে মায়েরও বুঝি মন গললো। তাড়াতাড়ি মাটিতে চিৎ

হয়ে শুয়ে সে ডাকলো বাচ্চাদের। বাচ্চারা এতোদিন পর দুধ খাওয়ার মতো এক অদ্ভুত সুন্দর সুযোগের সন্ধান পেয়ে আর দেরী করলো না, ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে।

দুধ খেতে খেতে গোপা আর জেসপা ঘুমিয়ে পড়লো, এল্‌সা উঠে এলো আমার পাশে। পা চেটে খানিকক্ষণ আদর জানাবার পর আমার কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো, ধীরে ধীরে বুজে এলো তার চোখের পাতা।

হঠাৎ নজর গেলো ছোটোর ওপর। দেখি, সে ঘুমোয়নি। উঠোনের চারপাশে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে দূরের জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে। অর্থ পরিষ্কার—সে এখন পাহারাদার। মা-দাদাদের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে সে পারবে না।

সে-রাতটা তাঁবুতেই কাটালো তারা, পরের দিনও তাই। সেদিন সন্ধ্যে হতে পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো এল্‌সার সিংহের ডাক। এল্‌সা গেলো না। আরো তিন দিন তিন রাত সে তাঁবুতেই কাটালো।

১০

মাঝে মাঝে মনে হতো, আমরা যেন বাস করছি ছোটোবেলার গল্পে-পড়া সেই পরীর দেশে। এখানে ভয় নেই, ভীতি নেই—সকলে সকলের চেনা-জানা। স্বচ্ছন্দে যে যার ঘুরে বেড়ায় যেখানে-সেখানে—বাধা দেবার কেউ নেই।

একজোড়া গজলা হরিণ-দম্পতিকে দেখে অন্ততঃ সেরকম ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক। রোজ দুপুরে খেতে বসে দেখতাম, তারা আমাদের উঠোনের পাশ দিয়ে হেলতে-দুলতে নদীর দিকে এগোচ্ছে। আমরা কথা বলতাম, হাসি-তামাশা করতাম—এতোটুকু অবাক হতো না তারা। যেন আমাদের প্রতি তাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই।

চিতল হরিণের দলটা ছিলো একটু বেশি রকম বেপরোয়া। দলেও তারা ছিলো ভারী—দুটি পুরুষ, তিনটি মেয়ে এবং তিনটি বাচ্চা নদীর জলে তেষ্টা মিটিয়ে পুরো দলটা স্টুডিওর পাশে শুয়ে লাগাতো এক মস্ত ঘুম। ঘুম থেকে উঠে বিকেলের আগেই যে যার ঢুকতো গিয়ে জঙ্গলে। বিকেলে এল্‌সারা আসে, তারা জানতো।

আর বেবুনদের কথা তো স্বতন্ত্র। এতোদিন পাশাপাশি থাকতে থাকতে ওদের সঙ্গে যেন একটা অলিখিত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। আমাদের কাউকে হাত দুয়েক দূরে দেখেও ওরা এতোটুকু চমকাতো না বা ভয় পেতো না।

এমনও দিন গেছে—ওরা বসে আছে অদূরে—ক্যামেরা বাগিয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে আমি হয় ওদের ছবি তুলছি, নয়তো তুলি-ক্যানভাস নিয়ে স্কেচ করছি—এতোটুকু অবাক হতো না ওরা। আমাকে আমার কাজ করার অবাধ সুযোগ দিয়ে তারা মত্ত হয়ে থাকতো তাদের কাজে।

অবশ্য কাজ মানে হেলাফেলা কিছু নয়—বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খরায় নদী-নালা শুকিয়ে খটখটে, নদীর ঢালে বালি খুঁড়ে আমরা আমাদের জলের প্রয়োজন মেটাতাম। ওরা আরো চালাক, খোঁড়াখুঁড়ির ধার-কাছ দিয়েও যেতো না। স্রেফ বেছে বেছে উলুখাগড়ার ঝোপ টেনে উপড়ে ফেলতো, তারপর একেকটা গাছ নিয়ে এক একজন বসে যেতো সার বেঁধে। নল ভেঙে নলের ভেতরকার জলটুকু চুমুক দিয়ে খেতো। দেখে মনে হতো, যেন পিপে থেকে আকণ্ঠ মদ গিলছে সবাই।

পিপে সংগ্রহের কাজে পুরুষরাই অগ্রণী, মেয়েদের কাজ শুধু তেষ্টা মেটানো। এক একটা পুরুষ ঝোপঝাড় ভেঙে সংগ্রহ করে আনতো আট-দশটা পিপে, ডেরায় ফিরে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতো সকলের মধ্যে—সবাই তেষ্টা মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হতো।

তা দেখেই চেনা যেতো—কে পুরুষ। উলুখাগড়ার ঝোপ থাবায় ধরে বেশ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে লম্ফ-ঝম্প করতে করতে ডেরায় ফিরে আসতো পুরুষটি, এসেই শুরু করে দিতো হম্বিতম্বি। যেন এতোক্ষণ কত পরিশ্রমই না করে এলো সে, কৃতজ্ঞতায় সকলের সেজন্য মাথা নীচু করে থাকা উচিত। বণ্টন শুরু হতো হম্বিতম্বির পর। সকলের তেষ্টা মিটিয়ে বাকী নলকটায় সে নিজে চুমুক লাগাতো।

নদীতে জল না থাকায় সকলের চেয়ে বেশি মুশকিল হতো কুমীরদের। ঝোপঝাড়ের আড়ালে এখানে-সেখানে তারা রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকতো। লোকজনের সাড়া পেলেই সড়সড় করে ঢুকতো গিয়ে গভীর জঙ্গলে।

বেবুনদের আস্তানার কাছে প্রায় সময়ই একটা মস্ত কুমীরকে দেখতাম। লম্বায় সে আট ফুট, চওড়ায় ফুটখানেকের মতো। মড়ার মতো পড়ে থাকতো নদীর পারে। দেখে মনে হতো, সব সময়ই ঘুমোচ্ছে—পৃথিবীর ঝুট-ঝামেলা, দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সে একেবারেই উদাসীন।

কিন্তু না, ওপর থেকে দেখে যা মনে হতো, আসলে তা নয়। সদা সতর্ক থাকতো সে—সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকতো। রাইফেল তুলে নিশানা করতে দেখলেই সে বুঝতে পারতো। অলিম্পিকের সেরা-দৌড়বাজের মতো ছুটতে ছুটতে ঢুকতো গিয়ে জঙ্গলে।

দুদিন সোজাসুজি চেষ্টা করে বিফল হয়ে তৃতীয় দিন এক মতলব খাটালাম।

এক ঝোপের আড়ালে বসে তাক করলাম রাইফেল। ব্যস্, যেই না উঁচিয়েছি নল, অমনি শুরু হলো বেবুনদের হৈ চৈ মুহূর্তে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো সে।

দেখো কাণ্ড! কি ধূর্ত এই জলের জীবটি! বেবুনদের সঙ্গে আগে থেকে সড় করে রেখেছে, চেঁচামেচি করে তারাই এ যাত্রা ওকে রক্ষা করলো।

কোনো কোনো পাখীদের অনেক সময় এ ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি করতে দেখা যায়। জেব্রা বা কৃষ্ণসার হরিণের হয়ে জিরাফকে কখনো কখনো প্রহরীর কাজ করতে হয়। কিন্তু বেবুনদের এরকম আচরণে অবাক হলাম খুব। কুমীরের মুখে এতাবৎ কত যে বেবুন প্রাণ হারিয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। সব জেনেশুনে হন্তারকের প্রতি তাদের এতো প্রেম—অবাক হবার কথা বৈকি!

অবশ্য একটা কথা ঠিক—আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই সমান। কুমীরের যতটুকু, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবটিরও ঠিক ততটুকু। কিন্তু মুশকিল হলো এই—কুমীর অতশত বোঝে না। সকলের ওপরই সে জোর খাটাবে। এমন কি নিরীহ-নির্জীব মাছগুলোকে অবধি রেহাই দেবে না।

মাছেদের প্রসঙ্গ আসতে মনে পড়ে গেল সেই ঘটনাটা। একদিন সকালে প্রাতরাশ খাচ্ছি উঠোনে বসে। ডিম, কলা, দুধ—একেবারে ঢালাও বন্দোবস্ত। কলা খেয়ে খোসাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পাশের ছোট জলাশয়ে। যেই না ফেলা, অমনি জলে শুরু হলো তোলপাড়। অজস্র রূপোলী মাছ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো খোসাটার ওপর। টানা-টানি হেঁচড়া-হেঁচড়ি চললো কিছুক্ষণ ধরে। হঠাৎ বড়সড় একটি মাছ কোত্থেকে ছুটে এসে খপ করে কামড়ে ধরলো খোসাটা, মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো জলের নীচে।

কলার খোসা যে মাছেদের এতো প্রিয়, একথা আগে জানতাম না। দিলাম আরেকটা, আবার শুরু হলো ছুটোপাটি। কায়দাটা জানা হয়ে গেলো। সেদিন থেকে ভুক্তাবশেষ এটা-ওটা হাজারো জিনিস জলে ফেলতে শুরু করলাম। শেষে এমন হলো, পুকুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই চারপাশ ঝেঁটিয়ে মাছ এসে ভিড় করতো পায়ের কাছে, মাথা তুলে পাখনা নেড়ে খাবারের অপেক্ষায় ভেসে থাকতো।

পাঁউরুটির টুকরো থেকে শুরু করে আমের খোসা—সবই দিতাম, তারা খেতো! শুধু মাংসটা বাদ রাখতাম। এল্সাদের খাইয়ে-মাংস বড় একটা বাঁচতো না। সুতরাং মাংসের স্বাদ সম্পর্কে তারা বরাবর অনভিজ্ঞই রয়ে গেল।

তা মাংস শুধু যে এল্সারাই খেতো, তা নয়। অজস্র জীবজন্তু মাংসের লোভে রাতবিরেতে ঘুরে বেড়াতো আমাদের তাঁবুর চারপাশে, সুযোগ পেলেই দু-এক খাবলা তুলে নিয়ে চম্পট দিতো।

বেজি থেকে শুরু করে গিরগিটি, শেয়াল, গন্ধগোকুল—সবাই আসতো। হায়না, সিংহ—এরা তো আসতোই।

জন্তু-জানোয়ার বাদ দিলে থাকে পাখীর দল। পাখীরা ছিলো আমাদের অরণ্য-জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। একজোড়া সারস দিনের মধ্যে অন্তত বারদশেক ঘুরে ফিরে আসতো উঠোনে, নির্ভয়ে দু একটা চক্কর মেরে তারপর চলে যেতো।

একদল বাঁকা ঠোঁট হাদাদা সারসকেও নিয়মিতভাবে দেখতাম। টেনে টেনে কান্নার মতো করুণ সুরে তারা ডাকতো। হঠাৎ শুনলে মনে হতো, যেন বাচ্চা কাঁদছে। সারস-জাতীয় পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশালকায় হলো গোলিয়েথ। দেখতে ভারী সুন্দর—ছবির মতো গড়ন। তবে লোকজনদের এড়িয়ে থাকতেই তারা ভালবাসতো বেশি, খুব একটা কাছে ঘেঁষতো না।

কি অদ্ভূত পরিবেশ—তাই না! এইতো দেখুন—এখন আমি উঠোনে বসে লিখছি, বেবুনদের আস্তানার কাছে জমেছে এক মস্ত ভিড়। তিনটে গজলা হরিণ, একটা কৃষ্ণসার হরিণ, একটা হরিণী এবং তাদের তিনটে বাচ্চা নির্বিবাদে ঘোরাফেরা করছে। একটা বাচ্চা আবার এক বেবুনের বাচ্চাকে ঘাড়ে নিয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে।

যাক, এল্সার প্রসঙ্গে আবার আসি। এল্সা যে তার শত্রুপক্ষের সঙ্গে সাহসে ভর করে লড়তে যায়—এটা খুবই সুখের সংবাদ। বন্য জীবনে ধীরে ধীরে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে—আশার কথা বৈকি! আগস্টের শেষাশেষি এক বিকেলে সে বসে আছে উঠোনের একপাশে, বাচ্চারা খাবার ঘিরে বসেছে—এমন সময় তাঁবুর পেছন দিকের জঙ্গল কাঁপিয়ে ভেসে এলো দু-দুটো সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! দৌড়ে সেদিকে ছুটলো এল্সা, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলো অনেকদূর। ঘণ্টাখানেক পর মুখে কয়েকটা আঁচড় কামড়ের দাগ নিয়ে সে ফিরে এলো তাঁবুতে, বাচ্চাদের ভুক্তাবশেষ মাংসটুকু নিয়ে বসে গেলো উঠোনের একপাশে।

পরদিন ইব্রাহিম এলো নাইরোবি থেকে। সঙ্গে সে এনেছে এক নতুন ল্যাণ্ডরোভার—অর্ডার দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী করিয়েছি গাড়িটা, সিংহের আঁচড়ে-কামড়ে ক্যানভাসের ঢাকনার আর এতোটুকু ক্ষতি হতে পারবে না। চিঠিপত্র একপাঁজা এনেছে সে সঙ্গে। 'ইলাস্ট্রেটেড্ লণ্ডন নিউজ'-

এর এ-মাসের সংকলনটা নিয়ে এসেছে। এই সংকলনে এল্‌সার সম্বন্ধে আমার লেখা দু পৃষ্ঠা এক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। প্রবন্ধে এল্‌সাকে আমি পৃথিবী-বিখ্যাত সিংহী বলে বর্ণনা করেছি।

এল্‌সাও এসে হাজির বিকেল নাগাদ। মুখের আঁচড়-কামড়ের দাগগুলো তার তখনও শুকোয়নি, দু-এক জায়গা দিয়ে রক্ত পড়ছে। যন্ত্রণায় মাঝে-মধ্যে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ছে সে, তবু ওরই ফাঁকে ফাঁকে জেসপাকে সতর্ক নজরে রাখছে। নজরে রাখার কারণ আর কিছু নয়—আমি বসেছি টাইপ-মেসিনটা নিয়ে, মেসিন সম্বন্ধে যথোপযুক্ত জ্ঞানলাভ না করে জেসপার শান্তি কোথায়!

বেচারা জেসপা—কত কি আছে এখনও তার জানবার! এই বিশাল পৃথিবী—এর কন্দরে কন্দরে কত রহস্য, কত না-জানা তথ্য! মানুষের জীবনটা তাদের জীবনের মতো ছকে ফেলা নয়, কৌতূহলী হবার মতো লক্ষ লক্ষ ঘটনা সেখানে জড়িয়ে আছে পাকে পাকে।

এই তো সেদিন—রাতে রয়েছে ওরা জর্জ-এর তাঁবুতে—ঘুম-ঘুম চোখে শুনলাম, কি যেন একটা জিনিস নিয়ে জেসপা ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সকালে উঠে জিনিসটি কি—বুঝতে আর বাকী রইলো না। আমার দুরবীনটা উধাও। খোঁজ খোঁজ···দেখি, বাইরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে দুরবীনের চামড়ার খাপটা শতছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে, একটু দুরে আরেক ঝোপের আড়ালে পড়ে আছে দুরবীনটা। তবু ভালো—কাঁচটা অক্ষত আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আট মাসে পড়লো বাচ্চারা। স্বভাবে বা চেহারায় এই আট মাসে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাদের। গায়ের লোম এখন মোমের মতো মসৃণ, চেহারায় সেই বাচ্চাটে ভাবটা আর নেই। তারা তখন কৈশোরত্বে পৌঁছেছে—এখন আর বালকসুলভ আচরণ করলে চলবে কেন!

তা মুশকিল হয়েছে জেসপাকে নিয়ে। এল্‌সার মতো সে-ও আমাদের ভালোবাসা পেতে চায়, আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে চায়, খেলাধুলো করতে চায়। মাঝে মাঝে পায়ের কাছে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সে। উদ্দেশ্য, মাকে যেমন ভাবে আদর করি তাকেও তেমনি করতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার গায়ে হাত দিই, আস্তে আস্তে হাত বোলাই পিঠে। ব্যস্, ওইটুকুই—আর কিছু নয়। এল্‌সা অনেক বোঝদার, সব সময় যে নিজের জোর খাটাতে হয় না—একথা সে বোঝে। জেসপার এখনো সে-বোধ জন্মায়নি, তাই তার ওপর ততটা নির্ভর করা যায় না।

স্বভাবে ছোটো ঠিক তার দাদার বিপরীত। কিছুতেই সে বশ মানবে না।

কথায় কথায় গজরাবে, হম্বিতম্বি করবে – তারপর পেছোতে পেছোতে চলে যাবে নাগালের বাইরে। দাদার মতো মিলেমিশে থাকতে সে রাজী নয়। তবে হ্যাঁ, আগেই বলেছি—তার যা আছে, সেটা তার দাদাদের কারুর নেই। উপস্থিত বুদ্ধিতে সে ওস্তাদ। ভেবেচিন্তে এমন একটা উপায় বাতলাবে– যা তার দাদারা ভুলেও ভেবে উঠতে পারবে না। তাছাড়া, শক্তিতেও সে দুজনের চেয়ে বড়।

এই তো সেদিন—গোপা-জেসপা প্রাণপণে চেষ্টা করছে তাদের ভাগের ছাগলটা টেনে ঝোপের আড়ালে নিয়ে যেতে। ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে উলটে পড়ে কত কসরতই না করছে তারা—লাভ কিছু হচ্ছে না। অবশেষে সব দেখেশুনে ছোটো এগিয়ে এলো বীরদর্পে। দাদাদের সরিয়ে ছাগলটাকে কামড়ে মাটি থেকে তুললো ইঞ্চিখানেক উঁচুতে, তারপর সেই অবস্থায় দু হাতে ধরে পেছনের দু পায়ে হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে গেলো সেটাকে ঝোপের আড়ালে।

কালেভদ্রে তাঁবুতে এসে ঢুকতো গোপা। ডাঁশের আক্রমণে নাজেহাল না হয়ে পড়লে তাঁবুতে ঢোকার কথা তার মাথায় আসতো না। ঢুকে যদি দেখতো, এল্‌সাকে আদর করছি আমি, একটা একটা করে গায়ের ডাঁশ বেছে দিচ্ছি—অমনি হিংসেয় তার চোখ-টোখ কুঁচকে যেতো। তাঁবুর ক্যানভাস আঁচড়াতো আর গজরাতো—উঁম্-র্-ম্! মানে, মাকে ছেড়ে আমার দিকে নজর দাও, আদর-তোয়াজ যা কিছু করার আমাকে করো।

একদিন তাতেও হলো না। খানিকক্ষণ আঁচড়-গর্জনের পর তাঁবুর এক কোণ সে কামড়াতে লাগলো। বললাম, না গোপা, না! থামলো সে, আমার দিকে ছোট ছোট চোখে তাকিয়ে এক প্রবল হুঙ্কার দিলো, তারপর আবার মন দিলো তাঁবু-চর্বণে। আবার নিষেধ করলাম, আবারও থামলো সে, আবার হুঙ্কার দিলো। অবশেষে উঠে গিয়ে এল্‌সা এক চড় বসালো তার গালে, মাথা নীচু করে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে।

দেখলাম, 'না' বলে নিষেধ করলে সব বাচ্চাই শোনে। সাময়িকভাবে হলেও দুষ্টুমি থেকে নিবৃত্ত হয়, তারপর আবার নতুন উদ্যমে কাজে লাগে। আসলে, 'না' শব্দটায় ওরা ভয় পায়, ঘাবড়ে যায়।

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে খরার রূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। টহলদারী পুলিস দলের শ্যেনদৃষ্টির আড়ালে কয়েকটা জন্তু যথারীতি বিষের তীর খেয়ে মরলো, শত পাহারা সত্ত্বেও কিছু করা গেলো না।

কদিন পর পুলিস দলের এক বিরাট অংশকে সরকারী নির্দেশে চলে যেতে হলো উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। ঘাঁটিগুলো বহাল রইলো ঠিকই, কিন্তু নামমাত্র

পুলিস নিয়ে কিভাবে কি হবে ভেবে বড় দুশ্চিন্তায় পড়লাম। অক্টোবরের আগে বৃষ্টি নামবে না। এই একটা মাস এল্‌সাকে সদা-সাবধানে রাখতে হবে।

একদিন ইসিওলো থেকে জর্জ বয়ে নিয়ে এলো এক সুসংবাদ—স্যর জুলিয়ন হাক্সলি ইউনেস্কো-আয়োজিত এক শুভেচ্ছা-সফরে আসছেন উত্তর-সীমান্তের জঙ্গলে। বন্য পশু রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তাঁরা সারা পৃথিবীব্যাপী এক দীর্ঘ সমীক্ষা চালাচ্ছেন।

ভালোই হলো, এই সুযোগে এ-অঞ্চলে যাবতীয় সুবিধে-অসুবিধের কথাও ওঁকে বলা যাবে। তাছাড়া শুনলাম, এল্‌সা সম্পর্কে স্যর হাক্সলির আগ্রহ কম নয়। সুতরাং সব দিক থেকেই ভালো।

কিন্তু একটা বিষয়ে একটু চিন্তায় পড়লাম। তাঁবুর চারপাশে দলে দলে অজানা-অচেনা সিংহের যে হারে ঘন ঘন যাতায়াত—তাতে তাঁদের নিরাপত্তা বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। দলে লোকজন কম থাকবেন না—সস্ত্রীক স্যর হাক্সলি, প্রধান বন-অধিকর্তা মেজর গ্রিমউড, পাইলট, ড্রাইভার—কম নয়। ঠিক হলো, সীমান্ত ঘুরিয়ে ফেরার পথে তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াবো সকলে, ওঁরা গাড়িতেই বসে থাকবেন, এল্‌সাকে একচমক দেখিয়ে দেব সকলকে, তারপর ওঁরা রওনা হবেন বিমান-বন্দরের দিকে।

সেরকমই হলো। সাতই থেকে নয়ই সেপ্টেম্বর—এই তিনদিন ঘুরে ঘুরে সীমান্ত প্রদেশের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলোই তাঁদের দেখালাম, ন' তারিখ বিকেলে এসে দাঁড়ালাম তাঁবুর সামনে।

দুটো ফাঁকা আওয়াজ করা হলো। মিনিট কুড়ি পরে সপরিবারে এসে হাজির এল্‌সা। আমাকে দেখে ভারী আনন্দ তার—এক ধাক্কায় সকলের সামনেই আমাকে একেবারে চিৎপটাং করে ছাড়লো। খাবার দিলাম। টানতে টানতে খাবার নিয়ে সকলে গিয়ে বসলো ঝোপের আড়ালে, আমরা এই ফাঁকে গাড়ি ছাড়লাম।

ওঁদের হাওয়াই জাহাজে তুলে দিয়ে পরদিন ফিরে এলাম তাঁবুতে। আমরা আসার তিন ঘণ্টা পর এলো এল্‌সারা। কালকের বাসী মাংসটুকু চারজনে ভাগাভাগি করে খেলো।

রাত্তিরে পেছনের দিকের জঙ্গলে দুটো সিংহের হাঁকডাক শোনা গেলো। নিমেষে ছুটে বাইরে গেলো এল্‌সা। মারপিট ঝগড়াঝাঁটি আজ কিছুই হলো না—তিনজনের মধ্যে হলো এক দীর্ঘ কথোপকথন। রাত তিনটে নাগাদ কথাবার্তা শেষ করে তাঁবুতে ফিরে এলো সে, বাচ্চাদের ডেকে তুললো। তারপর সকলে মিলে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে। সকালে

উঠে জর্জ-এর তাঁবুতে গিয়ে আমি তো হতভম্ব—জেসপা হাতের নাগালে যা পেয়েছে, সব টেনে নামিয়ে ছত্রখান করে গেছে।

রাতে এল্‌সা এসে হাজির। উঠোনে না বসে তাঁবুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে করুণ সুরে সে বাচ্চাদের ডাকতে লাগলো। বাচ্চাদের সাড়া পাওয়া গেলো না। খাণিকক্ষণ পর চলে গেলো সে।

সারাটা রাত বড় দুশ্চিন্তায় কাটলো। সকালে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। দেখি, উঠোনের পাশ ঘেঁষে বসে আছে সবাই, ক্ষিধেয় মুখচোখ শুকিয়ে গেছে। খাবার দিলাম। দু ঘণ্টা ধরে চেটেপুটে পুরো ছাগলটাই খেলো তারা। তারপর রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে।

বিকেলে টোটোকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে দেখি, বিরাট পাথরের চাঁইটার ওপর বসে আছে চারজন। আমাদের দেখে একলাফে নেমে এলো এল্‌সা, পায়ে মুখ ঘষে আদর জানালো। জেসপাও এলো গুটিগুটি, কিন্তু খুব একটা কাছে ঘেঁষতে সাহস পেলো না। দূরে বসে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তাঁবুতে ফিরে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছি, জর্জ এসে হাজির। সঙ্গে তার এক বিরাট লরি, কত কি মালপত্র রয়েছে তাতে। কি ব্যাপার—না, ডেভিড অ্যাটেনবোরো এবং জেফ মুলিগ্যান লণ্ডন থেকে হাওয়াই জাহাজে আগামী কাল এসে পৌঁছচ্ছেন এখানে। তাঁদের আসার উদ্দেশ্য—বি. বি. সি.-র হয়ে এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ ছবি তুলে নিয়ে যাওয়া।

ছবি তোলার ব্যাপারে আগ্রহ আমার যতখানি, অনাগ্রহও ঠিক ততখানি। ছবি তুলতে এলে লটবহর আসবে, দলে দলে লোক আসবে—এল্‌সার একাকীত্ব বিঘ্নিত হবে। যারা আসবে তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটাও কম নয়। অতোগুলো লোককে আমার এই গরীব-খানায় কিভাবে সেরে-সামলে রাখবো—সেটাই এক দুশ্চিন্তা।

এঁরা দুজনও আমাদের কম দুশ্চিন্তায় ফেলেননি। সমাধান অবশ্য যাহোক একটা বের করেছি। আমার সেই বিশেষ কায়দায় তৈরী গাড়িটায় থাকবেন একজন, আরেকজনের জন্য জর্জ-এর আনা লরিতে সাময়িক থাকার জায়গা হবে। কাঁটাঝোপে ঘেরা একটা তাঁবু তৈরী করতে হবে আমাদের তাঁবুর পাশে। সেটা হবে একাধারে ওঁদের কলঘর এবং যন্ত্রপাতি রাখার স্থান।

জর্জ-এর গাড়ির শব্দে এল্‌সা চলে এসেছিলো তাঁবুতে, রাত ঘন হতে আবার তাঁবু ছাড়লো। সে চলে যাবার একটু পরেই পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে

এলো এক অচেনা সিংহের ডাক।

পরদিন তেরোই সেপ্টেম্বর। জর্জ-এর হাঁকডাকে ভোর রাতে ঘুম ভাঙলো। গিয়ে ঢুকলাম তার তাঁবুতে। দেখি, রক্তে মাখামাখি হয়ে জর্জ-এর খাটের নীচে বসে আছে এল্‌সা, তার মাথা বুক কাঁধ এবং থাবা থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে পাশে বসলাম, ক্ষতস্থানগুলো পরীক্ষা করার জন্য ঝুঁকে পড়লাম—অর্ধনিমীলিত ক্লান্ত চোখে সে তাকালো আমার দিকে।

ওষুধ লাগাতে গিয়ে বিফলমনোরথ হতে হলো। মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে সে নদীর দিকে চলে গেলো। অগত্যা কৌশল খাটাতে বাধ্য হলাম। ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে চললাম নদীর দিকে। কিন্তু কোথায় কি! সব ভোঁ ভাঁ—এল্‌সার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার। ওঁরা আসবেন—ওঁদের আদর অভ্যর্থনা জানাতে আমাকেই যেতে হবে। সুতরাং জর্জ-এর ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে রওনা দিলাম। এ অবস্থায় কিভাবে যে ওর ছবি তোলা হবে—ভগবান জানেন! ওঁরা এসে পণ্ডশ্রমই করে যাবেন, ফল হয়তো কিছু হবে না।

বিমান-বন্দরে দেখা হতে স্বাগত-সম্ভাষণের পর সব কথা তাঁদের বললাম। শুনে ওঁরা যারপরনাই চিন্তিত হলেন। নিশ্চিন্ত হলাম—যাক তবুও শান্তি! ওঁরাও যে আমাদের মতো এল্‌সার কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছেন—এটাই যথেষ্ট।

দুপুর নাগাদ এসে পৌছলাম তাঁবুতে। এসে শুনি, জর্জ তার সাধ্যমতো খোঁজাখুঁজি করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছে। এল্‌সা বা তার বাচ্চাদের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

তক্ষুণি বেরোলাম। বেশি দূর যেতে হলো না। দেখি, পাহাড়ের পাদদেশে এক গভীর ঝোপের আড়ালে শুয়ে আছে এল্‌সা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়ে, চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত।

তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে এক গামলা জল এবং ট্যাবলেট মেশানো মাংস নিয়ে রওনা হলাম। ডেভিড আমার সঙ্গে গামলাটা বয়ে নিয়ে এলেন অনেক দূর অবধি। এল্‌সার কাছাকাছি পৌছে সেটা নিলাম তাঁর হাত থেকে, একাই এগোলাম।

আহা বেচারা! কি অসুস্থই না দেখাচ্ছে ওকে! মাথা তুলে যে জলটুকু খাবে—সে সামর্থ্যও ওর নেই। মুখের কাছে এগিয়ে ধরলাম জলের গামলা, আস্তে আস্তে পুরো জলটুকুই সে খেলো। ক্ষতস্থানের ওপর থেকে মাছি

তাড়িয়ে দিলাম। মাংস খেতে শুরু করলো সে।

কিছুক্ষণ বসে রইলাম। এল্‌সা আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। বুঝলাম, এসময় একলা থাকতে চাইছে ও, আমার সঙ্গ ওকে বিব্রত করছে, বিরক্ত করছে। সুতরাং ফিরে এলাম তাঁবুতে।

নাঃ, এল্‌সার বিষয়ে আপাততঃ আমাদের করণীয় আর কিছুই নেই। এখন যেটা মুখ্য কাজ—তা হলো বাচ্চাদের হদিশ খুঁজে বের করা।

বেরিয়ে পড়লাম। জর্জ আর নুরু গেলো এক দিকে, আমি আর ইব্রাহিম আরেক দিকে। যেতে যেতে নাম ধরে ডাকলাম—কারুর সাড়া পাওয়া গেলো না।

এক ঝোপের পাশ কাটাতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম—বাচ্চাদের তিনজনের একজন আমাদের সাড়া পেয়ে ছুটে জঙ্গলের গভীরে গিয়ে ঢুকলো।

আরো খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এলাম তাঁবুতে। জর্জরাও ফিরে এসেছে ততক্ষণে। ম্যাকেদ বললো, চিন্তার কোনো কারণ নেই—বাচ্চারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক একসময় মায়ের কাছে এসে হাজির হবে। সত্যি-সত্যিই তাই। প্রথমে কুঁই কুঁই করতে করতে এলো জেসপা, তার পেছন পেছন এলো গোপা। শুধু ছোটো এলো না।

নতুন করে একপ্রস্থ খাবার দিলাম। বাচ্চারা পরমানন্দে পেট পুরে খেলো। অতিথিদের নিয়ে নদীর পার বরাবর খানিকটা বেড়িয়ে আমরা ফিরে এলাম তাঁবুতে।

এসে দেখি ওরা তিনজনও হাজির। এল্‌সা বসে আছে গাড়ির ছাদে, গোপা-জেসপা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে উঠোনময়। ছোটো তখনো এসে পৌঁছয়নি।

খোলা উঠোনে আমরাও বসে গেলাম খাবার নিয়ে। এল্‌সা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলো না। বাচ্চারাও আমাদের দিকে মনোযোগ দিলো না। হঠাৎ কুঁই কুঁই করতে করতে তাঁবুর পেছন দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো ছোটো, এসেই দাদাদের সঙ্গে মেতে উঠলো খেলায়।

মাঝরাত নাগাদ সকলে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে। তারা চলে যাবার খানিকক্ষণ পরেই নদীর দিক থেকে ভেসে এলো সেই ক্রুদ্ধা সিংহীর কান-ফাটানো গর্জন।

এল্‌সার কথা ভেবে বাকী রাতটুকু বড় দুশ্চিন্তায় কাটালাম। পরদিন এলো না সে, তার পরদিনও নয়। তৃতীয় দিন সকালে উঠে দুজন টহলদার পুলিস এবং ম্যাকেদকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তার খোঁজে।

একেবারে সীমান্তের পাহাড়ে পৌঁছে দেখা পেলাম তার। চারজনই আছে। খুবই তৃষ্ণার্ত তারা, খুবই ক্ষুধার্ত। চারজনেরই চোখে ভয়-চকিত দৃষ্টি। আমাদের দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে তারা এগিয়ে এলো।

জলের পাত্র সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, খাবারও দিলাম। পরম পরিতৃপ্তি-সহকারে খেলো তারা। এল্‌সা এগিয়ে এসে সঙ্গের পুলিস দুজনকে শুঁকলো, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলো আমার কাছে।

দেখলাম, ঘা তার শুকিয়ে উঠেছে, কিন্তু পুরোপুরি আরোগ্য এখনো হয়নি। এখন উচিত ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বাকী চিকিৎসা যা কিছু করার—করা।

তা খুব একটা কসরত করতে হলো না। এল্‌সা নিজের থেকেই আমার পিছু পিছু এগোতে লাগলো। খানিক দূর গিয়ে নুরুকে পাঠিয়ে দিলাম তাঁবুর দিকে। বললাম, সে গিয়ে যেন আগে থেকেই ডেভিডদের সতর্ক করে দেয়—আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি।

চলে গেলো সে। ম্যাকেদও একটু আগে পুলিস দুজনকে নিয়ে চলে গেছে। এই বিজন বনে মানুষ বলতে আমি এখন একলা, সঙ্গে আমার চার সিংহের এক ক্ষুদ্র বাহিনী।

খানিক দূর গিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললাম। মন চঞ্চল হলো—নুরুকে ছেড়ে দিয়ে বড় বোকামি হয়েছে। কি করি এখন · কোন্ পথে যাই!

ভাবলাম, এক কাজ করি—নদীর পার বরাবর এগোই, একসময় না একসময় ঠিক পৌঁছে যাবো তাঁবুতে। তাই-ই চললাম। খানিকটা এগিয়ে একটা বাঁক। মোড় ঘুরেছি—হঠাৎ সামনে দেখি এক গণ্ডার। আমাকে দেখে নাক তুলে সে তেড়ে এলো। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম, ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠলাম নদী-মধ্যবর্তী এক ছোট্ট চরে। গণ্ডারটা ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সোজা ছুটলো। বাচ্চাদের আগলে এল্‌সা স্থির হয়ে বসে রইলো জঙ্গলের পাশে, তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো এক হতবিহ্বল ভাব।

ঠিক সেই মুহূর্তে জঙ্গলের আড়াল থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো নুরু। আমাদের বিপদের কথা অনুমান করে তাঁবুতে খবর দিয়েই সে ফিরে এসেছে। যেন স্বয়ং ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে। প্রাণ ভরে শ্বাস টানলাম। সকলে মিলে নিশ্চিন্তে রওনা দিলাম আবার।

তাঁবুতে ফিরে দেখি, কেউ নেই। শুধু ম্যাকেদ বসে আছে তাঁবু আগলে।

কি হলো! গেলো কোথায় সকলে! ম্যাকেদ বললো, এল্‌সাকে পাওয়া গেছে—এই খবর শুনে ডেভিড, জর্জ আর জেফ আমাকে সাহায্য করার জন্যে পাহাড়ের দিকে এগিয়েছে।

তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলাম তাকে। বললাম, এল্‌সাকে নিয়ে আমরা তাঁবুতে ফিরেছি—এই খবর দিয়ে সে যেন ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

একফাঁকে চটপট নদীতে চান সেরে শরীর ঠাণ্ডা করে এলো এল্‌সারা। খাবার দিলাম। সকলে গোল হয়ে বসে গেলো খাবার ঘিরে।

সেদিন আর ছবি-টবি তোলার অবকাশ হলো না। পরদিন সকালে আশপাশের জঙ্গলের কয়েকটা ছবি নেওয়া হলো। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে উঠোনে খাটিয়া বিছিয়ে যে যার শুয়ে পড়লাম। সর্বপ্রথম আমি, আমার পাশে ডেভিড, তাঁর পাশে জর্জ এবং জর্জ-এর পাশে ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত জেফ। গল্প করতে করতে কখন যেন চোখের পাতা বুজে এলো। ঘুম ভাঙলো এল্‌সার আদরের ঠ্যালায়। সর্বাঙ্গে জল নিয়ে সে এসে বসেছে আমার বিছানায়, জিভ দিয়ে হাত-পা চেটে দিচ্ছে।

আর দেরী করলেন না ডেভিড। নিঃশব্দে জর্জ-এর বিছানা ডিঙিয়ে তিনি গিয়ে বসলেন জেফ-এর খাটে। শুরু হলো তাঁর ছবি তোলা। এখানে আসার পর এই প্রথম মনের সুখে ছবি তুললেন তাঁরা।

সন্ধ্যে হতে জর্জ-এর তাঁবুতে এসে ঢুকলো এল্‌সা। পেছন পেছন এলো জেসপা। আমরা চারজন তখন বিয়ারের গেলাস হাতে জমিয়ে আড্ডা মারছি তাঁবুতে। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না তারা, কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। খানিকক্ষণ সকলের পায়ে পায়ে ঘোরাঘুরি করে কি ভেবে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো, নদী পার হয়ে চলে গেলো ওপারে।

পরদিন বিকেলে চা-জলখাবার খেয়ে বেরোলাম। সঙ্গে নিলাম গোটা পাঁচেক ক্যামেরা। পাহাড়ের ওপর তাদের দেখা মিললো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে তাদের অজস্র ছবি নিলাম। কেউ এতোটুকু বাধা দিলো না বা অন্য দিনের মতো ক্যামেরা দেখে রুখে দাঁড়ালো না। বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতার মতো এক একজন এক এক ভঙ্গিমায় দাঁড়ালো--ডেভিড আর জেফ ছবির পর ছবি তুলে চললেন।

সন্ধ্যে হতে ফিরে এলাম তাঁবুতে। জেফ জানতে চাইলেন, আজ আর এল্‌সা খাবারের লোভে আসবে কিনা। আমি বললাম, না, হয়তো আসবে না। কেননা···মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, পেছন থেকে আচমকা এল্‌সার ধাক্কায় ধরাশায়ী হলাম। স্বয়ং সে হাজির হয়ে প্রমাণ করে দিলো—সে এসেছে, আমাদের ছেড়ে বনে-পাহাড়ে টই টই করে বেড়াবার পাত্রী সে নয়।

খাবার এনে দিলাম, মাংসের সঙ্গে বেশ খানিকটা কড-লিভার তেল মিশিয়ে দিলাম। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলো এল্সা।

এমন সময় জেসপা এসে হাজির। খাবার দেখে সে আর লোভ সামলাতে পারলো না, ছুটে গিয়ে বসে পড়লো মায়ের পাশে। তাঁবু থেকে জেফ নিয়ে এলেন এক টেপরেকর্ডার। আগেকার তোলা অন্যান্য কয়েকটা জন্তু-জানোয়ারের ডাক-চিৎকারের রীলটা চালিয়ে দিলেন।

শব্দ-টব্দ শুনে জেসপা তো অবাক। খাওয়া ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে এলো সে যন্ত্রটার কাছে, অভিনিবেশসহকারে দেখলো, তারপর ছুটে মায়ের কাছে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে হাত পা নেড়ে কত কথাই না বললো। বুঝলাম, যন্ত্র-জানোয়ারটার সম্বন্ধে সে মাকে সময় থাকতে সাবধান করে দিচ্ছে।

পরের দিনও বিকেল নাগাদ ক্যামেরা নিয়ে গেলাম পাহাড়ে। এল্সাদের অনেকগুলো ছবি নিলাম। জেফ আমি আর জর্জ যখন তুলছি এল্সা-গোপা-টোটোর ছবি, ডেভিড হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন জেসপার পেছন পেছন। জেসপাকেই তাঁর ভালো লেগে গেছে সবচেয়ে বেশি। সকলকে ছেড়ে তাই তিনি পড়েছেন জেসপাকে নিয়ে।

এবার ফেরার পালা। ফিরতে হবে তাঁদের। ছবি-টবি যতটা যা নেওয়ার, নেওয়া হয়েছে। কাজও ওদিকে রয়েছে বিস্তর। সুতরাং যেতে হবে।

গাড়ি তৈরী। এল্সা শুয়ে আছে ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে। ডেভিড এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন, ধীরে ধীরে গায়ে হাত বোলালেন, তারপর উঠে বসলেন গাড়িতে।

দূর থেকে স্পষ্ট দেখলাম, তাঁর চোখের কোণে টলটল করছে একবিন্দু অশ্রু। এই ক'দিনেই এল্সাদের বড় ভালোবেসে ফেলেছিলেন ওরা।

॥ ১১ ॥

একুশে ডিসেম্বর বিকেলে পাহাড়ের নীচে জঙ্গলে দেখা পেলাম তাদের। এল্সা এগিয়ে এসে আমার আর জর্জ-এর গা চেটে দিলো। দেখাদেখি জেসপাও এসে আমার পা চাটতে লাগলো। পায়ের সব ধুলো-ময়লা তার জিভের ধারে পরিষ্কার করে খানিকক্ষণ পর যেই সে এগোলো টোটোর দিকে, এল্সা অমনি এক লাফে তার সামনে পড়ে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো এক পাশে।

তার মানে, জেসপাকে ও টোটোর ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না।

আশ্চর্য! টোটোর পায়ের রঙ কালো, নুরু-ম্যাকেদ-ইব্রাহিমেরও তাই। অথচ ওদের বেলায় তোমার ভাব-ভালোবাসা একেবারে উথলে ওঠে, আর টোটোকে দেখলেই মাথা গরম—এ আবার কেমনতর কায়দা!

সে-রাতভর তাঁবুর খুব কাছাকাছি এক অচেনা সিংহের ডাকাডাকিতে কানে তালা লাগার উপক্রম। ভোরের আলো ফুটতে তার হাঁকডাক থামলো। রোদ উঠতে আমি আর টোটো বেরিয়ে পড়লাম। তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ে। দেখি, পাহাড়ের গোড়ায় এসে সে জঙ্গলের দিকে মোড় ঘুরেছে।

টোটোকে সেখানে রেখে পাহাড় বেয়ে উঠলাম। বেশ খানিকটা এগিয়ে দেখা পেলাম এল্‌সার। বিরাট এক পাথরের ওপর সে বসে আছে। বাচ্চারা বসে আছে আশেপাশে। আমাকে দেখে চোখ তুলে তাকালো তারা, এগিয়ে আসার কোনো লক্ষণ দেখালো না। কিছুক্ষণ আশায় আশায় বসে থেকে অবশেষে ফেরার পথ ধরলাম।

অবাক কাণ্ড! এল্‌সা তো কখনো এমন করে না! আমাকে দেখেও যেন দেখলো না আজ—ব্যাপারটা কি!

সে-রাতে তাঁবুতে এলো না তারা, পরের দিনও নয়। বিকেল পড়তে টোটো এসে বললো, নদীতে তারা সদলবলে খেলতে নেমেছে। গেলাম সেদিকে। দেখি, বাচ্চারা সবাই জলে নেমে ছুটোপাটি করছে, এল্‌সা বসে আছে পারে। আমার সঙ্গে টোটোকে দেখে সে ঘুরে বসলো, আড়চোখে সারাটাক্ষণ তাকিয়ে রইলো টোটোর দিকে। চোখ দুটো তার জ্বলতে লাগলো ভাঁটার মতো।

কিন্তু বাপু হে, যা দুরন্ত ছেলেমেয়ে তোমার—কতক্ষণ রাখবে ওদের চোখে-চোখে! যে জেসপাকে নিয়ে তোমার এতো চিন্তা—ঐ দেখো, ফেরার পথে একফাঁকে তোমার চোখ এড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে সে খপ করে কামড়ে ধরেছে টোটোর হাতের বন্দুকের নলটা; হাত থেকে ছিনিয়ে না নেওয়া অবধি সে ছাড়বে না! এখন ঠ্যালা সামলাও!

তা সামলালো এল্‌সা, বেশ বুদ্ধির সঙ্গেই সামলালো। এগিয়ে গিয়ে জেসপাকে চেপে ধরলো সে থাবার নীচে, টোটোকে শ'খানেক গজ এগিয়ে যাবার সুযোগ দিলো। তারপর পরিস্থিতি নিরাপদ বিবেচনা করে জেসপাকে ছেড়ে ধীরে ধীরে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো।

তাঁবুতে ফিরে এক নতুন সমস্যা। ডাঁশগুলো যেন এতোক্ষণ হাঁ করে বসে ছিলো—এল্‌সারা ফিরতে তাদের একেবারে আষ্টে-পিষ্টে ছেঁকে ধরলো চারদিক থেকে। শুরু হয়ে গেলো মাটিতে গড়াগড়ির পালা।

ব্রাশ-ট্রাশ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। কার তোয়াজ আগে করবো—এল্‌সার না বাচ্চাদের! ভেবেচিন্তে দেখলাম, সব ব্যাপারে মেয়েদের অধিকার অগ্রগণ্য, সুতরাং এল্‌সাকে নিয়েই শুরু করলাম কাজ। যেই না ব্রাশ চালিয়েছি তার গায়ে, অমনি বাচ্চারা উঠে বসলো। প্রচণ্ড ক্রোধে মাটিতে লেজ আছড়াতে আছড়াতে আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হুঙ্কার দিতে লাগলো। যেন বলতে চায় তারা—স্বার্থপর পাষণ্ড কোথাকার! আমরা কি কেউ নই? বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি?

বেগতিক দেখে অবস্থা আয়ত্তে আনার দায়িত্ব এল্‌সাই নিজের হাতে তুলে নিলো। বাচ্চাদের মাটিতে শুইয়ে সাময়িক সান্ত্বনা হিসেবে সে তাদের গা চেটে দিতে লাগলো। এই ফাঁকে আমিও আমার কাজ করে যেতে লাগলাম।

পরের রাতে একবার নাম-কা-ওয়াস্তে দর্শন দিয়ে গেলো এল্‌সা। একলাই এলো। পরদিন সন্ধ্যে হতে সদলবলে আবার এসে হাজির হলো সে। বাচ্চারা উঠোন জুড়ে খেলে বেড়াতে লাগলো, সে এক পাশে বসে রইলো গম্ভীর হয়ে। চোখের দৃষ্টিতে তার এক নীরব ঔদাসীন্য, মুখের রেখায় যেন জগৎ-সংসার সম্পর্কে এক প্রচণ্ড অনাসক্তির ছাপ। কাছে ঘেঁষতে সাহসে কুলোলো না। দূর থেকে তাদের রোজকার বরাদ্দ খাবার ছুঁড়ে দিয়ে আমি গিয়ে ঢুকলাম তাঁবুতে, খাবার টানতে টানতে ওরা এগোলো নদীর দিকে।

পরদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে তাঁবুতে ফিরে দেখি, দুমড়ে-মুচড়ে জেসপা আমার একমাত্র শোলার টুপিটার একেবারে বারোটা বাজিয়ে রেখেছে। রোদে বেরোতে গেলে টুপি ছাড়া চলে না। জেসপার দৌলতে সে-সুবিধেটুকুও গেলো।

এদিকে তলে তলে গোপা যে হিংসুটের শিরোমণি হয়ে উঠেছে—সে খবর কি ছাই আমরা জানতাম! শুধু আমাদের নয়, ভাই-বোনকেও সে হিংসে করতো। জেসপাকে মায়ের সঙ্গে খেলা করতে দেখলে সে আর স্থির থাকতে পারতো না। দুজনকে ঠেলে দু পাশে সরিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে জেসপার দিকে তাকিয়ে গজরাতো।

জর্জ চলে যাবার পর থেকে আমি সেই বিশেষ কায়দায় গাড়িটায় শুতে আরম্ভ করলাম। কারণ আর কিছুই নয়—ট্রেলারে রাখা এল্‌সাদের খাবার চোখে চোখে রাখা। সারারাত ধরে উৎপাত তো কম পোয়াতে হয় না—কত সুযোগ-সন্ধানীই যে আসে মাংসের লোভে!

ঘুমের ব্যাঘাত হতো। হয়তো সারারাতে কোনো কোনো দিন এক ঘণ্টাও সুস্থির হয়ে ঘুমোতে পারতাম না, তবু যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতাম গাড়ির

জানলা দিয়ে, তার তুলনা হয় না।

হায়না আসতো, শেয়াল আসতো—অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলতো আগুনের ভাঁটার মতো। ট্রেলারের চারপাশে নিঃশব্দে চক্কর লাগাতো তারা, মাঝে-মধ্যে ঘাড় তুলে আশপাশটা দেখে নিতো। দেখার কারণ আর কিছু নয়—ভয়। না, আমাদের মতো দু'-পেয়ে জীবকে তাদের ভয় নেই, ভয় সেই কালো কুচকুচে রঙের গন্ধ-গোকুলটাকে। রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে কখনো না কখনো সে আসবে। এলেই শেয়াল-হায়নারা পালাতে আর পথ পাবে না।

তা এমন এক বীর হায়না-শেয়াল তাড়ুয়াকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু না দেওয়াটা যথার্থই অন্যায়। দিতাম—জানলার ফোকর গলিয়ে দু-এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিতাম। খেয়েদেয়ে সে চলে যেতো।

সেটা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ। ঘুম থেকে উঠে বসেছি উঠোনে—ছুটতে ছুটতে এলো এক আদিবাসী। কি ব্যাপার—না, আমাদের সাহায্য তার দরকার। একজোড়া সিংহের উপদ্রবে সে ভারী বিব্রত হয়ে পড়েছে। আজই সকালে তারা এক চিতল হরিণ মেরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে তার বাড়ির কাছে, কড়মড় কড়মড় করে চিবিয়েছে তার হাড়-মাংস, তারপর ভোরের আলো ফুটতে কয়েকটা ডাক-চিৎকার ছেড়ে ঢুকেছে গিয়ে জঙ্গলে। দুজন টহলদারী পুলিসকে পাঠিয়ে দিলাম তার সঙ্গে। খোঁজখবর করে এসে তারা বললো—সিংহ দুটো জঙ্গল ভেঙে উঠেছে গিয়ে দশ মাইল দূরের পাহাড়ে, আর ফেরেনি।

সে যাই হোক একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তবু ভালো, আদিবাসীরা এখন আর কারণে অকারণে এল্‌সাকে দোষ দেয় না। এল্‌সা ছাড়াও এ জঙ্গলে যে অন্য সিংহ আছে—একথা তারা এতোদিনে বুঝতে পেরেছে।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে আমাকে নাইরোবিতে যেতে হলো। বিলি কলিন্স-এর সঙ্গে 'বর্ণ ফ্রি'র বিষয়ে কিছু নতুন আলাপ-আলোচনার দরকার। ইচ্ছে, কাজ শেষ করে ফেরার সময় সে-কলিন্স ফিরে আসবে তাঁবুতে।

তা ইচ্ছাপূরণ ঠাকুরের অসীম দয়া আমার ওপর। একবার বলতেই কলিন্স রাজী হয়ে গেলেন। সকালে উঠে দুর্গা দুর্গা বলে রওনা দিলাম।

যেতে যেতে কথাবার্তার ফাঁকে বলবো না বলবো না করে বলেই ফেললাম কথাটা, 'এল্‌সার গতবারের ব্যবহারে নিশ্চয়ই এখনো চটে আছেন আপনি, তাই না?' আমার আকস্মিক এই প্রশ্নে প্রথমটায় থতমত খেয়ে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর হঠাৎ গলা ফাটিয়ে

হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'পাগল পেয়েছেন নাকি আমাকে ? চটে থাকলে আবার এ-পথে আসি ?'

তা যতই যা বলুন তিনি, এল্‌সাকে এবার চোখে চোখে রাখতে হবে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভালো দেখায় না।

কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। হলোও তাই। তাঁবুতে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। গাড়ি থেকে নেমেই চোখাচোখি হলো এল্‌সার সঙ্গে। বাচ্চাদের নিয়ে উঠোনে শুয়ে আছে সে। দোষ তাকে দেওয়া যায় না, সে তার সময়মতোই এসেছে। দোষ আমাদের, আমরাই পৌঁছেছি দেরীতে।

কলিন্সকে দেখে উঠলো সে। গুটিগুটি এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে মাথা ঘষে পুরনো বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে নিলো। তারপর ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লো বাচ্চাদের পাশে।

রাত নটা অবধি উঠোনে বসে কাটালাম আমরা। উঠোনে বসেই রাতের খাবার খেলাম। এল্‌সা নিমীলিত চোখে কয়েকবার তাকালো আমাদের দিকে, তারপর পরম আলস্যে চোখ বুজলো।

জর্জ বললো, গত সাতই আর আটই অক্টোবর রাতভর এক অচেনা সিংহ তাঁবুর চারপাশে ঘুরঘুর করে গেছে। খাবারের লোভে সে আসেনি, এসেছিল এল্‌সার খোঁজে।

তা সে-রাতেও সে এলো। আমরা আলো নিভিয়ে বিছানায় শুতে না শুতে শুরু হলো তার হাঁকডাক। বাচ্চাদের নিয়ে এল্‌সা রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে।

কদিন ধরে রোদের তেজ বাড়লো। দারুণ দহন বেলা—নীরস রুক্ষতা চারদিকে, গাছের ছায়ায় ঘেরা আমার অমন যে শান্ত-শীতল আশ্রয় সেখানেও শান্তির চিহ্নমাত্র নেই। উঃ, অসহ্য !

অসহ্য যে কেবল আমাদের, তা নয়। বনের তাবৎ পশু-পাখী, জীব-জন্তু—সকলেই যেন অস্বস্তিতে ছটফট করছে। বেবুনগুলোর দিনভর কিচিমিচির ডাকের বিরাম নেই, হরিণের দল পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়। সর্বোপরি আছে পাখীর দল। ডানা ঝাপটিয়ে করুণ সুরে ডেকে তারা যেন রীতিমতো এক নাটকই জমিয়ে বসে।

বিকেলে চা-টা খেয়ে বেরোলাম এল্‌সার খোঁজে। সেই যে কাল রাতে বেরিয়ে গেছে সে, আর এ-মুখো হয়নি। সুতরাং চললাম।'

পাহাড়ে গিয়ে দেখা পেলাম না তার। বাচ্চারাও বেপাত্তা। আশেপাশে খানিকক্ষণ নিষ্ফল ঘোরাঘুরি করে ফেরার পথ ধরলাম। তাঁবুর আধ মাইল-

টাক আগের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ এল্‌সারা আমাদের সঙ্গী হলো।
কলিন্স-এর প্রতি এল্‌সার এবারকার ব্যবহার চোখে পড়ার মতো নয়। আমাদের সঙ্গে সচরাচর সে যা যা করে, তাঁর সঙ্গেও তেমনিই করলো। কিন্তু খেল দেখালো বটে জেসপা। আমাদের অতিথিটির দুধ-সাদা রঙের মোজা আর জুতোজোড়াকে হঠাৎ যেন তার বড্ড বেশি ভাল লেগে গেলো। অমন সচল একজোড়া কিমাকার বস্তু—কতক্ষণই বা সে আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারে! কতবার সে যে কলিন্স-এর পায়ের দিকে তাকিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলো—তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকবারই মা তাকে নিরাশ করলো। ঐ ভঙ্গিতে দেখামাত্র সে এগিয়ে এসে ধমকালো তাকে, চড়-চাপড় মারলো—একটি বারও কায়দা করে অন্তিম লাফটি সে দিয়ে উঠতে পারলো না।
পরদিন ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। দেখি, মশারীর মধ্যে মাথা গলিয়ে এল্‌সা পরমানন্দে আমার হাত চাটছে। এল্‌সা…এখন…এখানে …কলিন্সকে আবার আগের মতো ভালোবাসা দেখিয়ে আসোনি তো! চেঁচিয়ে ডাকলাম তাঁকে। তিনি সাড়া দিলেন। বললেন, একটু আগে এল্‌সা তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেছে।
টোটো ঢুকলো চায়ের ট্রে নিয়ে, খোলা দরজা-পথে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো এল্‌সা। বাচ্চাদের নিয়ে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে।
চায়ের কাপ পড়ে রইলো। তাড়াতাড়ি পোশাক পালটে গেলাম কলিন্স এর তাঁবুতে। দেখি, নিরাপদেই আছেন তিনি। জর্জ এবার মস্ত এক চাল চেলেছে। তারের জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে তাঁর বিছানার চারদিক। জালের আবরণ ডিঙিয়ে এবার তাই এল্‌সার পক্ষে তাঁর ধারে-কাছেও পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। খানিকক্ষণ জালের গায়ে নিষ্ফল আঁচড় কেটে সে গিয়ে ঢুকেছে আমার তাঁবুতে, মশারী সরিয়ে আমারই হাত চাটতে শুরু করেছে।
মনে মনে শত সাবাশ দিলাম জর্জকে। ভেবেচিন্তে মতলব খাটিয়েছে সে বটে একখানা! এল্‌সা এবার আচ্ছা জব্দ।
অথচ দেখুন, এই কদিন আগে জেফ আর ডেভিড এসে রয়ে গেলেন তাঁবুতে, এল্‌সা বড়জোর তাঁদের হাত-পা চেটেছিলো, বিছানায় উঠে আদিখ্যেতা দেখাবার চেষ্টাটুকুও করলো না। কি যে হয় ওর কলিন্সকে দেখলে—ভালোবাসা যেন একেবারে উথলে ওঠে। মুখে যতই উনি 'না না' করুন, মনে মনে অখুশী না হয়ে পারেন না। হওয়াটাই স্বাভাবিক—রোজ রোজ তাঁর ঘুমের বারোটা বাজাবে এল্‌সা, আর তিনি খুশীতে একেবারে গদগদ হয়ে থাকবেন—এমন তো হতে পারে না! একদিন আধদিন হলে নয় কথা ছিলো, কিন্তু রোজ রোজ—উঁহু, সহ্য হয় না। আমার নিজেরই

খারাপ লাগে, তা উনি তো বাইরের লোক!

বিকেলে গেছি পাহাড়ে, এল্‌সাদের সঙ্গে দেখা। চারজনই বসে আছে সেই বিরাট পাথরটার ওপর। আমাদের দেখে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল এল্‌সা আর জেসপা, শুরু হলো আদর-আপ্যায়ন। আদরও কি আদর—আমাকে জড়িয়ে ধরে, কলিন্স-এর গালে গাল ঘষে, ভর্জ এর হাত চেটে, ম্যাকেদ-এর পায়ে মুখ ঘষে সুখের যেন ফোয়ারা ছোটাল তারা। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস দেখলাম—এতো ভাব ভালবাসার মধ্যেও আসলটি এল্‌সার ঠিক আছে, জেসপাকে সে টোটোর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দিচ্ছে না। দেখো কাণ্ড! টোটোর গায়ের রং কালো বলে সে কি জেসপার আদরটুকুও পাবার যোগ্য নয়!

গোপা-ছোটো দূরে বসে বসে আগাগোড়া আদর পর্বটুকু দেখলো। তারপর আমরা যেই এল্‌সাদের ছেড়ে এগিয়ে গেছি শ'খানেক গজ—অমনি ছুটতে ছুটতে নেমে এলো তারা, মায়ের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো।

এদিক-ওদিক দু-দশ কদম বেড়ালাম, কয়েকটা গাছ চিনিয়ে দিলাম কলিন্সকে, পাখী চেনালাম। তারপর ফেরার পথ ধরলাম। নদী পেরিয়ে যাবার সময় দেখি, এল্‌সারা জলে নেমে পড়েছে—জল ছিটিয়ে জল সরিয়ে জল নাচিয়ে শুরু করে দিয়েছে খেলা।

ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। খেলা শেষ করে একে একে জল ছেড়ে উঠলো তারা। এল্‌সা-জেসপা আমাদের সঙ্গে এগোলো, গোপা ছোটো রইলো একটু তফাতে। বাকী পথটুকু জেসপার দুষ্টুমি দেখতে দেখতে এলাম। কলিন্স আজ ইচ্ছে করেই মোজা পরেননি, শুধু জুতো পরে এসেছেন। কিন্তু তাতেও স্বস্তি নেই জেসপার। বারবার সে তাঁর পায়ের সামনে বসে পড়ছে। যেন বলতে চায়—কেন বাপু, আজ সেই সাদা বস্তুটা পায়ে চড়িয়ে এলে না কেন!

তেরোই অক্টোবর চলে যাবেন কলিন্স। বারো তারিখ সারাটা দিন এল্‌সাদের আর দেখা নেই। কত খোঁজাখুঁজি করলাম, কত ডাকলাম—সব নিরর্থক। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তারা। অগত্যা কি আর করি, এল্‌সাদের বদলে তাঁকে একপাল চিতল হরিণ আর কয়েকটা গিনিপিগ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম তাঁবুতে।

তখন সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে, ধীরে ধীরে জেগে উঠছে বনভূমি—উঠোনে বসে চায়ের কাপ হাতে চুপচাপ তাকিয়ে আছি জঙ্গলের দিকে, হঠাৎ…হঠাৎ একটা খস্‌খস্ শব্দ, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কারা যেন হেঁটে আসছে কারা আসছে- কারা!

ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলাম তাদের—মহারানী এসেছেন, সঙ্গে রয়েছে তার সন্তানবাহিনী। এসে সে আর দাঁড়ালো না। কত যেন রাজ্য জয় করে এলো, এমন এক ভঙ্গি করে উঠলো গিয়ে গাড়ির ছাদে। বাচ্চারা শুয়ে পড়লো মাটিতে।

কলিন্স তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। গর-র-র গর-র-র শব্দ করতে করতে সুখের আবেশে চোখ বুজলো এল্‌সা।

পরদিন ভোরবেলায় উঠে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য কলিন্সকে টানার জলপ্রপাত দেখিয়ে ওদিককার এক রাস্তা ধরে নিয়ে যাবো ইসিওলোয়, সেখান থেকে যাবেন উনি নাইরোবি এবং নাইরোবি থেকে হাওয়াই জাহাজে লণ্ডন। যাওয়ার পথে এক বিরাট বাওবাব গাছ নজরে পড়লো। চারপাশে ঝুড়ি-টুড়ি নামিয়ে যা একখানা চেহারা হয়েছে গাছের—দেখলে মনে হয়, যেন জটাজূট এক সন্ন্যাসী অনন্তকাল ধরে ধ্যানে বসেছেন। জর্জ হিসেব করে বললো, গাছটার বয়স কম করেও আটশো বছর। দু পাশের ডালপালা এগিয়ে এসে সৃষ্টি করেছে দুটো গুহা! আট-দশজনের এক দল অবলীলাক্রমে এক একটা গুহায় লুকিয়ে থাকতে পারে। থাকেও তাই। চারপাশ থেকে তাড়া খেয়ে আদিবাসী অনুপ্রবেশকারীর দল এখানেই এসে আস্তানা গাড়ে। গুহার জায়গায় জায়গায় তাদের বসবাসের চিহ্ন। ডালে পোঁতা পেরেক কিংবা মাটিতে ছড়ানো ছাই—দেখেই বোঝা যায় ক'দিনের জন্য এখানে তারা পেতেছিলো তাদের অস্থায়ী সংসার। এ-গাছটা বলে নয়, এ-অঞ্চলের প্রায় সবকটা গাছেই এরকম গুহা। এইসব গুহার পাশ দিয়ে যাবার সময় এল্‌সা বরাবর যথেষ্ট সতর্কতা দেখাতো।

তেমন কিছু জন্তু-জানোয়ার যে দেখতে পাবো, এমন আশা নিয়ে বেরোইনি এখন খরার দিন, বন-জঙ্গলের আস্তানা ছেড়ে সকলে গিয়ে জড় হয়েছে নদীর পাশে। তবে সকলেই যে গেছে, এমন নয়। কেউ কেউ শত দুঃখ-কষ্টেও নিজের ডেরা ছেড়ে এক পা নড়েনি। এই তো···সামনে দিয়ে ছুটে গেলো একদল জেব্রা, কটা জিরাফের উঁচু মাথাও দেখা যাচ্ছে ঐ দিকে, আর ঐ তো—ঐ তো ছুটে যাচ্ছে চারটে কস্তুরী-মৃগ, চিতল হরিণও দু-চারটে মাঝে-মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এরা জঙ্গলের বনেদী পরিবার—জঙ্গল ছেড়ে এক পাও নড়ে না এরা।

দেখতে দেখতে একসময় কখন রাস্তা ফুরিয়ে গেলো। টানার জলপ্রপাতের গুমগুম শব্দ কানে এলো। সেই পুরনো দৃশ্য। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলের রাশি, তুষারকণার মতো কুচো কুচো জল ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে, মাটি স্পর্শ করে জলরাশি আর দাঁড়াচ্ছে না—কলকল নিনাদে

এগিয়ে চলেছে বন-পাহাড় ভেদ করে।

আগের বারের মতো এবারও পাশের জলাশয়ে জলকেলিতে মেতেছে আটটা জলহস্তী। তাদের সিক্ত-মসৃণ শরীর রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে।

দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে পড়েছি—হঠাৎ চমক ভাঙলো। বনের দিক থেকে একসঙ্গে যেন আট-দশটা কুকুর ডাকলো। কুকুর…এই বনে · তবে কি ধারে-কাছেই কোথাও রয়েছে আদিবাসীর দল!

কোমরের খাপ থেকে পিস্তল বের করে জর্জ ততক্ষণে ছুটেছে ডাক লক্ষ্য করে, পাথর টপকে চলে গেছে নদীর বিপরীত পারের জঙ্গলে। একটু পরে দেখলাম এক আশ্চর্য দৃশ্য। এক চিতল হরিণ ঝপাং করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জলে, তার পিঠ আঁকড়ে তিনটে কুকুরও সেই সঙ্গে জলে পড়লো। শিকারী কুকুর—প্রভুর নির্দেশে একবার ধরেছে তারা শিকার। টুঁটি ছিঁড়ে শিকারের রক্ত না খেয়ে ছাড়বে না।

গুড়ুম গুড়ুম·· পরপর দুটো গুলি ছুঁড়লো জর্জ। একটা কুকুর ছিটকে পড়লো জলে। বাকী দুটো সঙ্গীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে হত-বিহ্বল হয়ে শিকার ছেড়ে দিলো, সাঁতরে উঠলো গিয়ে পারে।

হঠাৎ ডান দিকের জঙ্গলে শুকনো পাতার ওপর একটানা একটা খসখস শব্দ। চমকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, এক আদিবাসী প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে এদিকে। আমি আর কলিন্স যুগপৎ চিৎকার করে উঠলাম। সে আমাদের চিৎকার শুনে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো, তারপর ঝপাং করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জলে। দেখো কাণ্ড! ঝাঁপ তো দিলি—নদীতে কুমীর আছে, জলহস্তী আছে, আছে ঘূর্ণি—সেগুলো একটু বিবেচনা করে দ্যাখ! তা অতশত ভাবার সময় তার নেই, আমাদের দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে—প্রাণের দায়ে এখন যেন-তেন-প্রকারেণ পালাতে পারলেই বাঁচে।

ভয় দেখিয়ে তাকে পারে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জর্জ কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করলো। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হলো না। উজানের স্রোতে শরীর ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্তে ভাসতে ভাসতে একসময় চোখের আড়াল হয়ে গেলো।

ততক্ষণে আর এক দিক থেকে একপাল কুকুর একটা ছোট হরিণকে তাড়া করতে করতে নিয়ে আসছে এদিকে—জর্জ পিস্তল বাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হরিণটা বেদম ছুটতে ছুটতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে, পেছন পেছন লাফ দিয়ে পড়লো পাঁচটা কুকুর। জর্জ-এর টিপ অব্যর্থ। পাঁচটার মধ্যে তিনটে মরলো তার গুলিতে, বাকী দুটো ত্রস্তে পালালো। হরিণটা প্রাণপণে জল কেটে এগোতে এগোতে একসময় পড়লো ঘূর্ণির কবলে। চরকির মতো

বনবন করে কয়েকটা পাক খেয়ে চোখের নিমেষে সে তলিয়ে গেলো।
চোখের সামনে পাঁচ পাঁচটা মৃত্যু দৃশ্য দেখলাম—চারটে কুকুর আর একটা হরিণ। কুকুর চারটের মৃতদেহ জলের টানে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললো, তাদের রক্তে-রাঙা জল নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেলো—কলকলনিনাদিনী স্রোতস্বিনী ভ্রুক্ষেপমাত্র করলো না। সে আবার আগের মতোই বন-পাহাড় ভেদ করে বয়ে চললো···চললো···চললো···সাগর তাকে ডাক দিয়েছে—এসব তুচ্ছ ঘটনায় নজর দেবার সময় কোথায় তার!
কেনিয়ার জঙ্গলে এ-ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে। কটা খবরই বা কানে আসে আমাদের। বন্যজন্তুদের ওপর আদিবাসীদের এই বিরাগ—এ সহজে বন্ধ হবার নয়।
তবে হ্যাঁ, চেষ্টা চলছে। শিক্ষিত আফ্রিকায় এক নতুন জোয়ার এসেছে। যা কিছু প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক—সব ভেঙে চুরমার করে নতুন ঢঙে নতুন আঙ্গিকে জীবনকে গড়ে তোলার এক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আফ্রিকার বিরাট অর্থনৈতিক সম্পদ অরণ্য এবং তার জীবকুল নিয়েও তাঁদের মনে চিন্তা কিছু কম নেই। অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের তত্ত্বাবধানে আদিবাসীদের এই দৌরাত্ম্য হয়তো কমবে—বনের অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় জীবজন্তুর দল সুখে-স্বস্তিতে আবার আগের মতো স্বাধীন-নির্ভয় জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

॥ ১২ ॥

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জর্জ ফিরে এলো তাঁবুতে। কয়েকটা দিন বেশ শান্তিতে কাটলো। তারপরই যথাপূর্বং। পাহাড়ের দিক থেকে একদিন মাঝরাত নাগাদ ভেসে এলো এল্‌সার প্রতিপক্ষ সেই সিংহ-দম্পতির ঘন ঘন ডাক। চঞ্চল হয়ে উঠলো এল্‌সা। বাচ্চাদের নিয়ে রওনা দিলো সে জঙ্গলের দিকে।
পরদিন সকালে জর্জ বেরিয়েছে প্রাতর্ভ্রমণে, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে পাহাড়ের নীচে—হঠাৎ তার চমক ভাঙলো। দেখে, সুবিস্তৃত আকাশের পটভূমিকায় পাহাড়ের মাথায় এক সিংহী দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের মতো। জর্জ হাততালি দিতে সে চমকে উঠলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে।
সেদিন সন্ধ্যায় একচমক এসে দেখা দিয়ে গেলো এল্‌সা। খাবার খেয়ে আর দাঁড়ালো না। কোথায় গেলো, কেন গেলো—কে জানে। তবে মুখচোখ

দেখে বুঝলাম, সে বড় ঘাবড়ে গেছে। নিজের এবং বাচ্চাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

তা সেই যে গেলো সে, পাক্কা দুটি দিন আর এ-মুখো হবার নাম করলো না। চিন্তা আমাদেরও কিছু কম নয়। পালা করে আমি আর জর্জ বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালাম। জর্জ তাদের পায়ের ছাপ দেখতে পেলো, কিন্তু দেখা পেলো না কারুর।

তৃতীয় দিনের দিন সকালে উঠে দেখি—তাঁবুর চারপাশে এল্‌সাদের আনকোরা একপ্রস্থ পায়ের ছাপ। তার মানে, কাল রাতে কখন যেন নিঃশব্দে এসেছিলো তারা, নিঃশব্দেই আবার ফিরে চলে গেছে। আশ্চর্য!

সেদিন সন্ধ্যে গড়াতে এসে হাজির সকলে। এল্‌সার চোখে-মুখে এখনো দুশ্চিন্তার ছাপ, দৃষ্টিতে চকিত-বিহ্বলতা। বাচ্চাদের দিকে তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। আমাদের দিকে তো নয়ই। বেচারা গোপা—কতবার কতরকম ভাবে সে চেষ্টা করলো মায়ের একটু আদর পেতে, মা তাকে পাত্তাই দিলো না। খানিকক্ষণ জেসপার সঙ্গে চাপা গলায় কি যেন আলোচনা করলো সে, তারপর উঠে বসলো গাড়ির ছাদে।

রাত সাড়ে আটটা বাজতে শুরু হলো দুই সিংহের হাঁকডাক। এক লাফে এল্‌সা নেমে পড়লো গাড়ির ছাদ থেকে, নেমে জেসপাকে নিয়ে ছুটলো পাহাড়ের দিকে। গোপা আর ছোটো খাবার আগলে বসে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর নদীর দিক থেকে এল্‌সার হাঁক-ডাক শুনে খাবার ফেলে তারাও এগোলো।

অভুক্ত খাবারটুকু টানতে টানতে নিয়ে এলাম বেড়ার আড়ালে। রাত বাড়তে দুটি সিংহ লোভে লোভে এলো। তাঁবুর চারপাশ ঘুরে কয়েকটা হুঙ্কার ছেড়ে তারা চলে গেলো পাহাড়ের দিকে।

পরদিন বিকেলে স্বচক্ষে দর্শন পেলাম এল্‌সার প্রতিপক্ষ সিংহীটির। পাহাড়ের চূড়ায় বসে তিনি নিসর্গশোভা অবলোকন করছিলেন। দুরবীনে চোখ রেখে তার প্রতিটি ভাবভঙ্গি আমি চোখের ক্যামেরায় ধরে রাখলাম। গায়ের রঙ তার কালচে, দেখতেও এল্‌সার তুলনায় যথেষ্ট কুৎসিত। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। দুরবীন নামিয়ে আস্তে আস্তে পেছোতে পেছোতে আমরা তার দৃষ্টির বাইরে এলাম, তারপর সেখান থেকে একছুটে তাঁবুতে।

ছোটার কারণ অবশ্য ভিন্ন। ততক্ষণে ওদিকের জঙ্গলের আড়ালে শুরু হয়ে গেছে একপাল হাতির তাণ্ডব। এখানে দাঁড়িয়ে সিংহী দেখার অবকাশ আর নেই। মানে মানে সব দিক বজায় রেখে তাঁবুতে ফিরে যাওয়াই

বিবেচকের কাজ।

সকালে উঠে সেই সিংহীর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোলাম। নদীর পার ঘুরে সে চলে গেছে গভীর জঙ্গলের দিকে। যতদূর মনে হয়, ওদিকেই ওর আস্তানা। হয়তো এদিকে এসেছিলো সে এল্‌সার ওপর বীরত্ব ফলাতে।

তা তার মতলব যে এল্‌সা বোঝেনি, এমন নয়। বাচ্চাদের সে তাই শত-সাবধানে আগলে রেখেছে, এ ক'দিন তাঁবু-পাহাড়ের সীমানা থেকে দূরে দূরেই কাটিয়েছে। অবশেষে অবস্থা খানিকটা স্বাভাবিক হতে সে ফিরে এসেছে তাঁবুতে।

সেদিন বিকেল থেকেই আকাশের 'সাজো সাজো' চেহারা। দলকে দল মেঘ ছুটে এলো চারদিক থেকে, বিদ্যুৎ চমকালো, বাতাস ছুটলো, অবশেষে রাত একটু বাড়তে নামলো বৃষ্টি।

প্রথমে টিপটিপ, তারপর টপটপ, তারপর একেবারে ঝরঝর। ঝরছে তো ঝরছেই—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই—কত জলই যে আছে মেঘে! ঘণ্টা দুয়েক পর দেখি, বৃষ্টি-ধোওয়া জলের স্রোত বয়ে চলেছে আমার তাঁবুর মেঝে বরাবর, জলের তোড়ে মেঝেয় রাখা দু-একটা টুকিটাকি জিনিস ভাসতে ভাসতে এক প্রান্ত থেকে এসে ঠেকেছে আরেক প্রান্তে।

শুধু এটুকু হলেও নয় হতো। কিন্তু আসল বিপদ দেখা গেলো আরো কিছুক্ষণ পর। তাঁবুর মাঝখানের খুঁটিটা জলের প্রচণ্ড তোড়ে একসময় ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে। ব্যস্, ঘুমের দফারফা! বাকী রাতটুকু কোনক্রমে লাঠি-ঠেঙা দিয়ে চাল উঁচু করে খাটের ওপর বসেই কাটিয়ে দিলাম। কার দায় পড়েছে বৃষ্টিতে ভিজে এই রাত্তিরে আবার নতুন করে খুঁটি গাড়তে!

ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটলো। বৃষ্টিও কমতে কমতে থেমে গেলো একসময়। টোটোর হাত থেকে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিলাম—আ, শান্তি! পৃথিবী রসাতলে যাক, ক্ষতি নেই—ভোরবেলায় এক কাপ চা আমার চাই-ই চাই।

চা খেয়ে বাইরে এসে দেখি, মুরু-ম্যাকেদদেরও একই অবস্থা। অমন দমকা বাতাস আর বৃষ্টির তোড়ে এদিকের তাঁবু কটাও অক্ষত থাকেনি। কোনো-টার খুঁটি ভেঙেছে, কোনোটার দড়ি পেরেক-সমেত উপড়ে গেছে—সব মিলিয়ে সে-এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড!

জর্জ-এর তাঁবুও বাতাস-বৃষ্টির কবল থেকে রেহাই পায়নি। একদিকের সবকটা পেরেকই খুলে গেছে, ছাট এসে খাট-বিছানা ভিজে জবজবে।

ফিরে আসছি, থমকে দাঁড়ালাম। তাঁবুর আড়াল থেকে এল্সা যেন ডাকলো। ঢুকে দেখি, ঠিক তাই। টেবিলের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে এল্সা, জেসপা-গোপাও রয়েছে একপাশে। নেই শুধু ছোটো। বাইবে বেড়ার আড়ালে বসে সারাটা রাত সে ভিজেই কাটিয়েছে!

ভেজা জামা-কাপড় বাক্স-প্যাঁটরা—সব এনে তুললাম গাড়িতে। আনার আগে জেসপাকে দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস একবার পরীক্ষা করিয়ে নিতে হলো। খানিকক্ষণ শোঁকাশুঁকি করে সে রায় দিলে তবেই নিয়ে আসতে পারলাম এক্কেকটা জিনিস।

চারদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হলো। চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। দশ হাত দূরের মানুষ অবধি নজরে আসে না। নদীর জল দু'কূল ছাপিয়ে ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। আমাদের উঠোনটাও রেহাই পেলো না। মাছের মতে ভেসে বেড়াতে লাগলো চেয়াব-টেবিল। উপড়ে-যাওয়া কটা গাছও ভাসতে ভাসতে চলে এলো উঠোনে।

কেনিয়ার পাহাড়ে বৃষ্টির এমনই বেওয়াজ। সমতলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যখন সাকুল্যে পনেরো ইঞ্চি, পাহাড়ে বৃষ্টির মাপ তখন কম করে একশো ইঞ্চি—একেবারে আকাশ-পাতাল ফারাক।

তা হোক বৃষ্টি—যে ক'দিন ইচ্ছে চলুক, ক্ষতি নেই। এল্সারা তাঁবু ছেড়ে এক পা বেরোচ্ছে না, তাদেব দু হপ্তার মতো খাবারের যোগানও আমাদের কাছে মজুত—সুতরাং চিন্তা কিসের!

এদিকে দেখতে দেখতে বন-পাহাড়েব চেহারা পালটে গেলো। কদিন আগের দেখা শুকনো খটখটে জমি ঘাসে ঘাসে ছেয়ে গেলো। এখানে-সেখানে গজিয়ে উঠলো রাশি রাশি আগাছা—যেদিকে চোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ—সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝি না—ভারী মনোরম হয়ে উঠলো প্রকৃতির রূপ।

পাখ-পাখালিরও বুঝি এতোদিনে হুঁশ হলো। বৃষ্টি হয়েছে, চারপাশ সবুজ—তাদের আনন্দ আর ধরে না। বাবুই পাখীর দল তো তৈরী হয়েই ছিলো। বৃষ্টি ধরতে দলকে দল এসে শুরু করে দিলো বাসা-বোনা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কত কথা তাদের—কিচির-মিচির, কিচির-মিচির। অষ্টপ্রহর সমানে চলছে বকবকানি, কানে একেবারে তালা লাগার উপক্রম।

এখান থেকে একটি পাতা, ওখান থেকে একগুচ্ছ ঘাস—সবকিছু নিয়েই তাদের নিপুণ কারিগরি। তিন দিনের মধ্যে বাসা বোনার কাজ শেষ। এবার ডিম প্রসবের পালা। কটা দিন সমানে তা দিলে ডিম ফুটে বেরোবে বাচ্চা, শুরু হবে আরেক দফা কচি গলার কিচির-মিচির।

উঠোনের জল এতোদিনে সরে গেছে। শুকিয়ে খটখট করছে চারদিক। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে রোদ। ডিমগুলো ফুটতে শুরু করেছে। উঠোন ভর্তি ডিমের নীলচে-সবুজ রঙের খোসা। পিঁপড়ের দলও বোধহয় এতোদিন তাকে-তাকে ছিলো। খোসার খবর পেয়ে আর তারা দেরী করলো না, দলকে দল এসে ছেঁকে ধরলো খোসাগুলো।

ডাল থেকে টপাটপ বাসা খসে পড়া শুরু হলো। রোজই একটা দুটো বাসা দমকা বাতাসের তাড়নায় খসে পড়ে। আমার আর বিশ্রাম নেই। বাসাগুলোকে আবার তুলে ডালে লটকে দেবার জন্যে সব সময় আমাকে উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়।

এই তো সেদিন—একটা বাসা খসে পড়েছে মাটিতে বাচ্চাটা ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে বাসা থেকে—সযত্নে তুলে নিলাম তাকে মুঠোয়। হাতের তাপটুকু পেয়ে কি শান্তিই না পেলো সে! গায়ে সবে দু-একটা পালক গজাতে শুরু হয়েছে। এ-অবস্থায় ঝড়-জলের দিনে ওদের একটু মায়ের শরীরের উষ্ণতার দরকার। তা মায়েদের কি সেদিকে হুঁশ আছে—সকালবেলা বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে তারা সেই যে বেরিয়েছে, ফিরবে সন্ধ্যের আগের মুহূর্তে।

তা বাচ্চাটাকে দেখে ভারী মায়া হলো। আহা বেচারা—হাতের আরামটুকু পেয়ে ক্ষিধের কথা মনে পড়ে গেছে, চিঁচিঁ করে ঠোঁট কাঁপিয়ে ডাকছে। দেখো কাণ্ড—কি এখন খেতে দিই তোকে! এতোটুকু বাচ্চা···আচ্ছা দেখা যাক। ততক্ষণ তুমি বাপু তোমার বাসায় একটু ধৈর্য ধরে বোসো। খুঁজে পেতে ততক্ষণ দেখি চারধার।

তাকে বাসায় ঢুকিয়ে বাসাটি ঝুলিয়ে দিলাম নীচু একটা ডালে। বেরোলাম তার খাদ্যের সন্ধানে। বেশি দূর যেতে হলো না। আশে-পাশের ঝোপে উড়ে বেড়াচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে ফড়িং। চটপট ধরে ফেললাম কয়েকটা। ডানা ছিঁড়ে পেটের কাছের মাংসটুকু ঠোঁট ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিলাম তার মুখে। এক ঢোকে সেটুকু গিলেই সে আবার হাঁ করলো।

ব্যস্, নতুন এক কাজ পেয়ে গেলাম। প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর এসে তাকে খাইয়ে যেতে লাগলাম পাঁচটা করে ফড়িং। একদিনেই আমার এই ঘড়িধরা সেবার ফল পাওয়া গেলো—বাসার কাছে আমাকে দেখামাত্র ঠোঁট কাঁপিয়ে শুরু হতো তার চেঁচামেচি। অবশেষে বাসাসুদ্ধ নিয়ে এলাম তাকে তাঁবুতে, দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে জর্জ বললো, বাচ্চাটার প্রতি আমার এই অনুরাগের ঠ্যালা সারাটা রাত তাকেই সামলাতে হয়েছে। রাতভর উঠোনের গাছের বয়স্ক

বাবুইগুলো বাচ্চার খোঁজে চেঁচামেচি করে একেবারে পাড়া মাথায় তুলেছে। দু'চোখের পাতা সারারাতে সে আর এক করতে পারেনি।

বাচ্চাটার নাম রাখলাম ট্যাম-ট্যাম। সোহাহিলি ভাষায় 'ট্যাম-ট্যাম' কথাটার মানে মিছরি বা মিষ্টি। অতশত বিবেচনা করে নাম রাখিনি, কথাটা মনে এলো—নাম রেখে দিলাম, ব্যস্।

দু'দিনের দিন দেখি, নতুন এক মুশকিল। খেয়েদেয়ে সারারাত আমার মশারীর চালে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলো ট্যাম-ট্যাম, ভোরের প্রথম পাখীটি ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিলো কিচির-মিচির। অগত্যা বাধ্য হয়ে আমাকেও উঠতে হলো। চা না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম তার খাদ্যের সন্ধানে।

কিন্তু বেরোলেই তো হলো না, সাত সকালে ফড়িং পাই কোথায়! রাজ্যের কুয়াশায় আর শিশিরে ভারী হয়ে আছে গাছের ডাল-পাতা। রোদ না উঠলে ফড়িং বেরোবে না! অগত্যা খালি হাতেই ফিরে এলাম তাঁবুতে।

ভাবছি, ভাবছি হঠাৎ মাথায় এক মতলব খেলে গেলো—আচ্ছা, দেখি তো—ডিমের কুসুমটুকু দিয়ে ওকে ব্রেকফাস্ট করানো যায় কিনা! টোটোকে বলতে হাজির হলো সেদ্ধ ডিম। ট্যাম-ট্যামকে হাতের মুঠোয় ধরে চামচে ভরে একটু একটু করে পুরো কুসুমটুকুই খাইয়ে দিলাম। খেয়েদেয়ে শান্ত হলো সে, চেঁচামেচি থামালো।

তা তখন আর কিছু খেয়াল হয়নি, হলো কিছুক্ষণ পরে। চেঁচামেচি তো থামলো, কিন্তু হঠাৎ এমন অলস-অনড় হয়ে পড়লো যে—একেবারে নিস্তেজ. ব্যাপারটা কি! নজর গেলো তার গলার দিকে, দেখি—হে ভগবান, গপগপ করে তখন যে কুসুমটুকু গিললো, সব এসে জমা হয়ে রয়েছে তার গলার কাছে—পাতলা চামড়ার ওপাশে হলুদ রঙের কুসুমটুকু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গলা বেয়ে তা আর নিচে নামেনি।

এখন উপায়! কি করি····· দেখা যাক, দলাই-মলাই করে কিছু সুফল পাওয়া যায় কিনা। শুরু হলো পরিচর্যা। পাক্কা দুটি ঘণ্টা পর খাবার নামলো, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ঢের শিক্ষা হয়েছে বাপু—আর এমন কাজ ভুলেও করবো না। কষ্ট করে কটা বাড়তি ফড়িং নয় আজ বিকেলেই ধরে রাখবো, সকালে তাই খাওয়াবো তোমায়।

তা শেষ অবধি ফড়িং ধরার দরকার হলো না। নতুন এক খাবারের সন্ধান পেয়ে গেলাম। সেইদিনই বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ঢুকল এল্‌সা, ঢুকেই মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে লাগলো। বুঝলাম, কেন এতো আস্ফালন—ডাঁশে ছেঁকে ধরেছে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে, তাদের কবল থেকে

মুক্তি না পাওয়া অবধি ওর আর শান্তি নেই।

ট্যাম-ট্যাম আমার বাঁ হাতের মুঠোয়—তাকে যে বাসায় রেখে আসবো, সে-ফুরসতটুকুও পেলাম না। ডান হাতে একটা একটা করে বেছে দিতে লাগলাম ডাঁশ। হঠাৎ কি খেয়াল হতে একটা ডাঁশ এনে ধরলাম ট্যাম-ট্যামের মুখের গোড়ায়। চিবিয়ে চিবিয়ে সুন্দর খেয়ে ফেললো সে ডাঁশটাকে। অবাক কাণ্ড! একথা তো এ ক'দিনে খেয়াল হয়নি! এবার থেকে তাহলে ফড়িং না পেলে কটা ডাঁশই ধরে দেওয়া যাবে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—কোনো ঋতুতেই ডাঁশের বিরাম নেই। একটু খোঁজখবর করলে আনাচে-কানাচে প্রভূত পরিমাণে তাদের দেখা মেলে।

ক'দিনের মধ্যে পালকে পালকে ছেয়ে গেলো ট্যাম-ট্যামের শরীর। ঠোঁটের হলুদ দাগগুলো ছোট হতে হতে একসময় হলুদ ফুটকির মতো হয়ে গেলো। আগের চেয়ে একটু বড়সড়ও হলো সে।

একদিন ভোরে বাইরে বেরিয়ে দেখি, আকাশ ফরসা। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। এ ক'দিনের জমাট-বাঁধা বৃষ্টির কালো মেঘগুলো উধাও। নীল আকাশের খুশী যেন আর ধরে না।

তা এমন খুশীর দিন—ট্যাম-ট্যাম বসে থাকবে তাঁবুর অন্ধকারে···না, ভালো দেখায় না। বাসাসুদ্ধ তাকে নিয়ে এলাম বাইরে। উঠোনের গাছের ডালে বাসাটা ঝুলিয়ে দিলাম।

ব্যস্, অমনি যেন হাতে স্বর্গ পেলো সে। এক লাফে বাসা থেকে বেরিয়ে এসে বসলো সামনের ডালটায়। ঘাড় বেঁকিয়ে, ঘাড় তুলে, ঘাড় নীচু করে কি হৈচৈ-ই না শুরু করে দিলো!

তা তখনো উড়তে শেখেনি সে। পালক বড় না হওয়া অবধি বাচ্চারা উড়তে পারে না। কিন্তু পারে না বলে যে চুপচাপ এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে, সে-পাত্তর সে নয়। এ ডাল থেকে ও ডাল, এ পাতা থেকে ও পাতা—লম্ফঝম্পের সে কি চোট!

কিন্তু না, অতো দৌড়-ঝাঁপ ভালো না। এ গাছটায় প্রায়ই একটা গোখরোকে ঘোরাঘুরি করতে দেখি। তোমাদের মতো বাচ্চাদের লোভেই সে আসে। সুতরাং ভালোয় ভালোয় বাসায় ঢুকে পড়ো বাপু।

হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে, ডাকলাম—আয় ট্যাম-ট্যাম, আয়। ফুড়ুৎ করে এক লাফে সে এসে বসলো আমার হাতের ওপর, কিচমিচ কিচমিচ করে শুরু করলো কথা। আমি ছাই একবর্ণও বুঝলাম না। সোজা ঢুকিয়ে দিলাম তাকে বাসায়, বাসা এনে রাখলাম তাঁবুতে।

পরদিন স্টুডিওতে বসে আমি আমার লেখার কাজে ব্যস্ত, ট্যাম-ট্যাম বসে

আছে টেবিলের ওপর—হঠাৎ সামনের ঝোপ লক্ষ্য করে সে দিলো এক লাফ। ওমা, কি কাণ্ড! উড়তে শিখেছে সে! এইটুকু পথ বেশ উড়তে উড়তে চলে গেলো!

ডাকলাম তার নাম ধরে, ক্লিচ ক্লিচ শব্দে সাড়া দিলো সে। কাছে আসতে বললাম, এলো না। আমার নাগালের বাইরে থেকে সে তার নতুন-শেখা বিদ্যেটা ভালোভাবে রপ্ত করে নেবার উদ্দেশ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ওড়ার মহড়া দিতে লাগলো।

ইত্যবসরে গুটিগুটি পায়ে বাচ্চাদের নিয়ে এল্‌সা এসে হাজির। ট্যাম-ট্যামকে অমন লম্ফঝম্প করতে দেখে জেসপার তো কান খাড়া! মাটিতে লেজ আছড়াতে আছড়াতে জ্বলজ্বল চোখে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

কি মুশকিল—বলুন দেখি! শ্যাম রাখি না কুল রাখি! উভয়সঙ্কট আর কাকে বলে! এখন উপায়! তা নুরুই উপায় করে দিলো। এল্‌সাদের খাবার নিয়ে যেই সে এসে দাঁড়ালো উঠোনে, অমনি জেসপার নজর গেলো তার দিকে। ট্যাম-ট্যামকে ছেড়ে সে মাংসে মন দিলো।

কিন্তু কোথায় ট্যাম-ট্যাম! বিকেলের আলো দ্রুত ম্লান হয়ে আসছে…এ সময় গেলো কোথায় সে! ভারী বিপদে ফেললো তো দেখি আমায়!

একটু খোঁজাখুঁজি করতে দেখা পেলাম তার। গাছের মগডালটাতে উঠে বসেছে সে, তারস্বরে একটা দোয়েলের দিকে তাকিয়ে কিচির-মিচির করছে।

নুরু বললো, দাঁড়াও, তোমার ঝগড়া ইখুনি ঘুচিয়ে দিচ্ছি! একদৌড়ে ঢুকলো গিয়ে সে তাঁবুতে, বেরিয়ে এলো এক কাটারি নিয়ে। তারপর তড়বড় করে গাছে উঠে মগডালের গোড়ায় বসালো কোপ। ভয় পেয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালালো দোয়েলটা। ট্যাম-ট্যাম উড়লো না। শক্ত পায়ে ডাল আঁকড়ে বসে রইলো সে একভাবে।

হুড়মুড় করে একসময় ভেঙে পড়লো ডাল। এবার যেন একটু অবাক হলো সে। ঘাড় তুলে কি না কি হচ্ছে দেখার চেষ্টা করতেই নুরু বাড়িয়ে দিল হাত। ট্যাম-ট্যাম বন্দী হলো। গাছ থেকে নেমে নুরু তাকে তুলে দিল আমার মুঠোয়।

আদরের হাত বুলিয়ে দিলাম তার গায়ে, ঠোঁটে চুমু খেলাম। পরম নির্ভয়ে সে চোখ বুজলো। আমার হাতের তালুতে তার ছোট্ট প্রাণটুকু ধুকপুক করতে লাগলো।

আহা রে বেচারা! কতদিন তোকে এই শান্তিটুকু দিতে পারবো—কে জানে! ঘরে-বাইরে অজস্র শত্রু তোর। বিপদ ওত পেতে আছে চতুর্দিকে—

ক'দিনই বা তোকে সেরে-সামলে রাখতে পারবো, ভগবান জানেন।

পরদিন সকালে এনে রাখলাম তাকে বাইরে। বাসার ফোকর গলিয়ে মাথা বের করে চারদিকে তাকালো সে, ডাকলো—ক্লিচ, ক্লিচ, ক্লিচ। ব্যস্, অমনি শুরু হলো কাণ্ড। কি মধু ছিলো যে সেই ডাকে, কে জানে! চারপাশের ডালপালা, ঝোপঝাড় কেঁপে উঠলো শত শত বাবুইয়ের কলকণ্ঠে। চারদিক থেকে ছুটে এসে সকলে ভিড় জমালো তার বাসার আশেপাশে। বয়োজ্যেষ্ঠ ছু-তুটো বাবুই পালা করে বারকয়েক ঢুকে পড়লো তার বাসায়। কত কথা বললে তাকে, কত কি-ই না বোঝালে। অন্যান্য পাখীদের মধ্যে একটু বয়স্ক যারা, ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে তারা বারবার বন-বাদাড় খুঁজে ট্যাম-ট্যামের জন্যে নিয়ে এলো পোকামাকড়। খাতির-আদরের একেবারে ছয়লাপ!

সকাল কাটলো, তুপুর কাটলো। ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এলো বিকেল। কতবার কতরকম ভাবে চেষ্টা করলাম ট্যাম-ট্যামকে ধরতে, পারলাম না। পক্ষীব্যূহ ভেদ করে তার কাছে পৌঁছয়—এমন সাধ্য কার! অবশেষে সন্ধ্যে নাগাদ বেরিয়ে দেখি, বাসা খালি। ট্যাম-ট্যাম বা অন্যান্য পাখীদের চিহ্নমাত্র নেই। বাসার ফোকরের মুখে পড়ে আছে তার কয়েকটা ঝরা-পালক। ট্যাম-ট্যাম পালিয়েছে।

বনের পাখীকে বাঁধতে চেয়েছিলাম। তার অতোবড় আকাশটাকে এইটুকু করে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম ঘরের কোণে। পারলাম না। মুক্ত বিহঙ্গ অনন্ত আকাশে মেলে দিল তার মুক্তির ডানা।

সাত দিন পর মন একটু হাল্‌কা হলো। এই ক'দিন তন্ময় হয়ে ছিলাম ট্যাম-ট্যামকে নিয়ে, চারদিকে নজর দেবার ফুরসত হয়নি। ঘোর কাটতে দেখি, অরণ্যের চিরাচরিত জীবনে যেন লেগেছে এক আশ্চর্য পরিবর্তনের ঢেউ।

গাছে গাছে নতুন কিশলয়, পাতার আড়ালে-আবডালে ফলের কুঁড়ি, অ্যাকাশিয়া গাছ ফুলে-ছাওয়া। যেন নবজীবনের দৃপ্ত ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠেছে বনভূমি।

জীবজগতেও পড়ে গেছে সাড়া। সময়টা যেন বাচ্চা হবার মরশুম। জলভোঁদড় থেকে শুরু করে কুমীর, কচ্ছপ, জিরাফ, জেব্রা, হরিণ, বেবুন—কেউ পিছিয়ে নেই। কচ্ছপের বাচ্চাগুলোর মাপ ঠিক আধুলির মতো। মা-বাবার সঙ্গে রোদ পোয়াতে তারাও উঠে আসে পারে, অবাধে ঘুরে বেড়ায় চার হাত-পায়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখতে ভারী মজা লাগে।

সব থেকে বেশি অবাক করে কুমীরের বাচ্চারা। ছোট্ট গিরগিটির মতো দেখতে, গায়ে অসংখ্য রোঁয়া। বালির ওপর বুক পেতে শুয়ে থাকে চোখ বুজে, পায়ের শব্দ পেলে টপাটপ নেমে পড়ে জলে। বয়েসে শিশু হলে কি হবে—এই বয়েস থেকেই বেশ সাবধানী হতে শিখেছে। ওই যে চোখ বুজে শুয়ে থাকা, ওটা একটা ভাণ। মা-বাবা এখন থেকেই ওদের আচ্ছা তালিম দেওয়া শুরু করেছে।

রাজ্যের উদ্ভট বুদ্ধি ভগবান যেন জর্জ-এর মাথাতেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। একদিন করলো কি—একটা বিরাট বাঁশের মাথায় একটুকরো মাংস বেঁধে আস্তে আস্তে এগিয়ে ধরলো একটা বাচ্চার মুখের সামনে। বাচ্চাটা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে টুকরোটার দিকে একচমক তাকিয়ে চোখ বুজলো।

তা অত সহজে জব্দ হবার পাত্র নয় জর্জ। প্রথম চেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে এবার দিলো সে এক মোক্ষম চাল। জলের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুরু করলো তার 'ইয়ঁ, ইয়ঁ, ইয়ঁ'। কাজ হলো। ঝাঁকে ঝাঁকে রোঁয়া-ওঠা বিরাট মাথা ভেসে উঠলো জলের ওপর, বাচ্চারাও তাড়াহুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। জর্জ-এর মুখে ফুটে উঠলো বিজয়ীর হাসি।

রাস্তা-ঘাটের অবস্থা একটু ভালো হতে সদর থেকে এলো পাঁচজন টহলদারী-পুলিস। বন-অধিকর্তা এক বিশেষ ফরমান দিয়ে পাঠিয়েছেন তাদের। অরণ্যের বিভিন্ন স্থানে অবাধ যাতায়াতের জন্য রাস্তা বানাতে হবে। জর্জ যেন অবিলম্বে কাজ শুরু করে দেয়। খরচ খরচা যেমন যা লাগে দেওয়া হবে।

ব্যস্, জর্জকে আর পায় কে! লোক-লস্কর যোগাড় করে লেগে পড়লো সে কাজে। রাস্তা তৈরীর কাজ দ্রুতগতিতে এগোতে লাগলো।

তা কম দিন হলো আসিনি তাঁবুতে। এবার এসে এক নাগাড়ে অনেকদিন কাটিয়ে গেলাম। আর নয়, এখন ফেরা উচিত। এল্‌সা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফিরে যাক অরণ্যের জীবনে। গোপা-ছোটো-জেসপা আরো চতুর হোক। শিকার-টিকার নিজেরাই করুক। জীবনকে চিনতে শিখুক তারা নতুন ভাবে।

গোপা-ছোটো-জেসপা—না, কারুর সম্বন্ধেই আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। জেসপা তো এখন রীতিমত ভাবে আমাদের বন্ধু। গোপা-ছোটোরও মন পালটেছে। জেসপার মতো অতোটা না হলেও মায়ের ধমক-ধামক খেয়ে এতোদিনে ওরা আমাদের মনের যথেষ্ট কাছাকাছি পৌছতে পেরেছে। অন্ততঃ আর কিছু না হোক, আমরা যে ওদের বন্ধু, পরমাত্মীয়—এ বিষয়ে ওদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সাধুবাদের সবটুকু এজন্যে নিঃসন্দেহে এল্‌সার

প্রাপ্য।

অবশ্য বন্ধুত্ব ঠিক একে বলা যায় না, কেমন যেন এক ধরনের আপোষ। আমরা আমাদের মতো থাকবো, তারা থাকবে তাদের মতো। কেউ কারুর ব্যাপারে নাক গলাবো না—সব যেমন চলছে, চলবে—এরকমই ছিলো আমাদের বোঝাপড়া। এইতো দেখুন না, সেদিন রাতে জর্জ শুয়ে আছে বিছানায়, এল্‌সা সপরিবারে স্থান করে নিয়েছে তার তাঁবুর মেঝেয়—হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, কি যে হলো এল্‌সার! একলাফে জর্জ-এর খাটে উঠে পড়লো সে। স্প্রিংয়ের খাট—তিনশো পাউণ্ড ওজনের অমন একখানা লাশের ভার সহ্য করবে কিভাবে! আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে প্রবল যন্ত্রণায় ককিয়ে কেঁদে উঠলো খাটটা। জর্জ-এর শরীর শূন্যে একটা পাক খেয়ে ধপ করে পড়লো মেঝেয়—জেসপার ঠিক পায়ের গোড়ায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা ঘাবড়ে গেল জেসপা। মস্ত এক হুঙ্কার ছেড়ে ছিটকে সরে গেল দূরে, পরক্ষণেই জর্জকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে তার হাত চাটতে লাগলো। পাশে ঘুমোচ্ছিল গোপা। আধবোজা চোখে সে একবার আগাগোড়া বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে আবার চোখ বুজলো। খানিকক্ষণ পরে তার নাক ডাকতে লাগলো বিকট শব্দে।

এছাড়াও আছে। আমাদের ল্যাণ্ডরোভারখানা বলতে গেলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে উঠোনের একপাশে। সময়-সুযোগ পেলে এল্‌সা চড়ে বসে গাড়ির ছাদে। বাচ্চারা দেখে, কিন্তু ভুলেও গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করে না। এমন নয় যে তারা উঠতে পারে না। লাফ টাফ দিতে এখন তারা যথেষ্ট ওস্তাদ। তবু গাড়ির ব্যাপারে ওদের কেমন যেন নিস্পৃহতা। গাড়িটা একান্তভাবে আমাদের জিনিস। কি দায় পড়েছে ওদের আমাদের জিনিসে নাক গলাতে!

সেদিন বিকেলের বেড়ানো সেরে ফিরে আসছি তাঁবুতে—দেখি, এল্‌সা-গোপা-ছোটো নদীর পারে বসে সান্ধ্যভোজ সারছে। কি ব্যাপার! সবাই আছে—জেসপা নেই কেন! কোথায় গেলো সে!

কয়েক পা এগিয়ে দেখি, তাঁবুর পেছনে এক ঝোপের আড়ালে বসে জেসপা আধা-ঝলসানো একটা গিনি-ফাউলের সদ্গতি করছে। বলা বাহুল্য, গিনি-ফাউলটা তাকে হাতাতে হয়েছে রান্নার তাঁবু থেকে।

বেশ পরিপাটি করে পক্ষীভক্ষণ সমাপনান্তে সে উঠলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো মায়ের কাছে। মায়েরাও ততক্ষণে খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলেছে। জেসপাকে দেখে গোপা-ছোটো যেন হাতে স্বর্গ পেলো। তিনজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে, দুধ চাটতে লাগলো।

দেখুন কাণ্ড! সাড়ে দশ মাসের বুড়ো ধাড়ি তোরা—এখনও মায়ের দুধের লোভ! বলিহারি আদিখ্যেতা বাপু!

তা দুধ খাক আর যা-ই করুক, ওরা যে এখন যৌবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। জেসপা-গোপার মুখের চারপাশ ছেয়ে গেছে ছোট ছোট লোমে, ঘাড়ে কেশরও গজাতে শুরু করেছে। চোখে-মুখে সব সময় বেশ কেমন একটা তাজা চনমনে ভাব।

দুধ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে তারা উঠলো। এল্‌সাও উঠলো। সকলে মিলে এলাম তাঁবুতে। উঠোন জুড়ে খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে বেড়ালো বাচ্চারা। তারপর ক্লান্ত হয়ে এসে বসলো মায়ের কাছে।

আরো কিছুক্ষণ পর তাঁবুর পেছনের জঙ্গল থেকে ডাকলো এক চিতা। এল্‌সা উঠে ছুটলো তার ডাক লক্ষ্য করে। বসে থেকে থেকে বাচ্চারা একসময় অধৈর্য হয়ে পড়লো। শেষে তারাও এগোলো জঙ্গলের দিকে।

যাক বাবা, নিশ্চিন্ত! নিজের এলাকা রক্ষার দায়িত্ব এল্‌সা এখন নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে। এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি হতে পারে!

পরদিন সকালে নদীর দিক থেকে এল্‌সার ডাকাকাকি শুনে গিয়ে দেখি, ভারী মুশকিলে পড়েছে বেচারা। বাচ্চাদের বারবার সে আসতে বলছে এপারে, কিছুতেই আসছে না তারা। জড়সড় হয়ে বসে আছে ওপারে, বারবার মুখ তুলে পেছনের জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে।

কে জানে—হয়তো কোনো কিছুতে ভয় পেয়েছে তারা, তাই এপারে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ভয়ের কারণ কুমীর নয়। কুমীর দেখলে এল্‌সা নিজেই তাদের আসতে নিষেধ করতো।

ইব্রাহিমকে ইশারায় খাবার আনতে বললাম। চটপট ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে এলো সে একটা ছাগল। দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো বাচ্চারা। ভয়ডর নিমেষে ভুলে ঝুপঝাপ ঝাপিয়ে পড়লো জলে, সাঁতরে এপারে এসে উঠলো। উঠেই আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নয়, সোজা গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো খাবারের ওপর।

তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে নিয়ে এলাম ক্যামেরাটা। বহুদিন ছবি তুলিনি ওদের—আজ এই ফাঁকে কয়েকটা তুলে নিই।

ক্যামেরা ঠিকঠাক করে যেই না গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাদের সামনে, অমনি গোপা লেজ-টেজ আছড়ে মারমুখী ভঙ্গিতে রুখে দাঁড়ালো! জেসপা এতোক্ষণ কিছু খেয়াল করেনি। গোপার দাপাদাপিতে সে চোখ তুললো। চোখাচোখি হলো আমার সঙ্গে। মুহূর্তে তাবৎ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে গোপাকে সে দিলো এক ধমক, থাবা তুলে মারবে বলে ভয়ও দেখালো। জেসপার

রক্তচক্ষুর সামনে গোপা আর তেজ-বিক্রম দেখাতে সাহস পেলো না, মাথা নীচু করে অনুগত ভাইটির মতো খাবারে মন দিলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমিও একের পর এক ছবি তুলতে লাগলাম।

একটু পরে জর্জ এসে হাজির। তার কোমরের বেল্টে বাঁধা তিনটে গিনি-ফাউল, কাঁধে বন্দুক। ভোর থাকতে উঠে সে বেরিয়েছিল শিকারের সন্ধানে, এখন ফিরলো।

গিনি-ফাউল দেখে মতলবটা খেলে গেলো মাথায়। দেখা যাক, ছোটো তার প্রিয় খাবারটি দেখে কি করে! জর্জ-এর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম একটা পাখী, পেছনে লুকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে এগোলাম। ডাকলাম ছোটোর নাম ধরে, সে চোখ তুললো। সকলের চোখ এড়িয়ে গোপনে একচমক দেখালাম তাকে খাদ্যবস্তুটি। দেখেই সে বুঝলো, গুটিগুটি এগিয়ে এলো দল ছেড়ে। তারপর একঝটকায় আমার হাত থেকে পাখীটা ছিনিয়ে নিয়ে বসলো গিয়ে ঝোপের আড়ালে।

সে-রাতটা কেউ আর তাঁবুতে ঢুকলো না, উঠোনে শুয়েই কাটিয়ে দিলো। রাত একটু বাড়তে তাঁবুর পেছন থেকে মিহি গলায় ডেকে উঠলো এক গণ্ডার। অমনি বাচ্চাদের নিয়ে ডাক লক্ষ্য করে তেড়ে গেলো এল্‌সা। গণ্ডারটার মাটি-কাঁপানো পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম, প্রাণভয়ে সে মরীয়া হয়ে ছুটছে।

ভালো, খুবই ভালো। এল্‌সা যে আবার বিপুল পরাক্রমে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারছে, এটা সত্যিই সুখের সংবাদ। বাচ্চারাও ধীরে ধীরে বীর হয়ে উঠছে—বা, চমৎকার!

বীর···হুঁ, বীর তো বটেই! এই তো সেদিন—রগড় দেখবার জন্যে জেসপাকে দেখিয়ে খাবারের খালি প্লেটটা তুলে রেখেছি গাছের ডালে—অমনি এগিয়ে এলো সে, গাছের নীচে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ লম্ফঝম্ফ করে প্লেটের নাগাল না পেয়ে তড়বড় করে উঠে পড়লো গাছে। তারপর ডাল আঁকড়ে মুখ বাড়িয়ে প্লেটটা কামড়ে ধরে অদ্ভুত তৎপরতায় নেমে এলো গাছ থেকে।

দাদার রকমসকম দেখে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে গোপা আর ছোটো। তা আসুক, জেসপার তাদের দিকে নজর দেবার সময় নেই। বীরদর্পে প্লেট-মুখে সে এগিয়ে গেলো নদীর দিকে, তারপর নিশ্চিন্তে বসে প্লেটটা নিয়ে শুরু করলো খেলা।

দেখতে দেখতে জর্জ-এর ছুটি ফুরিয়ে এলো। ফিরতে হবে এবার। এলসাদের ব্যাপারে চিন্তা এখন অনেকটা কম। নিজেদের সামলে সুমলে

রাখতে বা শত্রুর মোকাবিলা করতে তারা নিজেরাই এখন সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া, অনুপ্রবেশকারীদের নিয়েও দুশ্চিন্তা খানিকটা কমেছে। ক'দিন ধরে ওদের আর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না যোধহয় হতোদ্যম হয়ে এ অঞ্চল ছেড়ে তারা চলে গেছে অন্য কোথাও। সুতরাং ফিরে যেতে আমাদের আর বাধা নেই-ই বলা চলে।

তবে হ্যাঁ, হুট করে চিরদিনের জন্যে ওদের ছেড়ে যাওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আসা-যাওয়ার ব্যবধান আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে। কালক্রমে সবকিছু গা-সওয়া হয়ে যাবে তাদের, আমাদের ওপর আর বিন্দুমাত্র নির্ভর করবে না।

সুতরাং চললাম ইসিওলোয়। দিন দশেক কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম তাঁবুতে। আসার পথে দু-দুটো দিন পথে কাটলো। লরিটা মুখ থুবড়ে পড়লো রাস্তার পাশের খানায়, পাক্কা দুটি দিন লাগলো তাকে তুলতে।

তাঁবুতে পৌঁছে তিনটে ফাঁকা আওয়াজ করলাম। এল্‌সা এলো না। তাঁবুর আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করলাম—কোথাও তার পায়ের ছাপ নজরে এলো না। অগত্যা বেরিয়ে পড়লাম। নদী ডিঙিয়ে সবে পাহাড়ের নীচে পৌঁছেছি, দেখি—হাঁপাতে হাঁপাতে বাচ্চাদের নিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে সে।

বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। এ ক'দিনে আর তাঁবুর ধারে-কাছে যাবারও সময় পাওনি, বাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে-জঙ্গলে টো টো করে বেড়িয়েছো। এখন গুলির শব্দ শুনে টনক নড়েছে, ছুটতে ছুটতে আসছো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তা বেশ, ভালো। নিজেদের মনে ছিলে এ ক'দিন, খারাপ কি! কিন্তু···কিন্তু···বাচ্চাদের যে আর চেনাই যায় না! মোটে বারো-তেরোদিন —এর মধ্যে দেখছি ওরা খুব পালটে গেছে! তিনজনেই লম্বা হয়েছে অনেকখানি, গোপার গায়ের রঙ একটু বেশি ঘন হয়েছে, জেসপার ঘাড়ের কেশরগুলো বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, আর ছোটোর তো কথাই নেই—সারা শরীরে তার টগবগ করছে যৌবন—যেন পূর্ণ যুবতী এক তরুণী। সাবাস এল্‌সা, তোমার গর্ভ সার্থক। তিনটি ছেলেমেয়েই তোমার সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। সারা তল্লাটে এমন সুন্দর গড়ন-পেটনের সিংহ-সিংহী আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি।

আসার সময় মেরে আনা ছাগলটা তাদের সামনে নামিয়ে দিলো ইব্রাহিম। সকলে পেট পুরে খেলো। উঠে এসে আমার পায়ে মুখ ঘষে আদর জানাতে লাগলো এল্‌সা।

পরদিন বিকেলে এক কাণ্ড। ইব্রাহিম মেরে এনেছে কটা গিনি-ফাউল,

বাচ্চাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছি একটা—শুরু হয়ে গেছে হুটোপাটি। পাখীটার এক ঠ্যাং থাবায় চেপে ধরে গোঁ গোঁ করছে ছোটো, জেসপা কামড়ে ধরেছে ঘাড়, গোপা দু পায়ে তার পেট চেপে ধরে ভাইবোনের দিকে তাকিয়ে মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার ছাড়ছে—সে এক যথার্থ খণ্ডযুদ্ধ আর কি ! অবশেষে অবস্থা আয়ত্তে আনতে এল্সাকেই আসতে হলো। শুয়েছিলো সে জর্জ-এর তাঁবুতে, ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে তিনজনকে তিন চড় কষালো। তারপর উঠে বসলো গাড়ির ছাদে।

এগিয়ে গেলাম। তাকে আদর করবো বলে হাত বাড়ালাম। খ্যাঁক করে আমাকেও ধমকে দিলো সে। ভারী অবাক লাগলো। এক পা এক পা করে পেছিয়ে এসে অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁবুর গা ঘেঁষে।

তা আমার মনের ভাব বুঝতে দেরী হলো না তার। এক লাফে গাড়ির ছাদ থেকে নেমে সে এগিয়ে এলো, আমার পায়ের নীচে শুয়ে গড়াগড়ি খেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলো। যেন বলতে চাইলো—কি করবো, বলো ! মাথার ঠিক ছিলো না তখন। বাচ্চাদের ডাক-চিৎকার শুনে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি, কি বলতে তোমায় কি বলে ফেলেছি—দোহাই, কিছু মনে করো না।

কথাটা মিথ্যে নয়। জেসপাকে নিয়েই যত চিন্তা তার। এই তো সেদিন—ভরপেট খেয়ে তাঁবুতে এসে ঢুকলো জেসপা, চিৎপাত হয়ে আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো। উদ্দেশ্য—খানিকক্ষণ আমার আদর খাওয়া। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলাম তার গায়ে, পরম শান্তিতে চোখ বুজলো-সে, একটানা- গর-র-র গর-র-র শব্দ করতে লাগলো। এতোক্ষণ এল্সা বসেছিলো দোরগোড়ায়, জেসপাকে চোখে চোখে রাখছিলো। অবশেষে ওকে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে সে এগিয়ে এলো তার কাছে, গা চেটে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো।

এমন সময় গুটিগুটি গোপা এসে হাজির। মায়ের কাণ্ড-কারখানা দেখে হিংসেয় চোখ জ্বলতে লাগলো তার। এক লাফে উঠে বসলো সে মায়ের পিঠে, থাবায় চেপে ধরলো তার মুখ। ভাবখানা এই—ওসব ছাড়ো বাপু, আমি এসেছি—আদর-তোয়াজ যা কিছু করার আমাকেই করো।

তা বাচ্চাদের যত্ন-আত্তি এল্সা যতটুকু যা করুক, ফাঁকে ফাঁকে তাদের ভব্যতা-সভ্যতা শেখাতে সে কিন্তু ভুলতো না। একদিনের কথা বলি। সেদিন কেন যেন বেড়ার আড়ালে কাঁটাগাছ ঘিরে তৈরী করা এক ছোট খুপরিতে দুটো ছাগল বেঁধে রেখেছে ইব্রাহিম। ছাগল দুটো মনের সুখে ঘাস-পাতা চিবোচ্ছে—হঠাৎ সেদিকে নজর গেলো জেসপার। ব্যস্, অমনি শুরু হলো বেড়ার ওপর তার আঁচড়াবার ঘটা। কিছুতেই পারা যায় না রুখে

রাখতে। এমন সময় এল্‌সা এসে হাজির। আগাগোড়া ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করে সে জেসপাকে দিলো এক ধমক, জেসপাও পালটা ধমক দিলো। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এল্‌সা তার গালে কষালো এক চড়। এবার ঠাণ্ডা হলো জেসপা, অবাধ্যপনা করতে আর সাহস পেলো না।

কাঁচুমাচু মুখ করে সে এসে ঢুকলো আমার তাঁবুতে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়লো মুখ-খোলা কণ্ডেন্সড্ মিল্ক-এর টিনটার ওপর। ব্যস্, আর যায় কোথায়! একটানে টিনটা নামিয়ে মেঝেময় গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা শুরু করলো সে।

কিন্তু না, একই খেলা অনেকক্ষণ ধরে খেলতে তার মন চায় না। সুতরাং নতুন খেলার সন্ধান চাই। নতুন খেলা···নতুন খেলা···পেয়ে গেলো সে সন্ধান। আমার সেলাইয়ের বাক্সটা টেনে নামালো মেঝেয়। কালক্ষেপ না করে সেটাকে নিয়ে ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

ছুটলাম আমিও তার পেছন পেছন। দাঁতের চাপে বাক্সটা যদি খুলে যায়, তবেই মুশকিল। ছুঁচ-টুঁচ রয়েছে, কোন্‌টা কোথায় ঢুকে বসে—কে জানে! শত সাধ্য-সাধনা করেও ফল হলো না। অগত্যা গেলাম রান্নাঘরে, একটা ছাড়ানো গিনি-ফাউল নিয়ে বাইরে এলাম। পাখীর দিকে চোখ পড়তে তার চৈতন্য হলো। টিনের বাক্স ফেলে এগিয়ে এলো গুটিগুটি।

খাবারের সামনে তাকে বসিয়ে রেখে আমি গেলাম বাক্স কুড়োতে। গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি—তাই। ছুঁচ, সুতোর গুলি, কাঁচি, ব্লেড—সব ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, তার দাঁতের চাপে বাক্সের ডালাটা শেষ অবধি ভেঙেই গেছে।

॥ ১৩ ॥

'পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহ ভাই······' এলো বিদায়ের বেলা, এলো ফেরার দিন। 'ফুরালো দিন, ফুরালো গান – ফুরালো সকল খেলা।'

তেসরা ডিসেম্বর গেলাম জেলা-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে। এল্‌সার খবর দিলাম, বাচ্চাদের কথা বললাম। বললাম, অরণ্য-জীবনের অবাধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিবেচনায় আমি আমার 'বর্ণ ফ্রী' বইয়ের রয়্যালটির এক বিরাট অংশ ব্যয় করতে প্রস্তুত। এখন কমিশনার রাজী হলেই হয়।

তা না হবারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। অরণ্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ এল্‌সা। 'বর্ণ-ফ্রী'র দৌলতে পৃথিবীর মানুষ চিনেছে তাকে। বনের হিংস্র

অবহেলিত জীবজন্তুর প্রতি তাদের সহানুভূতির অন্ত নেই। দেশ-দেশান্তর থেকে চিঠি আসে, চিঠি পড়তে পড়তে অবাক হই, অভিভূত হই। আমার ক্ষুদ্র সাহিত্যকর্ম যে মানুষের মনে এমন এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পেরেছে—একথা ভাবতেও মন গর্বে ভরে যায়।

তবে হ্যাঁ, অসুবিধেও আছে। আদিবাসী অনুপ্রবেশকারীদের বিবেচনায় এল্‌সা তথা আমরা এক আতঙ্কবিশেষ। তাদের স্বচ্ছন্দ ক্রিয়াকলাপ আমাদের উপস্থিতিতে ব্যহত হচ্ছে, সুতরাং তাদের তরফ থেকে আপত্তি যে উঠবে—এ আর বিচিত্র কি! ইদানিং আরো একটা ঘটনা ঘটেছে। ট্যাঙ্গানিকায় এক পোষা সিংহের কবলে একটি আদিবাসী মেয়ে প্রাণ দিয়েছে। সেই থেকে সেই পোষা সিংহটিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের তাবৎ পোষা সিংহ-সিংহীর প্রতি বিরূপ ধারণা ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে আদিবাসীদের মনে। এমতাবস্থায়, এল্‌সাকে এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

চারদিন পর এক গুজব শোনা গেলো। এল্‌সার এলাকার চোদ্দ মাইলের মধ্যে দুজন আদিবাসী নাকি এক সিংহের খপ্পরে পড়েছিল। বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করে তারা প্রাণটুকু হাতে নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে।

শুনে জর্জ আর কালক্ষেপ করলো না। বেরিয়ে পড়লো তদন্তে। খোঁজ-খবর করে তেমন কিছু বোঝা গেলো না। তবু এল্‌সাকে সন্দেহের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে পরদিন সকালেই পাঠিয়ে দিলো সে দুজন টহলদার-পুলিশ। তদন্ত-তল্লাসী সেরে বিকেলবেলা তারা এসে বললো, আদিবাসী দুজনের সিংহের খপ্পরে পড়ার সংবাদটা একটা নিছক গুজব। আশেপাশে প্রায় দশ-দশটা গ্রামের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও এ গুজবের কোনো ভিত্তি আবিষ্কার করা যায়নি।

দেখো কাণ্ড! কোথাও কিছু নেই···দুম্ করে একটা গুজব ছড়িয়ে গেলো! আসলে, আমাদের তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে ওরা এ-দোষ, সে-দোষ, এ-অন্যায় সে-অন্যায়—হাজারো বায়নাক্কা শুরু করে দিয়েছে। নাঃ, এল্‌সাকে আর এখানে রাখা দেখছি সত্যিসত্যিই সঙ্গত নয়।

আর তাছাড়া আমরাই বা কতদিন থাকবো এখানে তাঁবু আগলে! এসে-ছিলাম ক'দিনের জন্যে, কাটিয়ে গেলাম ছ'মাস। এই ছ'টি মাস আদি-বাসীদের হাত থেকে ওদের সামলেসুমলে রেখেছি ঠিকই, কিন্তু প্রকারান্তরে বাচ্চাদের নিয়মিত জীবন-যাপনেও কম বাধা সৃষ্টি করিনি। এমনভাবে আগলে-আঁকড়ে ঘরকুনো করে রেখে আমরা ওদের ক্ষতিই করেছি, লাভ কিছু করিনি।

সুতরাং, সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে আমাদের ঐ মতলবটাই ভালো। এখান থেকে সরিয়ে ওদের রেখে আসবো দূরের কোনো জঙ্গলে। প্রকৃতির কোলে নির্ভয়ে বেড়ে উঠবে বাচ্চারা, তাদের আদিম জীবন ফিরে পাবে—ব্যস, শান্তি!

কিন্তু তেমন মনের মতো জঙ্গলই বা পাই কোথায়! এমন একটা জায়গা খুঁজতে হবে—যেখানে মা-ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি থাকতে পারে, যেখানে আর যা-ই থাকুক, মানুষ থাকবে না। তা তেমন জায়গা···কোথায় সে-জায়গা!

জর্জ বললো, দাঁড়াও। আমি একচমক ঘুরে আসি ইসিওলো থেকে, দু-একজন জ্ঞানী-গুণী লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আসি—এ-সমস্যার সমাধান হয়তো তাঁরাই বাৎলে দেবেন।

বিকেলে নুরুকে নিয়ে বেরোলাম। পাহাড়ের কাছবরাবর যেতেই এল্‌সাদের সঙ্গে দেখা। বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে একপাশে, এল্‌সা ঘাড় তুলে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

আমাকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলো সে। একছুটে নেমে এলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, গা-হাত-পা চেটে আমাকে ভালোবাসা জানালো। ভাবলাম, যাই—বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে একটু খুনসুটি করে আসি। এগোলাম। মুহূর্তে এল্‌সা বুঝতে পারলো আমার মতলব। পেছন থেকে জামা কামড়ে ধরে আমার গতিরোধ করলো। ভাবখানা এমন থাক্ না বাপু, বাচ্চারা সারাদিন খাটা খাটুনির পর ঘুমোচ্ছে, ওদের একটু শান্তিতে ঘুমোতে দাও। কেন আর এ সময় জ্বালাতন করবে! অগত্যা কি আর করি! এল্‌সার সঙ্গেই খানিকক্ষণ কাটিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

সন্ধ্যে ঘনাতে এলো তারা। খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ উঠোনে হুটোপাটি করে বেড়ালো। তারপর ক্লান্ত হয়ে মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো জেসপা আর গোপা, ছোটো চারপাশ ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগলো।

রাত একটু বাড়তে কাছাকাছি কোথাও ডেকে উঠলো এক সিংহ। বাচ্চাদের নিয়ে এল্‌সা ঢুকলো তাঁবুতে। পরপর তিনদিন সিংহমশাই ঘোরাঘুরি করে বেড়ালেন তাঁবুর চারপাশে, শেষে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। এই তিনদিন তাঁবুর আশেপাশেই কাটালো এল্‌সা। বিকেলে খাবার-টাবার খেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে সেই যে সে গিয়ে ঢুকতো তাঁবুতে, আর বেরোতো না। তিনদিন পর সব দিক নিরাপদ দেখে সদলবলে সে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে।

বেচারা জেসপা—এই ক'দিন ছায়ার মতো ঘুরেছে আমার পায়ে পায়ে!

উদ্দেশ্য—একটু আদর, একটু ভালোবাসা। তা ওকে ভালবাসতে যে ভয় করে ভীষণ! আদরের জবাবে আদর জানাতে গিয়ে ও যখন ওর ধারালো নখে আমার সর্বাঙ্গ আঁচড়ে দেয়—তখন আনন্দের বদলে জল আসে চোখে। কিন্তু কি করি, উপায় নেই—দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতাম সব।
পরপর কটা রাত পাহাড়েই কাটালো এল্‌সা। বিকেলে বাচ্চাদের নিয়ে খেতে আসতো সে। খেয়ে আর দাঁড়াতো না। সন্ধ্যের আগেই রওনা দিতো পাহাড়ের দিকে।
একদিন···তখন রাত নটা হবে···চুপচাপ বই পড়ছি তাঁবুতে বসে—হঠাৎ, পাতার ওপর একটা খসখস শব্দ···কে যেন আসছে! বই রেখে একহাতে টর্চ, একহাতে রাইফেল নিয়ে বসে রইলাম স্থির হয়ে, আলো কমিয়ে দিলাম। শব্দটা চললো আরো কিছুক্ষণ, গাছের গুঁড়ি বেয়ে সে উঠলো, তারপর ঝপাং করে লাফিয়ে পড়লো তাঁবুর চালে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার, রাইফেল রেখে টর্চ হাতে বেরিয়ে এলাম গুটিগুটি। ততক্ষণে ডাল বেয়ে উঠে পড়েছে সে উঠোনের অ্যাকাশিয়া গাছটায়, বাবুইয়ের বাসাগুলো ছিঁড়তে শুরু করেছে। আলো ফেললাম তার মুখে—নীল চোখ দুটো দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো। আলো বা আমাকে দেখে ভ্রূক্ষেপমাত্র সে করলো না, নীরবে নিজের কাজ করে যেতে লাগলো।
এই খট্টাশটাকে আগেও ক'দিন দেখেছি। মানুষজন, আলো, হৈ-চৈ থোড়াই কেয়ার তার। রাতে চুপিচুপি আসবে চোরের মতো, গাছে উঠে বাবুইয়ের বাসা হাতড়াবে। পাখী খেতে কি ভালোই যে লাগে ওর! তা পাখীর দলও কম চালাক নয়। খট্টাশের গায়ের গন্ধ তাদের চেনা! সে গাছে উঠেছে···টের পাওয়ামাত্র তারা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ে পালায়। কালেভদ্রে দু-একটা আরামপ্রিয় পাখী ধরা পড়ে। হাই-যাচ্ছি-যাবো করতে করতে হয়তো তারা বসেই থাকে বাসায়, খট্টাশ এসে বাসাসুদ্ধ তাদের চেপে ধরে।
এতোদিনে ধরা দেবার কথা। ডিসেম্বর পড়লো, দেখতে দেখতে পনেরোটা দিন গড়িয়ে গেলো—তবু বৃষ্টি বন্ধ হবার লক্ষণ নেই। কি যে হয়েছে এবার! বিরক্তির একশেষ আর কি!
তা বৃষ্টি বেশিদিন চলায় সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছে বুঝি হায়নাদের। নদী টই-টম্বুর। সাঁতরে ওপারে যাবে—সে-সাহস নেই। ওদের প্রিয় খাবার বেবুনের বাচ্চাদের বাড়িটা আবার ওপারে। হায় হায়! এতো দুঃখ কি সহ্য করা যায়! রাত বাড়তে শুরু হয় ওদের বিলাপ। তাঁবুর পেছনে দাঁড়িয়ে মিহিসুরে গলা কাঁপিয়ে ইনিয়েবিনিয়ে ওরা মনের দুঃখ জানায়। কান্না শুনে ক্ষেপে যায় এল্‌সা। একছুটে সেদিকে গিয়ে ডাক-চিৎকার ছেড়ে

সকলকে ভিটে-ছাড়া করে তবে সে তাঁবুতে ফেরে। আমরাও শান্তিতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারি।

বিশে ডিসেম্বর বাচ্চাদের বয়েস এক বছর পূর্ণ হলো। সকালে উঠে ইব্রাহিমকে দিয়ে একটা গিনি-ফাউল শিকার করিয়ে রাখলাম। পালক-টালক ছাড়িয়ে সমান চারভাগে ভাগ করে বসে রইলাম এল্‌সাদের অপেক্ষায়। বিকেলে চা খাবার সময় নদী সাঁতরে এলো তারা। বাচ্চারা তাদের ভাগের মাংস নিয়ে বসলো গিয়ে ঝোপের আড়ালে, এল্‌সা তার পাওনাটুকু চোখের নিমেষে উদরসাৎ করে উঠে বসলো গাড়ির ছাদে।

মনের একটি আশা পূর্ণ হলো। এখন আরেকটি বাকী। পাহাড়ে যেতে হবে, বাচ্চাদের জন্মস্থানটা একচমক দেখে আসতে হবে। ম্যাকেদকে নিয়ে রওনা দিলাম। কি বুঝলো এল্‌সা—কে জানে! এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে সে-ও সঙ্গী হলো আমাদের। গুটিগুটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাচ্চারাও এগোলো আমাদের পেছন পেছন।

পাহাড়টা একচক্কর ঘুরে ফেরার পথ ধরলাম। দূরে অস্তায়মান সূর্য। দিনের শেষ রক্তাভা ছড়িয়ে পড়েছে এল্‌সার চোখেমুখে। দেখে মনে হলো, সে যেন এক সলাজ কুলবধূ। সন্তানের প্রথম জন্মতিথিতে মনে পড়ে গেছে তার অতীত দিনগুলির কথা, বিরাট আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সে একের পর এক স্মৃতিচারণ করে চলেছে।

ভেবেছিলাম, আজকের রাতটা তারা বনে-পাহাড়েই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু না, পাহাড়ে থাকবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাদের হলো না। আমাদের সঙ্গে সকলে ফিরে এলো তাঁবুতে।

খাওয়াদাওয়া হলো, খেলাধুলোও হলো একচোট। বাচ্চারা শুয়ে পড়লো উঠোনের একপাশে, এল্‌সা উঠলো গিয়ে গাড়ির ছাদে। চারজনের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় চারটে স্কেচ করলাম, ছবিও নিলাম কয়েকটা। তারপর এগিয়ে গিয়ে এল্‌সার গায়ে আদরের হাত বোলাতে লাগলাম।

লক্ষ্মী মেয়েটি আমার, সোনা মেয়ে—আজকের এমন আনন্দের দিনে সারাটা বিকেল তুমি রইলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, আমার বুকের ভাষা মনের ভাষা তুমি ঠিক বুঝতে পারো—তোমাকে শত আদর করেও মন ভরে না।

হঠাৎ তাঁবুর পেছন দিক থেকে এক হুঙ্কার—আবেগের পর্দা মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। ফিরে এলাম কঠোর বাস্তবে।

এল্‌সাও উঠে কান খাড়া করে বসলো, কিছুক্ষণ অপার মনোযোগে কি যেন শুনলো—তারপর বাচ্চাদের নিয়ে রওনা দিলো পাহাড়ের দিকে।

পরদিন সারা দিনমানে দেখা নেই তার, তার পরের দিনও না। তৃতীয় দিন

সকাল নটা নাগাদ পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো তার ঘন ঘন কান-ফাটানো ডাক। ভয় নয়, বিরাগ নয়—কেমন যেন এক ভিন্ন ধরনের ডাক। হয়তো কাউকে ডাকছে এল্‌সা—কাকে ডাকছে! কেন ডাকছে!

মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে গেলো। সন্ধ্যের দিকে বাচ্চাদের নিয়ে এলো সে তাঁবুতে। খাবার খেলো। অবশেষে রাত একটু গড়াতে পাহাড়ের দিক থেকে যেই না শুরু হলো এক সিংহের ডাক—সে আর কালক্ষেপ করলো না। সদলবলে ছুটলো সেই লক্ষ্য করে।

তেইশে ডিসেম্বর রাতটুকু কাটালো সে তাঁবুতে। সকালে উঠে ম্যাকেদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এল্‌সারাও এলো পিছু পিছু। কাল রাতে নদীর দিক থেকে ডাকাডাকি করছিল সেই সিংহটি, দেখি বালির ওপর তার পায়ের ছাপ দেখে কিছু বুঝতে পারি কি না।

তা তেমন কিছু বোঝা গেলো না। বালিতে পায়ের ছাপ ছড়িয়ে যায়, সুতরাং মিল খোঁজার চেষ্টা নিরর্থক। এগিয়ে চললাম। নদী বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে, ডান দিকে এল্‌সাদের পাহাড়ী আস্তানা। একপাশে এক ছোট পুকুর। সিংহেরা সচরাচর এখানেই আসে জল খেতে। পুকুরের চারপাশে অজস্র সিংহের পায়ের ছাপ। এর মধ্যে থেকে কালকের সিংহের ছাপ খুঁজে বের করা অসম্ভব। সুতরাং ফেরার পথ ধরলাম।

ফিরতে গিয়ে এক কাণ্ড। দুটো শেয়াল জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে। কয়েকবার চোখ তুললো এল্‌সা, বাচ্চারা গোঁ গোঁ করলো—তবু তাদের নড়ার নাম নেই। অবশেষে এতো বেয়াদপি আর সহ্য হলো না এল্‌সার। ছুটে গেলো সে তাদের দিকে। এবার কাজ হলো। তারা গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে।

ততক্ষণে রোদ চড়ে গেছে। এগোতে এগোতে বাচ্চারা প্রায়ই জিরিয়ে নিচ্ছে গাছ-পাথরের ছায়ায়। পাহাড়ের কাছাকাছি এসে হঠাৎ কি যে খেয়াল চাপলো তাদের মাথায়! একদৌড়ে সবাই উঠলো গিয়ে পাথরের চাঁইটার ওপর। সকলকে ফিরিয়ে তাঁবুতে নিয়ে যাবার জন্যে আমিও যেই উঠতে শুরু করেছি পাহাড় বেয়ে, এল্‌সা অমনি এসে দাঁড়ালো আমার পথরোধ করে। অর্থ পরিষ্কার—উঁহু, আর উঠো না। ওদের মর্জি হলে ওরা নিজেরাই সময়মতো ফিরে যাবেখন। তুমি এখন মানে মানে কেটে পড়ো।

জর্জ এসে পৌঁছলো বিকেল তিনটে নাগাদ। সঙ্গে সে এনেছে স্যুটকেশ বোঝাই চিঠি-চাপাটি। খুলে দেখার সময় হলো না, দুজনে বেরিয়ে পড়লাম ফুল তুলতে। আজ চব্বিশে ডিসেম্বর, রাত পোয়ালেই যীশুর পবিত্র জন্মদিন। সাজসজ্জা যা কিছু করার—আজই তো করে রাখতে হবে।

জর্জ বললো, বন-অধিকর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মনের মতো একটি জায়গার সন্ধান সে পেয়েছে। রুডল্‌ফ হ্রদের আশপাশটা বড় দুর্গম, জনবসতিও ধারে-কাছে কোথাও নেই। সুতরাং সব দিক থেকে নিরাপদ এই জায়গাটিই হবে এল্‌সাদের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান। কথাবার্তা সে প্রায় পাকাপাকি করেই এসেছে। বন-অধিকর্তার তরফ থেকে আপত্তির কোনো কারণ নেই। এল্‌সাদের সুযোগ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিবেচনায় আমরা যা ভালো বুঝি, করতে পারি।

বড় খারাপ হয়ে গেলো মন। এখানে থাকলে তবুও যা মাঝে-মধ্যে এসে ওদের দেখে যাওয়া সম্ভব হতো, ওই দুর্গম অঞ্চলে সে-সম্ভাবনাটুকুও নষ্ট হলো। একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক খালি করে। হাতের ফুল হাতেই ধরা রইলো! পা দুটো যেন কেউ পেরেক পুঁতে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়ে গেলো।

মনের এই অবস্থায় দুঃখ শতগুণ করে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো এল্‌সা, বাচ্চারা এলো তার পেছন পেছন। চোখ ফিরিয়ে নিলাম, গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়লো অশ্রু। হায়! এমন অনিন্দ্যসুন্দর পরিবেশ ছেড়ে আর ক'দিন পরে এই সোনার শিশুরা যাবে রুডল্‌ফের রুক্ষ-কঠিন প্রাঙ্গণে। এই শ্যামল বনানী পড়ে থাকবে। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কঠিন লাভাস্রোতের আড়ালে টা টা রোদে পুড়ে বাচ্চারা খুঁজে বেড়াবে একটু সবুজের হাতছানি—হায় রে কপাল!

তাঁবুতে ফিরে খাবার নিয়ে বসলো তারা. চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমি 'খ্রীস্টমাস ট্রি' সাজালাম। গতবারের চুমকি-বসানো গাছটা ছাড়াও লণ্ডন থেকে এবার জর্জ আনিয়েছে এক নতুন গাছ। কথা ছিল, গতবারের তুলনায় এবার উৎসব আরো ভালো হবে।

সাজগোজ সব হয়ে যেতে সকলের জন্যে আনা উপহারগুলো এনে সাজিয়ে রাখলাম টেবিলে। মোমবাতি কটা ঠিক করে রাখলাম। তারপর চুপচাপ বসে রইলাম ঘরের কোণের ছোট চেয়ারটায়।

গুটিগুটি চোরের মতো ঘরে ঢুকলো জেসপা। সব কিছু এড়িয়ে নজর পড়লো তার জর্জ এর জন্যে আনা শার্টের রঙচঙে বাক্সটার ওপর। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে হঠাৎ খপ্ করে কামড়ে ধরলো সে বাক্সটা—ছুটে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

পেছন পেছন আমিও এলাম। ততক্ষণে জঙ্গলের আড়ালে উধাও হয়ে গেছে সে, গোপাও গেছে তার পেছন পেছন।

জেসপার দেখা পেলো। প্রভূত সাধ্যসাধনা করে তাদের কবল থেকে মুক্ত করার পর বাক্সটা যখন এনে আমাকে দিলো, আমি তো অবাক! বাক্স কোথায়! এ তো দেখি পিচবোর্ডের কয়েকটা টুকরো মাত্র! আর শার্ট— হ্যাঁ, সেটাও এনেছে ম্যাকেদ; তবে শার্ট বলে সেটাকে আর চেনা যায় না। মুখের লালা-মেশানো দাঁতের ধারে শতছিন্ন সেটা যেন কাপড়ের এক মণ্ডবিশেষ।

ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাঁবুতে ঢুকে মোমবাতি কটা জ্বেলে দিলাম। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে আমার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলো জেসপা, তারপর গুটিগুটি একসময় ঢুকে পড়লো ঘরে। ঢুকেই শুরু হয়ে গেলো তার দুষ্টুমি। টেবিলের অমন রঙচঙে ঢাকনাটা একবার সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবে না—এমন তো হতে পারে না! কামড়ে ধরলো ঢাকনার এক প্রান্ত, টান দেবার আগেই আমি হা হা করে ছুটে এলাম। হয়েছিলো আর কি! জ্বলন্ত মোমবাতি-টাতি উলটে পড়ে আগুন-টাগুন লেগে সে এক বিশ্রী কাণ্ডই হতো!

তাড়া খেয়ে তখনকার মতো বেরিয়ে গেলো সে, এলো আবার খানিকক্ষণ পরে। এবার আর দুষ্টুমি নয়, এবার বিস্ময়। মোম যতো পুড়ছে, আগুনের শিখা নীচে নামছে—অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো সে একদৃষ্টে।

একটি একটি করে আলো নিভে গেলো জেসপার চোখের সামনে, ঘর অন্ধকারে ভরে গেলো। নতুন করে যে আলো জ্বালবো, সে ইচ্ছাও হলো না। বাইরে এলাম। দেখি, উঠোনের একপাশে এল্‌সা শুয়ে আছে গোপা ছোটোকে নিয়ে, পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

চিঠির বাক্স নিয়ে বসলাম জর্জ-এর তাঁবুতে। একের পর এক চিঠি পড়তে লাগলাম। মুহূর্তে মন ভরে উঠলো খুশীতে। 'বর্ণ ফ্রী'র অগণিত পাঠক দেশ-দেশান্তর থেকে লিখেছেন চিঠি—যীশুর পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে ঈশ্বরের কাছে সকলেই এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের জন্য শান্তি কামনা করেছেন। সার্থক জনম তোমার এল্‌সা, সভ্য দুনিয়ার মানুষও আজ তোমার জন্যে ভাবে, প্রার্থনা করে!

কৃতজ্ঞচিত্তে শেষ কখানি চিঠির ভেতর থেকে তুলে নিলাম একখানা খাম, পড়লাম। সদর থেকে লিখিত আদেশ বয়ে এনেছে এই চিঠি—এল্‌সাদের এ অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত করার আদেশ।

ফরএভার ফ্রী

ভাষান্তর : ইন্দুভূষণ দাস

স্থানান্তরের নির্দেশ

উনিশ শো ষাটের বড়দিন।

আজও মনে আছে সে দিনটির কথা। বড়দিনের আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করে আফ্রিকার জেলা পরিষদের কাছ থেকে এক পত্রাঘাত এলো—"এল্‌সা এবং তার বাচ্চাদের সংরক্ষিত এলাকা থেকে অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

এই হুকুম জারির কারণও একটা দেখানো হয়েছিল চিঠিতে। জানানো হয়েছিল এল্‌সা আর তার বাচ্চারা নাকি জনসাধারণের বিপদের কারণ হয়ে

বিস্মিত হলাম চিঠিখানা পড়ে। যাঁরা এই হুকুম জারি করেছেন, তাঁরাই একদিন উদ্যোগী হয়ে এলসাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁরা বলে এসেছেন : এলসাকে তাঁরা সংরক্ষিত এলাকার সম্পদ হিসেবে মনে করেন। কিন্তু এই 'সম্পদ'-ই হঠাৎ কেন যেন 'বিপদ' হিসেবে গণ্য হয়েছে তাঁদের মতে।

কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তটা রীতিমত দুর্বোধ্য বলে মনে হলো আমাদের। এলসা আজ পর্যন্ত কাউকেই আক্রমণ করেনি এখানে। এ ছাড়া, ওদের যাতে কোন রকম আর্থিক ক্ষতি না হয় তার জন্যে মোটা অঙ্কের টাকাও দিয়ে আসছি জায়গাটার ভাড়া হিসেবে।

যাই হোক, এখন আর এ ব্যাপারে কিছু করণীয় নেই। আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এলসা আর তার বাচ্চাদের এখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সরিয়ে নাও বললেই তো আর সে কাজ করা যায় না। এরা তো সুসভ্য মানব-সন্তান নয় যে হুট্ করে গাড়িতে চাপিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যাবে! একটা প্রাপ্তবয়স্ক সিংহী আর তার তিন তিনটে শিশু-সন্তানকে এত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তাদের বসবাসের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া বাসভূমির ব্যবস্থা হলেও চলবে না, ওদের স্থানান্তরিত করতে হলে আরও নানাভাবে প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু প্রস্তুতির কাজ পরেও চলতে পারে; সবচেয়ে আগে দরকার বিকল্প বাসস্থান।

আমরা তাই টাঙ্গানাইকা, উগাণ্ডা, রোডেসিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের যে সব বন্ধুবান্ধব ছিলেন তাঁদের কাছে চিঠি লিখলাম। জানতে চাইলাম,

ওইসব দেশে এলসা আর তার বাচ্চাদের উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যেতে পারে কিনা।

জর্জ কিন্তু চিঠির উত্তরের জন্যে চুপচাপ বসে থাকতে রাজী নয়। ও বললে যে দু-এক দিনের মধ্যেই ও বেরিয়ে পড়বে বিকল্প বাসস্থানের সন্ধানে। ওর ধারণা, রুডলফ্ হ্রদের পূর্ব উপকূলে হয়তো উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওখানে জায়গা পাওয়া গেলেও সমস্যার সমাধান হবে না। ওখানে যেতে হলে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে আমাদের। যদিও আমরা গাড়িতে করে যাব, তবুও উঁচু-নিচু পার্বত্যপথ, মরুভূমির মতো বিশাল প্রান্তর আর বালুকাময় নদীবক্ষ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পুরো তিন দিন আর তিন রাত লেগে যাবে। তাছাড়া অতদূরের পথে এলসা আর তার বাচ্চাদের নিয়ে যেতে হলে লরীর ওপরে ইস্পাতের তার দিয়ে মজবুত করে খাঁচা তৈরি করতে হবে। এলসাকে যখন এখানে আনা হয়েছিল তখনও আমরা এই ধরনের খাঁচা ব্যবহার করেছিলাম। সেবার এলসা একা ছিল। কিন্তু এবার তার বাচ্চাগুলো সঙ্গে থাকায় খাঁচার আকার অনেক বড় করতে হবে। আমরা তাই ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং কেনিয়ার বন্যজন্তু-বিশেষজ্ঞদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখলাম।

আরও একটা বিষয় আমাদের ভাবিয়ে তুললো। এটা হলো, এলসা আর তার বাচ্চাদের দেহে মাদক ঔষধ প্রয়োগ করার সমস্যা। এলসাকে নিয়ে বিশেষ কোন ঝামেলা হবে না জানি, কিন্তু মুশকিল হবে বাচ্চাদের নিয়ে। ইনজেকশন করে ওদের দেহে মাদক ঔষধ প্রয়োগ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তা করতে গেলে বাচ্চাগুলো বিদ্রোহ করবে। আমাদের তাই এ ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হলো। বিকল্প ব্যবস্থা মানে খাদ্যের সঙ্গে মাদক ঔষধ মিশিয়ে দেওয়া। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে বাচ্চাগুলো যেভাবে খোলা জায়গায় আহার করতে অভ্যস্ত হয়েছে, তাতে এ কাজটা সহজ হবে না। এটা সম্ভব হতে পারে, যদি আমরা ওদের ঘেরা জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে খাওয়াতে পারি।

আমরা তাই পরামর্শ করে ঠিক করলাম এখন থেকে বাচ্চাদের লরীর ওপরে খাওয়াতে হবে। কিন্তু ওরা যে লরীর ওপরে উঠতেই চায় না। লাফ দিয়ে লরীর ওপরে উঠতে ওদের ভীষণ আপত্তি। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে জর্জ একটা উপায় উদ্ভাবন করলো। সে বললে, মাটি দিয়ে ত্রিভুজের মতো একটা ঢালু ঢিবি তৈরি করতে হবে। ঢিবিটার এক প্রান্ত লরীর পাটাতনের সমান উঁচু থাকবে এবং সেখান থেকে ঢালু হয়ে এসে অন্য প্রান্তটা মাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। এর পর লরীকে ব্যাক করে এনে তার পাটাতনের পেছন

দিকটা টিবির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে বাচ্চারা সহজেই সেটা বেয়ে লরীর ওপরে উঠতে পারবে।

পরিকল্পনাটা আমারও খুব মনঃপূত হলো। আমরা তাই আর দেরি না করে লেগে গেলাম টিবি তৈরীর কাজে। ক্যাম্পের লোকদের লাগিয়ে দেওয়া হলো মাটি খুঁড়তে। স্টুডিওর পাশে যে মাঠটায় বাচ্চারা খেলা করে তারই এক দিকে শুরু হলো টিবি তৈরীর কাজ।

আমাদের এই নতুন ধরনের কাজ দেখে এলসার ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ জেসপা, গোপা আর ছোট এলসা বেজায় খুশী। ওরা হয়তো ভাবলো, ওদের খেলার জন্যেই গর্ত কেটে মাটি তোলা হচ্ছে। ওরা তখন তিন ভাই-বোনে মিলে সেই তোলা মাটির ওপরে গড়াগড়ি দিতে শুরু করে দিল।

ওদের খেলার গুঁতোয় কাজ কিছুটা বিলম্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত তৈরী হয়ে গেল টিবিটা। এর পর আমরা যখন লরীকে ব্যাক করে এনে সেই টিবির সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম, তখন আর বাচ্চারা লরীতে উঠতে আপত্তি করলো না। ওরা তখন খুশী মনে টিবি বেয়ে লরীর ওপরে উঠতে শুরু করে দিল। এইভাবে সমস্যার সমাধান করার পর জর্জ বললে, এবার সে বেরিয়ে পড়বে।

২৮শে ডিসেম্বর সকালে ক্যাম্প থেকে রওনা হলো জর্জ। এলসা আর তার বাচ্চারা তখন ক্যাম্পে ছিল না। ওদের সঙ্গে দেখা হলো বিকেলে। ওদের খোঁজেই আমি তখন নদীর ধারে এসেছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে এলসা আর তার বাচ্চারা আমার কাছে এলো। এলসা আমাকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানালো তার চিরাচরিত পদ্ধতিতে। এদিকে তার ছেলেমেয়েরা তখন জলে নেমে পড়েছে। জলের ওপরে অনেকগুলো হাঁসের বাচ্চা সাঁতার কাটছিল। এলসার ছেলেমেয়েরা তাদের তাড়া করতে শুরু করেছে তখন। এলসা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের জলক্রীড়া দেখতে লাগলো।

একটু পরেই জল থেকে উঠে এলো বাচ্চারা। এলসার তখন ইচ্ছে হয়েছে, এবার সে বাচ্চাদের গাছে চড়া শেখাবে। কাছেই ছিল মস্তবড় একটা অ্যাকেশিয়া গাছ। এলসা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই গাছের তলায় এসে উপস্থিত হলো। এরপর নিজে গাছে চড়ে বাচ্চাদের ওঠার জন্যে প্রলুব্ধ করলো। বাচ্চাগুলোও মায়ের দেখাদেখি গাছ বেয়ে ওপরে উঠে গেল। গাছে ওঠার ব্যাপারে এলসা খুব সাবধানী ছিল। কোন ডালে পা দেবার আগে সেই ডালটার শক্তি পরীক্ষা করে নিত। এবারেও ওর ব্যতিক্রম হলো না। কোন ডালে পা দেবার আগে সেটা ওর দেহের ভার সহ্য করতে পারবে কিনা তা ভালভাবে পরীক্ষা করে তারপর সেই ডালে উঠতে লাগলো। মায়ের

দেখাদেখি বাচ্চারাও বিভিন্ন ডালে উঠতে শুরু করলো।

বিকেল উত্‌রে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন। এলসা তাই সপরিবারে গাছ থেকে নেমে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো। আমিও চলতে লাগলাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু চলার পথে বাচ্চারা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে এমন কাণ্ড শুরু করলো যে তাদের সামলানোই দায় হয়ে উঠলো এলসার পক্ষে। আমার অবস্থাও রীতিমত কাহিল হয়ে উঠলো ওদের খেলার গুঁতোয়।

এলসা যে তার ছেলেমেয়েদের কতখানি ভালবাসে তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিন সকালে। সেদিন ও তার বাচ্চাদের নিয়ে নদীর অপর তীরে গিয়েছিল। আমিও চা-পান শেষ করে নদীর ধারে হাজির হলাম। দেখলাম ছ' ফুট লম্বা একটা কুমির জলের ওপরে ভেসে উঠেছে। বাচ্চারা নদী পার হয়ে এপারে আসার জন্যে তৈরী হয়েছিল, কিন্তু কুমিরটার ভীতিপ্রদ চেহারা দেখে জলে নামতে সাহস পাচ্ছিল না।

এলসা তখন ওদের মনে সাহস ফিরিয়ে আনবার জন্যে একে একে ওদের গা চাটতে শুরু করলো। মায়ের কাছ থেকে এইভাবে আদর পেয়ে ওরা বুঝতে পারলো ওই জলচর প্রাণীটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা তখন মায়ের সঙ্গে জলে নেমে সকলে এপারে চলে এলো।

এপারে এসেই শুরু করলো লাফালাফি। এলসাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। সে জেসপার লেজটাকে আলতোভাবে কামড়ে ধরে তাকে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো।

খেলা শেষ হলে জেসপা এসে আমার কাছে বসে পড়লো। এমনভাবে আমার দিকে পেছন ফিরে বসলো যাতে আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারি। ও জানতো, আমার দিকে মুখ করে বসলে আমি ওর গায়ে হাত দিতে ভয় পাই। আমার ভয়টা মোটেই অমূলক ছিল না, কারণ জেসপা তার মায়ের মতো থাবার নখগুলোকে লুকিয়ে রাখার কায়দাটা তখনও রপ্ত করতে পারেনি। ও যদি ওর থাবার সাহায্যে আমাকে আদর করতে চায় তাহলে আমার শরীরের চামড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। এই জন্যেই আমি ওর মুখের সামনে বসে ওকে আদর করতে ভয় পেতাম। কিন্তু আমার দিকে পেছন ফিরে বসায় আমি ওকে ভালভাবেই আদর করলাম সেদিন।

বিকেলের দিকে আমি যখন বেড়াতে বের হলাম তখন সিংহপরিবারও চলতে লাগলো আমার সঙ্গে। তখনও বেশ গরম ছিল। কিন্তু মাইল দুই এগোবার পর গরমের ভাবটা কমে আসতেই এলসা জেসপার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে শুরু করে দিল। মা আর ছেলের এই লুকোচুরি খেলাটা ভারী চমৎকার লাগলো আমার। বিড়ালের বাচ্চা যেভাবে তার মায়ের সঙ্গে খেলা করে

ওরাও প্রায় তেমনিভাবে খেলছে।

এদিকে জেসপা যখন তার মায়ের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছে সেই সময় গোপা আর ছোট এলসা অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু এলসার ভাব-গতিক দেখে মনে হলো, ওদের জন্যে সে মোটেই ব্যস্ত নয়।

ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। এবার আমাদের ফিরতে হবে। কিন্তু গোপা আর ছোট এলসা সেই যে সরে পড়েছে এখনো তাদের দেখা নেই। কোথায় গেল! চারদিকে তাকাতে লাগলাম ওদের খোঁজে। হঠাৎ দেখি, ওরা তুটিতে পাহাড়ের ওপরে বসে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তুজনেই আমাদের দেখতে পেয়েছে তখন। কিন্তু তবুও নামলো না। ওদের এইরকম অনাগ্রহ ভাব দেখে এলসা আব জেসপা পাহাড়ে উঠে ওদের ডাকতে লাগলো। মা আর দাদাব ডাক শুনে অলসভাবে বার তুয়েক হাই তুলে গদাইলস্করী চালে নিচে নেমে এলো ওরা। কিন্তু নিচে এসেও কেন যেন আমার কাছে এলো না। আমি তখন একাই ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

গভীর রাত্রে সিংহের গর্জন শুনতে পেলাম। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারলাম বাচ্চাদের বাবা এসেছে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে। সে রাত্রে ওরা আর ক্যাম্পে এলো না।

পরদিন সকালে মুরুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওদের সন্ধানে। পাহাড়ের কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম আমাদের জামাই বাবাজী তখনও তার বউ-ছেলেমেয়ের কাছে অবস্থান করছেন। সেই পারিবারিক আনন্দ থেকে ওদের বঞ্চিত না করার জন্সে আমরা তখুনি ফিরে এলাম ওখান থেকে।

এরপর পুরো তুটো দিন ওদের আর দেখা মিললো না। এই তুটো দিন প্রায়ই আমবা সিংহের গর্জন শুনতে পেয়েছি।

এলসা ফিরে এলো তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে। জেসপা আর গোপাও এসেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু ছোট এলসা কোথায়? তাকে কি ওরা তার বাবার কাছে রেখে এসেছে? হয়তো তাই হবে।

ওদের দেখে আমার মনে হলো গত তু দিন ওরা ঠিকমত খেতে পায়নি। আমি তখন মুরুকে ডেকে ওদের খেতে দিতে বললাম। খাবার তৈরীই ছিল একটু পরেই বড় সাইজের তিনখণ্ড মাংস দেওয়া হলো ওদের। মাংস পেয়েই খেতে লেগে গেল। খাওয়ার নমুনা দেখে বুঝতে পারলাম সত্যিই ওরা খুব ক্ষুধার্ত। খাওয়া শেষ হতেই আবার ওরা চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

পরদিন সকালেই ওদের খোঁজে পাহাড়ের দিকে ছুটলাম। সেখানে যেতেই দেখি গোপা আর ছোট এলসা দিব্যি আরামে পাহাড়ের ওপরে বসে আছে।

বুঝতে দেরি হলো না যে এলসা এখনও স্বামীর কাছেই রয়েছে। কিন্তু জেসপা কোথায় গেল? সেও কি বাবার কাছে রয়েছে? যাই হোক, ভাই-বোনের নিশ্চিন্ত ভাব দেখে বুঝতে পারা গেল ওদের জন্যে চিন্তা করতে হবে না। হালকা মন নিয়েই ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোতেই দেখি, ওরা ফিরে আসছে। ফেরার পথে একটা শিয়াল দেখতে পেয়ে গোপা আর ছোট এলসা তার দিকে তেড়ে গেল। সিংহ শিশুদের তাড়া খেয়ে শিয়ালের পো এমন দৌড় মারলো যে তাকে ধরে কার সাধ্য!

এলসা কিন্তু নজরও দিল না সেদিকে। ছেলে-মেয়ের শিয়াল তাড়ানো দেখে তাদের তারিফ করার চেয়ে আমার কাছে আসাটাই বোধ হয় বেশী দরকার বলে মনে হলো তার। সে তাই সোজা আমার কাছে ছুটে এসে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানালো আমাকে।

এদিকে জেসপা তখন মুরুকে নিয়ে পড়েছে। মুরু আমার কাছেই আসছিল, কিন্তু জেসপার খেলার গুঁতোয় তার অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল। জেসপাকে সামলাতে তার তখন প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। বেচারাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করলো এলসা। ও বেশ বুঝতে পারলো জেসপাকে সরিয়ে না নিলে মুরু আমার কাছে আসতে পারবে না। ও তাই জেসপার কাছে ছুটে গিয়ে তার সঙ্গে খেলতে শুরু করলো। গোপা আর ছোট এলসাও তখন ফিরে এসেছে। শিয়াল-শিকারে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে ওরাও খেলায় অংশগ্রহণ করলো। মুরু বেচারা তখন জেসপার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমার কাছে চলে এলো।

ক্যাম্পে ফিরে এসে ওদের সবাইকে আমরা খেতে দিলাম। বাচ্চাগুলো সঙ্গে সঙ্গে ভোজন শুরু করলেও এলসার বিশেষ কোন গরজ দেখা গেল না ও ব্যাপারে। ও তখন বারকয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ জঙ্গলের দিকে ছুটলো। ওর চাল-চলন দেখে মনে হলো বাচ্চাগুলোকে এখানে রেখে যাবার জন্যেই সে ওদের নিয়ে এসেছিল।

১লা জানুয়ারী এসে গেল। খ্রীস্টানদের কাছে এ দিনটি বিশেষ মূল্যবান। তারা মনে করে, নববর্ষের এই প্রথম দিনটি তাদের কাছে আনন্দের বার্তা বহন করে আনে। তারা তাই খুশী মনে পালন করে নববর্ষের উৎসব—ন্যু ইয়ার্স ডে। আমার কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগলো এবারের পয়লা জানুয়ারী আমাদের জন্যে আনন্দের বার্তা বহন করে আনেনি।

আমার মনমরা ভাব দেখে জেসপা এসে আমার সঙ্গে খেলতে শুরু করলো। কিন্তু ও জানে না, ওর কাছে যেটা আনন্দদায়ক খেলা আমার কাছে সেটা

রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। ও যদি ওর থাবার সাহায্যে আমাকে আদর করতে শুরু করে তাহলেই কম্ম চিত্তির! আদরের ঠেলায় আমার হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে। আমি তাই ইচ্ছে থাকলেও আহত হবার ভয়ে ওর সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পারছিলাম না। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ও আমার ওপর রেগে যাচ্ছে, কিন্তু বুঝলেও আমি ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেলাম না।

এলসা তখন ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে বসে আমাদের দিকেই লক্ষ্য রাখছিল। আমি ভয় পাচ্ছি দেখে এবং জেসপা রেগে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ও এক লাফে নিচে নেমে এসে জেসপাকে আদর করতে শুরু করলো। মায়ের আদরে তার মনের সব রাগ একেবারে জল হয়ে গেল।

এদিকে এলসা তার বড় ছেলেকে আদর করছে দেখে ছোট এলসা অভিমান-ভরে ঘাসের জঙ্গলের ভেতরে বসে মা আর দাদার দিকে তাকাচ্ছে। এলসা তখন জেসপাকে ছেড়ে ছোট এলসার কাছে গিয়ে তাকে আদর করতে লাগলো। মায়ের আদর পেয়ে ও খুশীমনে ঘাসবন থেকে বেরিয়ে দাদার কাছে হাজির হলো। মেজ ছেলে গোপাও এই সময় সেখানে এসে উপস্থিত। তারপরেই শুরু হয়ে গেল তিন ভাই-বোনের খেলা। বাচ্চাদের খেলতে দেখে এলসা আবার ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে উঠে শুয়ে পড়লো।

আমার মনের আকাশে যে নিরানন্দের কালো মেঘ জমে উঠেছিল, তা দূর হয়ে গেল এলসার বাচ্চাদের আনন্দ দেখে। উনিশ শো বাষট্টির 'ন্যু ইয়ার্স ডে' ভালভাবেই কাটলো।

২রা জানুয়ারী। দুপুরের আগেই কেন্ স্মিথ এবং পিটার স এসে হাজির হলো আমাদের ক্যাম্পে। ওরা এসেছিল একখানা লরীতে করে। এসেই বললে যে এলসা আর তার বাচ্চাদের স্থানান্তরণের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে 'গেম ডিপার্টমেন্ট'এর কর্তৃপক্ষ ওদের পাঠিয়েছেন। আরও শুনলাম, আমাদের পুরোনো লরীটার মেরামতের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। শীগগিরই ওটাকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া ওরা যে বেডফোর্ড লরীটা নিয়ে এসেছে সেটাকেও আমরা ব্যবহার করতে পারি।

আমরা তখন আর সময় নষ্ট না করে বেডফোর্ড লরীটার ওপরে খাঁচা তৈরীর ব্যবস্থায় লেগে গেলাম। কেন্ নিজেই লেগে গেল মাপজোক করার কাজে।

এখানে কেন্ স্মিথের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ও একজন বিখ্যাত সিংহ শিকারী। এলসাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসার মূলেও ছিল কেন্ স্মিথ। এর আগে আরও দুবার ও আমাদের ক্যাম্পে কিছুদিন বাস করে গেছে।

তবে তখন এলসার বাচ্চা হয়নি। আমার কাছ থেকেই ও প্রথম জানতে পারলো এলসার মা হবার খবর। এবং জানবার সঙ্গে সঙ্গেই ও বাচ্চাদের দেখতে চাইলো। কিন্তু কোথায় বাচ্চারা! ক্যাম্পে নতুন লোক আসতে দেখেই ওরা লুকিয়ে পড়েছিল। এলসা কিন্তু কেন্ স্মিথকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। তাই কেন্-এর কাছে এগিয়ে এসে তাকে নীরব ভাষায় অভিনন্দন জানালো ও। কেন্ও তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো।

বাচ্চারা এতক্ষণ স্টুডিওর পাশের জঙ্গলটার মধ্যে খেলা করছিল। মাঝে মাঝে নবাগত লোক দুটিকেও দেখছিল। ওরা যখন বুঝতে পারলো ওদের মায়ের সঙ্গে নবাগতদের পরিচয় আছে, তখন আর কোন সংকোচ রইল না ওদের। খেলা ছেড়ে তখন এলসার কাছে এসে হাজির হলো ওরা।

বাচ্চাদের দেখে খুবই খুশী হলো কেন্। ও তখন ক্যামেরা বের করে এলসা এবং তার বাচ্চাদের গ্রুপ ফটো নেবার জন্যে তৈরী হলো। এলসা কোন আপত্তি জানালো না এতে। কিন্তু জেসপার হাব-ভাব বিশেষ সুবিধের মনে হলো না। ও আবার লুকিয়ে পড়লো জঙ্গলের মধ্যে।

এদিকে কেন্ তখন ক্যামেরায় ফিল্ম ভরতি করে এলসার দিকে এগিয়ে আসছে। এলসাও দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। খোপা আর ছোট এলসাও দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়ের পাশে। ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জেসপাও বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে। তবে গোপা আর ছোট এলসার মতো মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো না ও। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে কেন্ আর পিটারকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

জেসপার রকমসকম দেখে, বিশেষ করে তার চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে কেন্ স্মিথ শেষপর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করলো। ও বেশ বুঝতে পারলো বাচ্চারা তাদের দেখে ঘাবড়ে গেছে। বেডফোর্ড লরীটাকেও বাচ্চারা সুনজরে দেখছিল না। বারবার তাকাচ্ছিল লরীটার দিকে। ব্যাপার দেখে কেন্ আর পিটার লরীটাকে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখে এলো।

এরপর ওরা যখন ক্যাম্পে ফিরে এসে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে, সেই সময় এলসা এসে হাজির হলো আমাদের কাছে। সে এসেই কেন্-এর হাঁটুর ওপরে থাবা তুলে দিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইলো। এলসার এই ইঙ্গিতটা আমার জানা। ও যখন কাউকে সরে যেতে বলে, তখনি সে ওইভাবে তার হাঁটুর ওপরে থাবা তুলে দেয়। আমি ওর ওই মনোভাবের কথা কেন্ আর পিটারকে বলতেই সরে গেল ওখান থেকে ওরা।

পরদিন সকালে সবাই মিলে চা পান করলাম। এরপর আমি বাচ্চাদের খবর

নেবার জন্যে তাদের কাছে গেলাম। জেসপার একটা চোখ বেশ একটু ফুলেছে দেখলাম। কেন ফুলেছে জানবার জন্যে ওর কাছে গিয়ে ভালভাবে চোখের দিকে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম ওর চোখের পাতায় একটা কাঁটা ফুটে রয়েছে। যত্নসহকারে সেই কাঁটাটি বের করে ফেললাম।

কাঁটা তোলবার পর জেসপা তার দেহের আরও দুটি জায়গা জিভ দিয়ে চেটে আমাকে বোঝাতে চাইলো যে ওই জায়গা দুটিও ওর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। জায়গা দুটি লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম, সেখানে 'ম্যাগট' ঢুকেছে।

ম্যাগট হলো এক ধরনের বীজাণু। আফ্রিকার জঙ্গলে 'ম্যাংগো-ফ্লাই' নামে একশ্রেণীর বড় আকারের জংলা মাছি দেখা যায়। এই মাছির বাচ্চাকেই বলা হয় ম্যাগট। 'ম্যাংগো-ফ্লাই'রা ঘাসের ওপর ডিম পাড়ে। ওইসব ডিম ঘাসের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে থাকে। কোন পশু যদি ওইসব ঘাসের ওপরে গড়াগড়ি খায় তাহলে কিছু-সংখ্যক ডিম তার লোমের সঙ্গে বিঁধে তার দেহে আশ্রয় নেয়। এরপর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে সেই বাচ্চাগুলো (অর্থাৎ ম্যাগটগুলো) তার শরীরের চামড়া ফুটো করে মাংসের ভেতরে ঢুকে যায়। যে সব জায়গায় ম্যাগট ঢোকে সে জায়গাগুলো ফোড়ার মতো ফুলে যায়। ম্যাগটগুলো বের করে না দিলে সেই সব জায়গা পরে সেপটিক হয়ে যায় এবং সেখান থেকে পুঁজ বের হতে থাকে।

জেসপার দেহেও ম্যাগট ঢুকেছিল। কিন্তু মুশকিল হলো সেগুলোকে বের করা নিয়ে। ম্যাগট বের করতে হলে ফোলা জায়গাটা খুব জোরে টিপতে হয়। কিন্তু জেসপা যে রকম বন্য স্বভাবের হয়েছে তাতে ম্যাগট বের করতে গেলে ও হয়তো আমার হাতে থাবা বসিয়ে দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর দেহের ফোলা জায়গা টিপতে লাগলাম। জেসপা কিন্তু চুপ করেই রইলো। সে হয়তো বুঝতে পারলো, তার ভালর জন্যেই ও-কাজটা আমি করছি।

জেসপা আমাকে বাধা না দেওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর দেহ থেকে ম্যাগট বের করে দিলাম। ও তখন আরাম পেয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

সন্ধ্যার দিকে জেসপা হঠাৎ আমার তাঁবুতে এসে হাজির। তার হাব-ভাব দেখে মনে হলো আমার কাছ থেকে ও আদর পেতে চাইছে। কিন্তু ওকে আদর করতে গেলে বিপদের আশংকা ছিল। আদরের প্রতিদানে সেও যদি তার থাবার সাহায্যে আমাকে আদর করতে যায় তাহলে তার ধারালো নখগুলো আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে। আগেই বলেছি, জেসপা এবং তার ভাই-বোনেরা তাদের নখগুলোকে থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে শেখেনি।

তাই ওদের গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে আমি ভয় পেতাম। কিন্তু সেদিন সমস্ত ভয়-ভাবনা মন থেকে দূর করে দিয়ে জেসপাকে আদর করলাম আমি। জেসপা ছিল বাচ্চাদের সর্দার। তার সেই সর্দারীর জন্যে মাঝে মাঝে বিপদেও পড়তো ও। একদিন নদীর ধারে গিয়ে দেখতে পেলাম, গোপা আর ছোট এলসা ওপারে দাঁড়িয়ে আছে আর জেসপা এপারে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে জলের দিকে তাকাচ্ছে। ওকে ওইভাবে জলের দিকে তাকাতে দেখে আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। জলের দিকে তাকাতেই দেখি বিশাল একটা কুমির জলের ওপরে ভেসে উঠেছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ওর ভয়ের কারণ।
আমি তখন কুমিরটাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করলাম। পরপর কয়েকটা ঢিল ছুঁড়তেই কুমিরটা ভুস করে জলে ডুব দিল। জেসপা তখন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জলে নেমে ওপারে গিয়ে উঠলো।
এদিকে যখন এইসব ব্যাপার চলছে তখন এলসা এসে দূরে দাঁড়িয়ে আমার কাজকর্ম লক্ষ্য করছিল। কুমিরটাকে তাড়িয়ে তার ছেলেকে নদী পার হতে সাহায্য করেছি বলে ও আমার কাছে ছুটে এসে আমাকে আদর করতে লাগলো।
সন্ধ্যার সময় আমরা যখন ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসছি সেই সময় গোপা হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমার সামনে এসে গর্জন করতে শুরু করলো। কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক! কেন সে রেগে গেছে প্রথমে তা আমি বুঝতেই পারলাম না। পরে বুঝলাম একটা পশু শিকার করে সেটাকে ওই ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ভক্ষণ করছিল। আমরা সেই ঝোপের পাশে হাজির হতেই ওর হয়তো ধারণা হয়েছে যে ওর ভোজনে বাধা দিতে এসেছি আমরা। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই আমার ওপরে রেগে গিয়েছিল গোপা। ব্যাপারটা অবশ্য অল্পতেই মিটে গেল। এলসার ধমক খেয়ে ও চুপ করে গেল।

এই ঘটনার পরের দিন আমাদের টেমস্ লরীটা এসে গেল। কয়েকজন নিগ্রো কুলিও এসেছিল লরীটার সঙ্গে। লরীটা পেয়ে খুশী হলাম। আমরা তখন কুলিদের সাহায্যে লরীটাকে ধোয়া-মোছা করতে লাগলাম। এর পরেই শুরু হলো স্টার্ট দেওয়া। গাড়িটা ঠিকভাবে স্টার্ট নিচ্ছে কিনা দেখার জন্যেই স্টার্ট দিতে শুরু করলাম।
এদিকে আমরা যখন লরীটাকে স্টার্ট নেওয়াবার চেষ্টা করছি সেই সময় পেট্রল আর মবিলের গন্ধে এবং কয়েকজন অপরিচিত নিগ্রোকে দেখে বাচ্চাগুলো ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। শুধু বাচ্চাগুলোই নয়, এলসাও যেন একটু ঘাবড়ে গেছে

মনে হলো। সন্দেহের দৃষ্টিতে বারকয়েক লরীটার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ বাচ্চাদের নিয়ে সরে পড়লো ওখান থেকে।

৮ই জানুয়ারী বিকেলের দিকে হঠাৎ বেবুনদের কিচির-মিচির শুনতে পেলাম নদীর দিক থেকে। বুঝতে দেরি হলো না, শ্রীমতী এলসার শুভাগমন হচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে। আমি এগিয়ে গেলাম ওদের স্বাগত জানাতে। আজ কিন্তু আমাকে দেখে ছুটে এলো না এলসা। আমি দেখতে পেলাম বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ও জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে আছে। কাছে যেতেই দেখলাম ওর শরীরের কয়েকটা জায়গা ফুলে উঠেছে। বুঝতে দেরি হলো না, ওর দেহেও ম্যাগট ঢুকেছে। আমি তখন ওর পাশে বসে ফোলা জায়গাগুলো টিপে ম্যাগট-গুলোকে বের করে দিলাম। ম্যাগট বের করে দেবার পরেও ওখান থেকে উঠতে চাইলো না এলসা। বুঝতে পারলাম যে ওর শরীরটা ভাল নেই।
জেসপা আর গোপা কাছেই ছিল। কিন্তু ছোটকে ওখানে দেখতে পেলাম না। এদিক-ওদিক তাকিয়েও তার সন্ধান পেলাম না। ওকে না দেখে চিন্তিত হলাম। এলসাকে কিন্তু মোটেই চিন্তিত দেখলাম না। তার হাব-ভাব দেখে মনে হলো, ছোটর জন্যে চিন্তা করার কিছু নেই।
পরের দিনও ওরা ক্যাম্পে এলো না। বিকেল পর্যন্ত ওদের জন্যে অপেক্ষা করে আমি আর নুরু ওদের খাবার নিয়ে সেই জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলাম। খাবার দেখে ওরা খুশী হয়ে উঠলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে খেতে শুরু করলো। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই এলসা হঠাৎ কান খাড়া করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বোধ হয় কোন শব্দ শুনেছে। একটু পরেই ও ছুটে গেল নদীর দিকে। ব্যাপারটা কি হলো বুঝতে না পেরে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। নদীর ধারে যেতেই দেখলাম ছোট এলসা ওপারে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে জলের দিকে তাকাচ্ছে। বোধ হয় কুমির দেখতে পেয়ে জলে নামতে ভরসা পাচ্ছে না।
মেয়ের ভয় দেখে এলসা উজানের দিকে এগোতে লাগলো। ছোটও এগোতে লাগলো মায়ের দেখাদেখি। অনেকটা এগিয়ে যাবার পর এলসা দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর মেয়ের দিকে মুখ তুলে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললে। কিন্তু আমার কাছে দুর্বোধ্য হলেও ছোট এলসার কাছে সে ভাষা সু-বোধ্য। ও তখন নির্ভয়ে জলে নেমে সাঁতার কেটে এপারে চলে এলো।
সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন। আমি তাই আর দেরি না করে ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু এগোতেই জেসপা আর গোপার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা বোধ হয় মা আর বোনটির জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি ক্যাম্পে আসবার কিছুক্ষণ পরেই এলসা আর তার ছেলে-মেয়েরা হাজির হলো। ওখানে এসেই এলসা আমাকে আদর করতে লাগলো।

গভীর রাত্রে সিংহের গর্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমার। বুঝতে দেরী হলো না এলসার স্বামী-জী এসেছে। বউ ছেলেমেয়েদের জন্যে মনটা হয়তো উতলা হয়েছে তার। কিংবা শুধু এলসাকেই ডাকছে ও। এলসা কিন্তু তার সে আহ্বান শুনেও শুনলো না। ও তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আহারে ব্যস্ত। এদিকে সিংহ-বাবাজী তখনো ডেকেই চলেছে। মেঘ গর্জনের মতো তার সেই ভীষণ গর্জন শুনে বাচ্চাগুলো বোধ হয় ভয় পেয়ে গেল। তারা খাওয়া বন্ধ করে বারবার তাকাতে লাগলো জঙ্গলের দিকে। এলসা কিন্তু মোটেই সাড়া দিল না। পত্নীর অবাধ্যতা দেখে পতিদেবতা তাঁর হাঁক-ডাক বন্ধ করে সরে পড়লেন ওখান থেকে। বাবার হুঙ্কার থামলে ছেলেমেয়েরা আবার খেতে শুরু করলো। এরপর বাকি রাতটুকু ক্যাম্পে কাটিয়ে ভোর হতে না হতেই ওরা সরে পড়লো।
সারাটা দিন ওদের আর দেখা পাওয়া গেল না। রাত্রেও এলো না। এমন কি পরদিন বিকেল পর্যন্ত ওদের দেখা পেলাম না। অবশেষে সন্ধ্যার আগে ফিরে এলো ওরা। ওদের জন্যে খাবার মজুদ করে রেখেছিলাম আগে থেকেই। আসার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে দিলাম ওদের। খাবারটাও বেশ জুতসই। গোটা একটা ছাগল। সেই 'ছাগলাদ্য' খানা পেয়ে খুশী হলো ওরা। খুশীর চোটে সেটাকে টেনে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

আমাদের লরীটা এসেছে দুদিন আগে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বাচ্চারা লরীর কাছে ঘেঁষছে না। আমার মনে হলো, ওদের ভয়টা ভেঙে দেওয়া দরকার। আমি তাই লরীর উপরে উঠে এলসাকে ডাকলাম। আমার আহ্বানে এলসা এগিয়ে এলো। জেসপাও এলো তার সঙ্গে। জেসপা লরীর দিকে পা বাড়াতেই এলসা তাকে বাধা দিল। ব্যাপার দেখে আমার মনে হলো যে এলসার মনে কোন রকম সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। ওর মন থেকে এই সন্দেহটা দূর করবার জন্যে আমি নিচে নেমে এসে তাকে আদর করলাম। বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে সন্দেহের কোন ব্যাপার নেই এখানে। এলসা কিন্তু তবুও লরীর দিকে এগোলো না। আমি তখন বাধ্য হয়ে তাকে আর জেসপাকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ওখানে এসেই এলসা এক লাফে ল্যাণ্ড-রোভারের ছাদে উঠে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। আমি তখন বাচ্চাদের খেতে দিয়ে এলসার কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে শুরু

করলাম। এই সময় আমি দেখতে পেলাম যে, ওর গায়ের দুটো জায়গায় ক্ষত হয়েছে। ক্ষতস্থানের অবস্থা দেখে মনে হলো সেপটিক হয়ে গেছে। আমি তখন ওর ক্ষতস্থান থেকে ম্যাগট বের করে দিতে সচেষ্ট হলাম; কিন্তু এবার ও আমাকে ওর ক্ষতস্থানে হাত দিতে দিল না। যত বারই আমি হাত দিতে গেলাম তত বারই ও থাবা দিয়ে আমার হাত সরিয়ে দিতে লাগলো।

এলসার ক্ষতস্থান সেপটিক হয়ে গেছে দেখে সেখানে সালফানীলামাইড্ প্রয়োগ করার কথা মনে হলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো যে ওষুধ প্রয়োগ না করে ওদের দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তির ওপরে নির্ভর করাটাই সঙ্গত। বনের পশুরা তাদের এই স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রয়োগ করেই নিরাময় হয়। এলসার বেলাতেও এটাই আমাদের কাম্য ছিল, তাই তাঁবুতে ওষুধ থাকলেও আমি তা প্রয়োগ করলাম না।

ক্যাম্পে তখন কতকগুলো ছাগল আনা হয়েছিল। কোনদিন যদি ওদের জন্যে বন্য পশু শিকার করা সম্ভব না হয় তাহলেও যাতে ওদের খাদ্য সরবরাহ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই ছাগলগুলোকে আনা হয়েছিল। কিন্তু ছাগলগুলোকে খোলা জায়গায় রাখলে হিংস্র জানোয়ারদের আক্রমণে ওরা সাবাড় হয়ে যাবে মনে করে নুরু ওদের জন্যে খাঁচা তৈরি করতে বসলো।

এদিকে এলসার ছেলেমেয়েরা তখন ছাগল দেখে রীতিমতো লোভাতুর হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা এলসাও লক্ষ্য করেছে। সে তাই বাচ্চাদের ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এল্‌সার এই রকম সহযোগিতা আগেও অনেকবার পেয়েছি। আর একদিনের কথা বলছি। সেদিন আমি আর নুরু যখন ওদের নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসছি, সেই সময় জেসপা নুরুকে এমনভাবে বিরক্ত করতে লাগলো যে তার পক্ষে এগোনো কঠিন হয়ে পড়লো। নুরুর অবস্থা দেখে এল্‌সা এগিয়ে এলো তার সাহায্যে। সে এসেই জেসপাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। নুরুর বিপদ কেটে যেতেই শুরু হলো আমার বিপদ। আমাকে ঘিরে গোপা আর ছোট এল্‌সার দৌড়ঝাঁপের ঠেলায় আমার অবস্থা তখন রীতিমতো কাহিল। এল্‌সা তখন জেসপাকে ছেড়ে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসে গোপা আর ছোট এল্‌সাকে দু ধমকে থামিয়ে দিল। এরপর আর ক্যাম্পে ফিরে আসতে কোন অসুবিধে হলো না।

ক্যাম্পে ফিরে এসে ওদের সবাইকে খেতে দিলাম। খাবার পেয়ে বাচ্চারা খুশী মনে খেতে শুরু করলো। এল্‌সা কিন্তু খাবারের দিকে ফিরেও তাকালো না। সে এক লাফে ল্যাণ্ড-রোভারের ছাদে উঠে শুয়ে পড়লো।

এলসা অসুস্থ হয়ে পড়লো

জর্জ ক্যাম্প থেকে চলে গেছে দু সপ্তাহের ওপর। এতদিন তার ফিরে আসা উচিত ছিল। সে না আসাতে আমি বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠলাম। জর্জ এখান থেকে রওনা হবার কয়েকদিন পরে কেন্ স্মিথও চলে গেছে তার কাছে। দুজন গেম ওয়ার্ডেনও গেছে ওদের সঙ্গে।

আমি এখন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। যে কোনদিন ফিরে আসতে পারে ওরা। কিন্তু ফিরে আসবার পরের অবস্থাটা কি হয় সেই কথা চিন্তা করেই আমি শঙ্কিত হয়ে আছি। এখানে এল্সা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। বাচ্চারাও বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। তার মানে, এ জায়গাটা ওদের বেশ পছন্দ হয়ে গেছে। কিন্তু সুদূর রুডলফ্ হ্রদের তীরে গিয়ে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে ওরা কি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে? এছাড়া, ওদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়াটাও একটা সমস্যা। বাচ্চাগুলো এখনও লরীর কাছে ঘেঁষছেই না। এই সব কথা ভেবেই আমার মনটা খারাপ হয়ে আছে।

এখানে ওরা মহা আরামে গাছতলায় শুয়ে থাকে এবং নদী পার হয়ে পাহাড়ে উঠে লুকোচুরি খেলে। মোট কথা এখানে ওরা দিব্যি আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু···

যাক গে, ভবিষ্যতের কথা নিয়ে মন খারাপ না করে এবার বর্তমানের কথা কিছু বলি। যেদিনের কথা বলছি সেদিন সকালেও ওরা স্টুডিওর কাছেই খেলাধুলো করছিল। ওদের খেলতে দেখে আমি একখানা স্কেচ বই নিয়ে ওদের দিকে এগোলাম। একটু এগোতেই পাখিদের কলকাকলি শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল আবার। হায় রে! এই রকম সুন্দর পরিবেশ থেকে কোন্ প্রাণে আমরা ওদের সরিয়ে নিয়ে যাবো!

এলসা সেদিন সকাল থেকেই ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম ভাঙলো বিকেলের দিকে। ঘুম ভাঙতে সে বাচ্চাদের কাছে হাজির হলো। ওখানে গিয়ে বাচ্চাদের কিছুক্ষণ আদর করে সে আমার কাছে চলে এলো। এসেই শুরু করলো আমাকে আদর করা। এটা হলো ওর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশবিক অভিব্যক্তি। ও আমাকে আদর করছে দেখে আমিও ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলাম। আমার কাছ থেকে কিছুক্ষণ আদর কুড়িয়ে আবার ও চলে গেল ছেলেমেয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে আবার তাদের আদর

করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ ওদের আদর করে ক্যাম্পের দিকে রওনা দিল এলসা। চলার পথে বার বার সে পেছনে মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলো আমরা তাকে অনুসরণ করছি কিনা।

এদিকে জেসপার চালচলন দেখে আমি তখন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। ও আমার ক্যামেরাটার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যে সেটাকে আমি ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেললাম। ক্যামেরা ছাড়া আরও যে-সব টুকিটাকি জিনিস আমার হাতে ছিল সেগুলোকেও ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললাম। জেসপাকে যদিও বা ঠাণ্ডা করা গেল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গোপা আর ছোট এলসার ঝামেলা। ওরা দুটিতে এমনভাবে আমার পথ আগলে রইলো যে, আমার পক্ষে এগোনোই কঠিন হয়ে পড়লো। ওদের এই জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি ওখানেই বসে পড়লাম। কিন্তু বসেই কি ছাই রক্ষে আছে! হাজার হাজার মশা এসে আমার কানের কাছে ভন ভন করতে শুরু করেছে তখন। কামড়ও বসাচ্ছে হাতে আর মুখে। মশার অত্যাচারে আমার তখন শোচনীয় অবস্থা। বসে থাকলে মশার উৎপাত আবার চলতে গেলে এল্সার ছেলেমেয়েদের উৎপাত! এই অবস্থায় পড়ে আমি যখন 'কি করি' ভাবছি সেই সময় এল্সা হঠাৎ ফিরে এসে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলো। সে এসেই তার ছেলেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমিও সেই সুযোগে ক্যাম্পে চলে এলাম।

পরের দিন সকালে গোপার চাল-চলন দেখে আমি রীতিমতো বিস্মিত হলাম। তার বয়স তখন সবে এক বছর পার হয়েছে; কিন্তু সেই বয়সেই ওর মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে দেখলাম। ও যখন এল্সার সঙ্গে খেলা করছিল তখনই ওর এই ভাবটা লক্ষ্য করি আমি।

রাতের বেলায় ক্যাম্পের কাছাকাছি রইলো ওরা। পরদিন সকালে এল্সা একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সে লরীটার কাছে ছুটে গিয়ে এক লাফে তার ছাদের ওপরে উঠে পড়লো। গত দশদিন যাবৎ এটাই আমি চাইছিলাম। কিন্তু এ কদিন সে লরীর ধারেকাছে ঘেঁষেনি। তাই, আজ যখন সে নিজেই লরীতে উঠে বসলো, তখন আমার মনে হলো ওই লরীতে করেই যে ওদের আমরা সরিয়ে নেবো, এই আমার মতলবের কথা এখনও তাহলে বুঝতে পারেনি এল্সা।

আমি তখন আর একবার এলসার কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থানগুলো থেকে ম্যাগট বের করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও তাতে রাজী হলো না। আমাকে ক্ষতস্থানে হাত দিতে না দিয়ে সেই জায়গাগুলো চাটতে আরম্ভ করলো। এই

সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে, ওর দেহের সাতটি জায়গায় ক্ষত হয়েছে। আমি এতে ভয়ের কিছু দেখলাম না, কারণ এর আগেও একবার ওর দেহে পনেরটি জায়গায় ক্ষত হয়েছিল।

পরদিন দুপুরে বাচ্চাগুলো ঝোপের মধ্যে খেলা করছিল। এলসা ধীরে ধীরে উঠে তাদের কাছে চলে গেল। ওরা ফিরে এলো বিকেলের দিকে। তারপর ইতস্তত ছড়ানো কাঠের গুঁড়িগুলোর ওপরে খেলতে শুরু করলো। খেলার সময় বাচ্চারা এমনভাবে এল্‌সার গায়ের ওপর এসে পড়তে লাগলো যে, উৎপাত সহ্য করতে না পেরে সে আবার লরীর ওপরে উঠে গেল।

সারা বিকেলটা সেখানেই শুয়ে রইলে এল্‌সা। শুয়ে শুয়েই সে বাচ্চাদের দেখতে লাগলো। এই সময় আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেলাম। এল্‌সা তখনও লরীর ওপরে শুয়ে রইলো। এরপর আমি যখন ফিরে এলাম, তখনও সে সেইভাবে শুয়ে আছে দেখলাম। এরপর সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে এলে সে নেমে এসে ক্যাম্পের পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো। সাধারণত এই সময়টায় সে ল্যাণ্ডরোভারের ছাদে উঠে শুয়ে পড়ে, কিন্তু সেদিন আর সে ওখানে উঠলো না।

পরদিন সকালে এলসা তার বাচ্চাগুলোকে ডাকতে লাগলো। বাচ্চাদের ডাকবার সময় সে মুখ দিয়ে 'মম্ মম্' শব্দ করতে লাগলো। তার মুখের এই রকম শব্দ আমার খুবই ভাল লাগে।

বাচ্চারা আসতেই এলসা তাদের নিয়ে দূরে চলে গেল।

বিকেলের দিকে আমি যখন ওদের কাছে গেলাম তখন এলসা এগিয়ে এসে আমাকে স্বাগত জানালো। গোপাও খুশী হলো আমাকে দেখে। ওরা খেলা করছে দেখে আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম। আমার তখন মনে হলো ওদের সরিয়ে নেবার কথা। এই আনন্দময় পরিবেশ থেকে ওদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। মনে হলো, এলসা তখনও বুঝতে পারেনি যে, তাকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি। কিছুক্ষণ পরে সে আবার কাছে এসে আমার হাত-পা চেটে বুঝিয়ে দিল যে, এবার সে বাড়িতে ফিরতে চায়। এলসার এই আদরটা আমার খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তাকে যখন এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে তখনও কি সে এইভাবে আমাকে আদর করবে? তখনও কি সে আমাকে তার সুহৃদ বলে মনে করবে? কে জানে রুডলফ্ হ্রদের তীরে গিয়ে ওরা এইভাবে আনন্দের সঙ্গে থাকতে পারবে কিনা!

সে রাত্রেও এলসা ল্যাণ্ড-রোভারের ছাদে উঠলো না। গতরাত্রের মতোই সে

ঘাসের ওপর শুয়ে তার ক্ষতস্থানগুলো চাটতে লাগলো। আমি তার কাছে যেতেই গোপা হঠাৎ ছুটে এসে আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে লাগলো। গোপার কাছ থেকে এই রকম ভদ্র ব্যবহার পাবো বলে আমি আশা করিনি। কিন্তু সে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেও আমি তার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে সাহসী হলাম না। সে এখনও তার নখগুলোকে থাবার ভেতর ঢুকিয়ে নেবার কায়দাটা শিখতে পারেনি। তাই সে যদি থাবা মেরে আমার আদরের প্রতিদান দিতে চায় তাহলে তার নখের আঘাতে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ওর আদর আমার পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। আমি তাই ওর কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে মুখে শব্দ করে যতটা সম্ভব ওকে খুশী করতে চেষ্টা করলাম।

গোপা আর জেসপার ঘাড়ে তখন কিছুটা কেশর গজিয়েছে। গোপার কেশর বেশ কিছুটা কালচে রঙের। তাছাড়া লম্বায়ও তার কেশর জেসপার কেশর থেকে বড় হয়েছে। তার কেশরের এই রঙ এবং দৈর্ঘ্য দেখে বুঝতে পারা যায় যে, আর এক বছর পরেই সে পূর্ণাবয়ব শক্তিমান সিংহে পরিণত হবে।

পরদিন বিকেলে ওরা স্টুডিওর কাছে এসে হাজির হলো। আমি তখন ওদের কাছে গিয়ে এলসার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আদর জানালাম। আমার কাছ থেকে আদর পেয়ে সে শুয়ে পড়লো। আমি তখন তার পাশে বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু আমার হাত তার ক্ষতস্থানের কাছে গেলেই সে গোঁ গোঁ শব্দে গর্জন করে আপত্তি জানাতে লাগলো। এই সময় তার নাকের দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তার নাক দিয়ে জল পড়ছে। নাক দিয়ে জল পড়াটা অসুখের লক্ষণ। অর্থাৎ এবার আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারলাম যে, এল্‌সা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার দেহের ক্ষতস্থানগুলো থেকে পুঁজ বের হতে দেখা গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তার ক্ষতস্থানে সালফা-নিলামাইড প্রয়োগ করলাম না! তার দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তির সাহায্যেই যাতে সে নিরাময় হয়ে উঠতে পারে, সেই জন্যেই ওষুধ ব্যবহার করলাম না। তার রক্ত পরীক্ষা করবার কথাও আমার মনে হলো না, কারণ আমার ধারণা যে, ম্যাগটের আক্রমণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন অসুখ তার হয়নি।

সন্ধ্যা উৎরে গেলে এল্‌সা ওখান থেকে উঠে চলে গেল। আমিও তখন আবার তাঁবুতে ফিরে এলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থেকেও যখন এল্‌সা ফিরে এলো না, তখন আমি চিন্তিত হয়ে তার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম। আমার ডাক শুনে সে আমার কাছে ছুটে এসে আমার হাত চাটতে লাগলো। একটু পরেই সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ওদের খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়লাম। খোঁজ পেতেও দেরি হলো না। এল্সা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাহাড়ের ওপরে বসে ছিল। ওরা খুশী মনে বসে আছে দেখে আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

ক্যাম্পে এসে চা পান করবার পর আবার আমি এল্সার কাছে গেলাম। এবার নুরুও চলল আমার সঙ্গে। আমাদের দেখে এল্সা খুবই খুশী হলো। সে এগিয়ে এসে আমাদের অভিনন্দন জানালো। এই সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে, এল্সা টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। তা হলো জেসপার চালচলন। সে সব সময় এল্সার কাছে কাছে থেকে বডিগার্ডের মতো তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। জেসপার এই রকম সতর্কতার জন্যে এলসার গায়ে হাত বোলানো সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। আমি তখন এলসার কাছে বসে তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে গোপা আর ছোট এল্সা এসে হাজির হলো সেখানে। আমরা তখন ওদের নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ফেরার পথে এল্সা এমনভাবে সাবধান হয়ে চলতে লাগলো যাতে বাচ্চারা তার গায়ে পড়তে না পারে। বাচ্চাদের কেউ তার কাছে এলেই সে কান খাড়া করে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো। আমি তার পাশে পাশে হাঁটছিলাম। বেচারা এতই কাহিল হয়ে পড়েছিল যে, মাঝে মাঝে সে বসে পড়ে জিরিয়ে নিচ্ছিলো।
ক্যাম্পে ফিরে আসতে সেদিন বেশ দেরি হলো। ওখানে এসেই এল্সা ল্যাণ্ড-রোভারের ছাদে উঠে শুয়ে পড়লো। তাকে ওইভাবে শুয়ে পড়তে দেখে আমি এক প্লেট মজ্জা নিয়ে তার কাছে হাজির হলাম। এই জিনিসটা এলসার খুব প্রিয় খাবার। কিন্তু সেদিন সে প্লেটটির দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো।
পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলাম যে, জেসপা আর ছোট এলসা তাঁবুর ধারে লাফালাফি করছে। কিন্তু এলসাকে তাদের কাছে দেখতে পেলাম না, সে বেশ কিছুটা দূরে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল।
তাঁবু থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে কিছুটা এগোতেই আমি দেখতে পেলাম যে, গোপা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাবভাব দেখে মনে হলো সে নদী পার হতে চেষ্টা করছে।
স্থানত্যাগের নির্দেশ পাবার পর চার সপ্তাহ পার হতে চলেছে। জর্জ এখান থেকে চলে গেছে তিন সপ্তাহ আগে। ও যাবার আগে আমরা স্থির করেছিলাম যে, ২০শে জানুয়ারি আমরা এখান থেকে রওনা হব। কিন্তু তা আর হলো

না। আজ ১৯শে জানুয়ারি। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাচ্চারা লরীতে ওঠেনি। বেডফোর্ড লরীটাও ফিরে আসেনি। এদিকে এল্‌সা অসুস্থ হয়ে পড়েছে; অথচ এখনও আমরা ওদের থাকার জায়গা ঠিক করতে পারিনি। এ অবস্থায় কি ভাবে যে ওদের সরিয়ে নেব তা আমি ভাবতেও পারছি না। আমাদের পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা তাই রীতিমতো পিছিয়ে পড়েছি।

সিংহদের জন্য নতুন আবাসস্থল

জর্জ ফিরে এলো প্রায় এক মাস বাদে। এই দীর্ঘ এক মাস সময় সে আর কেন্ স্মিথ এক বিস্তীর্ণ এলাকা চষে বেড়িয়েছে এলসাদের বাসভূমির সন্ধানে। ওদের সঙ্গে ছিল দুখানা ল্যাণ্ড-রোভার এবং একখানা হালকা লরী। জর্জের মুখে শুনলাম যে, প্রথমেই ওরা গিয়েছিল আলিয়া উপসাগরের তীরে। এর আগেও একবার আমরা ওখানে গিয়েছিলাম। সেবার এল্‌সাও ছিল আমাদের সঙ্গে। (সেবারের সেই সাফারীর কাহিনী বর্ণ ফ্রী বইটিতে লেখা হয়েছে।) আলিয়া উপসাগরের পাশেই লঙ্গানডোটি পর্বতশ্রেণী (Longandoti Hills)। ওখান থেকে কয়েকটি উপত্যকা রুডলফ্ হ্রদ পর্যন্ত নেমে গেছে। জর্জ আশা করেছিল যে, ওই উপত্যকাগুলির কোন না কোনটা দিয়ে মোটর চালানো যাবে। তাই প্রথমেই সে মোটর চালাবার উপযুক্ত পথের সন্ধান শুরু করে।

ওরা তাঁবু খাটিয়েছিল উপসাগরের খুবই কাছে। তাঁবু থেকে বের হতেই ওরা দেখতে পেলো যে, শত শত গরু মোষ আর ছাগল তীর-ভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে। পশুগুলোর সঙ্গে তাদের মালিকরাও এসেছে। তাদের দেখে জর্জ বুঝতে পারে যে, তারা সম্বরু আর রেনডিলে উপজাতির লোক। ওদের বাসভূমি অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা হয়েছে বলে তৃণভূমির সন্ধানে ওখানে এসে হাজির হয়েছে ওরা। সংরক্ষিত এলাকায় আদিবাসীদের আসা নিষেধ। কিন্তু কে কার কথা শোনে! খরার জন্যে খাদ্যের অভাব হলেই ওরা দলে দলে হানা দেয় সংরক্ষিত এলাকায়। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন না। তাঁরা জানেন যে, বৃষ্টি নামলেই ওরা চলে যাবে। আমরাও এটা জানি। তাই আদিবাসীদের ওখানে দেখতে পেয়ে জর্জ এবং কেন্ মোটেই বিস্মিত হলো না।

পরদিন সকালে ওরা মোটর নিয়ে পথের সন্ধানে বের হলো। প্রায় কুড়ি মাইল যাবার পর ওরা একটা নদীর কূলে এসে হাজির হলো। আফ্রিকার বহু

নদীতে জল থাকে না। জলের পরিবর্তে সেখানে থাকে শুধু বালি। তবে বৃষ্টিপাত শুরু হলে পাহাড় এবং উচ্চভূমি থেকে জল গড়িয়ে এসে নদীর কূলে ছাপিয়ে পড়ে। সে সময় মরা গাঙে বান আসে। নদী তখন স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠে। আবার বৃষ্টি বন্ধ হলেই যে-কে-সেই।

জর্জরা যখন ওখানে হাজির হলো তখন বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। অতএব নদীগুলো তখন চওড়া আকারের রাস্তায় পরিণত হয়েছে। যে নদীটাতে ওরা এসেছিল সেটা রুডলফ্ হ্রদে গিয়ে পড়েছে। জর্জ এবং কেন্ তাই নদীর বুকের ওপর দিয়েই চালিয়ে দিল তাদের গাড়িগুলোকে। বালির দানাগুলো বেশ মোটা আর শুকনো থাকায় তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালানো কঠিন হলো না। তবে গাড়ি চালানো কঠিন না হলেও উত্তপ্ত ঝোড়ো হাওয়ার জন্য খুবই অসুবিধে হচ্ছিলো ওদের। ওখানকার তাপমাত্রা তখন ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়েও বেশী। তার ওপর আবার বাতাসটা বইছিল প্রতিকূলে। বাতাসের এই বাধার জন্যেই গাড়ি চালাতে অসুবিধে হচ্ছিলো।

এই সময় ওরা দেখতে পায় যে, দলে দলে জিরাফ আর জেব্রা ছুটে চলেছে। বুঝতে দেরি হয় না ওরা ছুটছে ছায়ার সন্ধানে।

অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে ওরা এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হয়, যে জায়গাটা জর্জ আগে থেকেই জানতো। ওখানে আমরা একবার ক্যাম্প করেছিলাম এবং সেই ক্যাম্পে এল্সা আমাদের গাধাগুলোকে আক্রমণ করেছিল। (এই কাহিনীও বর্ণ ফ্রী বইয়ে লেখা আছে।)

সেখানে আসতেই জর্জ গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ চারধারটা লক্ষ্য করলো। এর-পর আবার শুরু হলো চলা। বিকেলের দিকে ওরা মইটি (Moite) নামে একটা জায়গায় উপস্থিত হলো। ওখানেই নদীটা হ্রদে গিয়ে পড়েছে। গাড়ি থেকে নামতেই ওরা দেখলো যে, বিশাল একপাল গেজেল (grants gazelle) ওখানে চরে বেড়াচ্ছে।

জর্জ আর কেন স্মিথ উভয়েই ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ওরা তখন হ্রদে স্নান করে শরীরের ক্লান্তি দূর করলো।

সে রাতটা হ্রদের তীরে কাটিয়ে পরদিন সকালেই ওরা বের হলো জায়গাটা ভাল করে দেখার উদ্দেশ্যে। কিছুটা যেতেই ডেল্টার উত্তর দিকে একটা জঙ্গল দেখতে পেলো ওরা। এই ধরনের জায়গা সিংহদের খুব পছন্দ। তাছাড়া ওখানে গাছপালার ছায়া থাকায় ক্যাম্প করার পক্ষেও জায়গাটা মন্দ নয়।

জায়গাটা ভাল করে দেখে নিয়ে ওরা আরও এগিয়ে গিয়ে মইটি পাহাড়ে হাজির হলো। ওখানে যেতেই ওরা দেখতে পেলো যে, পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরনা বইছে। ঝরনার আশেপাশের জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করে নিলে

ওখান থেকে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করা যাবে।

কিন্তু এতগুলো সুবিধে থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জায়গাটা ওদের পছন্দ হলো না। পছন্দ না হবার কারণ হলো, ওখানে ভারী লরী আনা যাবে না। পথের অবস্থা দেখে ওরা বুঝতে পারলো যে, সে পথে ল্যাণ্ড-রোভার অথবা হালকা লরী চালিয়ে আসা সম্ভব হলেও 'টেমস্' কিংবা 'বেডফোর্ড' লরী ও-পথে আসতে পারবে না। অথচ ওগুলোকে বাদ দিলে এল্সা আর তার বাচ্চাদের ওখানে আনা যাবে না।

ওরা তাই আবার বেরিয়ে পড়লো উপযুক্ত বাসভূমির সন্ধানে। এবার ওরা হাজির হলো উপসাগরের উত্তর তীরে। পথশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা সবাই। তাই তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটিয়ে সবাই মিলে শুয়ে পড়লো।

গভীর রাত্রে একটা বিকট শব্দ শুনে জর্জের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই সে দেখলো যে, একটা পেল্লাই সাইজের হিপো তার বিদঘুটে বদনটি ব্যাদান করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। গেম ওয়ার্ডাররাও জেগে উঠেছিল হিপো মহারাজের আওয়াজ পেয়ে। ওরা রাইফেল তুলে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলো হিপোকে লক্ষ্য করে। রাইফেলের আওয়াজ শুনে হিপো মহারাজ ভয় পেয়ে জলের দিকে ছুট দিলেন। ওরা তখন আবার শুয়ে পড়লো যে যার জায়গায় গিয়ে। বাকি রাতটা আর কেউ ঘুমোতে পারলো না।

পরদিন সকালে উঠে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। কিছুদূর যাবার পর ওরা দেখতে পেলো যে বহুদূরে একদল আদিবাসী সাগরের ধারে ধারে ঘুরছে। আদিবাসীদের উদ্দেশ্য জানবার জন্য চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো ওরা। ভাল করে লক্ষ্য করতেই ওরা দেখতে পেল যে, আদিবাসীদের পরণে কোন রকম আবরণ নেই। জর্জ এবং কেন্ তাই বুঝতে পারলো ওরা গালুব্বা উপজাতির লোক। ওরা আরও বুঝতে পারলো লোকগুলো ওখানে এসেছে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করতে।

ওদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক লোক তখন হ্রদের তীরে রান্না চাপিয়ে দিয়েছিল। তারা জর্জদের গাড়িগুলো দেখে রান্নাবান্না ফেলে রেখেই দৌড় মারলো। ওদের ভয় দেখে জর্জ আর কেন্ ওখান থেকে আরও উত্তরে চলে গেল। লোকগুলো যাতে নিশ্চিন্ত মনে খানাপিনা করতে পারে তার জন্যেই ওরা দূরে চলে গেল।

অবশেষে ওরা এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হলো যেখানে হাজার হাজার গেজেল হরিণ এবং জেব্রা চরে বেড়াচ্ছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই জায়গাটা ওদের পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু একটা বড় রকমের অসুবিধেও ওখানে ছিল। জর্জ জানতো যে, দুর্দান্ত প্রকৃতির আদিবাসীরা প্রায়ই ওখানে হানা দেয় বিষাক্ত

তীর আর ধনুক নিয়ে। পশু শিকার করার জন্যে ইথিওপিয়ার সীমান্ত পার হয়ে আসে ওরা। এ ছাড়া আরও একটা অন্তরায় ছিল আমার থাকা নিয়ে। ওখানকার নিয়ম অনুসারে কোন বিদেশী স্ত্রীলোকের ওখানে যাওয়া নিষেধ ছিল। এই দুটি অসুবিধের কথা ভেবে অবশেষে মইটিতেই এল্‌সার বাসভূমির সন্ধান করবে বলে স্থির করলো জর্জ। তখন আবার শুরু হলো পশ্চাদপসরণ। অনেকটা যাবার পর ওরা 'সার-এল-টম্বিয়া' নামে একটা নদীর ওপরে এসে হাজির হলো। 'সার-এল-টম্বিয়া' কথাটার অর্থ হলো হাতীদের নদী। কিন্তু নামে হাতীদের নদী হলেও হাতীর কোন চিহ্নই ওখানে ছিল না। বহুদিন আগেই হাতীর দল ওখান থেকে চলে গিয়েছিল।

ওখানে গিয়ে অনেক দিন আগের একটা অভিযানের কথা মনে পড়ে জর্জের। ছাব্বিশ বছর আগে জর্জ এবং তার এক দুঃসাহসী বন্ধু সোনার খনির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ওখানে এসে হাজির হয়েছিল। খিদের জ্বালায় ওদের তখন প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওরা তখন গাছের ডাল আর তেরপল দিয়ে ডিঙি তৈরি করে তাতে চড়ে হ্রদ পার হয়ে লোকালয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

যাই হোক পুরনো কথা বাদ দিয়ে আবার আমরা ফিরে আসছি আসল প্রসঙ্গে।

সার-এল-টম্বিয়া থেকে ওরা মইটিতে এসে হাজির হলো।

এবারে যে পথ দিয়ে ওরা এলো সে পথটা আগের পথের চেয়ে সুগম হলেও ভারী লরীর পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়। তাছাড়া আরও একটু অসুবিধে আছে। তুরকানা উপজাতির লোকেরা প্রায়ই ওখানে মাছ ধরতে আসে। আসার সময় ওরা কিছু-সংখ্যক ছাগলও নিয়ে আসে সঙ্গে করে। অর্থাৎ, ওরা দেখাতে চায় যে, ছাগলদের ঘাস খাওয়াবার জন্যেই ওরা আসছে—মাছ ধরার জন্যে আসেনি। কিন্তু আমাদের পক্ষে মুশকিল হলো এই যে, ছাগল দেখলেই এল্‌সা আর তার বাচ্চাদের জিভ দিয়ে লালা ঝরতে থাকবে। ফলে তারা ছাগলের দলকে উজাড় করতে শুরু করবে। তবে, এই সব ছোটখাটো অসুবিধে থাকলেও এই জায়গাটাই ইজারা নেবে বলে স্থির করে জর্জ।

এখান থেকেই ওরা ইসিওলোয় ফিরে যায়, তবে ফেরবার আগে জেলা কমিশনারের সঙ্গে জায়গাটা ইজারা নেওয়া সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে নেয়। কথাপ্রসঙ্গে রাস্তার কথাটাও আলোচিত হয়। ছশো মাইল দীর্ঘ একটা রাস্তা তৈরি করে দেবার কথা বলে জর্জ। কমিশনার তাতে এই শর্তে রাজী হন যে, রাস্তা তৈরী করবার পুরো টাকাটাই আমাদের ব্যয় করতে হবে। জর্জ তাঁকে বলে আসে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে শীগগিরই সে তার উত্তরটা জানিয়ে

দেবে।

এখানেই শেষ হয় বাসভূমির সন্ধান।

আমার কিন্তু ও জায়গাটা বিশেষ পছন্দ হয় না। ওখানে যে সব সিংহ আগে থেকেই বাস করছে তারা এলসা আর তার বাচ্চাদের সুনজরে দেখবে না। এ ছাড়া আমাদের টাকায় যে রাস্তাটা তৈরি হবে, সে রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। এবং লোক-চলাচল শুরু হলেই ওখানেও হয়তো জনসাধারণের বিপদের কথা উঠবে। এই সব কথা চিন্তা করেই আমি খুশী হতে পারছিলাম না।

আমার যখন এই রকম মানসিক অবস্থা ঠিক সেই সময়েই কয়েকখানা চিঠি এলো আমাদের কাছে। আমরা যে সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম, তারই উত্তর এগুলো। চিঠিগুলো এসেছিল রোডেসিয়া, বেচুয়ানাল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। প্রত্যেক চিঠিতেই এলসার জন্যে নতুন বাসভূমির কথা জানানো হয়েছিল আমাদের।

কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, ওই সব অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। জায়গাগুলোর সুবিধে-অসুবিধের কথা না জানা পর্যন্ত চিঠিগুলোর উত্তরও দেওয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। আবার মইটির জেলা কমিশনারকে জর্জ যে কথা দিয়ে এসেছে, সেটাও বেশীদিন ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

এই সব নানা কথা চিন্তা করে জর্জ বললে যে আমি যদি নাইরোবিতে গিয়ে মেজর গ্রীনউডের সঙ্গে দেখা করে ওই সব অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জেনে নিতে পারি, তাহলেই সবচেয়ে ভাল হয়। জর্জের কথাটা আমারও মনঃপুত হয়। কারণ মেজর গ্রীনউড ওই সব অঞ্চল সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে বন্য-জন্তুদের বসবাসের সমস্যা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। আমি তাই খুশী মনেই রাজী হয়ে গেলাম নাইরোবি যেতে।

পরদিনই আমি নাইরোবি রওনা হলাম। যাবার পথে জেলা কমিশনারের সঙ্গেও একবার দেখা করলাম। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে কর্তৃপক্ষের হুকুমটা রদ করার কোন ব্যবস্থা হতে পারে কিনা। কিন্তু তিনি জানালেন এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

ওখান থেকে আমি ইসিওলোয় গিয়ে কেন্ স্মিথের সঙ্গে দেখা করলাম। সে আমাকে সঙ্গে করে একটা কারখানায় নিয়ে গিয়ে আমাদের বেডফোর্ড লরীটা দেখিয়ে দিল। লরীর ওপরে তখন ইস্পাতের তারের একটা খাঁচা তৈরী হয়ে গেছে দেখলাম। আমার কিন্তু খাঁচাটা খুব মজবুত বলে মনে হল না। আমি

তখন ওটাকে আরও মজবুত করার কথা বলে এলাম।
ইসিওলো থেকে নাইরোবি যাবার পথে স্থানীয় পশু-চিকিৎসকদের সঙ্গে আমি দেখা করলাম। এবং এল্‌সা ও তার বাচ্চাদের স্থানান্তরণের কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলাম। কিন্তু দীর্ঘ সময় আলোচনা করেও বিশেষ কোন ফল হলো না।
পশু-চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনাটা হতাশাব্যঞ্জক হওয়ায় আমি আর দেরি না করে সোজা চলে গেলাম নাইরোবিতে। ওখানে গিয়ে মেজর গ্রীনউডের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি জর্জের একখানা টেলিগ্রাম আমার হাতে তুলে দিলেন। টেলিগ্রামে লেখা ঃ
"এল্‌সার অবস্থা খুব খারাপ। খুব জ্বর। ওরিওমাইসিন নিয়ে এসো।"

এলসার মৃত্যু

টেলিগ্রামটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা দুরুদুরু করে কেঁপে উঠলো। এলসার অবস্থা খুবই খারাপ না হলে জর্জ আমাকে টেলিগ্রাম করতো না। আমি তাই চিন্তাক্লিষ্ট মুখে মেজর গ্রীনউডের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই মিসেস অ্যাডামসন। টেলিগ্রামটা আসার পরে মিঃ স্মিথ আমাকে ফোন করেছিলেন ইসিওলো থেকে। তিনি আপনাকে জানাতে বলেছেন যে, ইতিমধ্যেই তিনি আপনার স্বামীর কাছে ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন।
মেজর গ্রীনউডের কথায় মনটা একটু হালকা হলেও সুস্থির হতে পারলাম না। যাই হোক, আমি তখন আমার ওখানে আসার কারণটা খুলে বললাম তাঁকে। সব কথা শুনে তিনি বললেন যে, রুডলফ হ্রদের তীরে জায়গা পাওয়া গেলে সেটাই হবে সবচেয়ে ভাল। রোডেসিয়া বা বেচুয়ানাল্যাণ্ড সিংহদের বসবাসের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়।
মেজর গ্রীনউডের অভিমত শুনে সেইদিন আমি মার্সাবিটের জেলা কমিশনারকে একখানা টেলিগ্রাম করলাম। টেলিগ্রামে লিখলাম, জর্জের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল তিনি সেই অনুসারে কাজ শুরু করতে পারেন।
এইসব কাজকর্ম সারতে দুপুর পার হয়ে গেল। আমি তখন মেজরকে জানিয়ে দিলাম যে পরদিনই আমি ওখান থেকে চলে যাব, কারণ এলসার জন্যে আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিচের তলায় আসতেই দেখি কেন্ স্মিথ আমার জন্ত অপেক্ষা করছে। তার ধুলোমাখা পোশাক-পরিচ্ছদ আর বিবর্ণ মুখ দেখে আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম। জিগোস করলাম—কি ব্যাপার। আপনি হঠাৎ এখানে এসে হাজির হলেন যে? কোন খারাপ খবর নিয়ে এসেছেন কি?

আমার প্রশ্নের উত্তরে কেন্ যা বললে তার সারমর্ম হলো: গতরাত্রে জর্জের কাছ থেকে সে একটা জরুরী খবর পেয়েছে। জর্জ তাকে জানিয়েছে যে, সে যেন অবিলম্বে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দেয় এল্‌সার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে।

কেন্ বললে, খবরটা পেয়েই আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তারপর সারারাত গাড়ি চালিয়ে এইমাত্র এসে পৌঁচেছি।

খুব ভাল করেছেন মিঃ স্মিথ। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো তার ভাষা খুজে পাচ্ছি না। যাই হোক, আপনি ব্রেকফাস্ট করে একটু সুস্থ হয়ে নিন। ইতিমধ্যে আমি দেখছি কোন প্লেন চার্টার করতে পারি কিনা।

প্লেন চার্টার করতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু মুশকিল হলো অন্য ব্যাপারে। প্লেনটা যেখানে নামবে সেখান থেকে আমাদের ক্যাম্প সত্তর মাইল দূরে। সুতরাং প্লেন থেকে নেমে যদি কোন মোটর গাড়ি ভাড়া করতে না পারি তাহলে হয়তো ছোটাছুটিই সার হবে।

আমার আশঙ্কার কথা শুনে কেন্ ভরসা দিয়ে বললে যে, ওখানে মোটর গাড়ি পেতে অসুবিধে হবে না। কার না পেলেও ল্যাণ্ডরোভার পাওয়া যাবেই। কেনের কথা শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তখুনি আমরা বিমান বন্দরে গিয়ে প্লেনে চড়লাম।

কেনের কথাই সত্যি হলো। প্লেন থেকে নেমেই একখানা ল্যাণ্ড-রোভার পেয়ে গেলাম আমরা।

ক্যাম্পে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। ওখানে যেতেই দেখি জর্জ বিষণ্ণ মুখে স্টুডিওর পাশে বসে আছে। তার মুখের দিকে তাকাতেই আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারলাম এখুনি কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনতে হবে আমাকে।

জর্জ কিন্তু একটা কথাও বললে না। শুধু তার বিষণ্ণ মুখখানা তুলে ধরলো আমার দিকে। কিন্তু কথা না বললেও তার চোখের নীরব ভাষাই আমাকে বুঝিয়ে দিল যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কান্না এসে আমার গলার স্বর বন্ধ করে দিচ্ছিলো। কেবলই মনে হচ্ছিলো,

হায় রে ! একবার শেষ দেখাটাও দেখতে পেলাম না এল্‌সাকে !
শোকের প্রথম আঘাতটা সামলে উঠতেই জর্জ আমাকে নিয়ে চললো এলসার সমাধির পাশে। অদূরে একটা গাছের নিচে সমাধিস্থ করা হয়েছিল এলসাকে। এটা সেই গাছ যার তলায় আমার এল্‌সা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দে খেলা করতো—যার গায়ে আঁচড় কেটে এল্‌সার বাচ্চারা তাদের নখের ধার পরখ করতো। এই গাছের নিচেই গত বছর এলসার স্বামী বড়দিনের ভোজের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করেছিল !
পাশেই এল্‌সার সমাধি। ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সে সমাধিক্ষেত্র। এখানেই চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে আছে আমার এল্‌সা। আমার সেই প্রাণবন্ত এল্‌সা, যাকে আমি এতটুকু থেকে কোলে-পিঠে করে লালনপালন করেছি, যার সুখের জন্যে নিজের সুখ-শান্তির দিকে আমি তাকাইনি, যাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারতাম না আমি—আজ আর সে নেই। চিরদিনের মতো আমাকে সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।
অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার সমাধির দিকে তাকিয়ে থাকার পর কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে জর্জকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি চলে যাবার পর কি হয়েছিল ?
আমার কথার উত্তরে জর্জ বলতে শুরু করলো এল্‌সার শেষ দিনকটির করুণ ইতিহাস। ও বললে, তুমি চলে যাবার পরেই আমি আমার তাঁবুটা ওই ঢিবির কাছে নিয়ে আসি। এল্‌সা আর তার বাচ্চাদের গতিবিধির ওপর চোখ রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁবুটা ওখানে নিয়ে আসি। কিন্তু সে রাত্রে ওরা আর ফিরলো না। সকালে উঠে আমাকে একটা বিশেষ দরকারী কাজের জন্যে গেমপোস্টে যেতে হয়েছিল। ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। এসে দেখি বাচ্চারা নদীর ধারে খেলা করছে এবং এলসা একটু দূরে শুয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করছে।
আমার সঙ্গে তখন ম্যাকেদও ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে এল্‌সা উঠে এসে আমাকে আর ম্যাকেদকে অভিনন্দন জানালো। বাচ্চারাও এলো। তারা এসে মায়ের কাছে খেলতে শুরু করলো।
ওদের খেলতে দেখে আমি ক্যাম্পে চলে গেলাম। রাত্রে ওদের কোন সাড়া পেলাম না! সকালে উঠেই আমি এল্‌সার খোঁজে বের হলাম। কিছুটা যেতেই দেখি সে একটা জঙ্গলের পাশে শুয়ে আছে। সে তখন একাই ছিল। বাচ্চাদের কাউকেই দেখতে পেলাম না। আজ আর সে আমাকে দেখে উঠে এলো না। কাছে যেতেই দেখি সে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। তার খুব কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হলো আমার। তার অবস্থা দেখে তখুনি আমি ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে তোমার নামে একখানা টেলিগ্রাম লিখে ম্যাকেদকে ইসিওলোয় পাঠিয়ে

দিলাম টেলিগ্রাম করার জন্যে। টেমস লরীতে করে তখুনি সে রওনা হলো। ওই টেলিগ্রামে তোমাকে আমি এল্‌সার অসুখের কথা জানিয়ে ওরিওমাইসিন পাঠাবার কথা লিখেছিলাম। একখানা চিঠিও তোমাকে লিখেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে।

ম্যাকেদকে পাঠিয়ে দিয়ে আবার আমি ফিরে গেলাম এল্‌সার কাছে। যাবার সময় তার জন্যে কিছু মাংস ব্রেন আর জল নিয়ে গেলাম। ব্রেনের সঙ্গে আমি সালফাফিয়াজোল মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু খাবার জিনিসে ও মুখ দিল না। সামান্য একটু জল খেয়েই ও মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো।

আমি তখন ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। তারপর আবার আমি এল্‌সার কাছে গেলাম। যেতেই দেখি ও কিছুটা সরে গিয়ে লম্বা হয়ে ঘাসের ওপর শুয়েছে। ও অবস্থা দেখে আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম। বেশ বুঝতে পারলাম যে ওর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি তখন তার মুখের কাছে ব্রেন আর মাংসখণ্ড নিয়ে গেলাম। কিন্তু সামান্য একটু জল খাওয়া ছাড়া কোন খাবারই সে খেলো না।

ওকে ওখানে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হলো না। আমার মনে হলো রাতের বেলা ওকে ওখানে একা রেখে গেলে বুনো মোষ বা হায়না এসে ওকে আক্রমণ করতে পারে। আমি তাই সে রাতটা ওর কাছে থাকব ঠিক করলাম। মনে মনে এই রকম স্থির করেই আমি ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে ওখানকার লোকদের সাহায্যে আমার খাটিয়াটা এল্‌সার কাছে নিয়ে এলাম। যে ছাগলটা ওর জন্যে মেরে রেখেছিলাম তার বাকি অংশটাও সঙ্গে নিয়ে এলাম। তাছাড়া একটা প্রেসার ল্যাম্পও নিয়ে এলাম। ল্যাম্পটা জ্বেলে রেখে সে রাতটা ওর কাছেই শুয়ে রইলাম আমি। কিছুক্ষণ পরে বাচ্চারা ওখানে এলো। তারা এসেই ছাগলের মাংসটা খেতে শুরু করলো। এরপর জেসপা আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার গা থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলো। এই সময় এল্‌সাকে একটু সুস্থ মনে হলো। দুবার ও উঠে আমার বিছানার কাছে এসে আমার গায়ে মাথা ঘষে আদর জানালো।

গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠতেই দেখি বাচ্চাগুলো আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে কি যেন লক্ষ্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি টর্চ-লাইট জ্বেলে জঙ্গলের দিকে আলো ফেলে দেখতে পেলাম যে, একটা বিশালকায় মোষ জঙ্গলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলো চোখের ওপরে পড়তেই মোষটা পালিয়ে গেল। বাচ্চারা তখন আবার খেলতে শুরু করলো। ওরা চাইছিল যে ওদের মাও ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিক। মায়ের যে অসুখ করেছে তা ওরা বুঝতে পারেনি। তাই ওরা

বার বার এল্‌সার কাছে গিয়ে ওকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু যতবারই ওরা তার কাছে যাচ্ছিল ততবারই ও মৃদু গর্জন করে উঠছিল।

ভোরের দিকে এল্‌সাকে বেশ সুস্থই দেখলাম। আমি তখন ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে নিলাম। কিছু টাইপ করার কাজ ছিল, সেগুলোও সেরে ফেললাম।

বেলা দশটার সময় আবার আমি এল্‌সাকে দেখতে গেলাম। কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও ওকে দেখতে পেলাম না। বাচ্চাদেরও দেখতে পেলাম না। এর পর প্রায় দু ঘণ্টা খোঁজাখুজি করে অবশেষে ওকে দেখতে পেলাম ক্যাম্পের দিকে একটা চরের ওপরে নির্জীবের মতো শুয়ে আছে। ওর অবস্থা দেখে আমার খুব দুঃখ হলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছিল ও। আমি তখন আঁজলা ভরে জল এনে ওর মুখের সামনে ধরলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও ও পান করতে পারলো না সে জল।

প্রায় এক ঘণ্টা আমি ওর কাছে বসে রইলাম। এরপর এল্‌সা হঠাৎ প্রাণপণ চেষ্টায় দাঁড়িয়ে উঠে জলের দিকে যেতে লাগলো। কিন্তু জল পর্যন্ত ও আর পৌঁছতে পারলো না, তার আগেই হুমকি খেয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে ছুটে গেলাম আমি। দেখতে পেলাম যে, ওর তখন উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। ওর অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ হলো আমার। মনে হলো এখনি ওকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি তাই নুরুকে ডেকে এনে ওর কাছে রেখে ক্যাম্পে চলে গেলাম। বলা বাহুল্য, ওকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করার জন্যেই আমি ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

ওখানে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর জন্যে একটা স্ট্রেচার তৈরি করে ফেললাম। তাঁবুর খুঁটি আর বিছানার কম্বল দিয়ে তৈরি করা হলো স্ট্রেচারটা। আমি তখন ওই স্ট্রেচার আর কয়েকজন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এলসার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে স্ট্রেচারে তুলতে চেষ্টা করলাম। এল্‌সা কিন্তু স্ট্রেচারে উঠতে চাইলো না। তার আপত্তি দেখে আমিও কোন রকম জোর করলাম না।

বিকেল তিনটের সময় আবার ও উঠে দাঁড়ালো। আমি তখন ওকে ধরে অনেক কষ্টে তাঁবুর কাছে নিয়ে এলাম। একটু পরেই এল্‌সার বাচ্চারা এসে হাজির হলো সেখানে। কিন্তু জানি না কেন তারা মায়ের কাছে এলো না। আমি তখন তাদের জন্যে কিছু মাংস নিয়ে নদীর ধারে রেখে এলাম। একটু পরেই তারা এসে খেতে শুরু করলো। এল্‌সা তখন দাঁড়িয়ে উঠে অতি কষ্টে নদীর ধারে এসে বালুকাময় তীরভূমির ওপর শুয়ে পড়লো। একটু পরে জেসপাও এসে হাজির হলো ওর কাছে। মায়ের অবস্থা দেখে সে ঘাবড়ে

গিয়েছিল। সে তাই মায়ের পাশে বসে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

প্রায় দু ঘণ্টা ওখানে শুয়ে ছিল এল্‌সা। এই দু ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ও দুবার নদীতে গিয়েছিল জল পান করবার জন্যে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ও ঢোক গিলতে পারলো না। ওর অবস্থা দেখে আমি আঁজলা করে জল তুলে ওকে খাওয়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন রকমেই ওকে জল খাওয়াতে পারলাম না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর অতি কষ্টে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্পের কাছাকাছি গিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি তখন দুধের সঙ্গে কিছুটা হুইস্কি মিশিয়ে পিচকিরির সাহায্যে তাকে খাওয়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সামান্য একটু খাওয়াবার পরেই আর সম্ভব হলো না। আমি তখন ওর গায়ের ওপরে একটা কম্বল চাপা দিয়ে দিলাম। ওর অবস্থা দেখে আমার মনে হলো যে, রাতটাও কাটবে না। এই কথাটা মনে হতেই আমি তোমার কাছে খবর পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার আরও মনে হলো যে, ওকে বাঁচাতে হলে এখুনি একজন পশু-চিকিৎসককে নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু আমার পক্ষে তখন ওকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু উপায়ই বা কি। ক্যাম্পে তখন এমন কোন লোক নেই যাকে ডাক্তার আনতে পাঠানো যেতে পারে। তাছাড়া যে লরীখানা ইসিওলোয় পাঠানো হয়েছিল সেখানা তখনো ফিরে আসেনি। লরীতে এলসার জন্যে ওষুধ আনবার কথা।

কিন্তু ওখানে চুপচাপ বসে থাকলে কিছুই হবে না মনে করে আমি বেরিয়ে পড়বো বলেই স্থির করলাম। মনে হলে যে, রাস্তায় হয়তো লরীখানাকে দেখতে পাবো। এই কথা চিন্তা করে তখুনি আমি বেরিয়ে পড়লাম ল্যাণ্ড-রোভারটা নিয়ে।

মাইল দুই যাবার পরেই লরীখানাকে দেখতে পেলাম। ড্রাইভার জানালো ইসিওলো থেকে এল্‌সার জন্যে ওষুধ নিয়ে এসেছে। আমি তখন কেনের কাছে একখানা চিঠি লিখে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে আবার তাকে ফেরত পাঠালাম ইসিওলোয়। চিঠিতে এলসার অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়ে কেন্‌কে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করলাম। ড্রাইভারের কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে আবার আমি ফিরে গেলাম ক্যাম্পের দিকে।

ক্যাম্পে এসে দেখতে পেলাম যে, এলসা তখনো একই ভাবে শুয়ে আছে। বাচ্চাগুলোও এসে গেছে ক্যাম্পে। আমি তখন বাচ্চাদের খেতে দিয়ে এল্‌সার কাছে গিয়ে ওকে ওষুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শত চেষ্টাতেও

ওকে ওষুধ খাওয়ানো সম্ভব হলো না।
রাত প্রায় একটার সময় ও আস্তে আস্তে আবার তাঁবুতে এসে শুয়ে পড়লো। প্রায় এক ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থেকে আবার হঠাৎ উঠে পড়লো। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে নদীতে গিয়ে জল খেতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করেও ও জল খেতে পারলো না। আমি বুঝতে পারলাম যে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে ও। কিন্তু ওকে সাহায্য করা আমার সাধ্যের বাইরে। জল খেতে না পেরে আবার ও আমার তাঁবুতে এসে শুয়ে পড়লো।
এই সময় বাচ্চারা এসে হাজির হলো ওর কাছে। জেসপা নাক দিয়ে ওর গা শুঁকতে লাগলো। এল্‌সা কিন্তু যেমন শুয়ে ছিল তেমনই রইলো। বাচ্চাদের দিকে ফিরেও তাকালো না।
রাত দুটোর সময় এলসা হঠাৎ তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো। আমি জেগেই ছিলাম, ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমার মনে হলো, এই অবস্থায় তাঁবু ছেড়ে বাইরে যাওয়া ওর পক্ষে উচিত হবে না। এই কথা মনে হতেই আমি ওকে বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার বাধাকে অগ্রাহ্য করেই ও এগিয়ে চললো নদীর দিকে। তারপর এই গাছটার কাছে এসে ভিজে বালির ওপরে শুয়ে পড়লো। ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম খুবই কষ্ট হচ্ছে ওর। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে তখন। ওর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমি ওকে তাঁবুতে নিয়ে যাবার কথা ভাবতে লাগলাম। মনে হলো পশু-চিকিৎসক এসে পড়লে এখনো হয়তো বাঁচানো যাবে ওকে।
তখন প্রায় সাড়ে-চারটে। আমি তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে গিয়ে কয়েকজন সহকারী আর সেই স্ট্রেচারটা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম। তখন সকলে মিলে ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তুলে বহুকষ্টে আবার তাঁবুতে নিয়ে এলাম ওকে। তাঁবুতে এনে শুইয়ে দেবার পর ওর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়লো।
ভোরের দিকে এল্‌সা আবার উঠে পড়লো হঠাৎ। তারপর এগিয়ে চললো সামনের দিকে। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই ও পড়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বসলাম।
কয়েক মিনিট পরে ও উঠে বসলো। তারপর হঠাৎ একটা বিকট আর্তনাদ করে ঢলে পড়লো মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে এল্‌সার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।
বাচ্চাগুলো কাছেই ছিল। তারা তখন ভীষণভাবে ঘাবাড়ে গেছে। জেসপা মায়ের কাছে এগিয়ে এসে ওর মুখ চাটতে লাগলো। কিন্তু মা নড়াচড়া করছে না দেখে ও কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। ও তখন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল ভাই-বোনের কাছে।
আধ ঘণ্টা পরে ইসিওলোয় সিনিয়ার ভেটারিনারি অফিসার জন ম্যাক-

ডোনাল্ড্ এসে হাজির হলেন। কিন্তু তখন আর করার কিছুই নেই। ম্যাক-ডোনাল্ড্ সাহেব তখন পোস্টমর্টেমের কথা বললেন। জর্জের এতে ভীষণ আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নানা কথা চিন্তা করে ও তার সম্মতি জানাল।

পোস্টমর্টেম শেষ হতেই এলসাকে সমাধিস্থ করা হলো। যে অ্যাকেশিয়া গাছের তলাটা এলসার অতি প্রিয় জায়গা ছিল সেই গাছের পাশেই তাকে কবর দেওয়া হলো।

কবর দেওয়া শেষ হতেই জর্জের নির্দেশে গেম স্কাউটরা সেই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পর পর তিনবার রাইফেল ফায়ার করলো। অদূরে অবস্থিত পাহাড়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো। কে জানে সে শব্দটা এল্সার স্বামীর কানে পৌঁছলো কিনা।

সে দিনের তারিখটা হলো উনিশশো একষট্টির চব্বিশে জানুয়ারি।

এলসার সন্তানদের অভিভাবক

আমরাই এখন এলসার ছেলেমেয়েদের অভিভাবক। এলসার অবর্তমানে ওদের দেখাশুনার ভার আমাদের ওপরেই এসে পড়েছে। তাই এল্সার জন্য হা-হুতাশ করার চেয়ে ওর বাচ্চাগুলোকে লালনপালনের দায়িত্বটাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বিকেলের দিকে বাধ্য হয়েই আমাদের বেরোতে হলো ওদের সন্ধানে।

যাবার পথে একটা জায়গায় অনেকখানি রক্ত দেখে বুঝতে পারলাম যে কোন একটা বড় আকারের জানোয়ার মারা পড়েছে। হয়তো বাচ্চাদের পিতৃদেবের কাজ এটা। আরও এগিয়ে পাহাড় অবধি ধাওয়া করা গেল। কিন্তু সেখানে গিয়েও ওদের দেখা মিললো না।

একটু পরেই সূর্যদেব অস্ত গেলেন। আমি তখন নদীর ধারে ফিরে এসে বালুকাময় তীরের ওপর বসলাম। এই জায়গাটাতেই গত বছর এল্সা ওর বাচ্চাদের নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেও বাচ্চারা এলো না। এদিকে অন্ধকার একটু ঘন হতেই হায়েনার ডাক শুনতে পাওয়া গেল। ব্যাপার দেখে ওখানে থাকা আর নিরাপদ হবে না মনে করে আমি ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই আবার শুরু হলো তল্লাশী। নদীর তীর ধরে উজানের দিকে এগিয়ে চললাম। যাবার সময় কিছু মাংসও সঙ্গে নিয়েছিলাম। মাংসের

লোভ দেখিয়ে যদি বাচ্চাদের আনা যায় এই উদ্দেশ্যেই মাংস সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু 'কোন বুদ্ধিই খাটল না ঘরপোড়ার কাছে'। জেসপা একটা ঝোপের ভেতর যেন উঁকি মেরে আমাদের হাতে মাংসের চাঙর দেখেও কাছে ঘেঁষলো না। পেটে খিদে থাকতেও মুখের লাজ তার গেল না। বেচারারা অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে বুঝতে পেরে আমরা মাংসের চাঙরটাকে এখানেই রেখে দিয়ে ক্যাম্পের দিকে চলতে লাগলাম। একটু যেতেই পেছনে হুটোপাটির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখলাম যে ছোট এলসাও এসে গেছে দাদার কাছে। কিন্তু আমাদের ফিরে তাকাতে দেখেই ও জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। আরও লক্ষ্য করলাম যে জেসপা নিমেষে সবটা মাংস উদরসাৎ করে ফেলেছে।

এদিকে হায়েনার আক্রমণ থেকে বাচ্চাগুলোকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সেটা একটা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠলো আমাদের কাছে। আমরা তাই স্থির করলাম যে আর ওদের মাংস দেওয়া হবে না। ক্ষিদের জ্বালায় ওরা তখন আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হবে।

কেনের সেইদিনই ইসিওলোয় রওনা হবার কথা। আমরা তাই বাচ্চাদের খোঁজে না বেরিয়ে কেনকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্যে তার সঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। ফেরার পথে ছোট এলসা আর গোপার জন্যে কিছু মাংসও সংগ্রহ করে নিলাম। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম ওরা দুজনেই ভীষণ রকম ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। আমরা তাই গতকাল যেখানে ওদের দেখতে পেয়েছিলাম সেখানে এসে হাজির হলাম। এই সময় জেসপা হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আমাদের কাছ থেকে একখণ্ড মাংস কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। জেসপার এই স্বার্থপরের মতো কাজ দেখে গোপা আর ছোট এলসার জন্যে আমাদের দুঃখ হলো। আমাদের কাছে তখনও অনেকটা মাংস ছিল। আমরা তখন মাংসের চাঙরগুলোকে মাটিতে ফেলে টানতে টানতে ক্যাম্পের দিকে নিয়ে চললাম। এতে কাজ হলো। দেখতে পেলাম তিন ভাইবোনই গুটিগুটি এগিয়ে আসছে আমাদের পেছন পেছন। নদীর কাছে আমরা মাংসখণ্ডগুলোকে ওপারে ছুঁড়ে দিলাম। তারপর ওপারে গিয়ে ওদের দিকে লক্ষ্য রাখলাম। বাচ্চারা কিন্তু নদীর তীরে এসেই থেমে গেল। সাঁতার কেটে এপারে এলো না। ওদের ভাবগতিক দেখে আমরা মাংসখণ্ডগুলোকে একটা গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেঁধে রেখে ওখান থেকে সরে পড়লাম।

ক্যাম্পে এসেই দেখি আমাদের সহকারীরা তিন লরি পাথরের নুড়ি এনে এলসার কবরের ওপরে সাজিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন কবরের চারধারের আগাছাগুলোকে সাফ করিয়ে ওখানে কিছু লতাগাছ লাগিয়ে দিলাম

লতাগাছ বড় হলে পাথরগুলো আর স্থানচ্যুত হতে পারবে না—এই কথা মনে করেই লতাগাছ লাগিয়ে দেওয়া হলো।

আমি তখন মনে মনে স্থির করলাম যে একটা বড় সাইজের পাথরের গায়ে এল্‌সার নাম খোদাই করে রাখবো। এ ছাড়া কবরে বাতি দেবার ব্যবস্থাও করবো বলে ঠিক করলাম।

এই সব ব্যবস্থা করতেই ঘন্টাখানেক কেটে গেল। এরপর আবার আমরা ফিরে গেলাম সেই গাছটার কাছে। যেখানে মাংসখণ্ডগুলো বেঁধে রেখে এসেছিলাম। কাছাকাছি যেতেই দেখি জেসপা আর ছোট এল্‌সা মাংস-খণ্ডগুলোকে নামিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। গোপাটা কিন্তু তখনও নদীর ওপারেই রয়ে গেছে। তীরে দাঁড়িয়ে ও বার বার ওদের দিকে তাকাচ্ছে।

এদিকে আমাদের দেখেই জেসপা আর ছোট এল্‌সা ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে পড়লো। জর্জ তখন বাকি মাংসটা টানতে টানতে নিয়ে চললো ক্যাম্পের দিকে। মাংস বেহাত হয়ে যাচ্ছে মনে করে জেসপা তিন লাফে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জর্জের হাত থেকে মাংসটা ছিনিয়ে নিয়ে ঝোপের ভেতরে চলে গেল। ওর কাণ্ড দেখে মনে মনে হেসে আমরা তখনকার মতো ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

সন্ধ্যার একটু আগে আবার আমরা বেরুলাম ওদের সন্ধানে। তখনও দেখি, গোপাটা ওপারেই রয়ে গেছে। ও হয়তো বার বার আমাদের আনাগোনা করতে দেখে এপারে আসছে না—এই কথা ভেবে আমরা আবার ফিরে গেলাম ক্যাম্পে। এলসার মৃত্যুর পরেই ওরা আর আমাদের কাছে আসছে না। মনে হয়, আমাদের ওরা ভয় পাচ্ছে। জেসপা যদিও সাহস করে মাঝে মাঝে এগিয়ে আসছে, কিন্তু গোপা আর ছোট এল্‌সা আসছে না। আমরা যে ওদের জন্যে কতটা চিন্তিত হয়ে আছি তা ওরা বুঝতে পারছে না।

রাতের বেলা হায়েনার ডাক শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। হায়েনারা যদি বাচ্চাদের আক্রমণ করে তাহলে ওরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আমি তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম—হে ভগবান, এল্‌সার বাচ্চাদের তুমি নিরাপদে রেখো।

ভোর হতেই আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম ওদের সন্ধানে। নদী পার হয়ে পাহাড়ে যেতেই ওদের দেখতে পেলাম। ওরা কিন্তু আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল। তা যাক, ওদের যে বিপদ-আপদ হয়নি এতেই আমরা খুশী।

আমরা তখন নদীর তীর ধরে ভাটির দিকে হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা যেতেই দেখতে পেলাম সামনে কিছুটা দূরে একটা নুড়ির ওপরে শকুন

পড়েছে। কাছে যেতেই দেখি, দুদিন আগে যে মোষটাকে মৃত অবস্থায় দেখেছিলাম এটা সেই মোষেরই ভুক্তাবশেষ। আশেপাশে সিংহের পায়ের দাগ দেখে বুঝতে দেরি হলো না যে, রাতের বেলাতেও সিংহ মহারাজ ওটাকে ভক্ষণ করে গেছেন। এখন ছাল ছাড়া হাড়গোড়গুলো টানাটনি করছে শকুনের দল এসে। মড়িটাকে দেখবার পর আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।
বিকেলের দিকে আমি একাই গেলাম পাহাড়ে। ওখানে যেতেই বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু আমাকে দেখেই ওরা সরে পড়লো। আমাকে ওরা বিশ্বাস করছে না দেখে আমার মনে খুবই দুঃখ হলো। কিন্তু দুঃখ হলেও কিছু করবার নেই। আমি তাই ওদের ওখানে রেখেই ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই ওরা ক্যাম্পে এসে হাজির হলো। ওদের দেখে খুবই খুশী হলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম ওদের কাছে। তারপর 'জেসপা জেসপা' বলে ডাকতেই ও ছুটে এলো আমার কাছে। আমি তখন ওর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। আমার কাছে থেকে আদর খেয়ে ও ফিরে গেল ওর ভাইবোনের কাছে। আমি একটা ডাল নিয়ে জেসপার দিকে লম্বা করে ধরলাম। ডালটা দেখে জেসপা ছুটে এসে তার প্রান্তটা ধরে টানতে শুরু করলো। শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে 'টাগ-অব-ওয়ার'। এ খেলায় জেসপারই জিত হলো। ও তখন বিজয়গর্বে ডালটাকে ভাইবোনদের কাছে নিয়ে গিয়ে ওদের কাছে নিজের বীরত্বটা দেখিয়ে দিল।
আমি তখন ওদের কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে ওদের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।
জেসপা তখন ওর ভাইবোনের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছে। ওদের খেলতে দেখে আবার আমি এগিয়ে গেলাম ওদের কাছে। আমাকে দেখেই জেসপা ছুটে এলো আমার কাছে; কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। একটু পরেই জর্জ ফিরে এলো। কিন্তু ওকে দেখেই জেসপা একদৌড়ে জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকে গেল। আমরা তখন কিছু মাংস নিয়ে নদীর ধারে রেখে এলাম। ফেরার পথে বিশাল একটা মোষকে দেখতে পেলাম জঙ্গলের ধারে। মোষটা ঘোঁত ঘোঁত করে ছুটে এসে আমার উরুর ওপরে একটা চাট্ মারলো পেছনের পা দিয়ে। ভাগ্যিস আঘাতটা জোরে লাগেনি; আমি তাই দ্রুতবেগে সরে পড়লাম ওখান থেকে। বাচ্চারাও দেখতে পেয়েছিল মোষটাকে। ওরা তাই ভয় পেয়ে নদীর ওপারে চলে গেল। সে রাত্রে ওরা আর ফিরে এলো না ক্যাম্পে।
ভোরের দিকে বেবুনের কিচিরমিচির শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। আমরা তখন দু টুকরো মাংস নিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে হাজির হলাম। পাহাড়ের

কাছে যেতেই বাচ্চাদের দেখা মিললো। আমরা তখন এক টুকরো মাংস ওদের খেতে দিয়ে বাকি টুকরোটা নিয়ে এপারে চলে এলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মাংসটা ফিরিয়ে নিয়ে এলাম সে উদ্দেশ্যটা সফল হলো না। বাচ্চারা এলো না।

দুপুরের দিকে আমার মনে হলো যে, ওরা হয়তো খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে। এই কথা মনে হতেই আমি মাংসটাকে নদীর ওপারে ছুঁড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জেসপা মাংসটাকে নিয়ে একটা জাম গাছের তলায় চলে গেল। আমি তখন একটু দূরে গিয়ে ওদের দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। আমি তখন দেখতে পেলাম যে গোপা আর ছোট এল্‌সাও খেতে শুরু করেছে মাংসটা।

বিকেলে চা পানের পরে আমি আর জর্জ ওদের সন্ধানে বের হলাম। নদী পার হয়ে পাহাড়ের দিকে যেতেই দেখা মিললো ওদের। কিন্তু আমাদের দেখেই ওরা সরে পড়লো।

রাতের বেলা নদীর ওপার থেকে হায়েনার ডাক শুনতে পেলাম। ব্যাপারটা আমাদের চিন্তিত করে তুললো। বাচ্চাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমরা। কিন্তু একটু পরেই সিংহের গর্জন শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। বুঝতে পারলাম যে ওদের বাবা এসে গেছে ওখানে। কিছুক্ষণ পরে এল্‌সার কবরের দিক থেকে তিনবার ওর গর্জন শোনা গেল। ওর সেই বিশিষ্ট গর্জন শুনে আমাদের মনে হলো, ও বোধ হয় এল্‌সাকে ডাকছে। হায় রে! ও হয়তো এখনও বুঝতে পারেনি এল্‌সা আর কোনদিন ওর ডাকে সাড়া দেবে না!

ভোর হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাচ্চাদের খোঁজে। নদীর ওপারে যে যে জায়গায় ওদের দেখা পাবার কথা, সব জায়গাতেই আমরা ওদের খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথাও ওদের দেখা মিললো না। তবে পায়ের দাগ দেখে বুঝতে পারলাম যে ওদের বাবাও ছিল ওদের সঙ্গে। হয়তো বাবাই ওদের সঙ্গে করে দূরে নিয়ে গেছে। সারাটা দিন খোঁজাখুঁজি করেও ওদের সন্ধান পেলাম না।

সাতদিন আগে এল্‌সার মৃত্যু হয়েছে। আমরা আশা করছিলাম, বাচ্চারা আমাদের কাছেই থাকবে। ওরা তখনও নিজে নিজে শিকার ধরতে শেখেনি; সুতরাং পেটের খিদের জন্যেই ওরা আমাদের শরণাপন্ন হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আর হলো না। পেটে খিদে থাকলেও ওরা আমাদের কাছ থেকে দূরেই রইলো।

পরদিন জর্জ ইসিওলোয় রওনা হলো। দূরে চলে যাবার আগেও আমরা

বাচ্চাদের খোঁজ করলাম। নদীর ওপারে গিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই জেসপার দেখা মিললো। ও তখন উজানের দিকে একটা জায়গায় নদী পার হতে চেষ্টা করছিল। আমরা তখন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে একখণ্ড মাংস ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এসে ও খেতে শুরু করলো মাংসটাকে। গোপা আর ছোট এল্‌সাও এসে ভোজনে যোগ দিল। এর কিছুক্ষণ পরেই জর্জ ইসিওলোয় রওনা হয়ে গেল।

সে রাত্রেও বাচ্চারা ক্যাম্পে এলো না দেখে ভোর হতেই আমি আর মুরু বেরিয়ে পড়লাম ওদের খোঁজে। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজ করবার পর অবশেষে একটা জঙ্গলের ভেতর ওদের দেখা পেলাম। কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েই ওরা লুকিয়ে পড়লো। আমরা তখন এপারে এসে নদীর ধারে কিছুটা মাংস খেতে দিয়ে ক্যাম্পে চলে এলাম।

আমার সেদিন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছিলো। ক্যাম্পে এসে থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখলাম জ্বরটা ১০৩ ডিগ্রিতে উঠেছে। কাঁপুনিও শুরু হয়েছে তখন। কাঁপুনি দেখে বুঝতে পারলাম আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি। তখনই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাত্রের দিকে জ্বরটা ছাড়লো। তখন বিছানা ছেড়ে উঠে মাংসগুলোকে ক্যাম্পের বেড়ার বাইরে একটা জায়গায় রেখে এলাম।

রাত প্রায় নটার সময় কি একটা শব্দ শুনে মনে হলো যে বাচ্চারা হয়তো ফিরে এসেছে। বাইরে আসতেই দেখি, যা ভেবেছিলাম তাই। বাচ্চারা এসে মাংস খেতে লেগে গেছে। আমি তখন ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমাকে দেখেই ওরা পালিয়ে গেল। আমার শরীরটা ভাল না থাকায় ওদের খোঁজ করতে বেরুতে পারলাম না। আবার তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম আমি।

পরদিন বিকেলের দিকে আমি আর মুরু ওদের খোঁজে বের হলাম। বহু খোঁজাখুঁজি করেও ওদের দেখা পেলাম না। অবশেষে ফিরে আসবার সময় ওদের দেখা মিললো। আমাদের দেখতে পেয়ে জেসপা আমার কাছে ছুটে এলো। আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতেই সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের দিকে আসতে লাগলো।

দাদাকে আমার সঙ্গে আসতে দেখে গোপা আর ছোট এল্‌সা ঝোপের ভেতর থেকে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

জেসপা ক্যাম্পে আসতেই আমি তাকে খেতে দিলাম। কিন্তু খাবারটা সে একা খেলো না। টেনে নিয়ে তার ভাইবোনের কাছে ফিরে গেল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে জেসপা আবার আমার কাছে ফিরে এলো। তাকে দেখে মনে হলো আমার ওপরে যে অবিশ্বাস আর সন্দেহের ভাবটা তার মনের

ভেতরে দানা বেঁধেছিল সেটা দূর হয়ে গেছে। আমার কাছে এগিয়ে এসে সে বার বার থাবা উঁচিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইলো এবার সে আমার সঙ্গে খেলা করতে চায়। কিন্তু আমি যে তার থাবাকে ভয় পাই তা সে বুঝতেই চায় না। অবুঝকে কি করে বোঝাই! আমি তাই একখানা লাঠি তার দিকে এগিয়ে দিলাম। লাঠিটা পেয়ে সে কিছুক্ষণ ওটাকে নিয়ে খেলা করলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ও বিরক্ত হয়ে ভাইবোনের কাছে চলে গেলো। লাঠির মতো একটা প্রাণহীন জড় পদার্থ নিয়ে খেলা করতে ও মোটেই রাজী নয়। আমি তখন ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ করে ওদের ডাকতে লাগলাম। আমার ডাকে জেসপা এগিয়ে এসে আবার তার থাবাটাকে উঁচাতে লাগলো। আমি তখন গোপার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে ডাকলাম। গোপা কিন্তু জেসপার মতো আমার দিকে এগিয়ে এলো না। তার বদলে ও তার কান দুটো খাড়া করে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগলো। গোপার হাবভাব দেখে জেসপা এসে আমাদের দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওর চাউনি আর চাল-চলন দেখে আমার মনে হলো ভাইয়ের বিপদ দেখে সে তাকে রক্ষা করতে এসেছে।

অনেকদিন থেকেই জেসপার এই সর্দারী ভাবটা আমি লক্ষ্য করছি। ওর হয়তো ধারণা, ওর ভাইবোনেরা নেহাতই দুর্বল প্রাণী এবং তাদের রক্ষা করবার দায়িত্বটাও ওরই। ওর এই নেতাগিরিটা আমার বেশ ভালই লাগে।

এরপর দুটো দিন আর ওদের দেখা পাওয়া গেলো না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার কিছু আগে ক্যাম্পের একটা চাকর যখন মাংস নিয়ে ক্যাম্পে ফিরছিলো, সেই সময় জেসপা কোথা থেকে ছুটে এসে তার হাত থেকে মাংসটা কেড়ে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেলো।

রাত একটু বেশী হলে পাহাড়ের দিক থেকে সিংহের গর্জন শুনতে পেলাম। পরদিন সকালে ওদের খোঁজ করতে গিয়ে ওদের কাউকেই দেখতে পেলাম না। ওই দিনই জর্জ ফিরে এলো। এল্‌সার পোস্টমর্টেম রিপোর্টও সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। রিপোর্টটা পড়ে জানতে পারলাম, ব্যাবোশিয়া নামক একরকম বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। ওই বীজাণুগুলি কোন পশুর শরীরে ঢুকলে তার রক্তের লাল কণিকাগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে।

শাবকদের সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা

ইসিওলো থেকে ফিরে এসে জর্জ আমাকে বললে, ওখানে মেজর গ্রীমউডের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। বাচ্চাদের সরিয়ে নেবার সম্বন্ধেও কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। মেজর বলেছেন, এ ব্যাপারে তিনি কেনিয়ার ন্যাশানাল পার্কগুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যদি ওদের জায়গা পাওয়া যায় তাহলে খুবই ভাল হবে। জায়গার ব্যবস্থা হলে সে খবরও আমাদের জানিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন তিনি। আমরা এখন তাই মেজর গ্রীমউডের চিঠির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ইতিমধ্যে আমি বিরাট একটা খাঁচা নিয়ে এসেছি। খাঁচাটা তৈরী হয়েছিলো এল্‌সার জন্যে। কথা হয়েছিলো ওই খাঁচায় করে এল্‌সাকে হল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি। এবং সেই থেকেই খাঁচাটা প্রস্তুতকারকের কাছে পড়ে ছিলো। এবারে বাচ্চাদের খাঁচার মধ্যে খাওয়ার অভ্যাস করাবার জন্যে ওটাকে আমি নিয়ে এসেছি।

বাচ্চাদের সরিয়ে নেবার সময় ওদের দেহে মাদক ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার। আগেই বলেছি ইনজেকশন করে এটা সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় হলো খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। কিন্তু খোলা জায়গায় সবাই একসঙ্গে খেলে ও কাজটা সম্ভব হবে না। এর জন্যে ওদের আলাদা আলাদা ভাবে খাওয়াও অভ্যাস করাতে হবে। এই জন্যেই খাঁচার দরকার।

ওরা যদি খাঁচার ভেতরে খেতে অভ্যস্ত হয় তাহলে পরে ওদের আর একটা বড় খাঁচায় ঢোকানো কঠিন হবে না। বড় খাঁচাটা তৈরী হবে লরীর মাপে। পার্টিশান করে সেটাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে এবং পার্টিশান এমনভাবে করা হবে যে, বাচ্চারা ভেতরে ঢুকলে ওপর থেকে ডালা নামিয়ে দিয়ে ওদের আলাদা আলাদা করা যায়। যাই হোক, পরের কথা পরে, এখন আমাদের কাজ হলো বাচ্চাদের খাঁচায় ঢুকিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করানো।

১০ই ফেব্রুয়ারি। বিকেলের দিকে বাচ্চারা তাঁবুর পাশে খেলতে শুরু করলো। এল্‌সার মৃত্যুর পরে এই প্রথম ওরা ক্যাম্পে এসে খেলা করছে।

পরদিন সকালে উঠেই আমি খাঁচাটাকে ওদের খেলার জায়গার কাছাকাছি নিয়ে রাখলাম। বাচ্চারা ফিরে এলো বিকেলের দিকে। কিন্তু ওদের খেলার জায়গায় বিরাট একটা খাঁচা দেখে ওরা বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেলো। সন্দেহের দৃষ্টিতে বার বার ওরা তাকাতে লাগলো সেই নতুন ধরনের বস্তুটার দিকে।

কিছুক্ষণ ওটাকে লক্ষ্য করবার পর জেসপা সাহস করে খাঁচার ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর একটু ঘোরাঘুরি করে আবার বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে আমরা ওদের খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। জেসপা বাইরে এসেই ভাই-বোনদের নিয়ে খেতে শুরু করলো। ওদের জন্যে সেদিন তিন ডিস নতুন খাদ্যও দেওয়া হলো। কডলিভার তেল, মগজ আর হাড়ের মজ্জা মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো সেই নতুন খাবার। কিন্তু সেদিন ওরা তাতে মুখ দিলো না। কি-না-কি ভেবে ডিসগুলোর ধারেও গেলো না ওরা।

এরপর তিনদিন ওরা সন্ধ্যার পরে আসতে লাগলো। বুঝতে দেরি হলো না, ওরা ক্যাম্পে আসে রাতের খাওয়াটার জন্যে। ওরা বুঝে নিয়েছে ক্যাম্পে ওদের জন্যে ডিনার তৈরী থাকবেই।

এদিকে আমরা কিন্তু রোজই কডলিভার তেল দিয়ে তৈরী খাদ্যটা ডিসে করে রেখে চলেছি। কিন্তু এখনও সে খাবার ওরা ছোঁয়নি। জিনিসটা প্রথমে খেলো জেসপা। চতুর্থ দিনে সে হঠাৎ হাজির হলো বিকেলের দিকে। কডলিভার তেলের খাবারটা তখনও রাখা ছিলো খাঁচার পাশে। ও এসেই সেটাকে খেতে শুরু করলো। জিভ ঠেকাতেই জিনিসটা ভাল লেগে গেল জেসপার। ও তখন চেটেপুটে খেয়ে নিলো জিনিসটা। এরপর বাকি ডিস দুটোও চেটে সাফ করে ফেললো ও।

কয়েকদিন পরের কথা। সে রাত্রে আমি ল্যাণ্ড-রোভারের ভেতরে শুয়েছিলাম। ভোরের দিকে সিংহের মৃদু গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। গর্জনটা শোনা যাচ্ছিলো নদীর ওপার থেকে। মনে হলো সিংহ বাবাজী তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলছে। আমার তখন আরও মনে হলো যে, বাচ্চারা হয়তো সারাদিন কিছু খায়নি। হয়তো ওরা ভোর হতে না হতেই খেতে আসবে এখানে। ওরা যাতে এসেই খেতে পায় সেই উদ্দেশ্যে আমি ওদের জন্যে কিছু মাংস নিয়ে খাঁচার মধ্যে রাখতে গেলাম। আমার চোখ থেকে তখনও ঘুমের জড়তা কাটেনি। ঘুমচোখে আমি তাই হুমড়ি খেয়ে ডালপালার একটা গাদার ওপরে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুঁচলো ডালের আঘাতে আমার ডান পাটা ভীষণভাবে ছড়ে গেলো। চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো ক্ষতস্থান থেকে। আমি তখন তাঁবুতে গিয়ে নিজে নিজেই ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে ফেললাম। ব্যথায় আমার আর ঘুম হলো না। বাকি রাতটুকু জেগেই কাটালাম। কিন্তু যাদের জন্যে আমার মাথাব্যথা এবং যাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমি আহত হলাম তারা কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও ক্যাম্পে এলো না।

ওরা এলো রাত প্রায় আটটার সময়। এসেই শুরু করলো মাংস ভোজন। খেয়েদেয়ে পেট ঠাণ্ডা করবার পর শুরু হলো ওদের খেলা। সে কি নিদারুণ খেলা! ছুটোপাটি, কামড়া-কামড়ি এবং লেজ ধরে টানাটানি চললো সারাটা রাত ধরে। পায়ের ব্যথায় আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। তাই শুয়ে শুয়েই ওদের খেলা দেখতে লাগলাম।

এর পরের দিনটা আমার কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিনই জেসপা সর্বপ্রথম খাঁচার মধ্যে ঢুকে তার ভোজনপর্ব সমাধা করলো। গোপা আর ছোট এল্সা কিন্তু খাঁচার মধ্যে ঢুকলো না। ওরা দুটিতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাদার খাওয়া লক্ষ্য করতে লাগলো। মনে হলো, ওরাও খাঁচার মধ্যে ঢুকে খাওয়ার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে, কিন্তু আমাকে দেখে ভেতরে ঢুকতে লজ্জা পাচ্ছে। আমি তাই ওদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম।

জর্জও ওই দিনই ফিরে এসেছিলো। সেও লক্ষ্য করছিলো ব্যাপারটা। সেও তাই আমার মতো দূরে সরে গেলো।

আমরা সরে যেতেই গোপা আর ছোট এল্সা খাঁচার মধ্যে ঢুকে দাদার সঙ্গে খেতে শুরু করে দিলো। একটা মহাদুর্ভাবনা দূর হলো আমাদের।

এরপর থেকে ওরা খাঁচাটার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেতো না। রোজই ওরা খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে খেতে লাগলো। এবার আমাদের কাজ হলো লরীর মাপে তিন খোপওলা একটা খাঁচা তৈরি করা। জর্জের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে ঠিক হলো, আমি নান্যুকিতে (Nanyuki) গিয়ে সেখানকার কারখানায় খাঁচার জন্যে অর্ডার দিয়ে আসব।

কয়েকদিন পরেই আমি নান্যুকি অভিমুখে রওনা হলাম। জায়গাটা আমাদের ওখান থেকে দুশো কুড়ি মাইল দূরে। ওখানে গিয়ে একটা কারখানার মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর কারখানাতেই খাঁচার অর্ডার দিলাম। ওখানকার কাজ সেরে ফেরবার পথে ইসিওলোয় গেলাম। মেজর গ্রীমউডের কাছ থেকে কোন খবর এসেছে কিনা সেই কথা জানতেই ওখানে যাওয়া। কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনলাম, তখনও কোন খবর আসেনি। তবে মেজরের কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র না এলেও একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে দেখলাম। চিঠিখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত প্রতিষ্ঠান আমাদের জানিয়েছে, আমরা যদি চাই তাহলে তারা আমাদের পাউডারের আকারে অ্যান্টিবায়োটিক টেরামাইসিন সরবরাহ করতে রাজী আছে। চিঠিতে তারা আরও লিখেছে, ওই পাউডার খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে সহজেই এল্সার বাচ্চাদের খাওয়ানো যাবে। এর ফলে তাদের দেহে স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে; এই

চিঠি পেয়ে তখুনি আমি সেই প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দিলাম। একজন প্রতিনিধি পাঠাতেও অনুরোধ করলাম আমার চিঠিতে। প্রতিনিধি পাঠাতে দেরি করলো না কোম্পানি।

কোম্পানির প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করলে আমি তাঁকে সিংহদের দেহে ওষুধ প্রয়োগের অসুবিধের কথা বললাম। আমি তাঁকে জানালাম, সিংহদের ওষুধ খাওয়ালে তাদের দেহে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়; সুতরাং এমন কোন জিনিস তিনি আমাকে দিতে পারবেন কিনা, যাতে এল্‌সার বাচ্চাদের দেহে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়। আমার কথা শুনে সেই ভদ্রলোক বললেন, ওদের যদি লিব্রিয়াম (Librium) খাওয়ানো যায় তাহলে ওষুধের প্রতিক্রিয়া বন্ধ করা যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটু অসুবিধেও দেখা দিলো; কারণ ১০ মিলিগ্রামের ৮০টি ক্যাপসুল প্রত্যেক বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। প্রতিনিধি ভদ্রলোক তখন তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে ক্যাপসুলগুলো ১০ মিলিগ্রামের পরিবর্তে ৪ মিলিগ্রাম করা যায় কিনা। ওই চিঠির উত্তরে কর্মকর্তারা জানালেন, ক্যাপসুলকে আর ছোট করা সম্ভব নয়।

আমি ক্যাম্পে ফিরে এলে জর্জ আমাকে বাচ্চাদের কথা জানালো। ও বললে যে প্রথম দিন বাচ্চারা ক্যাম্পে আসে সন্ধ্যার পরে। সে রাত্রে ওদের বাবা ওদের বার বার ডাকলেও বাচ্চারা সারারাত ক্যাম্পেই থাকে। তবে সকাল হতেই ওরা পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

পরদিন বিকেলে ওদের খোঁজে পাহাড়ে যায় জর্জ। ওখানে যেতেই ও দেখতে পেলো বাচ্চাদের। জর্জ পাহাড়ের ওপরে উঠতেই জেসপা ওর কাছে এসে বসলো। জর্জ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেই ছোট এল্‌সা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে দাদাকে দেখতে লাগলো। জর্জ ওকে ডাকলেও ও কাছে এলো না। গোপাটা কিন্তু মোটেই কাছে এলো না। সে দূর থেকে ওদের দেখতে লাগলো।

ক্যাম্পে ফেরার পথে তিনটে মোষ আর একটা গণ্ডার দেখতে পেয়েছিলো জর্জ। ভাগ্যিস বাচ্চারা ওর সঙ্গে ছিলো না, নইলে কি হতো কে জানে! বাচ্চারা ক্যাম্পে আসে বেশ একটু রাত করে। এসেই খাঁচার মধ্যে ঢুকে খেতে শুরু করে। খাওয়া শেষ হলেই ওরা আবার নদী পেরিয়ে ওপারে চলে যায়।

পরদিন বিকেলে জর্জ ওদের খোঁজ নেবার জন্যে নদীর ওপারে যায়। ওপারে গিয়ে সে দেখতে পায় যে বাচ্চারা একটা তেঁতুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে

ওপরের দিকে কি যেন লক্ষ্য করছে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে জর্জ ওপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পায় যে, গাছের মগডালে এক চিতা মহারাজ চেপে বসে আছেন।

একটু পরে জেসপা গাছে উঠে চিতাটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। চিতার পো তখন এক লাফে নিচে নেমে এই দৌড় তো সেই দৌড়। চিতাকে পালাতে দেখে বাচ্চাগুলোও তার পেছনে ধাওয়া করলো। জর্জ এগিয়ে চললো বাচ্চাদের অনুসরণ করে। কিছুটা যাবার পর সে দেখলো যে, বাচ্চারা একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে লক্ষ্য করছে। জর্জও তাকালো ওপরের দিকে। চিতার পো তখন পগার পার। তার টিকিটিও দেখা গেলো না সে গাছে। জর্জ তখন নিশ্চিন্ত মনে ক্যাম্পে ফিরে এলো।

জর্জ ফিরে আসবার আগেই আমিও ফিরে এসেছি ক্যাম্পে। আমাকে দেখে খুশী হয়ে সে বাচ্চাদের চাল-চলনের কথা খুলে বললে আমাকে। চিতার পেছনে ধাওয়া করবার কথাটাও শুনলাম। শুনে মনে হলো যে, এই জন্যেই সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। কোন পশুকেই ওরা ভয় পায় না।

এই নির্ভীক স্বভাবের জন্যেই চিতার পেছনে ধাওয়া করেছিলো জেসপা।

আমি ক্যাম্পে আসার পরদিনই জর্জ চলে গেলো ইসিওলোয়। সেদিন বিকেলে বাচ্চাদের আবার দেখতে পেলাম ক্যাম্পে। ওরা তখন স্টুডিওর কাছে খেলা করছিলো তিনজনে মিলে। এই সময় গোপাকে ভালভাবে দেখতে পেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে ওর কেশরগুলো ইতিমধ্যেই বেশ একটু বড় হয়েছে। তাছাড়া ওর কেশরের রঙও হয়েছে জেসপার কেশরের চেয়ে গাঢ়।

রাত্রে আর দেখা গেলো না ওদের। পরদিন সকালেও ওরা এলো না। অবশেষে সন্ধ্যার আগে ওরা ফিরে এলো। ওরা সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে এসেছিল। ওদের খাবার অবশ্য আগে থেকেই যোগাড় করে রাখা হয়েছিলো খাঁচার মধ্যে। ওরা তাই সোজা খাঁচার মধ্যে ঢুকে খাওয়া শুরু করলো। সেদিন একটা নতুন ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। ছোট এল্‌সা আগে কডলিভারের তেল দিয়ে তৈরী খাবারটা চেটে-পুটে খেয়ে নিলো।

ওরা যখন খেতে ব্যস্ত সেই সময় নদীর দিকে জঙ্গলটার মধ্যে একটা বিরাট জানোয়ারের শুভাগমন হয়েছে বলে মনে হলো। বাচ্চারা কয়েক সেকেণ্ড কান খাড়া করে শব্দটা শুনে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ছুটে গেলো। ওদের ওইভাবে ছুটে যেতে দেখে আমি বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ওরা ফিরে এসে খেতে শুরু করলো। আমি তখন

নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাত্রে হায়েনার আর্তনাদ শুনে ঘুম ভেঙে গেলো আমার। মনে হলো, কোন বলবান জানোয়ার হায়েনাটাকে আক্রমণ করে কাবু করে ফেলেছে। পরদিন সকালে জঙ্গলের কাছে যেতেই একটা গণ্ডারের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। ওকে দেখেই হয়তো বাচ্চারা ছুটে গিয়েছিলো।

সেদিন বাচ্চারা ক্যাম্পে এলো সন্ধ্যার পরে। সেদিনও ছোট এল্‌সা আগে গিয়ে কডলিভার তেলের খাবারটা খেয়ে নিলো। এরপর যথারীতি খাঁচার মধ্যে ঢুকে সবাই মিলে খেতে শুরু করলো।

এরপর দুটো দিন আর ওদের দেখা মিললো না। তৃতীয় দিন ভোরের দিকে ওদের বাবার গর্জন শুনতে পেলাম পাহাড়ের দিক থেকে। নদীর ধারে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম যে, বাচ্চারা পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে। হয়তো বাবার ডাক শুনে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই ওরা ছুটেছে। সেদিনও ওরা ক্যাম্পে এলো না। অবশেষে ওরা যখন ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখে মনে হলো ওরা সবাই ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত। এদিকে তিনদিন না আসাতে ওদের খাবারগুলো আমরা সরিয়ে রেখেছিলাম। ওরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় এসেছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি ওদের খেতে দিলাম। সেদিনের মাংসটা ওরা একেবারে চেটেপুটে খেয়ে নিলো। ওদের খেতে দিয়ে আমি আবার তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়ে পড়লেও পায়ের ব্যথায় ঘুমোতে পারলাম না।

নানা চিন্তায় আমার মনটা তখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। একবার মনে হলো মেজর গ্রীমউডের কথা। এখনও তাঁর কাছ থেকে কোন খবর এলো না কেন? পরক্ষণেই মনে হলো বাচ্চাদের কথা। এ জায়গা ছেড়ে ওরা কি আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে?

নতুন সংসারে

মুসলমানদের রমজান মাস শুরু হয়ে গেলো। এ মাস পড়তেই সারা দুনিয়ার মুসলমানরা রোজা পালন করেন। রোজার সময় সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যার সময় উপবাস ভঙ্গ করে মুসলমানরা নামাজ পড়েন।

আমাদের ক্যাম্পে যে সব সহকারী ছিলো তারা সবাই মুসলমান। তারাও রোজা শুরু করলো। সন্ধ্যার সময় ওরা যখন নামাজ পড়তে গেলো তখন ওদের মধ্যে একজন লোক ইমামের ভূমিকা গ্রহণ করে ভীষণ জোরে চিৎকার

করে আজান দিতে লাগলো। ইমাম সাহেবের সেই চিৎকার শুনে আমার মনে হলো যে, বাচ্চাগুলো হয়তো ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো যে, বাচ্চারা ঠিকই আছে। আজান শুনে মোটেই ঘাবড়ায়নি।

এদিকে আর একটা মুশকিল হলো এই যে, উপবাসের সময় মুসলমান সহকারীদের কাছ থেকে তেমন কোন সাযায্য পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে জর্জ এই সময় ফিরে আসায় ওই বিপদ থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া গেলো। রোজা যেদিন থেকে শুরু হলো সেই দিনই জর্জ ফিরে এলো ক্যাম্পে।

বাচ্চাগুলো ওইদিন সন্ধ্যার পরে ক্যাম্পে এলো। ছোট এল্সা এসেই কডলিভার তেলের খাবারটা খেয়ে নিল। দাদারা যাতে তার ভাগটা খেয়ে না ফেলে এই জন্যেই সে আগেভাগে তার অংশটা খেয়ে নিল। এর পরেই ওরা মাংস খেতে শুরু করলো।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ওরা সবাই মিলে এল্সার কবরের কাছে গিয়ে বসলো। এই প্রথম ওরা মায়ের কবরের কাছে গেলো। এল্সা মারা গেছে এক মাস আগে। এতদিন বাচ্চারা ওখানে একেবারেই যায়নি। ওরা বোধ হয় মায়ের মৃত্যুর কথাটা বুঝতে পেরেছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারি বাচ্চাদের দেখা গেল পাহাড়ের মাথায়। আমরা ওদের কাছে যেতেই জেপসা এসে আমার কাছে বসে মাথাটা নাড়তে লাগলো। একটু পরে ছোট এল্সাও এগিয়ে এলো। তবে দাদার মতো সে অতো কাছে এলো না। গোপা কিন্তু মোটেই এগোলো না। তার ভাব-গতিক দেখে মনে হলো যে আমাদের সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না।

এরপর আমরা যখন পাহাড় থেকে নেমে এলাম তখন দেখি তিন ভাইবোনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। ওদের ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভারী সুন্দর লাগলো আমাদের।

আমরা যখন ওদের দিকে তাকিয়ে আছি সেই সময় বিশাল একটা মোষ এসে হাজির হলো আমাদের কাছে। মোষ বাবাজীর আগমনে আমরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। মোষটাও হয়তো ভয় পেয়েছে আমাদের দেখে। সে তাই শিং বাগিয়ে মারলো এক ছুট। আমরা তখন আর ওখানে দেরী না করে সোজা রওনা হলাম ক্যাম্পের দিকে।

এরপর দুটো দিন আর দেখা পেলাম না বাচ্চাদের। তৃতীয় দিন নদীর ওপার থেকে সিংহের গর্জন শুনতে পেয়ে জর্জ বেরিয়ে পড়লো বাচ্চাদের খোঁজে। কিন্তু যে-যে জায়গায় ওদের দেখতে পাবার কথা তার কোথাও ওদের দেখতে পেলো না সে। তবে সশরীরে দেখতে না পেলেও ওদের পদচিহ্ন দেখতে

পেয়েছিলো। পদচিহ্ন অনুসরণ করে ও এমন একটা জায়গায় হাজির হলো যেখানে গত জুলাই মাসে এল্‌সাকে দেখতে পেয়েছিল ম্যাকেদ।
কাছেই ছিলো একটা পাহাড়। জর্জ সেই পাহাড়ে উঠে ওদের খুঁজতে শুরু করলো। কিন্তু সেখানেও ওদের দেখতে পেলো না।
জর্জ যখন বাচ্চাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি তখন পায়ের ব্যথায় অস্থির হয়ে ক্যাম্পে শুয়ে আছি। সেদিন শেষরাত্রে বাচ্চাদের খাবার দিতে গিয়ে সেই যে পড়ে গিয়ে পায়ে ক্ষত হয়েছিলো, সে ক্ষত এখন বিপজ্জনক অবস্থায় এসে গেছে। ব্যথা আর টনটনানি এতো বেড়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে অপারেশন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।
পরদিন সকালে ব্যথা আরও বেড়ে যাওয়ায় আমি ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে একটা মিশনারী হাসপাতালে হাজির হলাম। ও হাসপাতালটা কেবলমাত্র আফ্রিকানদের জন্যে সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু আমার অবস্থা দেখে ডাক্তাররা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন না। আমার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে তখনই আমাকে অপারেশন থিয়েটারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পরেই অস্ত্রোপচার করা হলো আমার পায়ে। অনেকটা মাংস কেটে বাদ দিতে হলো, কারণ ক্ষতস্থানটা তখন ভীষণভাবে সেপটিক হয়ে গিয়েছিলো।
অস্ত্রোপচারের পরে আমাকে মেট্রনের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেখানেই রাখা হলো। দু-দিন ওখানে থেকে তৃতীয় দিনে ছুটি পেলাম। আমি তখন ভালভাবেই হাঁটতে পারছিলাম, তাই ছুটি পেতেই আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম।
২রা মার্চ। নতুন কোন খবর নেই। জর্জ কদিন ধরেই বাচ্চাদের খোঁজ করছে। কিন্তু আজও তাদের দেখা নেই। ওর তাই মনে হলো যে, বাচ্চারা হয়তো তাদের বাবা আর সৎ-মায়ের কাছে রয়েছে।
আমাকে ওদের জন্যে চিন্তিত দেখে জর্জ বললে, ওদের জন্যে চিন্তা করার কিছু নেই। এ জায়গাটা ওরা ভালভাবেই চিনে নিয়েছে। তাছাড়া বিপদে পড়লে আত্মরক্ষা কি করে করতে হয় তাও জেনে নিয়েছে। আমার মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই ওরা ফিরে আসবে।
আমার মন থেকে কিন্তু চিন্তা দূর হলো না। মনে মনে ভগবানের কাছে ওদের মঙ্গল কামনা করলাম। এছাড়া আর কি-ই বা করার আছে এখন!
৩রা মার্চ। নুরুকে সঙ্গে নিয়ে সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম ওদের খোঁজে। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও ওদের সন্ধান পেলাম না। অবশেষে দেখতে পেলাম যে, নদীর ভাটির দিক থেকে তিন ভাই-বোনে আসছেন। আমাকে দেখেই জেসপা আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমি ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলাম। গোপা আর ছোট এল্‌সা কিন্তু কাছে এলো

না। তা না আসুক, ওরা যে ভাল আছে, এতেই আমি খুশী।

আমার কাছে কিছুক্ষণ থেকে জেসপা হঠাৎ জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। গোপা আর ছোট এল্‌সাও চলে গেলো তার পেছনে পেছনে। আমিও তখন নিশ্চিন্ত মনে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

বিকেলের দিকে আবার বেরিয়ে পড়লাম ওদের খোঁজে। পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখি ওরা তিনজনেই পাহাড়ের চুড়োয় বসে আছে। ওদের দেখতে পেয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

রাত প্রায় সাড়ে-সাতটার সময় ওরা ক্যাম্পে এলো। কিন্তু ওদের বিশেষ ক্ষুধার্ত বলে মনে হলো না। সে রাতটা ওরা ক্যাম্পে কাটিয়ে ভোরের দিকে আবার চলে গেলো পাহাড়ের দিকে।

৪ঠা মার্চ। বিকেল পাঁচটার সময় আমি ওদের খোঁজে পাহাড়ের দিকে গেলাম। ওখানে যেতেই দেখি তিন ভাই বোনে পাহাড়ের ওপরে বসে আছে। তখন আমি আর দেরী না করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

রাত এগারটা অবধি ওদের দেখতে না পেয়ে আমি তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত প্রায় সাড়ে-বারোটায় কি একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙতেই দেখি জেসপা আমার তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আমি তখন ওকে আদর করে এক ডিস কডলিভার তেলের খানা খেতে দিলাম। মুখরোচক খানা পেয়ে জেসপা খুশী মনে চাটতে শুরু করলো।

ওকে খেতে দিয়ে আবার আমি শুয়ে পড়লাম। রাত দেড়টার সময় বাচ্চাদের 'হুপ্, হুপ্' শব্দ শুনে আবার আমার ঘুম ভেঙে গেলো। বুঝতে দেরী হলো না যে, ওরা অপর কোন সিংহকে দেখতে পেয়েছে ক্যাম্পে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেই বাইরে সিংহের গর্জন শুরু হলো। গর্জন শুনে মনে হলো দুটি সিংহ এসে জুটেছে ওখানে। নিশ্চয়ই ওদের বাবা আর সৎ-মা! বাচ্চারা কিন্তু সাড়া দিলো না। ওদের সাড়া না পেয়ে সিংহ দম্পতি কিছুক্ষণ হাঁক-ডাক করে অবশেষে সরে পড়লেন ওখান থেকে। সে রাতটা বাচ্চারা ক্যাম্পেই রয়ে গেলো। তবে ভোর হতে না হতেই আবার দে ছুট।

৫ই মার্চ। ভোরে উঠে বাইরে আসতেই দেখি সারা ক্যাম্প জুড়ে সিংহ-দম্পতির পদচিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বাচ্চাদের পদচিহ্নও দেখা গেলো। তবে সেগুলো হলো ওদের ক্যাম্পে আসার এবং ক্যাম্প থেকে চলে যাবার চিহ্ন।

ক্যাম্পে তখন আমি একাই ছিলাম। একা ছিলাম মানে, জর্জ ওখানে ছিলো না। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরেই সে ইসিওলোয় চলে গিয়েছিলো। এখনও আমার পায়ের ক্ষত পুরোপুরি নিরাময় হয়নি। তাছাড়া ডাক্তার আমাকে বেশী হাঁটাহাঁটি করতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তার

পরামর্শে আমি বেশিরভাগ সময় ক্যাম্পেই থাকতাম।

পরদিনও ওরা এলো না দেখে আমি মুরু আর ম্যাকেদকে ওদের খোঁজে পাঠালাম। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও ওরা বাচ্চাদের সন্ধান পেলো না। সে রাতটা আমি মোটর গাড়িতে শুয়েছিলাম। ভোরের দিকে সিংহের বিকট গর্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে কিন্তু কোন সিংহকে দেখতে পেলাম না। তবে চেহারা না দেখলেও সিংহীর পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। মোটর গাড়ির একেবারে কাছ পর্যন্ত এসে ঘুরে গেছে ওরা।

আরও একটা দিন কেটে গেলো ; কিন্তু সেদিনও বাচ্চাদের কোন খবর নেই। জর্জ সেই দিনই কেবল ফিরেছে, কিন্তু বাচ্চাদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না শুনেই সে বেরিয়ে পড়লো তাদের খোঁজে। সন্ধ্যা অবধি খোঁজ করেও ওদের দেখতে পেলো না জর্জ। পরদিন সকালে আবার সে বেরিয়ে পড়লো। সেদিন মুরুকেও সঙ্গে নিলো। নদীর ধার বরাবর অনেকটা যাবার পর অবশেষে বাচ্চাদের পায়ের দাগ দেখতে পেলো ওরা। দাগগুলো দেখে ওরা বুঝতে পারলো যে বাচ্চারা নদীতে এসে জল খেয়ে আবার চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। ওরা তখন তাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে এগোতে লাগলো। অনেক দূর যাবার পর সিংহের গর্জন শুনে থমকে দাঁড়ালো ওরা। গর্জনটা খুব কাছে থেকেই আসছিলো। ওদের মনে হলো যে বাচ্চাদের বাবা হয়তো ছেলেমেয়েদের ডাকছে। ওরা তখন জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলো। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বাচ্চাদের দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা।

ক্যাম্পে এসে চা আর কিছু খাবার খেয়ে আবার ওরা বেরিয়ে পড়লো। এবারও ওরা লুকিয়ে পড়লো সেই আগের জায়গাটাতেই। এবার কিন্তু হতাশ হতে হলো না ওদের। কিছুক্ষণ পরেই ওর দেখতে পেলো যে বাচ্চারা তাদের বাবা আর সৎ-মার সঙ্গে উত্তর দিকে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে ওরা আর দেরী না করে ক্যাম্পে ফিরে এলো।

সে রাত্রে পাহাড়ের দিক থেকে মাঝে মাঝেই সিংহের গর্জন শুনতে পেলাম আমরা! ভোর হতেই জর্জ আবার বেরিয়ে পড়লো বাচ্চাদের খোঁজে। সেদিনটা ছিলো আমার পায়ের ক্ষত স্থানটা ড্রেসিং করবার দিন। আমি তাই একখানা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হাসপাতালের উদ্দেশে।

আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে জর্জ বললে যে, মুরু নাকি জেসপাকে দেখতে পেয়েছিলো তার বাবার সঙ্গে। জর্জ আরও বললে যে, মুরুর কাছ থেকে এই কথা শুনেই সে ওদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হয় যেখানে কিছুক্ষণ আগেই বাচ্চারা শুয়ে ছিলো।

জায়গাটার অবস্থা দেখে তার নাকি মনে হয় যে, কয়েক মিনিট আগেও ওরা সবাই মিলে ওখানে ছিলো। ওদের সুখের সংসারে বাগড়া দিতে ইচ্ছে হলো না জর্জের। সে তাই আর দেরী না করে ওখান থেকে ফিরে এলো।
এরপর প্রায় প্রতি রাত্রেই ক্যাম্পের আশেপাশে সিংহের গর্জন শোনা যেতে লাগলো। জর্জের মনে হলো যে, গর্জনটা কোনো সিংহীর। হয়তো যে সিংহীটা এল্‌সা আর তার স্বামীকে আক্রমণ করেছিলো সে-ই এসে আবার ওদের খোঁজ করছে। হয়তো প্রেমিককে হারিয়েছে বলে প্রেমিকার এই আক্রোশ!
পরবর্তী কয়েকটা দিনও বাচ্চাদের পায়ের দাগ দেখতে পায় জর্জ। বাচ্চাদের পায়ের দাগের সঙ্গে তাদের বাবা আর সৎ-মার পায়ের দাগও সে দেখতে পায়। এতে তার মনে হয় যে, বাচ্চারা এক নতুন সংসারের সামিল হয়েছে। ওরা হয়তো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে এবার।

বিপদের মুখে

ষোলই মার্চ।
সেদিন সকালেই জর্জ আর নুরু বাচ্চাদের সন্ধানে বের হলো। আমি সেদিন একা বসেছিলাম আমার তাঁবুতে। হঠাৎ দুজন বনরক্ষী (Game Scout) এসে হাজির হলো আমার কাছে। ওরা বললে, গত ১৪ই তারিখ রাত্রে তিনটে সিংহ ট্যানা নদীর তীরে একদল আদিবাসীকে আক্রমণ করেছিলো। তাদের চারটে গরুকেও নাকি মেরে ফেলেছে সিংহরা। আদিবাসীদের ধারণা, এল্‌সার বাচ্চারাই তাদের আক্রমণ করেছিলো।
খবরটা শুনে তখুনি আমি তিনজন সহকারীকে পাঠালাম জর্জকে ডেকে আনবার জন্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জর্জ ফিরে এলো। আমি তখন তার কাছে স্কাউটদের দেওয়া খবরটা জানিয়ে দিলাম। জর্জ রীতিমতো দুশ্চিন্তা-গ্রস্থ হয়ে পড়লো খবরটা শুনে। সে তাই আর এক মুহূর্তও দেরী না করে ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।
ব্যাপারটা যেখানে ঘটেছে সেখানে যেতে হলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পনের মাইল পথ অতিক্রম করলেই ট্যানা নদীর তীরে হাজির হওয়া যায়। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যেতে হলে কমপক্ষে দেড়শ

মাইল ঘুরে যেতে হবে। জর্জ তাই জঙ্গলের ভেতর দিয়েই চালিয়ে দিলো গাড়িটা। আমি চিন্তিত হয়ে রইলাম পরবর্তী খবরের জন্যে।

খবরটা জানতে পারি জর্জ আসবার পরে। সে আমাকে যা বলেছিলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে।

সে যখন ঘটনাস্থলের চার মাইলের মধ্যে পৌঁছোয় তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। গাঢ় অন্ধকারে আর এগোনো সম্ভব নয় দেখে বাকি রাতটা এখানেই থেকে যেতে বাধ্য হয় সে। পরদিন সকালে বন থেকে বেরিয়ে গাড়িটাকে এক জায়গায় রেখে দিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়। গ্রামে গিয়ে সে দেখতে পায় যে, ওখানে মাত্র আটখানা বাড়ি। বাড়ি মানে মাটির তৈরী দুখানা বা তিনখানা কুড়েঘর ছাড়া আর কিছু না। তবে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই প্রত্যেকটা বাড়ির চারপাশে কাঁটা দিয়ে বেড়া দেওয়া রয়েছে। গ্রামটার পাশেই ট্যানা নদী।

জর্জ তখন গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে ঘটনাটা জানতে চায়। গ্রামবাসীরা বলে, গত ১৪ই মার্চ রাত্রে তিনটে সিংহ এসে তাদের গরুর পাল আক্রমণ করে দুটো গরুকে মেরে ফেলে। তারা তখন লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটে এসে সিংহগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরদিন রাত্রে আবার ওরা আসে এবং আরও দুটো গরুকে মারে। গ্রামবাসীরা আরও বলে যে একটা গরুকে গ্রামের পাশেই খেয়ে শেষ করেছে সিংহরা। জায়গাটাও তারা দেখিয়ে দেয় জর্জকে। জর্জ সেখানে গিয়ে সিংহদের পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে শুরু করে। দাগগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করে সে দেখতে পায় যে, সেগুলোর মধ্যে একটা সিংহীর পায়ের দাগও রয়েছে। সিংহীটাকেও সে দেখতে পায় নিকটবর্তী একটা জঙ্গলের মধ্যে। সে তখন সিংহীটাকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসে পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করে। কিন্তু দাগগুলো এতই অস্পষ্ট ছিলো যে, সেগুলো এল্‌সার বাচ্চাদের কিনা তা সে বুঝতে পারে না। এরপর সে নদীর ধার দিয়ে চলতে থাকে। অনেকটা যাবার পর আবার সে সিংহদের পায়ের দাগ দেখতে পায়।

জর্জের সঙ্গে তখন দুজন বনরক্ষী (game scout) ছিলো। তাদের এবং আদিবাসীদের ভেতর থেকে একজনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিয়ে সিংহদের খোঁজ করতে বের হলো জর্জ। ঘন্টা খানেক খোঁজাখুঁজির পর ওরা একটা সবজি ক্ষেতের কাছে এসে হাজির হলো। ক্ষেতটার পাশেই ছিলো বড় একটা গাছ। একটু এগোতেই ওরা দেখলো যে, সেই গাছের তলায় বিশালকায় একটা সিংহী ঘুমিয়ে আছে। তাকে দেখেই জর্জ বুঝতে পারলো যে, ওটা একটা পূর্ণবয়স্কা সিংহী। এই সময় পেছনে হঠাৎ রাইফেলের ট্রিগার

পতনের মতো খট্ করে একটা শব্দ হতেই জর্জ ফিরে তাকালো সেদিকে। সে দেখতে পেলো যে, একজন বনরক্ষী সিংহীটাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলো, কিন্তু তার রাইফেলে গুলি ভরা না থাকায় ফায়ার হয়নি। বনরক্ষী তখন জর্জকে গুলি করবার জন্যে ইশারা করলো। জর্জের পক্ষে সিংহীটাকে হত্যা করা মোটেই কঠিন ছিলো না। কিন্তু সে তাকে গুলি করলো না। এই সময় সিংহীটা হঠাৎ জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার নজর পড়লো জর্জের দিকে। সিংহীটা তখন উঠে বসলো এবং কিছুক্ষণ জর্জের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে এক লাফে ওখান থেকে সরে পড়লো। সিংহীটা পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো সিংহকে সবজি ক্ষেত থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে দেখা গেলো। ওদের দেখে জর্জের মনে হলো যে, ওরা এলসার ছেলেমেয়ে হতেই পারে না। কিন্তু তবুও নিঃসন্দেহ হবার জন্যে সে ওদের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতে আরম্ভ করলো। সিংহগুলো কিন্তু একবার ফিরেও তাকালো না তার দিকে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো যে, গ্রামবাসীদের ওপরে যারা অত্যাচার করেছে তারা এলসার ছেলেমেয়ে নয়।

জর্জ তখন গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে বললে যে, ও তিনটে সিংহের একটাও এলসার বাচ্চা নয়। তবে, এ কথাও সে ওদের বলে দিলো যে, আবার যদি ওখানে সিংহের উপদ্রব হয় তাহলে তারা যেন ক্যাম্পে গিয়ে খবর দেয়।

জর্জের কাছ থেকে এই সব কথা শুনবার পর আমারও মনে হলো যে, গরু-মারা কর্মটি এলসার বাচ্চারা করেনি। আমরা তখন পরামর্শ করে স্থির করলাম যে এবার কাছাকাছি অঞ্চলেই ওদের খোঁজ করতে হবে।

পরদিন সকালে জর্জ এবং নুরু যখন বাচ্চাদের খোঁজ করতে বেরিয়ে বনের ভেতরে প্রবেশ করে তখন একদল মধু-আহরণকারীর সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়। এই মধু আহরণকারীদের কাজ হলো বনে বনে ঘুরে মৌমাছির চাকের সন্ধান করা এবং লতাপাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিদের তাড়িয়ে দিয়ে চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা। এই লোকগুলো মিষ্টি বলতে একমাত্র মধু ছাড়া আর কিছু জানে না। অনেকগুলো দলই এইভাবে মধু আহরণ করে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে। মধু আহরণের এই ব্যাপারে বিভিন্ন-দলের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তিও আছে। চুক্তিটা হলো একদলের চিহ্নিত চাক থেকে আর কোন দল কখনও মধু সংগ্রহ করবে না। চিহ্নটা খোদাই করা থাকতো গাছের গায়ে। অর্থাৎ যে গাছে চাক হয়েছে সেই গাছের গুঁড়িতে চিহ্ন খোদাই করে দেওয়া হতো। যাই হোক, অবান্তর কথা বাদ দিয়ে আবার কাজের কথায় ফিরে আসি। মধু সংগ্রাহকদের কাছে জর্জ খবর পেলো যে, তারা নাকি নদীর ভাটির দিকে পাঁচটি সিংহের পায়ের ছাপ

দেখে এসেছে।

ওদের কাছ থেকে এই খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই জর্জ আর মুরু নদীর ধারে গিয়ে ভাটির দিকে চলতে লাগলো। অনেকটা যাবার পর ওরা দেখতে পেলো যে, সামনের দিকে নদীর চরের ওপরে দুটো বাচ্চা শুয়ে আছে। ওরা তখন বাচ্চা দুটোকে ভালভাবে লক্ষ্য করার জন্যে চোখে দূরবীন লাগাতেই বাচ্চারা ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীরের জঙ্গলের ভেতর থেকে সিংহের গর্জন শুনতে পেলো ওরা। একটা সিংহকেও দেখতে পেলো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে। ওরা তখন সেই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়লো। জঙ্গলের ভেতরে যেতেই ওরা দেখতে পেলো যে, সেখানে একটা মোষের মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতদেহর অবস্থা দেখে ওদের মনে হলো মোষটাকে গত রাতে শিকার করা হয়েছে। তার দেহে যেটুকু মাংস অবশিষ্ট ছিলো তা থেকে ওরা আরও বুঝতে পারলো যে, পাঁচটা সিংহ গত রাত্রে এবং আজ সকালে বেজায়-রকম ভোজ লাগিয়েছে। ওদের আরও মনে হলো যে, বাচ্চারা এখন আনন্দের সঙ্গেই তাদের বাবা আর সৎমায়ের সঙ্গে বাস করছে।

এই কথা মনে হতেই ওরা নদীর ধারে গিয়ে 'জেসপা জেসপা' বলে ডাকতে শুরু করলো। অনেকক্ষণ ডাকার পরে নদীর ওপার হতে একটা মৃদু গর্জন শোনা গেলো। কিন্তু জেসপা অথবা তার ভাই বোন কাউকেই দেখা গেলো না। ওরা তখন বিফলমনোরথ হয়ে সেদিনের মতো ক্যাম্পে ফিরে গেলো।

পরদিন সকালে জর্জ ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাচ্চাদের খোঁজে। দুজন বনরক্ষীও চললো তার সঙ্গে। জর্জের মনে হলো যে, মোষের দেহের বাকি অংশটা খাবার জন্যে সিংহগুলো আবার যাবে সেই মোষটার মৃতদেহের কাছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে সিংহদের ওরা দেখতে পেলো না। এরপর সারাদিন নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও যখন ওদের দেখা পাওয়া গেলো না, তখন ওরা গাড়িটাকে নদীর তীরে নিয়ে এসে সেখানেই রাত্রিবাস করবে ঠিক করলো।

রাত্রে ল্যাণ্ড-রোভারের ভেতরে শুয়ে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই ভীষণভাবে ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। সারারাত ঝড়বৃষ্টি সহ্য করে পরদিন সকালে ওরা ক্যাম্পে ফিরে এলো। সেই দিনই ইসিওলোর আদালতে একটা মামলার তারিখ ছিলো। জর্জ তাই ক্যাম্পে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই ইসিওলোয় রওনা হয়ে গেলো।

পরদিনও ভীষণ বৃষ্টি হলো সারা রাত ধরে। ভোর হতেই আমি নদীর অবস্থা দেখবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এলাম। নদীর দিকে তাকাতেই চক্ষুস্থির। এক

রাত্রেই নদীটা একেবারে প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। গতকাল যে নদী ছিল স্বল্পতোয়া, শীর্ণা—আজ সে হয়ে উঠেছে তটপ্লাবী, খরস্রোতা। স্রোতের বেগ এমন ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছে যে, নদী পার হওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও একজন সংবাদবাহক নদী পার হয়ে আমার কাছে এসে খবর দিলো যে ট্যানা গ্রামে আবার সিংহের উৎপাত শুরু হয়েছে। গোটা কয়েক সিংহ নাকি আদিবাসীদের গ্রামে হানা দিয়ে কয়েকটা গৃহপালিত পশুকে খতম করেছে।

খবরটা শুনে আমি রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠলাম। তখুনি আমি ইব্রাহিমকে ইসিওলোয় পাঠিয়ে দিলাম জর্জকে খবরটা জানিয়ে দেবার জন্যে। ইব্রাহিম ফিরে এলো পরের দিন। এসেই আমাকে বললে যে, কোর্টের মামলাটা শেষ হলেই জর্জ ট্যানা গ্রামে চলে যাবে। সে আরও বললে যে, ভাটি অঞ্চলের বনরক্ষীদের কর্পোরালকে জর্জ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে রওনা হতে বলেছে। কয়েকটা আগুনে পটকাও সে পাঠিয়েছে কর্পোরালের কাছে। কর্পোরালকে সে আরও বলতে বলেছে যে, সিংহদের দেখা পেলেও তিনি যেন তাদের হত্যা না করেন। হত্যা না করে পটকা ফাটিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে।

আমি তখুনি জর্জের নির্দেশটা কর্পোরালকে জানিয়ে দেবার জন্যে ইব্রাহিমকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আগুনে পটকাগুলোও পাঠিয়ে দিলাম তার সঙ্গে।

খবরটা পেয়েই কর্পোরাল ট্যানা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু যাবার পথে একটা দোকানে তামাক কিনতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে খবর পান যে, ট্যানা অঞ্চলের প্রধান সরকারী কর্মচারী তাঁর লোকদের হুকুম দিয়েছেন যে, কোন সিংহ দেখলেই যেন তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

খবরটা শুনেই কর্পোরাল আবার আমার কাছে ফিরে এলেন এবং এ অবস্থায় তাঁর করণীয় কি তা জানতে চাইলেন।

তাঁর কাছ থেকে খবরটা শুনে আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। আমি তখন তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম যে, তিনি যেন অবিলম্বে ঘটনাস্থলে চলে যান এবং অঞ্চল-প্রধানকে জর্জের নির্দেশটা জানিয়ে দিয়ে বলেন যে, জর্জ ওখানে না যাওয়া অবধি তাঁর লোকেরা যেন কোন সিংহকে না মারে।

এটা হলো ২৪শে মার্চ তারিখের কথা। আমার পায়ের অবস্থা তখনও বেশ খারাপ। ডাক্তারের নির্দেশে হাঁটা-চলা নিষেধ। আমি তাই শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ক্যাম্প থেকে বাইরে যেতে পারছিলাম না।

জর্জ ফিরে এলো সন্ধ্যার দিকে। একটু পরেই ক্যাম্পের পাশে সিংহের গর্জন

শুরু হলো। সারা রাত ধরেই সমানে চললো সেই সিংহনাদ। তবে ভোরের দিকে গর্জনটা শোনা গেলো ভাটির দিকে একটি পাহাড়ের কাছে। সিংহ মশাই সারারাত ক্যাম্পের পাশে দাপাদাপি করে অবশেষে পাহাড়ের দিকে চলে গেছেন বলে মনে হলো। জর্জ তখুনি বেরিয়ে পড়লো সিংহ মশাইকে দেখতে। অনুসন্ধানের ফলে সে জানতে পারলো যে, আমরা যাকে ভদ্রমহোদয় মনে করেছিলাম, আসলে তিনি ভদ্রমহোদয়া। অর্থাৎ সারারাত যিনি গর্জন করে আমাদের ঘুমোতে দেননি, তিনি হলেন একটি সিংহী। তাঁর পায়ের দাগ দেখে জর্জ আরও জানতে পারে যে, তিনি ভাটির দিকে চলে গেছেন।

সিংহীর গতিপথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার পরে জর্জ আবার ফিরে এলো ক্যাম্পে। এসেই সে তার ল্যাণ্ড-রোভারটা নিয়ে ট্যানা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। তখনও ভীষণভাবে বৃষ্টি হচ্ছিলো। বৃষ্টির ফলে বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালানো আদৌ সম্ভব ছিলো না। জর্জকে তাই সোজা পথ ছেড়ে ঘোরা-পথে যেতে হলো।

পরদিন সন্ধ্যার পরে বড় পাহাড়ের দিক থেকে সিংহের গর্জন শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সিংহ প্রলয় গর্জনে তার উত্তর দিল। আরও একটু পরে দুটিতে একসঙ্গে গর্জন করতে করতে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমার মনে হলো যে, এলসার বাচ্চারাও হয়তো ওদের সঙ্গে আসছে। কথাটা মনে হতেই আমি আমাদের সহকারীদের ডেকে বাচ্চাদের জন্যে খানার ব্যবস্থা করতে বললাম।

সহকারীরা যখন বাচ্চাদের জন্যে মাংস কাটতে ব্যস্ত সেই সময় ক্যাম্পের চারদিক থেকে গর্জন শুরু হয়ে গেলো। ব্যাপার দেখে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে মাংসগুলোকে লরীতে তুলে রাখতে বললাম।

সারাটা রাত ধরেই চললো ওদের দাপাদাপি আর গর্জন। সিংহ কোম্পানির সেই সিংহনাদের ঠেলায় কার সাধ্য ঘুমোয়। আমরা তাই জেগেই কাটালাম সে রাতটা। অবশেষে ভোরের দিকে ওরা বড় পাহাড়ের দিকে পশ্চাদপসরণ করলো।

আমি তখন ধীরে ধীরে এল্‌সার সমাধির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখান থেকে বড় পাহাড়টা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে সেদিকে তাকাতেই দেখি পাহাড়ের চূড়ার ওপরে একটা সিংহ ও একটা সিংহী দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম পাহাড়টার দিকে। কিছুটা এগোতেই দেখতে পেলাম যে, ওদের সঙ্গে তিনটি বাচ্চাও রয়েছে। ওরা একটু দূরে বসে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে সিংহীটা ওদের কাছে এসে আদর করে ওদের গা চাটতে লাগলো। আদর পেয়ে

বাচ্চারা খুশী হয়ে খেলা শুরু করে দিল। ওদের খেলা করতে দেখে আমি ওদের কয়েকটা ফটো তুলে নিলাম। কিন্তু অতদূর থেকে নেওয়া ফটো ভাল হবে না মনে করে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম ওদের দিকে। এবারে ওরা আমাকে দেখে ফেললো। এবং দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই সরে পড়লো ওখান থেকে। চলে যাবার সময় একটা বাচ্চা বার বার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগলো। তার হাব-ভাব দেখে আমার মনে হলো যে, ও বোধহয় জেসপা। কিন্তু ভালভাবে ওকে লক্ষ্য করতে না পারায় নিশ্চিত হতে পারলাম না। তবে ওর চেহারা আর চাল-চলন দেখে জেসপা বলেই মনে হলো ওকে। বাচ্চারা নতুন সংসারে এসে সুখে আছে মনে করে আমিও খুশী হলাম। মা-মরা ছেলেমেয়েদের জন্যে খুবই চিন্তিত ছিলাম আমি। এখন ওরা সৎমার কাছ থেকে আদর পাচ্ছে দেখে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। যদিও ওরা এল্‌সার বাচ্চা কিনা সে সম্বন্ধে আমি দৃঢ়নিশ্চয় হতে পারছিলাম না, তবুও আমার মনে হলো যে, ওরা আমার এল্‌সারই ছেলেমেয়ে। আমি তখন অনেকটা খুশী মনেই ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

ক্যাম্পে এসেই আমি খবরটা জানিয়ে দিলাম সবাইকে। শুধু খবর দিয়েই খুশী হলাম না, ইব্রাহিমকে কিছু মাংসও তৈরি করতে বললাম ওদের জন্যে। তাকে বিশেষভাবে বলে দিলাম যে, মাংসটাকে যেন এমন জায়গায় রেখে আসে যা সহজেই ওরা দেখতে পায়।

ইব্রাহিম যখন মাংস কাটছে সেই সময় আমার ইচ্ছা হলো যে, আমিও যাবো তার সঙ্গে। এই কথা মনে হতেই মাংসগুলোকে ল্যাণ্ড-রোভারে তুলে দিতে বললাম তাকে। একটু পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে। পাহাড়ের কাছে গিয়ে মাংসটা এক জায়গায় নামিয়ে রেখে আমরা গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের দিকে পেছিয়ে এলাম। তারপর লতা-পাতা দিয়ে গাড়িটাকে ঢেকে ফেলে তার ভেতরে বসে মাংসের দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। বাচ্চারা অথবা সিংহরা যাতে গাড়িটা দেখতে না পায় সেই উদ্দেশ্যেই ওটাকে লতা-পাতা দিয়ে আড়াল করেছিলাম আমরা।

কিন্তু বেলা এগারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও বাচ্চাদের দেখতে না পেয়ে অগত্যা আবার আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

ক্যাম্পে ফিরতেই দেখি দুজন বনরক্ষী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই ওরা আমার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা লিখেছিল জর্জ। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করলাম। পড়া শেষ হলেই বুঝতে পারলাম যে, এতক্ষণ আমি যাদের এল্‌সার ছেলেমেয়ে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম আসলে তারা তা নয়। এল্‌সার বাচ্চারা ট্যানা গ্রামে গিয়ে

উৎপাত শুরু করেছে।

পাঠকদের অবগতির জন্যে জর্জের সেই চিঠির মর্মকথাটা নিচে দেওয়া হলো।

জর্জ লিখেছিলো :

প্রিয় জয়,

আমি ট্যানা গ্রামে এসে হাজির হই ২৬শে মার্চ, রবিবার। এখানে আসতে আমাকে ৪৮ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এই ৪৮ মাইলের মধ্যে ৮ মাইল আসতে হয়েছে বনের ভেতর দিয়ে। আসবার পথে একটা মরা গরু দেখে বুঝতে পারি যে, হানাদার সিংহদের হাতেই ওটা মারা গেছে। মরা গরুটা গ্রামের কাছেই একটা জঙ্গলের ভেতর পড়ে ছিলো। রাতটা গাড়িতেই কাটালাম। কিন্তু সে রাত্রে কোন সিংহকে দেখতে পেলাম না। পরদিন সকালে আমি গ্রাম থেকে প্রায় দু মাইল দূরে ট্যানা নদীর তীরে তাঁবু খাটালাম। তাঁবু খাটানো হয়ে গেলে আমি নদীর ধার দিয়ে ভাটির দিকে চলতে শুরু করলাম। কিন্তু অনেকটা পথ গিয়েও কোন সিংহকে দেখতে না পেয়ে আবার তাঁবুতে ফিরে এলাম।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন বনরক্ষী আমার কাছে এসে খবর দিলো যে, গত রাত্রে সিংহরা আর একটা গ্রামে হানা দিয়েছিলো। তবে গ্রামবাসীরা তাড়া করায় ওরা পালিয়ে গেছে। আমি তখন আর দেরী না করে গাড়ি নিয়ে সেই গ্রামের দিকে রওনা হলাম। যাবার সময় একটা ছাগল মেরে সেটাকেও নিয়ে চললাম গাড়িতে তুলে। গ্রামের কাছাকাছি এসে ছাগলটাকে একটা জঙ্গলের পাশে নামিয়ে রেখে আমি একটু দূরে গিয়ে সেই মৃত ছাগলটার দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। রাত প্রায় বারোটায় ছোট এল্‌সাকে দেখতে পেলাম। সে এসেই ছাগলটাকে খেতে শুরু করে দিলো। একটু পরে জেসপা আর গোপাও এসে হাজির হলো সেখানে। ওরাও এসে বোনের সঙ্গে খেতে শুরু করলো। জেসপার গায়ে একটা তীর বিঁধে আছে দেখতে পেলাম। তীরটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো—'বিষাক্ত তীর নয় তো!' কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম যে, বিষাক্ত তীর হলে জেসপা ওভাবে নিশ্চিন্তে খেতে পারতো না।

ওদের দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। নাম ধরে ডাকলাম ওদের। আমার ডাক শুনে ওরা আমাকে চিনতে পারলো। আমি তখন একটা পাত্রে করে জল এনে দিলাম ওদের জন্যে। জল দেখে ওরা খুশী হয়ে একে একে পান করে যেতে লাগলো। জল পান করেই আবার ওরা ফিরে গেলো ছাগলের মৃতদেহের কাছে। ওদের দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, সময়মতো খেতে না পেয়ে ওরা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। ওরা যে খিদের জ্বালাতেই

গ্রামে এসে হানা দিতে শুরু করেছে তাও বুঝতে পারলাম। এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হলো যে, ওদের কৃতকর্মের খেসারতও আমাকেই দিতে হবে।

সব কথাই তোমাকে লিখলাম। তুমি অবিলম্বে ক্যাম্পের সবগুলো ছাগলকে ইব্রাহিমের সঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিও। এছাড়া আমার জন্যেও কিছু খাবার-দাবারও পাঠিও। সে যেন ল্যাণ্ড-রোভারটা নিয়ে আসে। আমার চেয়ার, টেবিল, বাক্স আর একটা ছোট তাঁবুও পাঠিয়ে দিও। কারণ এখানে আমাকে সাময়িকভাবে ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে কিছুদিনের জন্যে।

আমি স্থির করেছি যে, এখান থেকেই বাচ্চাদের স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করবো। লরী, খাঁচা এবং অন্যান্য জিনিসও এখানে নিয়ে আসতে হবে। ওগুলো অবশ্য পরে আনলেও চলবে। তবে ছাগলগুলোকে অবশ্যই পাঠাবে। যেমন করেই হোক। ইব্রাহিম যেন আজই এখানে এসে হাজির হয়। বাচ্চারা ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। ওদের যদি সময়মতো খেতে না দিই তাহলে ওরা হয়তো পেটের জ্বালায় অন্য কোন গ্রামে গিয়ে হানা দেবে। আমার মনে হচ্ছে, এল্‌সার প্রতিদ্বন্দ্বিনী সিংহীটাই বাচ্চাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আর বেশী কি লিখবো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে দেরী করো না। ইতি—

তোমার
জর্জ

পুনশ্চ : আমার গুলি-বারুদগুলোও পাঠাতে ভুলো না।

সঙ্কট

জর্জের চিঠিখানা পড়ে আমার সারাটা দেহ যেন হিম হয়ে গেলো। এল্‌সার বাচ্চারা খিদের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে জেনে দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। জেসপা আহত হয়েছে জেনেও আমার কষ্ট হলো। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হলো যে, এখানকার পাহাড়ে যে তিনটি বাচ্চাকে দেখেছি তাদের মা-টাই তাহলে ওদের এখান থেকে দূর করে দিয়েছে! কী দুর্ভাগ্য! ওর বাচ্চাদের দেখেই আমি তাহলে খুশী হয়ে ভাবছিলাম যে, এল্‌সার বাচ্চারা নতুন সংসারে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে!

কিন্তু এসব কথা ভেবে সময় নষ্ট করার মতো সময় কোথায়। জর্জ লিখেছে তার জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে করে তার কাছে পাঠাতে। আমাকে সে

যেতে বলেনি। আমার অসুস্থ অবস্থার জন্যেই আমাকে যেতে লেখেনি। কিন্তু আমি কি না গিয়ে পারি! আমার জেসপা আহত। আমার গোপা আর ছোট এল্‌সা আহত না হলেও খিদের জ্বালায় ওরা আজ গেরস্তদের ছাগল ভেড়া মেরে খাচ্ছে! আহা রে! নিজেদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আজ ওরা তীরন্দাজ আদিবাসীদের তীরের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে! এ কথা জেনে আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? না, তা কিছুতেই পারি না। আমাকে যেতেই হবে, এখুনি রওনা হতে হবে আমাকে।

মনে মনে এই রকম স্থির করে তখুনি আমি ইব্রাহিমকে ডেকে গাড়ি বোঝাই করতে বললাম। তাকে বললাম আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ট্যানা গ্রামের দিকে রওনা হবো। ওখানে কেন যাচ্ছি সে কথাও জানিয়ে দিলাম তাকে। গাড়ি বোঝাই হতে দেরী হলো না। ক্যাম্পে তখন পাঁচটা ছাগল ছিলো। সেগুলোকেও তুলে নেওয়া হলো গাড়িতে। এরপর অন্যান্য দরকারী জিনিস তুলে নিয়ে আমি, ইব্রাহিম আর সেই সংবাদবাহক গাড়িতে উঠে বসলাম। বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব ছিল না। বৃষ্টিতে বনপথ কর্দমাক্ত হয়ে গেছে তখন। আমরা তাই রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। রাস্তার অবস্থাও মোটেই ভাল না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রাত প্রায় ন'টার সময় গন্তব্যস্থলে হাজির হলাম আমরা।

আমাকে দেখে জর্জ আশ্চর্য হয়ে গেলো। কিন্তু খুশীও হলো খুব। সে তখন সংক্ষেপে এখানকার ঘটনাবলী বর্ণনা করে অবশেষে বললে—আজ রাত থেকেই আমাদের কাজ শুরু হবে। বাচ্চারা যাতে আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে হানা দিতে না পারে তার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে আমাদের।

কোন রকমে দুটি কিছু মুখে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। একটা শক্তিশালী স্পটলাইট ছিল আমাদের সঙ্গে। সেটাকে জ্বেলে দিয়ে বনভূমিকে আলোকিত করা হলো। গাড়িতে বসেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। এই সময় জর্জ আমাকে জেসপার আহত হবার ঘটনাটা জানালো। সে যা বললে তার মর্মকথা হলো: ২৫শে মার্চ রাত্রে একদল আদিবাসী লাঠি-সোঁটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সিংহ মারবার মতলবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটে সিংহ গ্রামে এসে হানা দেয়। ওরা এসেই দুটো ছাগলকে মেরে ফেলে। গ্রামবাসীরা তখন ভীষণ সোরগোল তুলে সিংহগুলোকে তাড়া করে। তীরন্দাজরাও এসে হাজির হয় চিৎকার শুনে। ওরা এসেই সিংহগুলোকে ঘেরাও করে ফেলে। বিপদ দেখে সিংহরা তখন লাফ দিয়ে কাঁটার বেড়া পার হয়ে জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে যায়।

গ্রামবাসীরাও ধাওয়া করে ওদের পেছনে। তারা বাচ্চাদের লক্ষ্য করে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে থাকে। আদিবাসীদের ভেতরে ধনুর্বাণধারী কয়েকজন ছোট ছেলেও ছিল। তবে তাদের তীরগুলো বিষাক্ত ছিল না। ওই ছেলেদের মধ্যে একজনের নিক্ষিপ্ত একটা তীর হঠাৎ একটা সিংহের গায়ে বিঁধে যায়। এরপর জর্জ যখন বাচ্চাদের দেখতে পায় তখনই সে জানতে পারে যে, ওই সিংহটা আমাদেরই জেসপা। তীরের ফলাটা তখনও তার গায়ে বিঁধে ছিল। তবে জর্জ বললে যে, এতে ভয়ের কিছু নেই ; তীরের ফলাটা যে অবস্থায় রয়েছে তাতে মনে হয় শীগগিরই ওটা খুলে পড়ে যাবে। এরপর জেসপা দিন কয়েক ক্ষতস্থানটা চাটলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
জর্জ আরও বললে যে, ইতিমধ্যেই সে ত্রিশজন আদিবাসীকে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। রাস্তাটা তৈরী হয়ে গেলেই ক্যাম্প থেকে বাকি জিনিসপত্র এখানে নিয়ে আসা হবে এবং এখানেই ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। তবে পুরোপুরিভাবে ক্যাম্প স্থাপন করবার আগে সাময়িকভাবে ছোটখাটো একটা আস্তানা আমাদের করতেই হবে এখানে। সেই ব্যবস্থাই করা হলো। লোকজনের সাহায্যে তাঁবু খাটিয়ে এবং তাঁবুর মধ্যে জিনিসপত্র সাজিয়ে কোন রকম ভাবে একটা আস্তানা গড়ে তোলা হলো ওখানে। তবে প্রথম রাত্রে তাঁবুটা ঠিকমতো খাটানো সম্ভব হলো না।
জর্জ আমাকে বললে যে, সে রাতটা খোলা জায়গাতেই থাকতে হবে আমাদের। শোবার জন্যে বিছানাও নিয়ে আসা হলো। আমি তখন বাচ্চাদের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করলাম এবং মাঝে মাঝে কু-উ-উ শব্দ করে ওদের আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করলাম। আগে আমার মুখ থেকে কু-উ-উ শব্দ শুনতে পেলেই জেসপা এগিয়ে আসতো আমার কাছে, আজ কিন্তু অনেকবার কু-উ-উ করলেও সে এলো না। গোপা আর ছোট এল্‌সারও পাত্তা পাওয়া গেলো না।
সারাদিন পথশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিলো আমার। আমি তাই আর দেরী না করে শয্যা গ্রহণ করলাম। পরদিন ঘুম ভাঙলো নারকেল জাতীয় একটা শক্ত ফল পড়ার শব্দে। ওই ফলকে বলা বলা হয় ডোয়াম-পাম নাট। ফলটা পড়েছিলো আমার পায়ের কাছে। ওটা ওখানে না পড়ে আমার মাথায় পড়লেই হয়েছিলো আর কি ! ফলের আঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ হতো তাহলে। জর্জও উঠে পড়েছিলো। আমরা তখন গাড়ির পাশে বসেই প্রাতরাশ সেরে নিলাম। প্রাতরাশ শেষ হলেই জর্জ নুরুকে নিয়ে বাচ্চাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। তবে যাবার আগে ক্যাম্প করবার জন্যে নদীর ধারে জায়গা দেখিয়ে দিয়ে গেলো সে।

জর্জের নির্দেশমতো সেইখানেই তাঁবু খাটিয়ে সাময়িকভাবে ক্যাম্প করা হলো। জায়গাটা ভালই। অনেকগুলো বড় বড় গাছ থাকায় গরমও ওখানটায় বেশ একটু কম। মোট কথা ক্যাম্পটা আমার বেশ পছন্দ হলো। আমরা তখন সবাই মিলে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আনন্দ একেবারে বিষাদে পরিণত হলো। হাজার হাজার গরু, মোষ আর ছাগল এসে আমাদের ঘিরে ফেললো। ওদের 'হাম্বা হাম্বা' আর 'ম্যা ম্যা' রবে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম। এর ওপর আবার শুরু হলো ধুলো ওড়া। পশুদের পায়ের আঘাতে মাটি থেকে ধুলো উড়ে আমাদের একেবারে ঢেকে ফেলে দিলো। খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, প্রতিদিনই ওদের শুভাগমন হয় ওখানে : ব্যাপার দেখে মনে হলো ওখান থেকে ক্যাম্প সরিয়ে না নিলে উপায় নেই। ধুলোর গুঁতোতেই তাহলে শেষ হয়ে যেতে হবে। আমি তাই তখুনি বেরিয়ে পড়লাম নতুন জায়গার খোঁজে। প্রচণ্ড গরমে পথ চলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো। আমি তাই নদীর তীর বরাবর গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় চলতে লাগলাম : কিছুক্ষণ হাঁটার পর এমন একটা জায়গায় হাজির হলাম যেখানে নদীটা বেঁকে গেছে। নদীর চওড়াও সেখানটায় অনেক বেশী। এছাড়া নদীর বুকে কয়েকটা চরও দেখতে পেলাম। একটা চরের ওপরে কয়েকটা কুমিরকে রোদ পোয়াতে দেখা গেলো। নদীর বুক থেকে কয়েকটা সরু পথ উপরে উঠে এসেছে দেখলাম। পথগুলোর চেহারা দেখে মনে হলো যে, ওগুলো হিপো মহারাজদের যাতায়াতের পথ।

আরও কিছুটা এগিয়ে যাবার পর একটা জায়গা বেশ পছন্দ হলো আমার। ওখানকার নদীর পাড়টা বেশ ঢালু থাকায় নদীতে নেমে জল আনা সহজ হবে আমাদের লোকদের। আমি তখুনি আমাদের সহকারীদের সাহায্যে ওখানকার আগাছাগুলো পরিষ্কার করিয়ে ফেললাম। নদীর তীরটা জল থেকে প্রায় দশ ফুট ওপরে থাকায় ওখানে একটা বাঁধের মতো হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের সময় ওই ছায়া-শীতল বাঁধের ওপরে বসে গরমের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে ; আবার জায়গাটা জল থেকে বেশ কিছুটা ওপরে থাকায় কুমিরের আক্রমণের ভয়ও থাকবে না। এরপর আবার আমি ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়।

জর্জ ফিরে এলো প্রায় দুটোর সময়। রোদে পুড়ে তার মুখের রঙ তখন লালচে হয়ে গেছে। ঘামের চোটে তার গায়ের জামা ভিজে গেছে দেখলাম। তার অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হলো। আমি তাই বাচ্চাদের খবর আর জানতে চাইলাম না তার কাছে। আর জানবারই বা কি ছিল? ওদের

দেখা পেলে জর্জ নিজেই বলতো সে কথা।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জর্জ নদীতে নেমে স্নান করে এলো। এরপর সে বলতে লাগলো তার খবর। সে বললে যে, সকালে সে যখন নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছে সেই সময় মাঝ নদীতে একটা জল-মৃগকে (water buck) দেখতে পায়। সে আরও দেখতে পায় যে, ওয়াকাম্বা উপজাতির কয়েকজন শিকারী ওটার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। ওদের হাত থেকে প্রাণীটাকে রক্ষা করবার জন্যে সে তার রাইফেল থেকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করে। আওয়াজটা শুনেই শিকারীর দল পালিয়ে যায় ওখান থেকে।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেই নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন করে আস্তানা পাতলাম। তাঁবু খাটানো হয়ে গেলে জর্জ একটা নতুন পরিকল্পনার কথা বললে। তার সেই পরিকল্পনাটা হলো : খাওয়ার পরে সে ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে বনের পাশে গিয়ে অপেক্ষা করবে। বাচ্চারা যে পথ দিয়ে বন থেকে বেরিয়ে গ্রামে গিয়ে হানা দেয়, সেই পথের পাশেই গাড়িটা সে রাখবে। যাবার সময় কিছু মাংসও নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। মাংসটা এমন জায়গায় রাখা হবে যে, বাচ্চারা বন থেকে বেরোলেই তা দেখতে পাবে। জর্জ আরও বললে যে, সে যখন ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে বনের পাশে থাকবে সেই সময় সহকারীদের নিয়ে আমি থাকবো ক্যাম্পে। আমরা যদি বাচ্চাদের দেখতে পাই তাহলে সে খবর জর্জকে জানিয়ে দিতে হবে রাইফেল ফায়ার করে। আমি যদি দেখতে পাই তাহলে দুবার ফায়ার করবো আর সহকারীরা দেখলে ফায়ার করবে একবার। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসতেই জর্জ বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু সে রাত্রে বাচ্চারা আর ওদিকে আসে না ; তারা অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে আর একটা গ্রামে হানা দেয়। সেখানে গিয়ে একটা ভেড়াকে মেরে ফেললেও সেটাকে খাবার সুযোগ ওরা পায় না। তার আগেই রক্ষীরা আগুনে পটকা ফাটিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয় ওখান থেকে।

রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পরদিন বাচ্চাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করা সম্ভব হলো না। জর্জ তখন মাংসখণ্ডগুলোকে বনের ভেতর দিয়ে টানতে টানতে গাড়ির দিকে নিয়ে এলো। মাংসের গন্ধ পেয়ে বাচ্চারা যাতে গাড়ির দিকে আসে সেই উদ্দেশ্যেই সে মাংসগুলোকে ওইভাবে টেনে আনলো। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেলো যে, বাচ্চাদের বদলে একদল হায়েনা আর কয়েকটা শিয়াল এসে ঘোরাঘুরি করছে ওখানে।

পরদিন রাত্রে বাচ্চারা আর একটা গ্রামে হানা দিয়ে দুটো ছাগল বধ করে। কিন্তু ছাগল দুটোকে খাওয়ার আগেই গ্রামবাসীরা ওদের তাড়িয়ে দেয়।

আর কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টিপাত শুরু হবার কথা। আমরা তাই রীতিমতো ভাবিত হয়ে উঠলাম। আমাদের মনে হলো, বৃষ্টির মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের দরকার হবে চার চাকার একখানা হালকী লরী। আমাদের পুরনো টেমস লরীটা বিশেষ কোন কাজে আসবে না। কেন্ স্মিথের বেডফোর্ড লরীটাও বার বার চাইতে ইচ্ছা হলো না আমাদের। যদিও সে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছে, তবুও তার লরীটাকে দখল করে রাখতে চক্ষুলজ্জায় বাধলো আমাদের। ক্যাম্প থেকে আমাদের বাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্যেও একটা লরীর দরকার। কার্যরত শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্যে এবং বাচ্চাদের ওখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্যেও লরীর দরকার হবে। বাচ্চাদের জন্যে একটা এবং ক্যাম্পের জিনিসপত্র বহন করবার জন্যে আর একটা লরীর দরকার হবে। তাছাড়া দুখানা ল্যাণ্ডরোভারও লাগবে আমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বহন করার জন্যে।

এই সব কথা চিন্তা করে আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, দু-এক দিনের মধ্যেই আমি ইসিওলোতে গিয়ে একখানা নতুন বেডফোর্ড লরীর অর্ডার দেবো। নতুন বেডফোর্ড গাড়ি পেলে তার ওপরেই খাঁচা ফিট করে নেওয়া যাবে।

পরদিন সকালে খবর পেলাম, গতরাত্রে বাচ্চারা দুটো গ্রামে হানা দিতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু দু জায়গা থেকেই ওরা বিতাড়িত হয়েছে। এদিকে আমি আর ওখানে বসে থাকতে রাজী ছিলাম না; লরীর অর্ডার এখুনি দেওয়া দরকার। আমি তাই ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই ইসিওলোয় রওনা হয়ে গেলাম। ওখানে গিয়ে খবরাখবর নিয়ে জানতে পারলাম, নতুন বেডফোর্ড লরী ডেলিভারী পেতে কমসে-কম তিন সপ্তাহ দেরী হবে। এতো দেরিতে গাড়ি পেলে আমাদের চলবে না, কারণ তার আগেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যাবে। আমি তাই অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যে একটা লরী ভাড়া পাওয়া যায় কিনা তার জন্যে চেষ্টা শুরু করলাম। খবরা-খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, লরী ভাড়া পেতে অসুবিধে হবে না।

এইসব ব্যবস্থা করে আমি কেন্ স্মিথের লরীটা নিয়ে এল্‌সার ক্যাম্পে চলে গেলাম। ওখান থেকে বাকি জিনিসপত্রগুলো এখুনি সরিয়ে আনা দরকার, কারণ বৃষ্টি শুরু হলে জিনিসপত্র সরানো রীতিমতো দুরূহ হয়ে উঠবে।

পুরোনো ক্যাম্পে হাজির হয়ে প্রথমেই আমি গেলাম এলসার কবরের কাছে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, কবরের চারদিক ফুলে ফুল হয়ে আছে। আমরা যে সব লতা-গাছ লাগিয়েছিলাম সেগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেছে। এক ধরনের অচেনা ফুলও দেখা গেলো। ওই ফুলগুলো সাদায় আর সবুজে

মেশানো। একটা অচেনা লতাও দেখতে পেলাম। ওটা যে কি করে ওখানে এলো তা বুঝতেই পারলাম না।

কবরের এই রকম সুন্দর চেহারা দেখে আমি পর পর কয়েকটা ফটো নিলাম। সে রাতটা ভালভাবেই কাটলো। মেঘ কেটে গিয়ে আবার ফুটে উঠেছে চাঁদ। আবার হেসে উঠেছে নৈশ প্রকৃতি। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে যেন। মনের আনন্দেই ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো সিংহের বিকট গর্জনে। বুঝতে দেরী হলো না যে, বাচ্চাদের খবর নেবার জন্যেই তাদের পিতৃদেবের শুভাগমন হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ হাঁক-ডাক করেও তখন বাচ্চাদের হদিস পেলো না, তখন সে আর দেরী না করে বড় পাহাড়টার দিকে চলে গেলো।

ভোরে উঠেই এল্সার কবরের কাছে গেলাম। ওখানেও দেখতে পেলাম সিংহ বাবাজীর চরণ-চিহ্ন। হয়তো সে বুঝতে পেরেছিলো যে, ওই কবরের নিচেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে তার প্রেমময়ী দয়িতা!

কবর থেকে ফিরে আবার এলাম ক্যাম্পে। আমাদের লোকেরা তখন জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করেছে। একটু পরেই ওগুলো তোলা হবে লরীতে। তারপর চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হবে এল্সার এই প্রিয় বাসভূমি। বিদায় এল্সা! আর কোনোদিন হয়তো আসা হবে না এখানে। কিন্তু এখানে না এলেও তোমাকে আমি কোনদিনও ভুলবো না। যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন প্রতি মুহূর্তে মনে করবো তোমার কথা!

মনটা বেশ একটু খারাপ হয়ে গেলো ওখান থেকে চলে যাবার কথা মনে হওয়ায়। কিন্তু উপায় নেই, যেতে আমাকে হবেই। এল্সার বাচ্চাদের জন্যেই আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে।

লরী বোঝাই হয়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। তখন সবাই মিলে উঠে বসলাম লরীতে। লরী চলতে শুরু করলো।

নতুন ক্যাম্পে হাজির হলাম চা পানের সময়। জর্জ আমাকে অভিনন্দন জানালো।

চা খেতে খেতে জর্জ বলতে লাগলো এখানকার খবর। সে বললে, সেদিন পর্যন্ত বাচ্চাদের দেখা সে পায়নি। তবে দেখা না পেলেও তাদের খবর সে রোজই পেয়েছে। রোজই ওরা একটা-না-একটা গ্রামে হানা দিয়েছে। বাচ্চাদের কথা বলতে গিয়ে তার গলার স্বর গাঢ় হয়ে এলো। সে বললে যে, গত দশদিন যাবৎ ওরা অনাহারে আছে। যে সব ছাগল-ভেড়া ওরা মেরেছে সেগুলোকেও খেতে পারেনি। খাওয়ার আগেই গ্রামবাসীরা ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সে আরও বললে, ওদের এই হানাদারী চলছে আট মাইল জুড়ে। কোনো গ্রামেই ওরা নাকি দুবার হানা দেয়নি। আজ যে গ্রামে হানা দিয়েছে,

পরদিন হানা দিয়েছে সে গ্রাম থেকে বহু দূরে আর একটা গ্রামে। তবে একটা স্বস্তির কথা এই যে, আজ পর্যন্ত ওরা কোনো মানুষকে আক্রমণ করেনি। জেসপা যদিও দুবার দুটো বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলো, তবুও সে গৃহবাসীদের ওপরে হামলা করেনি। প্রথম বারে যে ঘরটায় ঢুকেছিলো সেখানে ছিলো একটি স্ত্রীলোক। ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোকটির পাশে কয়েকটা ছাগলও ছিলো। সেই ছাগলগুলোর লোভেই ঘরে ঢুকেছিলো জেসপা। ছাগলদের 'ম্যা ম্যা' রবে স্ত্রীলোকটির ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই সে দেখে একটা সিংহ ঘরের মধ্যে ঢুকে তার প্রিয় ছাগলগুলোর মধ্যে একটার ঘাড়ে থাবা বসিয়ে দিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে স্ত্রীলোকটি পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে। ওর চিৎকার শুনে জেসপা ঘাবড়ে গিয়ে এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার সেই লম্ফের গুঁতোয় মাটির ঘরটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তবে ঘরটা ভেঙে পড়লেও কেউ আহত হয়নি।

পরদিন আরও একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ে জেসপা। এবারে যে ঘরটায় সে ঢোকে সেখানে ছিলো একটি জওয়ান মরদ ছেলে। ঘরের মধ্যে হুটোপাটি আর ছাগলের আর্তনাদ শুনে ছেলেটির ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পায় যে, একটা সিংহ তার চৌকির তলা থেকে একটা ছাগলকে টেনে বের করতে চেষ্টা করছে। ছেলেটি তখন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে জেসপার পিঠে একটা লাথি মা[illegible] লাথি খেয়ে জেসপা ওখান থেকে সরে পড়ে।

জর্জ যখন এই সব কথা বলছিলো আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে তার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, বেশ একটু কাহিল হয়ে পড়েছে ও। আমি ওকে লক্ষ্য করছি দেখে ও মৃদু হেসে বললে ---কি দেখছো? আমার শরীরের অবস্থা? ও আর দেখে কি হবে? ইসিওলোয় হাজারো কাজ পড়ে আছে, কিন্তু সেখানেও আমি যেতে পারছি না। কি করে যাই? বাচ্চাদের একটা হিল্লে না করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। যাই হোক, এবারে অন্যান্য খবর শোনো।

অন্যান্য খবর হিসেবে জর্জ যা বললো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো: আমি চলে যাবার পর জর্জ একটা নতুন রাস্তা তৈরার কাজে হাত দিয়েছে। চোদ্দ মাইল দীর্ঘ একটা সোজা রাস্তা তৈরি করবার জন্যে একদল আদিবাসীকে সে নিযুক্ত করেছে। এই রাস্তাটা তৈরী হয়ে গেলে বাচ্চাদের এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া সহজ হবে। জর্জের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বাচ্চাদের ধরে খাঁচায় বন্দী করা। ওদের খাঁচায় ঢোকাতে না পারলে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া সহজ হবে না। কিভাবে বাচ্চাদের খাঁচায় ঢোকানো হবে সে সম্বন্ধে একটা মতলবও

বের করেছে জর্জ। কোনোগতিকে একবার বাচ্চাদের এখানে আনতে পারলে পরবর্তী কাজগুলো অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে ওদের এখানে আনা যাবে? এ ব্যাপারেও একটা পরিকল্পনা করেছে জর্জ। সে বললে, আজ থেকেই সে তার নতুন পরিকল্পনা মতো কাজ করতে শুরু করবে। পরিকল্পনাটা হলো, ওদের সম্ভাব্য চলাচলের পথ দিয়ে যদি একটা মরা ছাগল বা অন্য কোনো মরা জন্তুকে টেনে আনা যায় তাহলে ওরা হয়তো মাংসের গন্ধে এখানে এসে হাজির হবে।

সেদিন সন্ধ্যার পরেই জর্জ তার এই পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু করলো। সে একটা মরা ছাগলকে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে সেটাকে ক্যাম্পের দিকে টেনে আনতে লাগলো কিন্তু পরিকল্পনাটা ফলপ্রসূ হলো না। বাচ্চারা সেদিকে মোটেই এলো না।

পরদিন একজন সংবাদবাহক এসে খবর দিলো, সে একটা সিংহের পায়ের দাগ দেখে এসেছে। দাগ দেখে সে বুঝতে পেরেছে যে, দলছাড়া হয়ে একটা সিংহ নাকি আমাদের আগের ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে। খবরটা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কি তাহলে দল ছেড়ে চলে গেছে! হয়তো তাই হবে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই সে হয়তো দল ছেড়ে চলে গেছে।

রাত তখন প্রায় ন'টা। জর্জ তার পরিকল্পনা অনুসারে বনের ভেতরে গিয়ে মাংস নিয়ে বসে আছে। হঠাৎ জেসপা আর ছোট এল্‌সাকে দেখতে পেলো সে, ওদের শরীরের অবস্থা দেখে দুঃখ হলো জর্জের। সে বেশ বুঝতে পারলো, খেতে না পেয়ে ওদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। সে তাই তাড়াতাড়ি দুটো ডিসে করে কড্‌লিভার তেলের খাবারটা ওদের সামনে এগিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা খেয়ে নিলো ওরা। এরপর কিছু মাংসও ওদের খেতে দিলো জর্জ। মাংস দেখে দুজনেই ভারী খুশী। মনের আনন্দে দুই ভাই-বোনে খেতে শুরু করে দিলো সেই মাংস। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বাকি রাতটা জর্জের কাছ থেকে ভোর পাঁচটা নাগাদ সেখান থেকে সরে পড়লো ওরা।

জর্জ ক্যাম্পে ফিরে এসে ঘটনাটা বলতেই আমার মনে হলো, সংবাদবাহক যে সংবাদটা দিয়েছে সেটা হয়তো ঠিকই। গোপা নিশ্চয়ই আমাদের পুরোনো ক্যাম্পে চলে গেছে। জর্জও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হলো। আমরা তখন পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, এখুনি একজন লোককে আগের ক্যাম্পে পাঠানো দরকার গোপার খবর জানতে। আমরা তাই একজন বনরক্ষীকে ডেকে তাকে পাঠিয়ে দিলাম আগের ক্যাম্পে। তাকে বিশেষভাবে

বলে দিলাম, ওখানে আমাদের যে সব লোকজন আছে তারা যেন গোপাকে দেখলেই পেট ভরে খেতে দেয়।

লোকটাকে পাঠিয়ে দেবার পরেই জর্জ গ্রামের দিকে চলে গেলো। যাবার সময় এক থলি টাকাও সঙ্গে নিয়ে গেলো সে। বাচ্চাদের আক্রমণে যাদের ছাগল-ভেড়া মারা গেছে অথবা আরও কিছু ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো জর্জ। সেই অনুসারেই সে তাদের ক্ষতিপূরণ করতে গেলো। খেসারত দেওয়া শেষ হলো দুপুরের পরে। বেশ মোটা টাকাই গচ্চা দিতে হলো এর জন্যে। যাই হোক, টাকা দিয়ে যে গ্রামবাসীদের ঠাণ্ডা করা গেছে, এটাকেই আমরা লাভ বলে মনে করলাম।

সন্ধ্যার আগে জর্জ আবার বেরিয়ে পড়লো বনের দিকে। কিন্তু সে রাতে বাচ্চাদের আর দেখা পাওয়া গেলো না। পরদিন শুনতে পেলাম, ওরা সে রাতে পর পর তিনটে গ্রামে হানা দিয়ে দুটো ছাগলকে মেরে ফেলেছে এবং ছ'টাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করেছে।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই বনরক্ষীটি আমাদের আগের ক্যাম্প থেকে ফিরে এলো। তার কাছ থেকে খবর পেলাম যে, ৬ই এপ্রিল রাত্রে অল্পবয়সী একটা সিংহ সেখানে গিয়েছিলো। তবে ওখানে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সে বড় পাহাড়টার দিকে চলে যায়। পরদিন আবার তাকে দেখতে পাওয়া যায় নদীর ওপারে। তখন তার সঙ্গে বড় আকারের একটা সিংহ ছিলো। অল্পবয়সী সিংহটা নদী পার হয়ে ক্যাম্পে আসে। ওখানে এসে সে নাকি প্রথমেই যায় এল্সার কবরের কাছে। ক্যাম্পের লোকেরা তাকে খেতে দিয়েছে কিনা তা কিন্তু সে বলতে পারলো না।

খবরটা শুনে আমাদের মনে হলো যে অল্পবয়সী সিংহটা নিশ্চয়ই গোপা; তা না হলে সে ক্যাম্পে যেতো না। ক্যাম্পে গেলেই খানা পাওয়া যায় এটা বাচ্চারা ভাল করেই জানতো। তাই ওটা যে গোপা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইলো না আমাদের।

ক্যাম্পে তখন যে ক'জন লোক ছিলো তারা কিন্তু বাচ্চাদের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলো না। কখন এবং কিভাবে ওদের খেতে দিতে হয় তাও তারা জানতো না। আমরা তাই পরদিন সকালেই নুরুকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। সেদিন আর একটা খবর পেলাম যে, গ্রামবাসীরা তাদের মরা ছাগলগুলোকে যেখানে ফেলে দিয়েছিল সেখানে নাকি দুটো সিংহকে দেখতে পেয়েছে কেউ কেউ। ওরা নাকি একটা ছাগলকে খাচ্ছিলো তখন।

এদিকে জর্জের ল্যাণ্ড-রোভারের পেছনের অ্যাক্সেলটা ভেঙে যাওয়ায় গাড়ি নিয়ে বেরোনো আর সম্ভব হচ্ছিলো না তার পক্ষে। ইব্রাহিমকে ইসিওলোয়

পাঠানো হয়েছে নতুন একটা অ্যাম্বুলেন্স কিনে আনার জন্যে। সে না আসা অবধি তাঁবুতে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না জর্জের পক্ষে। সে রাতটা সে তাই বাধ্য হয়েই তাঁবুতে রয়ে গেলো। পরদিন বিকেল অবধি যখন ইব্রাহিম ফিরলো না, তখন আর চুপচাপ বসে থাকতে রাজী হলো না জর্জ। পুরো একটা ছাগলের মাংস সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে। বনের ভেতরে আগে থেকেই সে ছোট একটা তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলো। সেখানেই সে রাত কাটাবে বলে স্থির করলো।

জর্জ বেরিয়ে যাবার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে মোটর গাড়ির আওয়াজ শুনে আমি বুঝতে পারলাম ইব্রাহিম ফিরে এসেছে। সে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করে বললে, নদী পার হতে অসুবিধে হচ্ছিলো বলেই তার ফিরতে এত দেরী হলো। সে জর্জের কাছে যাবে কিনা সে কথাও আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমি তাকে বললাম, বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে তার কাছে গিয়ে লাভ নেই ; তার সঙ্গে আগামী কাল কথা বললেই চলবে। সে তখন আর দেরী না করে খাওয়া দাওয়া করতে গেলো। আমিও চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাত্রে জলকল্লোলের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেলো আমার। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেলো। আমি দেখতে পেলাম যে, নদীর জল বেড়ে উঠে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। আমি তাই আবার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁবুর একটা খুঁটি কাত হয়ে পড়লো। বুঝতে দেরী হলো না যে, জলস্রোতের ধাক্কাতেই খুঁটিটা ওইভাবে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হলো যে, এখুনি যদি ক্যাম্পের তাঁবুগুলো সরিয়ে না নেওয়া হয় তাহলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বন্যার জলে সবকিছু ভেসে যাবে।

এই কথা মনে হতেই আমি সহকারীদের তাঁবুর দিকে ছুটলাম। ওদের সাহায্য ছাড়া তাঁবুগুলো এবং ক্যাম্পের অন্যান্য জিনিসপত্র সরানো সম্ভব নয়।

সহকারীদের তাঁবুগুলো প্রায় দুশো গজ দূরে ছিলো। এই দুশো গজ যেতেই আমার প্রায় পনের মিনিট সময় লেগে গেলো। জলস্রোত ঠেলে এগোতে হচ্ছিলো বলেই অতটা দেরী হলো।

ওদের তাঁবুর সামনে গিয়ে দেখি, তাঁবুগুলোর চারপাশের ক্যানভাস শক্ত করে বেঁধে ওরা নিশ্চিন্ত মনে ভেতরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি তখন প্রাণপণে চিৎকার করে ওদের ডাকতে শুরু করলাম।

আমার চিৎকারের ঠেলায় অবশেষে ঘুম ভাঙলো ওদের। এবং ঘুম ভাঙতেই ব্যাপার কি জানবার জন্যে ওরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমার সামনে হাজির

হলো। আমি তখন বন্যার বিপদের কথাটা ওদের বুঝিয়ে দিয়ে অবিলম্বে তাঁবুগুলো আর ভেতরের জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে বললাম। আমার কথা শুনে এবং জলের অবস্থা দেখে ওরাও বুঝতে পারলো বিপদটা। ওরা তাই এক মুহূর্তও দেরী না করে কাজে লেগে গেলো।

প্রথমেই আমার তাঁবুটা খুলে সরিয়ে ফেলা হলো। ভেতরের জিনিসপত্র-গুলোও সরিয়ে নেওয়া হলো। এরপর বাকি তাঁবুগুলো এবং মালপত্র সরানোর কাজ শুরু হলো। সবাই মিলে হাত লাগিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁবু আর জিনিসপত্রগুলোকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা গেলো।

এই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো যে, জর্জের ল্যাণ্ডরোভারটা কিছু দূরে অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আরও মনে হলো যে, গাড়িটাকে যদি সরিয়ে না নিতে পারি তাহলে ওটা হয়তো বন্যার জলে ভেসে যাবে। কথাটা সহকারীদের বলতেই তারা ছুটলো গাড়িটাকে রক্ষা করার জন্যে। আমিও চললাম তাদের সঙ্গে।

গাড়িটার কাছে যেতেই দেখি বন্যার জল চাকার অর্ধেকের ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে। জলটা যেভাবে বাড়ছে তাতে গাড়িটাকে জলস্রোত ঠেলে দূরে নিয়ে যাবো, তারও উপায় ছিলো না। ঠেলে নিতে গেলে হয়তো স্রোতের তোড়ে ওটা ভেসেই যাবে।

গাড়িটা ছিলো বড় একটা গাছের তলায়। ইব্রাহিম তখন উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কয়েকগাছা মোটা দড়ি আর গোটা দুই পুলী নিয়ে এলো আমাদের জিনিসপত্রের ভেতর থেকে। এরপর সে দ্রুতগতিতে গাছে উঠে পুলী দুটোকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো একটা মোটা ডালের সঙ্গে। পুলী দুটো খাটানো হলে, দুগাছা দড়ি তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নীচে নেমে এসে, সেই দড়ি দুগাছা দিয়ে গাড়িটাকে জড়িয়ে বেঁধে ফেললো।

এরপর সবাই মিলে 'মারে জওয়ান হেঁইও' করে দড়ি ধরে টেনে গাড়িটাকে প্রায় আট-ন ফিট ওপরে তুলে, দড়ির অপর প্রান্ত দুটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেধে ফেলা হলো। ইব্রাহিমের বুদ্ধির জোরেই গাড়িটাকে রক্ষা করা সম্ভব হলো।

গাড়ি, তাঁবু আর মালপত্রগুলো বাঁচানো গেলেও নিজেদের বাঁচানো রীতি-মতো কঠিন হয়ে পড়লো। তাঁবু খুলে ফেলায় আমাদের সবাইকে তখন বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছে। এই অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে আমরা তাঁবুগুলোর কাছে ছুটে গিয়ে সেগুলোকে টেনে গায়ে-মাথায় চাপা দিয়ে মালপত্রের সামিল হয়ে রইলাম।

ভোর হতে না হতেই জর্জ এসে হাজির হলো কুকুর-ভেজা হয়ে। তার

অবস্থা দেখলাম আমাদের চেয়েও খারাপ। সে বললে যে, বৃষ্টিপাত শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে জেসপা আর ছোট এল্‌সা এসে হাজির হয় তার কাছে। তখুনি সে ওদের খেতে দেয়। ওদের খাওয়ার নমুনা দেখে তার মনে হয়, বেচারারা ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে এসেছে।

বাচ্চারা খাওয়া শেষ করে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। একটু পরেই তাঁবুর খুঁটিগুলো আলগা হয়ে তাঁবুটা পড়ে যায়। তাঁবুটা যে নতুন করে খাটাবে তারও কোনো উপায় ছিলো না। তাই সারাটা রাত তাকে বনের মধ্যে তাঁবু মুড়ি দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

ভোর হবার আগেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিলো। সূর্য ওঠার পরে বন্যার জলটাও ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো। আমরা তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে জিনিসপত্রগুলোকে রোদে শুকোবার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম

বাচ্চাদের খাঁচায় বন্দী করবার তোড়জোড়

আমি যখন ভিজে জিনিসগুলো রোদে দিচ্ছি ঠিক সেই সময় জর্জ বেরিয়ে পড়লো বাচ্চাদের সন্ধানে। কিন্তু সারাদিন বনে বনে ঘুরেও সে ওদের সন্ধান পেলো না অবশেষে বিকেলের দিকে ফিরে এসে সামান্য কিছু আহার করে আবার সে বেরিয়ে পড়লো আমার গাড়িটা নিয়ে। বাচ্চাদের জন্যে কিছু মাংসও সঙ্গে নিলো সে। এবার তাকে হতাশ হতে হলো না। অন্ধকার একটু ঘন হয়ে এলেই জেসপা আর ছোট এল্‌সা এসে হাজির হলো তার কাছে। জর্জ তাড়াতাড়ি ওদের সামনে মাংস ধরে দিলো। মাংস পেয়ে দুজনে খুশীমনে খেতে শুরু করলো। খাওয়া শেষ হলে ঘণ্টা দুই জর্জের কাছ থেকে রাত প্রায় ১১টার সময় ওরা চলে গেলো।

ভোরের দিকে ওদের গর্জন শুনতে পেলো জর্জ। এর আগে আর কোনো দিন ওরা গর্জন করেনি। এটাই হলো ওদের প্রথম প্রচেষ্টা। তবে প্রথম প্রচেষ্টাতেই ওরা সাফল্য অর্জন করলো। গর্জনটা প্রাপ্তবয়স্ক সিংহের গর্জনের মতো গম্ভীর না হলেও বেশ ভালই হলো।

পরদিনও ওরা এলো। সন্ধ্যার পরেই ওরা হাজির হলো সেদিন। জর্জ ওদের জন্যে আগে থেকেই মাংস রেখে দিয়েছিলো। ওরা তাই এসেই শুরু করলো মাংস ভক্ষণ। খাওয়া শেষ হতেই বৃষ্টি শুরু হলো। ওরা তখন আর দেরী না

করে ওখান থেকে সরে পড়লো। পরদিন খবর পাওয়া গেলো যে, সে রাত্রেও ওরা একটা গ্রামে হানা দিয়ে তিনটে ছাগলকে হত্যা করেছে।

এবার আমার কথা বলছি। জর্জ যখন বাচ্চাদের জন্যে দিনরাত ব্যস্ত হয়ে বনে বনে কাটাচ্ছে, আমি তখন ক্যাম্প করবার জন্যে নতুন জায়গার সন্ধান করতে লেগে গেছি। জায়গাও একটা পেয়ে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। অনেকগুলো বড় বড় গাছ থাকায় জায়গাটা বেশ ছায়া-শীতল। আমি তখন আর দেরী না করে ওখানেই তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প তৈরি করে ফেললাম। কিন্তু জায়গাটা যে হিপো মহারাজদের পথে পড়েছে, আগে তা বুঝতেই পারিনি। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম রাত্রে।

রাত তখন বেশ গভীর। সারাদিন পরিশ্রমের পর আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙে গেলো আমার। ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে বাইরে আসতেই দেখি, বিশালকায় এক হিপো মহারাজ মুখ দিয়ে শব্দ করতে করতে আমার তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছেন। মহারাজও হয়তো দেখতে পেয়েছিলেন আমাকে। তাই, কি মনে করে আবার তিনি পশ্চাদপসরণ করলেন নদীর দিকে। মহারাজের শুভাগমন দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে, ওখান থেকে ক্যাম্প সরিয়ে না নিলে তিনি হয়তো আবার আসবেন তাঁর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে। ওরা দলবদ্ধ হয়ে এলে তাঁবুগুলোকে যে আস্ত রাখবে না, সে কথাও বুঝতে দেরী হলো না। কিন্তু বুঝেও কিছু করার উপায় ছিলো না তখন, কারণ তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিলো।

এদিকে বিপদের ওপর বিপদ। বৃষ্টির ঠেলায় আমাদের সবকটা তাঁবুই পড়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। বৃষ্টি এতো বেশী হচ্ছিলো যে, ওখানে প্রায় দশ ইঞ্চি জল জমে গেলো। আমাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। মাথার ওপরে আচ্ছাদন নেই, পায়ের দিকে দশ ইঞ্চি জল, বাক্স-পেটরা, বিছানা এবং কাগজপত্র জলে ভিজে একসা। কিন্তু করারও কিছু নেই। আমরা তখন কোনোরকমে তাঁবুর ক্যানভাস মাথায় চাপিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে মাথা আর গা বাঁচাতে চেষ্টা করছি।

ভোরের দিকে বৃষ্টি ধরলে দেখতে পেলাম, সব মালপত্রই ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে। যে বাক্সের ভেতরে দরকারী কাগজপত্র রেখেছিলাম তাতে জল ঢোকায় কাগজপত্রগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

বৃষ্টির ফলে পথ-ঘাট এমনভাবে কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিলো যে গাড়ি চালানো তো দূরের কথা; হেঁটে যাওয়াই কঠিন। তা সত্ত্বেও সন্ধ্যার পরে গাড়ি নিয়ে বের হলো জর্জ। কিন্তু কিছুটা যেতেই গাড়ির চাকাগুলো কাদায় এমনভাবে আটকে গেলো যে, গাড়ি চালানো রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠলো।

অবশেষে অনেক চেষ্টার ফলে সে যখন তার তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলো তখন বেশ একটু রাত হয়ে গেছে। তাঁবুতে পৌঁছে জর্জ দেখতে পেলো যে, জেসপা আর ছোট এল্সা তার অপেক্ষায় বসে আছে। সে তখন গাড়ি থেকে মাংস এনে ওদের খেতে দিলো। ওরা যখন খাওয়া শুরু করেছে সেই সময় জর্জ গাড়ির হেড লাইটটা জ্বেলে দিলো। লাইট জ্বালতেই সে দেখতে পেলো যে, গোপাও এসে জুটে গেছে ওদের সঙ্গে। এক সপ্তাহেরও বেশী গোপা অনুপস্থিত ছিলো। কিন্তু জর্জের মনে হলো যে, ইতিমধ্যে মুরু তাকে নিশ্চয়ই খাইয়েছে। যাই হোক, গোপা আবার ফিরে এসেছে দেখে সে খুবই খুশী হলো। জেসপা আর ছোট এল্সাও যে গোপাকে দেখে খুশী হয়েছে এটাও সে বুঝতে পারলো তাদের হাব-ভাব দেখে। ওরা তখন তিনজনে মিলে মাংসগুলো শেষ করেই ছুট দিলো গ্রামের দিকে। জর্জের মনে হলো, এবার হয়তো ওরা গ্রামে গিয়ে হানা দেবে। সে তাই রাইফেল তুলে একটা ফাঁকা আওয়াজ করে গ্রামরক্ষীদের সাবধান করে দিলো। গ্রামরক্ষীরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে রইলো আগুনে পটকা নিয়ে। এরপর জেসপা আর তার ভাইবোন যখন গ্রামে ঢুকতে গেলো তখন আলোব ঝলকানি আর পটকার কান-ফাটা শব্দে ভীত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হলো ওরা।

এদিকে আসল কাজের তখনও কিছু করতে পারিনি আমরা। আসল কাজ মানে বাচ্চাদের খাঁচায় ঢুকিয়ে সরিয়ে নেবার কাজ। কিন্তু বাচ্চাদের দেখা যদি বা পেলাম, তাদের খাঁচায় আটকাবার কোনো ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত করা যায়নি। আমাদের তাই মনে হলো, এখন থেকেই আমাদের সচেষ্ট হতে হবে এ ব্যাপারে। জর্জ যে নতুন রাস্তাটা তৈরি করাতে লোক লাগিয়েছিলো সেটাও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। আমি তখন ইব্রাহিমকে নিয়ে আমার গাড়িতে করে ইসিওলো রওনা হয়ে গেলাম। ওখানে যে সব জিনিসের অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম সেগুলো নিয়ে আসবার জন্যেই ওখানে যাওয়া।
নতুন রাস্তা দিয়েই চলতে লাগলাম আমরা। রাস্তার অবস্থা দেখে কিন্তু মোটেই খুশী হতে পারলাম না আমি। গাড়ি চালানো বেশ একটু কষ্টকরই হলো। সবচেয়ে বেশী অসুবিধে হলো নদী পার হবার সময়। নদীটা যদিও খুব সরু এবং গাড়ি পার করবার জন্যে একটা ভেলা তৈরি করে রাখা হয়েছিলো সেখানে, তবুও গাড়িটাকে সেই ভেলার ওপরে উঠিয়ে নদী পার করতে খুবই অসুবিধেয় পড়তে হলো আমাদের। বেশী অসুবিধের সৃষ্টি করলেন মোড়ল মশাই। ইনি হলেন শ্রমিকদের সর্দার। মোড়লের-পো তখন নেশা করে এমনই মাতাল অবস্থায় ছিলেন যে, কাজে বাগড়া দেওয়া ছাড়া

আর কিছু করতে পারছিলেন না তিনি। যাই হোক অবশেষে অনেক কষ্টে গাড়িটাকে পার করা সম্ভব হলো। এরপর বাকি পথটা যেতে আর বিশেষ কিছু অসুবিধে হলো না। রাস্তার কোন্ কোন্ জায়গায় অদল-বদল করতে হবে তাও আমি টুকে নিলাম নোটবইতে।

ইসিওলোয় যেতেই দেখা হয়ে গেলো মেজর গ্রীমউডের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলাম ইতিমধ্যে তিনি ভাল একটা জায়গা পেয়ে গেছেন বাচ্চাদের জন্যে। টাঙ্গানাইকার বনবিভাগের অধিকর্তা তাঁকে বলেছেন যে, সেরেঙ্গেটির (Serengeti) ন্যাশানাল পার্কে ওদের স্থান দিতে রাজী আছেন তিনি। সিংহদের বাসভূমির পক্ষে সেরেঙ্গেটির মতো ভাল জায়গা সারা আফ্রিকায় আর দ্বিতীয় নেই। আমি তাই খবরটা শুনে খুবই খুশী হলাম। মেজর গ্রীমউড়কে আমি কৃতজ্ঞতা জানালাম এর জন্যে। ন্যাশানাল পার্কের অধিকর্তাকেও একখানা চিঠি লিখলাম ধন্যবাদ জানিয়ে। চিঠিতে এ কথাও লিখলাম যে, আমাদেরও কিছুদিন থাকতে হবে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে, কারণ এখনও ওরা স্বাধীনভাবে বসবাস করবার উপযুক্ত হয়নি। জেসপার গায়ে যে একটা তীরের ফলা বিঁধে আছে সে কথাটাও তাঁকে জানিয়ে দিলাম আমি।

এরপর মোটর কোম্পানিতে গিয়ে লরীটার কথা জিজ্ঞেস করতেই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ আমাকে বললেন যে, লরীটা এখনও মোম্বাসা ডকে রয়ে গেছে; ওটা এসে পৌছতে আরও কিছুদিন দেরী হবে। খবরটা শুনে মোটেই খুশী হতে পারলাম না, কারণ বৃষ্টি শুরু হলে নতুন লরী পেলেও কোনো কাজ হবে না। আমি তাই কেন্ ডাউনি সাফারীতে গিয়ে একখানা লরী ভাড়া করে ফেললাম। খবরটা শুনে মেজর গ্রীমউড বললেন যে, কেন্ স্মিথের লরীখানাও এ ব্যাপারে আমরা ব্যবহার করতে পারি। লরী সমস্যার এইভাবে সমাধান করে আমি অন্যান্য দরকারী জিনিস সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম। খাঁচা তিনটির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলাম যে, ওগুলো ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে আছে।

এদিকে আমি ইসিওলোতে আসার দিন থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আমি তখন সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুখানা লরী, তিনটে খাঁচা এবং একগাদা দরকারী জিনিস নিয়ে ক্যাম্পে এসে হাজির হলাম। জিনিসগুলো দেখে, এবং দুখানা লরীই আমরা ব্যবহার করতে পারবো শুনে জর্জ খুবই খুশী হলো। এদিকের খবর জানাতে গিয়ে জর্জ বললো আমার অনুপস্থিতিতে বাচ্চারা প্রতি রাত্রেই এখানে এসেছে। সে আরও বললো ইতিমধ্যে তারা গ্রামবাসীদের কোনো

রকম ক্ষতিও করতে পারেনি। বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থারও বেশ উন্নতি হয়েছে বলে জানালো সে।

খবরগুলো ভালো হলেও আমি কিন্তু উৎসাহিত হতে পারলাম না। বারবার আমার মনে হতে লাগলো যে, আজ পর্যন্ত ওরা কোনো মানুষকে আক্রমণ না করলেও ভবিষ্যতে যে করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? ওরা যদি কোনো মানুষকে মেরে ফেলে অথবা সামান্য একটু জখমও করে তাহলে কর্তৃপক্ষ ওদের গুলি করে মেরে ফেলবার হুকুম দেবেন। সুতরাং আমাদের এখন কর্তব্য হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে ওদের সরিয়ে ফেলা। সেরেঙ্গেটির ন্যাশানাল পার্কে ওদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে শুনে জর্জ খুবই খুশী হলো। সেও আমার সঙ্গে একমত হয়ে বললো যে, যত শীগগির সম্ভব ওদের এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার।

কিন্তু সরিয়ে নেওয়া দরকার বললেই তো আর সরিয়ে নেওয়া যাবে না। এখনো আমরা ওদের খাঁচায় পুরতে পারিনি। খাঁচায় বন্ধ না করা অবধি ওদের সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের তাই আজ থেকেই চেষ্টা করতে হবে এ ব্যাপারে। প্রথমেই আমাদের যা করতে হবে তা হলো ওদের খাঁচার মধ্যে আহার করাতে অভ্যস্ত করা।

জর্জের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে বসলে সেও এই কথাই বললো। তবে সে এখন আশা করছে যে, শীগগিরই সে বাচ্চাদের খাঁচায় বন্ধ করতে সক্ষম হবে।

সেই দিন থেকেই শুরু হলো প্রচেষ্টা। সেদিন সন্ধ্যার পর দুটো ছাগল মেরে গাড়িতে তুলে নিয়ে জর্জ বেরিয়ে পড়লো বনের দিকে। তাঁবুর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই বাচ্চাদের দেখতে পেলো জর্জ। সে তখন ছাগলের মৃতদেহ দুটোকে ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাটিতে ফেলে দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিলো ক্যাম্পের দিকে। কিন্তু 'কোন বুদ্ধিই খাটিল না ঘর-পোড়ার কাছে'। লোভনীয় খাদ্য সরসর করে সরে যাচ্ছে দেখে জেসপা এক লাফে এগিয়ে এসে একটা ছাগলকে ধরে ফেললো। ছাগলটা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে দেখতে পেয়ে সেও দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিলো। ছাগলটাকে মুখে করে সামনের দিকে কিছুটা এসে, চট্ করে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি-গাছাকে পেঁচিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির টানে দড়িটা ছিঁড়ে গেলো। জর্জের মতলব এইভাবে বানচাল করে দিলো জেসপা।

জর্জও দমে যাবার পাত্র নয়। পরদিন সন্ধ্যার পরে আবার সে বের হলো গাড়ি নিয়ে। তবে সেদিন আর সে ওদের খাবার সঙ্গে করে নিলো না। তার বদলে সে প্রত্যেকটা খাঁচার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মাংস রেখে গেলো। জর্জের

গাড়ি দেখে বাচ্চারা এগিয়ে আসতেই সে গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো। বাচ্চারাও আসতে লাগলো গাড়ির পেছনে পেছনে। অবশেষে ক্যাম্পে এসে ওরা যখন দেখতে পেলো যে, আগের ক্যাম্পের মতো এখানেও খাঁচার মধ্যে মাংস আর তেলের চাটনি রেখে দেওয়া হয়েছে. তখন ওরা খুশী মনেই খাঁচায় ঢুকে খেতে শুরু করলো।

বাচ্চারা খাঁচায় ঢুকে খাচ্ছে দেখে জর্জের মনে হলো যে, এখন থেকে ওরা রোজই এখানে এসে আগের মতোই খাঁচায় ঢুকে খেতে থাকবে। এই কথা মনে হতেই সে পরবর্তী কাজেব জন্যে প্রস্তুত হবে বলে মনস্থ করলো।

জর্জের এই পরবর্তী কাজটা হলো প্রত্যেক খাঁচার মুখে এমন একটি করে দরজা ফিট করা যে, ওগুলোকে একই সঙ্গে ওপরে তোলা এবং নিচে নামানো যায়। কিন্তু এ কাজ এমন সাবধান হয়ে করতে হবে যাতে বাচ্চারা কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে।

এবারে কিছু অন্য কথা বলছি। এতদিন জর্জের পক্ষে মেজর গ্রীমউডের অধীনে চাকরি করা অসম্ভব হয়নি। ইসিওলোতে সরকারী কাজ করেও সে ক্যাম্পে এসে এল্সা এবং তার বাচ্চাদের দেখাশুনা করতে পেরেছে। কিন্তু এবার যখন একশ মাইল দূরে সেরেঙ্গেটিতে যেতে হচ্ছে, তখন আর তার পক্ষে চাকরি বজায় রাখা কোনমতেই সম্ভব নয়। সে তাই বাধ্য হয়েই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলো মেজর গ্রীমউডের কাছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, চাকরিতে ইস্তফা দেবার আগে জর্জ অনেক কিছু চিন্তা করেছে। তা না হলে বিশ বছরের চাকরি সে এভাবে ছেড়ে দিতে পারতো না। এল্সার বাচ্চাদের জন্যেই সে আজ চাক্‌রি ছেড়ে দিলো। চাকরির বাঁধা মাইনে এবং সুযোগ-সুবিধে এক কথায় ছেড়ে দেওয়ায় বুঝতে পারা গেলো যে. নিজের সুখ-সুবিধের চাইতে এল্সার বাচ্চাদের সুখ-সুবিধের দিকেই তার বেশী নজর।

এই সময় আমার মনে হলো যে, বাচ্চাদের খাঁচায় আটকানোর জন্যে যদি কোন পেশাদার খাঁচারু (Trapper) পাওয়া যায়, তাহলে জর্জের পরিশ্রমের লাঘব হবে। আমি তাই পরদিনই ইসিওলোয় রওনা হলাম পেশাদার খাঁচারুর সন্ধানে। কেন্ স্মিথের বেডফোর্ড লরীটাকে কারখানায় দিয়ে এলাম মেরামতের জন্যে। এর পরেই আমি লেগে গেলাম খাঁচারুর সন্ধানে। কিন্তু তেমন কোন পেশাদার খাঁচারু না পেয়ে অবশেষে আমি জুলিয়ান ম্যাক্‌কিঁয়্যাল্ডকে ফোন করে তার সাহায্য চাইলাম। জুলিয়ান সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলো। সে আমাকে জানিয়ে দিলো যে, পরদিন সকালেই সে আসছে। আগেও একটা

সাফারীর সময় সে আমাদের সঙ্গে ছিলো। (সে বারের সাফারীর কথা 'বর্ণ ফ্রী' বইতে উল্লেখ করা হয়েছে।)

জন বার্গার এবং নাইরোবীর অন্য একজন পশুচিকিৎসকের সঙ্গেও টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম আমি। ওঁরা জেসপার দেহে অপারেশন করে তীরের ফলাটা বের করতে পারবেন কিনা জানতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা রাজী হয়ে গেলেন। কথা হলো, বাচ্চাদের সরিয়ে নেবার সময় আমরা ওঁদের ডাক্তারখানায় যাবো এবং সেখানেই ওঁরা জেসপার দেহ থেকে তীরের ফলাটা বের করে দেবেন।

এইসব কাজ করে একটু সুস্থির হয়ে বসতেই টেবিলের ওপরে তিনখানা কেবল্ (cable) দেখতে পেলাম। প্রত্যেকটা কেবল্-ই এসেছে আমেরিকার একটি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে। কেবল্-এ তিনি জানিয়েছেন যে, এল্সার বাচ্চাদের স্থানান্তরিত করার বিবরণ জানবার এবং তাদের ফটো নেবার জন্যে পত্রিকার তরফ থেকে একজন রিপোর্টার পাঠানো হচ্ছে আমাদের কাছে।

কেবল্গুলো পড়ে আমি বিস্মিত হলাম। আমাদের সম্মতি না নিয়ে এইভাবে রিপোর্টার পাঠানো হচ্ছে জেনে কিছুটা বিরক্তও হলাম। এর পরেই আর এক বিস্ময়। পরদিন সকালেই নাইরোবী থেকে সেই রিপোর্টার মশাই আমাকে ফোন করে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানালেন যে. বিকেলের মধ্যেই তিনি ইসিওলোয় পৌঁছে আমার সঙ্গে দেখা করছেন।

একটু পরেই জুলিয়ান এসে হাজির হলো। আমি তার কাছে আমাদের পরিকল্পনাটা জানিয়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম যে, ইতিমধ্যেই তিনটে খাঁচা তৈরি করিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার কথা শুনে জুলিয়ান বললে, বাচ্চাদের ধরবার জন্যে একটা বড় আকারের খাঁচা দরকার হবে। আগে ওদের একসঙ্গে বড় একটা খাঁচায় বন্দী করে আলাদা আলাদা খাঁচায় ঢোকাতে হবে। বড় খাঁচা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। আমি তাই জুলিয়ানকে বললাম, বড় খাঁচা এখানেই আছে। যাবার সময় ওটাকে লরীতে তুলে নেওয়া যাবে।

এরপর আমি আর জুলিয়ান একত্রে কাজ শুরু করলাম। প্রথমেই মোটর কারখানায় গিয়ে লরীটা ডেলিভারী নিলাম। তারপর বড খাঁচাটা লরীর ওপরে তুলে রেখে সোজা চলে গেলাম ব্যাঙ্কে। সেখানে গিয়ে কিছু টাকা তুলে নিয়ে অনেকগুলো ছাগল ভেড়া কিনে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। এইভাবে সব কিছু ব্যবস্থা করে আমরা সেই রিপোর্টারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিলো সেদিন। সেই বৃষ্টির মধ্যেই বিকেলের দিকে রিপোর্টার এসে হাজির হলেন। যে পাইলট তাঁকে প্লেনে করে নিয়ে এসেছেন তিনিও এলেন তাঁর সঙ্গে। বৃষ্টির মধ্যে নাইরোবী থেকে প্লেন নিয়ে এসে ইসিওলোর পিচ্ছিল বিমান বন্দরে সুষ্ঠুভাবে অবতরণ করাটা সহজ ব্যাপার নয়। আমি তাই পাইলটকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

রিপোর্টার আমাকে জানালেন যে, সম্পাদকের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে তিনি বার্লিন থেকে সোজা কেনিয়ায় চলে এসেছেন। তিনি আরও বললেন যে, এখানকার কাজ শেষ হলেই তিনি কিউবায় চলে যাবেন।

সে রাতটা ইসিওলোয় কাটিয়ে পরদিন সকালেই আমরা রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমি আমার সহকারীদের নিয়ে লরীতে উঠে বসলাম এবং রিপোর্টার ভদ্রলোককে জুলিয়ান তার ল্যাণ্ডরোভারে তুলে নিলো।

শহর এলাকা পার হতেই দেখতে পেলাম, রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ। প্রবল বৃষ্টির ফলে রাস্তাটা কাদায় কাদা হয়ে গেছে। হাঁটু সমান সেই কাদা ঠেলে গাড়ি চালাতে রীতিমতো কষ্ট হতে লাগলো আমাদের। দেরীও হতে লাগলো অস্বাভাবিকভাবে। ফলে নদীর ধারে পৌঁছতেই বিকেল হয়ে গেলো।

নদীর অবস্থা দেখেই আমার 'চক্ষু চড়কগাছ' হবার উপক্রম। নদীর জল এবং স্রোতের বেগ এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, গাড়ি নিয়ে ওপারে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা তাই ওখানেই তাঁবু খাটাতে লেগে গেলাম। জুলিয়ান একটা ডবল তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো। আমার সঙ্গেও একটা ছোট তাঁবু ছিলো। ওই তাঁবু দুটো খাটানো হয়ে গেলে জুলিয়ান আর রিপোর্টার বড় তাঁবুতে এবং আমি আমার ছোট তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। সহকারীরা লরীতেই রইলো।

পরদিন সকালেও জল কমবার কোন রকম লক্ষণ না দেখে আমি দুজন সহকারীকে জর্জের কাছে পাঠালাম। তাদের বলে দিলাম জর্জ যেন তার ল্যাণ্ড-রোভার এবং একটা লরী নিয়ে ওপারে এসে হাজির হয়।

সহকারীরা চলে যেতেই আমি খবরের কাগজগুলো পড়তে শুরু করলাম। গত কয়েকটা দিন সময় অভাবে কাগজ পড়াই হয়নি। তাই ইসিওলো থেকে রওনা হবার আগে কয়েক দিনের কাগজ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম।

প্রথম যে কাগজখানা হাতে নিলাম তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই এল্‌সার বাচ্চাদের খবর বেরিয়েছে দেখলাম। বড় বড় হেড লাইনে লেখা হয়েছে—'এল্‌সার বাচ্চারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত'।

অন্যান্য পত্রিকাতেও প্রায় একই রকম হেড লাইনে এল্‌সার বাচ্চাদের খবর বের হয়েছে।

‘‘বাচ্চারা বন্দী হলো’’

খবরটা পড়ে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি। খবরে বলা হয়েছে যে, মেজর গ্রীমউডের কাছ থেকে জানা গেছে, এল্‌সার বাচ্চারা জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে দেখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের গুলি করে মেরে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন। মেজর গ্রীমউড এ কথা কি করে বললেন বুঝতে পারলাম না। হুকুম একটা জারী হয়েছে ঠিকই, তবে সেটা ঠিক ওভাবে নয়। হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, এল্‌সার বাচ্চারা যদি কোন মানুষকে আক্রমণ করে তাহলে তাদের গুলি করে মেরে ফেলতে হবে। এর মানে এই নয় যে, এখনই ওদের মেরে ফেলা হবে। তাছাড়া মেরে ফেলার প্রশ্নই এখনও ওঠে না, কারণ আজ পর্যন্ত ওরা কোন মানুষকে আক্রমণ করেনি। তবে আজ পর্যন্ত আক্রমণ না করলেও ভবিষ্যতে যে করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমার তাই মনে হলো, অবিলম্বে ওদের সরিয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সরিয়ে নেব বললেই তো আর সরিয়ে নেওয়া যায় না। এখনও পর্যন্ত ওদের আমরা খাঁচায় বন্দী করতেই পারিনি। অথচ খাঁচায় বন্দী করতে না পারা অবধি ওদের সরিয়ে নেবার কথা চিন্তাই করা যায় না। আমি তাই উতলা হয়ে উঠলাম জর্জের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যে। কিন্তু এখন যেভাবে বৃষ্টি পড়ছে তাতে কখন যে নদী পার হতে পারবো সে সম্বন্ধে কোনই নিশ্চয়তা নেই।

আমি যখন তাঁবুতে বসে এই সব কথা চিন্তা করছি সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টিটা থেমে গেলো। একটু পরেই নদীর জলও কমতে শুরু করলো। আমার তখন মনে হলো, হাঁটাপথে যে দুজন সহকারীকে পাঠানো হয়েছে তারা হয়তো সময়মতো ক্যাম্পে পৌঁছতে পারবে না। আমি তাই জুলিয়ানকে বললাম, সে যেন তার ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে ক্যাম্পে গিয়ে জর্জকে আমাদের অবস্থার কথা জানিয়ে দেয়। ইব্রাহিমকেও সঙ্গে নিতে বললাম, কারণ ল্যাণ্ড-রোভার যদি ক্যাম্প পর্যন্ত যেতে না পারে তাহলে ইব্রাহিম তাকে হাঁটাপথে বাকি রাস্তাটা নিয়ে যেতে পারবে।

আমার অনুরোধে তখুনি ওরা বেরিয়ে পড়লো ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে। ওরা বেরিয়ে পড়লেও আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না ; কারণ ওরা যে পথ দিয়ে যাবে সে পথটার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী। রাস্তার অবস্থাটা কেমন আছে তাও বুঝতে পারছিলাম না। তবুও এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা খুঁজে না পেয়েই ওদের পাঠিয়ে দিলাম।

সারা দিন আর সারা রাত আর কোন কাজ নেই। চুপচাপ বসে থাকা আর জর্জের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই আমার। তবে এরই মাঝে রিপোর্টার ভদ্রলোকের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব তা করা হলো। করবার মতো বিশেষ কিছুই ছিলো না। শুধু বার কয়েক চা করে দেওয়া আর টিনের খাবার পরিবেশন করা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব হলো না।

পরদিন সকালেই আমার মনের বিষাদাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলো জর্জকে দেখে। সে তার ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে নদীর ওপারে এসে হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে তখন। জুলিয়ান আর ইব্রাহিমও ফিরে এসেছে জর্জের সঙ্গেই। নদীর জলও তখন কিছুটা কমে গেছে। আমাদের লোকেরা তখন ধরাধরি করে আমাদের জিনিসপত্র ওপারে নিয়ে গেলো। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো আমাকে নিয়ে, কারণ আমার পায়ের ক্ষত তখনও নিরাময় হয়নি। সমস্যার সমাধান করলেন রিপোর্টার ভদ্রলোক। তিনি আর জুলিয়ান হাত-চেয়ার তৈরি করে আমাকে সেই চেয়ারে বসিয়ে নদী পার করে দিলেন। আমার পা যদি ভাল থাকতো তাহলো কখনো এভাবে নদী পার হতাম না। কিন্তু পায়ে জল লাগলে ক্ষতস্থান সেপ্‌টিক হতে পারে ভেবে বাধ্য হয়েই আমি ওদের হাত-চেয়ারে বসে নদী পার হলাম। এরপর সমস্যা দাঁড়ালো লরী আর তার ওপরের বিশালকায় খাঁচাটা নিয়ে। আমরা পার হলেও লরীটাকে এপারে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি তাই ড্রাইভারকে বললাম, সে যেন লরীটা নিয়ে ঘোরা-পথে ক্যাম্পে চলে যায়।

ড্রাইভার লরী নিয়ে চলে যাবার পর আমরাও রওনা হলাম। রিপোর্টার ভদ্রলোককে জুলিয়ান তার গাড়িতে নিয়ে রওনা হলো। আমরা তখন মালে আর মানুষে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি অবস্থায় জর্জের ল্যাণ্ড-রোভারে করে রওনা হলাম।

ক্যাম্পে হাজির হতেই জর্জ আমাদের সিংহ-ধরা ফাঁদের কাছে নিয়ে গেলো। ফাঁদটা জর্জ নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করেছে। এমন কায়দায় তৈরি করেছে যে, দড়ি ধরে টানলে খাঁচার তিনটে দরজা একই সঙ্গে ওপরে উঠে যায়; আবার দড়িটা ছেড়ে দিলেই দরজাগুলো একই সঙ্গে নিচে নেমে পড়ে।

ফাঁদটা দেখানো হয়ে গেলে জর্জ বললে যে, আমি এখান থেকে চলে যাবার পর প্রত্যেক রাত্রেই বাচ্চারা ক্যাম্পে এসেছে এবং খাঁচার মধ্যে ঢুকে মাংস খেয়ে গেছে। তবে এ কদিন তাদের ফাঁদে আটকানো সম্ভব হয়নি, কারণ একই সঙ্গে ওদের তিনজনকে তিনটে খাঁচায় ঢোকানো সম্ভব হয়নি।

জর্জের কাছ থেকে এই কথা শোনার পর আমার মনে হলো, এবার হয়তো

শীগগিরই ওদের খাঁচায় পোরা সম্ভব হবে।

এবারে রিপোর্টার ভদ্রলোকের থাকার ব্যবস্থা কোথায় করা যায় সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করতে বসা গেলো। রিপোর্টার নিজেও রইলেন সেই পরামর্শ সভায়। কিছুক্ষণ আলোচনার পরে স্থির হলো যে, রাতের বেলায় তিনি জর্জের সঙ্গে থাকবেন। তিনি বাচ্চাদের খাঁচায় বন্ধ করার সময়কার ফটো নিতে চান বলেই এ ব্যবস্থা।

গত কয়েক দিনের পরিশ্রমে আমার শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিলো। আমি তাই সন্ধ্যার পরেই নিজের তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়ে পড়লেও চোখে ঘুম এলো না। সব সময়ই মনে হতে লাগলো, এই বুঝি ফাঁদের দরজা নিচে পড়ছে। কিন্তু সে রাত্রে বাচ্চারা ক্যাম্পে এলেও কেন যেন খাঁচায় ঢুকলো না। হয়তো জর্জের সঙ্গে একজন নতুন লোক দেখেই ওরা খাঁচার কাছে এগোলো না। তবে খাঁচায় না ঢুকলেও রিপোর্টার ওদের কয়েকখানা ফটো নিয়ে নিলেন।

পরদিন সকালে উঠেই রিপোর্টার ভদ্রলোক আমাদের জানালেন যে, সেই দিনই তাঁকে কিউবা অভিমুখে রওনা হতে হবে। তিনি চলে যাবেন শুনে আমরা দুঃখিত হলাম। আমরা তাঁকে বললাম, তিন-চারদিনের মধ্যেই বাচ্চাদের ফাঁদে বন্ধ করতে পারা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। অতএব তিনি যদি তিন-চারদিন থেকে যেতে পারেন তাহলে বাচ্চাদের বন্দী করার ছবিও তিনি নিতে পারবেন।

আমাদের কথার উত্তরে তিনি জানালেন, থাকা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই তিনি থেকে যেতেন। কিন্তু কিউবার সফর-সূচী আগে থেকেই স্থির করে রাখা হয়েছে বলে আজই তাঁকে রওনা হতে হবে। তিনি আরও বললেন, এখানে এসে তিনি যা দেখে গেলেন তাতেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, বাচ্চাদের এখান থেকে সরিয়ে নেবার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

এরপর আরও কয়েকখানা ফটো নেবার পর তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে তিনি আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। এবারেও জুলিয়ানই তাঁকে নিয়ে গেলো তার ল্যাণ্ড-রোভারে করে। যাবার সময় সে বলে গেলো যে, ইসিওলোয় গিয়ে সে যদি বেডফোর্ড লরীটা পেয়ে যায় তাহলে সে ওটাকে নিয়ে সোজা এখানে চলে আসবে।

এদিকে আমাদের তিনজন ড্রাইভার তখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়েছে। দুজন সহকারীও সেইদিন আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছে। আমরা তাই জুলিয়ানকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম যে লরীটা পাওয়া না গেলেও

সে যেন চলে আসে।

রিপোর্টার চলে যাবার পরদিনই আর এক দুঃসংবাদ। সেদিন জেলা-কমিশনারের কাছ থেকে এক পত্রাঘাত এলো জর্জের কাছে। জেলা কমিশনার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা যদি অবিলম্বে বাচ্চাদের সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা না করি কিংবা আমরা যদি বাচ্চাদের সরিয়ে নিতে সক্ষম না হই তাহলে অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে উঠবে।

চিঠিখানা পড়ে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। এখনও আমরা ওদের খাঁচায় পুরতে পারিনি। যদিও আশা করছি, দু-একদিনের মধ্যেই আমরা ওদের ধরতে পারবো, কিন্তু সে আশা তো ফলবতী নাও হতে পারে! তবে কি শেষ পর্যন্ত বুলেটের আঘাতেই প্রাণ দিতে হবে ওদের! না, ওটা কখনো হতে দেবো না। যেমন করেই হোক ওদের এখান থেকে সরিয়ে নিতেই হবে।

এই সময় আমার মনে পড়ে গেলো, প্রায় দু' মাস আমি বাচ্চাদের দেখতে পাইনি। ওদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো ২৭শে ফেব্রুয়ারী; আর আজ হলো ২৪শে মার্চ। ইতিমধ্যে জর্জ যদিও কয়েকবার ওদের দেখতে পেয়েছে, কিন্তু আমি একবারও ওদের দেখতে পাইনি। বাচ্চাদের একটিবার দেখবার জন্যে সেদিন সন্ধ্যার পরে আবার গাড়িটা নিয়ে জর্জের গাড়ির পাশে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসতেই বাচ্চারা এসে হাজির হলো। প্রথমে জেসপা এসে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানে আগে থেকেই মাংস রাখা ছিলো। জেসপা খুশী মনে খেতে শুরু করলো। সেদিন মাংসের ভেতরে আমরা টেরামাইসিন ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। মাংসের সঙ্গে জেসপা সেদিন অজ্ঞাতসারেই খেয়ে নিলো ওষুধটা।

এদিকে জর্জ তখন দড়ির প্রান্ত ধরে বসে আছে তিনটে বাচ্চা আলাদা আলাদা খাঁচায় ঢুকলেই দড়িটা আলগা করে ওদের ফাঁদে আটকাবে। কিন্তু তখনও বাকি দুটোর দেখা নেই।

একটু পরে আবার গাড়িটার পাশে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ লাইট জ্বেলে আমি দেখতে পেলাম, গোপা এসেছে ওখানে। টর্চের আলো গায়ে পড়তেই গোপা জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে পড়লো। একটু পরে ছোট এলসাও এসে হাজির হলো ওখানে। বোনকে দেখে গোপা হঠাৎ তিন লাফে খাঁচার ভেতরে ঢুকে খেতে শুরু করলো। কিন্তু ছোট এল্সা খাঁচার দিকে গেলো না। অবশেষে রাত দুপুরের পরে সে ভেতরে ঢুকে তার খাবারটা খেয়ে নিলো। সে রাত্রে ওদের ফাদে আটকানো সম্ভব না হলেও ওদের সবাইকে

টেরামাইসিন খাওয়ানো সম্ভব হলো।

পরদিনও যথাসময়েই বাচ্চারা এসে খেতে শুরু করলো। কিন্তু অর্ধেক খাওয়া হতেই কিছু দূরে একটা সিংহের গর্জন শুনে খাঁচা থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে সেদিকে ছুট দিলো। এরপর আবার ওরা ফিরে এলো অনেক রাত্রে। তখন তিনজনে তাদের বাকি খাবারটা শেষ করে ওখান থেকে চলে গেলো।

পরের রাত্রে বাচ্চারা মোটেই এলো না। আমাদের মনে হলো, ওরা হয়তো সেই সিংটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। আমার তখন আর এক চিন্তা হলো যে, ওরা যদি ফিরে না আসে তাহলে আমাদের সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে।

কিন্তু চিন্তা করলে তো কাজের কোন সুরাহা হবে না! আমরা তাই ফাঁদটাকে আরও উন্নত করার কাজে লেগে গেলাম। সরু রডের প্রান্তগুলি ভেতরের দিকে এমনভাবে ছিলো যার ফলে বাচ্চাদের গায়ে খোচা লাগতে পারতো। আমরা তাই ওগুলোকে বাইরের দিকে বের করে দিলাম। বিকেলের মধ্যেই এ সব কাজ শেষ হয়ে গেলো। আমরা তখন প্রত্যেক বাচ্চার জন্যে মাংস আলাদা করে তার মধ্যে টেরামাইসিন ঢুকিয়ে বিভিন্ন খাঁচার মধ্যে রেখে দিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাত প্রায় নটার সময় জেসপা এসে হাজির হলো। সে এসেই খাঁচার মধ্যে ঢুকে মাংস খেতে শুরু করলো। গোপা আর ছোট এল্সার কিন্তু তখনও দেখা নেই। এদিকে জেসপা তখন খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু গোপা আর ছোট এল্সার কি হলো? ওরা এখনও আসছে না কেন? না, ওই তো এসে গেছে ওরা! জেসপার মতো ওরা খেয়েদেয়ে বাইরে এসে শুয়ে পড়লো।

জর্জ তখনও দড়ি ধরে বসে আছে: বাচ্চারা খাঁচায় ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দেবে সে। কিন্তু তার বসে থাকাই সার হলো। সময় বুঝে ঠিক সেই সময়েই গত রাত্রের সেই সিংহ মশাই গর্জন করে উঠলেন। গর্জন শুনেই বাচ্চারা তার দিকে ছুটে চলে গেলো।

পরদিনও কিছু হলো না। শুধু বসে থাকাই সার হলো। তার পরের দিনও একই অবস্থা। তৃতীয় রাত্রে আমার পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হলো না। শরীরটা ভাল না লাগায় আমি শুতে গেলাম। জর্জকে বলে গেলাম, মাঝরাতে সে যেন আমাকে ডেকে দেয়।

শুয়ে শুয়ে নানা কথা চিন্তা করতে লাগলাম আমি। বাচ্চাদের মাথার ওপরে মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া ঝুলছে; অথচ এখনো ওদের আমরা ধরতে পারলাম না। দু-একদিনের মধ্যেই যদি ধরতে না পারি তাহলে ওদের ভাগ্যে যে কি হবে

তা ভগবানই জানেন।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঝপাং করে একটা শব্দ হওয়ায় তন্দ্রা টুটে গেলো। মনে হলো, খাঁচার ভেতরে হুটোপাটির শব্দ হচ্ছে। তবে কি ওদের বন্দী করা হয়েছে!

ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। খাঁচার কাছে যেতেই দেখি বাচ্চারা বন্দী হয়েছে। এতদিনের প্রচেষ্টা, এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম আজ সফল হলো! এবার আর কোন চিন্তা নেই। আর ভয় নেই ওদের ভবিষ্যতের জন্যে। মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে গেছে বাচ্চারা।

সেরেঙ্গেটি অভিমুখে

আর দেরি নয়। আজই এখনই আমাদের রওনা হতে হবে। এই মৃত্যুপুরীতে আর এক দণ্ডও রাখতে চাই নে এল্‌সার ছেলেমেয়েদের। ওদের মাথার ওপর মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া ঝুলছে এখানে। কর্তৃপক্ষ হুকুম জারী করেছেন—"এল্‌সার বাচ্চারা কোন মানুষকে আক্রমণ করলেই তাদের গুলি করে মেরে ফেলতে হবে।" যদিও ওরা আজ অবধি কোন মানুষকে আক্রমণ করেনি, তবুও তা করতে কতক্ষণ! এখন অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কারণ ওদের তিনজনকেই আমরা খাঁচায় বন্দী করে ফেলেছি। কিন্তু ওদের গায়ে যে রকম শক্তি তাতে খাঁচা ভেঙে ফেলতেও পারে! সুতরাং যেমন করেই হোক এই বিপজ্জনক জায়গা থেকে ওদের সরিয়ে নিতেই হবে।

জর্জও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হলো। সে তাই আর দেরী না করে তখুনি লেগে গেলো কাজে। যে পুলীর সাহায্যে খাঁচার দরজা নিচে নামানো হয়েছিল সেই পুলীর সাহায্যেই খাঁচাগুলোকে লরীর ওপরে তুলে ফেললো সে।

এদিকে বাচ্চারা তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। খাঁচা ভেঙে ফেলবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওরা। সবচেয়ে বেশী রেগেছে গোপা। সে তার থাবার সাহায্যে খাঁচার রডগুলো ধরে টানাটানি শুরু করেছে। হঠাৎ দেখা গেলো, খাঁচার ওপরের দিকের একটা রড সরিয়ে ফেলেছে সে। ব্যাপার দেখে জর্জ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে প্রত্যেক খাঁচার ওপরে একখানা করে লোহার চাদর চাপা দিয়ে পেরেক মেরে টাইট করে লাগিয়ে দিলো।

ওদিকে সহকারীরাও তখন কাজে লেগে গেছে। ইতিমধ্যেই তাঁবুগুলোকে

গুটিয়ে ফেলেছে ওরা। জর্জ তখন ওদের সাহায্যে জিনিসপত্রগুলো কেন্ ডাউনিং-এর লরীতে তুলে ফেললো।

জিনিসপত্র লরীতে তোলা হয়ে গেলেই আমরা রওনা দিলাম। প্রথমে আমার ল্যাণ্ড-রোভার, তারপর সিংহবাহী নতুন বেডফোর্ড লরী, তারপর মালবাহী লরী এবং সবার পেছনে জর্জের ল্যাণ্ডরোভার—এমনি ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে চলতে লাগলো আমাদের সেই ক্ষুদে কনভয়।

জর্জ যে নতুন রাস্তাটা তৈরি করেছিলো সেই রাস্তা দিয়েই আমরা চলতে লাগলাম। প্রথম চোদ্দ মাইল চলতে রীতিমত কষ্ট হলো আমাদের। লরী ছুটো দুলতে দুলতে চলেছে সেই এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে। ফলে, ঝাঁকানির চোটে বাচ্চাদের অবস্থা রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর ধারে এসে হাজির হলাম আমরা। নদীর জল তখন অনেক কমে গেলেও স্রোত বেশ জোরেই বইছে। তা সত্ত্বেও নদী পার হতে অসুবিধে হলো না আমাদের। জলের তলায় বালির পুরু আস্তরণ থাকার জন্যেই অত সহজে পার হওয়া সম্ভব হলো।

ওপারে উঠে আবার শুরু হলো পথ চলা। কয়েক মাইল যেতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এলো। মেঘের চেহারা দেখে মনে হলো আধ ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হবে। আমরা তাই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে বৃষ্টি নামবার আগেই জেলার সদরে পৌঁছে গেলাম। জেলা-কমিশনারের অফিসটাও ওখানেই। কিন্তু সে সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না বুঝতে পেরে আমি একখানা চিঠি লিখে তাঁর অফিসের দারোয়ানের হাতে দিয়ে এলাম। চিঠিতে তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা বাচ্চাদের নিয়ে সেরেঙ্গেটি অভিমুখে যাত্রা করেছি।

চিঠিখানা দিয়ে ফিরে আসতে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেলো। সহকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, আজকের রাতটা ওখানেই থেকে গেলে ভালো হয়। আমি কিন্তু তাতে রাজী হলাম না, জর্জও না। আমাদের কথা, আজ রাত্রের মধ্যেই জেলার বাউণ্ডারী পার হয়ে যেতে হবে আমাদের। বাউণ্ডারী পার হলেই বাচ্চারা একদিক দিয়ে নিরাপদ হবে; কারণ তখন আর ওদের ওপরে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা জেলার বাউণ্ডারী পার হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ওপর থেকে যেন একখানা জগদ্দল পাথর নেমে গেলো। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "যাক আর কোন ভয় নেই বাচ্চাদের। এখন ভালয় ভালয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলে বাঁচা যায়।"

এতক্ষণ আমাদের গাড়িগুলো কাছাকাছিই ছিলো। এবার হঠাৎ দেখা গেলো যে, মালবাহী লরীটা পিছিয়ে পড়েছে। জর্জ তখন সেটার পাশ কাটিয়ে আগে চলে এলো। কিন্তু মাইল কয়েক এগিয়ে আসার পর ও লরীটাকে আর দেখতে পাওয়া গেলো না। জর্জ তখন তার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে লরীর সন্ধানে পেছনের দিকে চললো। আমি কিন্তু ওদের জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। আমার ইচ্ছা, আজ রাত্রেই জন বার্গারের বাড়িতে হাজির হয়ে তাঁর সাহায্যে জেসপার দেহ থেকে তীরের ফলাটা বের করে ফেলবো। তিনিও কথা দিয়েছিলেন, সেরেঙ্গেটি যাবার পথে জেসপাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি ওর দেহে অপারেশন করে তীরের ফলাটা বের করে দিতে চেষ্টা করবেন। আমি তাই জর্জের জন্যে দেরি না করে সোজা ডাঃ বার্গারের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

বাড়ির সামনে যখন হাজির হলাম তখন রাত প্রায় বারোটা। ডাঃ বার্গার তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। গাড়ির শব্দে জেগে উঠে বাইরে আসতেই আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সিংহবাহী লরীটা দেখিয়ে আমি বললাম, বাচ্চা-গুলোকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে। দেখুন, জেসপার গা থেকে তীরের ফলাটা বের করতে পারেন কিনা!

আমার কথা শুনে ডাঃ বার্গার তখুনি ছুরি, কাঁচি আর অস্ত্র করবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করেও অপারেশন করা গেলো না। ডাক্তারকে দেখে জেসপা এমন হাব-ভাব দেখাতে লাগলো যে, তিনি ওর দেহে অপারেশন করতে সাহস পেলেন না।

এদিকে জর্জ তখনও এসে পৌঁছয়নি। ডাঃ বার্গার তখন তাঁর চাকরকে ডেকে কফি তৈরি করতে বলে আমাকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে বাচ্চাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। একটু পরেই জর্জ এসে গেলো। কফিও এসে গেলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অত রাত্রে গরম কফি আর বিস্কুট পেয়ে আমরা খুবই খুশী হলাম। এরপর আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে আবার আমরা রওনা হলাম।

রাত প্রায় তিনটের সময় আমরা নাইরোবিতে এলাম। ওখান থেকে গাড়ি-গুলোতে তেল নিয়ে আবার শুরু হলো চলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজিয়াদো মালভূমিতে এসে হাজির হলাম আমরা। নাইরোবি থেকে কাজিয়াদো পর্যন্ত আসতে খুবই কষ্ট হলো আমাদের। রাস্তার অবস্থা এতো খারাপ যে, গাড়ি চালানো রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। এর ওপর আবার শীত। হাড়-কাঁপানো শীতে আমরা তখন ঠকঠক করে কাঁপছি। লরীর ড্রাইভারদের অবস্থা আরো সাংঘাতিক। কিন্তু সেই অবস্থাতেও আমাদের চলার বিরাম নেই।

ভোরের দিকে আমরা টাঙ্গানাইকার সীমান্তের কাছাকাছি এসে হাজির হলাম। যে জায়গাটায় এলাম তার নাম হলো নামাঙ্গক। এখানে এসে ড্রাইভারেরা আর এগোতে চাইলো না। সারা রাত সমানে গাড়ি চালিয়ে এসে তাদের দেহে আর শক্তি নেই তখন। বাচ্চাদের অবস্থাও রীতিমত উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছে। খাঁচায় ঢোকার পর থেকেই ওরা খাওয়া বন্ধ করেছে। ওদের সে অনশন ধর্মঘট এখনো চলছে। এমনকি জল পর্যন্ত পান করেনি ওরা। এই অবস্থায় বাধ্য হয়েই ওখানে রাত্রিবাস করতে হলো আমাদের। বাচ্চাদের খাঁচায় আগে থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে মাংস দেওয়া হয়েছিলো। সেগুলো অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় তার ওপরে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে বসছে। জর্জ তখন মাংসগুলো সরিয়ে নতুন মাংস দিতে গেলো। কিন্তু মাংসখণ্ডগুলি এমন শক্ত করে খাঁচার সঙ্গে বাঁধা ছিলো যে, সেগুলো সরানো সম্ভব হলো না। যাই হোক, আগের মাংস সরানো সম্ভব না হলেও প্রত্যেক খাঁচাতেই আবার নতুন করে মাংস দেওয়া হলো। কিন্তু যাদের জন্যে দেওয়া হলো তারা কি ওগুলো খাবে? না, আগের মতোই অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবে!

পরদিন সকালেই আবার আমাদেব যাত্রা শুরু হলো। এবার আমাদের যেতে হবে আরুশা শহরে। ওখানে গিয়ে ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে জেনে নিতে হবে, বাচ্চাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে ছাড়া হবে।

কিন্তু আরুশা শহরে পৌঁছতে হলে আমাদের কিলিমিঞ্জারো পর্বতশৃঙ্গ পার হয়ে যেতে হবে। পার হওয়া মানে অবশ্য পর্বতশৃঙ্গের মাথায় উঠে তারপর অন্যদিকে নেমে যাওয়া নয়; আমাদের যেতে হবে পর্বতশৃঙ্গের পাশ কাটিয়ে। এই পর্বতশৃঙ্গটি ইতিহাস-বিখ্যাত। (চলচ্চিত্রও তৈরী হয়েছে কিলি-মিঞ্জারোকে নিয়ে।) চিরতুষারাবৃত এই বিশাল পর্বতটি ভ্রমণকারীদের চোখে এক বিস্ময়। এই প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেলো। সে বলেছিলো যে, কিলিমিঞ্জারো পর্বতশৃঙ্গের ১৯০০০ ফিট ওপরেও সে একটি জ্যান্ত গণ্ডারকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলো। সাধারণত অত ওপরে কোন বন্য জন্তু বাস করতে পারে না; কিন্তু তবুও আমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম, কারণ আমি নিজেও একবার কেনিয়া পর্বতশৃঙ্গের ১৬০০০ ফিট ওপরে মোষের মাথার খুলি দেখতে পেয়েছিলাম।

আমরা যখন কিলিমিঞ্জারো পর্বতের সানুদেশে এসে হাজির হলাম তখন সূর্যের রশ্মি পর্বতগাত্রের জমাট তুষারের ওপরে প্রতিফলিত হওয়ায় এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে ভরে উঠেছিল পর্বতটা। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মতো সময় আমাদের কোথায়! আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরুশা শহরে

পৌঁছতে হবে। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করে আমরা যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে ছুটতে লাগলাম আরুশার উদ্দেশে।

অবশেষে বিকেলের দিকে আরুশা শহরে হাজির হলাম আমরা। আগেই বলেছি, ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তার অফিসটি ওখানেই অবস্থিত। আমি তাই ওখানে পৌঁছেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখে এবং আমার কাছ থেকে বাচ্চাদের খবর পেয়ে তিনি খুবই খুশী হলেন। আমি তখন তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, বাচ্চাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে ছাড়া হবে। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে জায়গাটার নাম করলেন তা শুনে আমি কিন্তু মোটেই খুশী হতে পারলাম না। তিনি আমাকে বললেন, ওদের ছেড়ে দিতে হবে সেরোনেরোয়। কিন্তু আমি জানতাম যে, সেরোনেরো জায়গাটা শহর না হলেও ওখানে জনবসতি আছে। ন্যাশনাল পার্কসের কিছু-সংখ্যক ওয়ার্ডেনও ওখানে সপরিবারে বাস করে। তাছাড়া ওখানে হামেশাই ভ্রমণকারীরা এসে ডেরা বাঁধে। আমার ধারণা ছিলো, বাচ্চাদের কোন নির্জন বনভূমিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবার কথা বলবেন অধিকর্তা। কিন্তু তার বদলে সেরেনেরোর নাম বলায় আমি রীতিমতো বিস্মিত হলাম। আমার মনের কথাটা গোপনও রাখলাম না তাঁর কাছে। আমার কথা শুনে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হলো, আমি যতটা অসুবিধে মনে করছি আসলে তা হবে না। তাছাড়া, সামান্য কিছু লোক ওখানে থাকলেও তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তিনি আরও বললেন যে, ওখানে যদি সত্যিই অসুবিধে দেখা দেয় তাহলে এ ব্যাপারে পরে তিনি নতুন করে চিন্তা করবেন।

এখানে ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তার আদেশ প্রায় হাইকোর্টের রায়ের মতো। আপীল করতে হলে তা করতে হবে ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে। এবং সে আপীলের শুনানি হবে কয়েক মাস পরে। আমি তাই সেরেনেরো যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

এদিকে জর্জ তখনো এসে পৌঁছয়নি। তার কি হলো জানবার জন্যে তখুনি আমি রওনা হলাম পেছনের দিকে। প্রায় পাঁচ ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে অবশেষে জর্জের দেখা পেলাম। রাস্তায় সে বললে, আরুশায় পৌঁছবার আগে সে সুবিধামতো একটা বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলো। তবে সে রকম কোনো জায়গা তখনও সে খুঁজে বের করতে পারেনি।

জর্জকে খুঁজে বের করতে রাত হয়ে গিয়েছিলো। আমরা তাই আরুশায় এসে সে রাতটা ওখানেই কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার চলতে শুরু করলাম।

এদিকে বাচ্চারা কিন্তু তখনও অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। না খেয়ে এবং গাড়ির ধকল সহ্য করে ওদের অবস্থা তখন রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমরা তখন নিরুপায়। সেরেনেরোয় না পৌঁছনো অবধি ওদের খাওয়ানোর ব্যাপারে আমাদের কিছুই করবার ছিল না।

আমাদের লোকেরা এতোই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাঁবু খাটাবার মতো শক্তি তাদের ছিলো না। জর্জ এবং আমার অবস্থাও তথৈবচ। আমরা তাই তাঁবু না খাটিয়ে সে রাতটা খোলা জায়গাতেই কাটাবো বলে স্থির করলাম। জর্জ এবং আমি খাঁচার পাশে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়ে পড়লেও আমার চোখে ঘুম এলো না। বাচ্চারা অধৈর্য্য হয়ে খাঁচার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। তাদের অবস্থা দেখে কি ঘুমোনো যায়! ভোর হতে না হতেই আমি সহকারীদের জাগিয়ে দিলাম। অতো ভোরে আমি তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায় তারা আমার ওপরে বেশ একটু বিরক্ত হলো বলে বুঝতে পারলাম।

একটু পরেই আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। এবারের যাত্রাটা উর্ধ্বমুখে। এবার আমরা চলেছি ম্যানিয়ারা হ্রদের দিকে। এই হ্রদটা টাঙ্গানাইকার একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। জলের ওপরটা শত শত ফ্লেমিংগো আর জল-মোরগে ভরতি থাকে। এ ছাড়া তীরভূমিতে দেখতে পাওয়া যায় শত শত বুনো হাতী, বুনো মেষ আর সিংহ। ওরা প্রায়ই হ্রদে আসে জল পান করবার জন্যে।

আমাদের কিন্তু এসব দেখবার মতো সময় ছিলো না। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ছিলো। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছিলো। আমরা তাই গাড়িগুলোর গতি-বেগ বাড়িয়ে দিয়ে আগ্নেয় পর্বতের ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। বৃষ্টির জন্যে সামনের দৃশ্য দেখতে অসুবিধে হচ্ছিলো আমাদের। আমাদের ইচ্ছে ছিলো, পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয় গহ্বরটা একবার দেখে নেবো। গহ্বরটার ব্যাস দশ মাইল। আমরা যতোই ওপরে উঠতে লাগলাম ততোই কুয়াশা বাড়তে লাগলো। আমাদের সহকারীরা এর আগে আর কোনোদিন অতো ওপরে ওঠেনি। তারা তাই ভীষণ অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলো।

অবশেষে আমরা গহ্বরের মুখের কাছে এসে হাজির হলাম। আগেও একবার আমি এখানে এসেছিলাম। সেবার আমি পনেরো হাজার ফিট নিচে পশুদের বিচরণ করতে দেখেছি। আজ কিন্তু মেঘের জন্য নিচের দিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এবার আমাদের পিচ্ছিল পথে চলতে হলো। কয়েক মাইল অতি সাবধানে চলবার পর হঠাৎ কুয়াশাটা কেটে গেলো। মনে হলো যেন, আমাদের সামনে থেকে একটা ভারী পর্দা সরে গেলো। এবার আমরা নিচের দিকে তাকিয়ে সেরেঙ্গেটির সমতল ভূমি দেখতে পেলাম।

এবার শুরু হলো তরাই। ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে সাবধানে নামতে হচ্ছিল

আমাদের। পথের দু ধারে হলদে রঙের এক ধরনের নাম-না-জানা ফুল ফুটে সমস্ত অঞ্চলটাকে ভরে রেখেছিলো। মনে হচ্ছিল, ওখানে যেন সোনা ছড়ানো রয়েছে। আরও একটু নিচে নামতেই বন্য পশুদের দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে ছিলো জেব্রা, গেজেল এবং আরও অনেক রকম বন্য পশু।

দেখতে দেখতে আমরা পাঁচ হাজার ফিট উচ্চতায় নেমে এলাম। এবার শুরু হলো প্রচণ্ড গরম। এতো গরম যে, গায়ে জামা-কাপড় রাখাই কষ্টকর হয়ে উঠলো। গরম থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমরা লরীর ওপরের ত্রেরপলের ঢাকাগুলো খুলে ফেললাম। দু ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে অবশেষে আমরা নাবাই পাহাড়ে (Naabi Hill) এসে হাজির হলাম। ওখানে একজন ওয়ার্ডেনের সঙ্গে আমাদের দেখা করবার কথা ছিলো। ওয়ার্ডেন বেচারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো সেখানে।

তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক দু-চারটে কথা বলেই আবার আমরা রওনা দিলাম। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে আমাদের। এবারের রাস্তাটা ভীষণ খারাপ। সেই অসমতল পথ দিয়ে যেতে যেতে আমরা বহুসংখ্যক বন্যপশু দেখতে পেলাম। অবশেষে সন্ধ্যার একটু আগে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম।

বাচ্চাদের এই নতুন বাসভূমি দেখে খুশী হলাম। জায়গাটা খুবই পছন্দ হলো আমাদের। আগের বাসভূমির চেয়েও এটা ভালো। সুযোগ-সুবিধেও অনেক বেশী এখানে। এটা একটা উপত্যকা। লম্বায় প্রায় চল্লিশ মাইল এবং চওড়ায় প্রায় কুড়ি মাইল। এর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী। সব সময়ই জল থাকে নদীটাতে। ছোট-বড় হাজার হাজার গাছ-গাছালিতে নদীর উভয় তীরই বেশ ছায়া-শীতল। ফলে জায়গাটা বন্য জন্তুদের কাছে একেবারে স্বর্গ-ধামে পরিণত হয়েছে।

আমরা ওখানে হাজির হতেই একজন ওয়ার্ডেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন জানালো। আমি তাকে বললাম, চলো, আগে আমাদের একটা পছন্দসই জায়গা দেখিয়ে দেবে। সন্ধ্যার আগেই বাচ্চাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাই।

আমার অনুরোধে সে আমার গাড়িতে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে তার নির্দেশ-মতো এগিয়ে চললাম আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই চমৎকার একটা জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানেই গাড়ি থামালাম। সিংহবাহী লরীটাকে একটা

বিশালকায় অ্যাকেশিয়া গাছের নীচে দাঁড় করানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেলো। জর্জের নির্দেশে সহকারীরা সেই গাছের একটা মোটা ডালে পুলী বেঁধে তার ভেতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে দিলো। দড়ির অপর প্রান্তে আগে থেকেই হুক লাগানো ছিলো। জর্জ সেই হুকটা খাঁচার সঙ্গে লাগিয়ে দিলো। এরপর সবাই মিলে দড়ি ধরে টেনে খাঁচাটা ওপরে তুলে নেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে লরীটাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে খাঁচাটাকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো।

খাঁচাটা মাটিতে নামানো হলে জর্জ আমার দিকে তাকিয়ে বললে—এবার ওদের মুক্তি দিতে হবে, তাই না?

পুরো তিনটে দিন বাচ্চারা খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। আমি তাই খুশী হয়ে বললাম—ঠিকই বলেছো। এখুনি ওদের ছেড়ে দেওয়া দরকার।

জর্জ বললে—হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করছি।

সহকারীদের সাহায্যে বড় খাঁচাটি নামিয়ে এনে তার পেছনের দরজাটা খুলে ফেলা হলো। এরপর ওটাকে এমনভাবে রাখা হলো যাতে ছোট এল্‌সা আর গোপার খাঁচার দরজা খুললে ওরা সেই বড় খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

খাঁচাটাকে এইভাবে রেখে জর্জ আর দেরি না করে গোপা আর ছোট এল্‌সার খাঁচার দরজা দুটো ওপরে তুলে ফেললো।

দরজা খোলা হলেও কিছুক্ষণ ওরা নড়াচড়া করলো না। যেমন ছিলো তেমনি বসে রইলো যে যার খাঁচার মধ্যে। কিন্তু এ ভাবে বেশীক্ষণ রইলো না ওরা। আধ মিনিটের মধ্যেই গোপা ছুটে গেলো তার বোনের কাছে। দাদাকে কাছে পেয়ে বোনটিও খুব খুশী। ওরা তখন মহা আনন্দে এ ওর গা চাটতে শুরু করে দিলো।

গোপা যখন ছোট এল্‌সার খাঁচায় ঢুকে তাকে আদর করছে সেই সুযোগে ছোট এল্‌সার খাঁচার দরজাটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং গোপার খাঁচাটা সরিয়ে নিয়ে জেসপার খাঁচাটাকে ওখানে নিয়ে আসা হলো।

এরপর জেসপার এবং ছোট এল্‌সার খাঁচার দরজা আবার খুলে দেওয়া হলো ঠিক আগেরই মতো। সঙ্গে সঙ্গে জেসপা এক লাফে ছোট এল্‌সার খাঁচায় ঢুকে ভাইবোনের সঙ্গে মিলিত হলো। জর্জ তখন দ্রুতগতিতে ছোট এল্‌সার খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জেসপার খাঁচাটাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিলো।

এতো সব কাণ্ড-কারখানা করতে আধ ঘণ্টাও লাগলো না তার। এরপর হুকের সাহায্যে ছোট এল্‌সার খাঁচার দরজাটা বড় খাঁচার পেছনের খোলা দরজার

সামনে লাগিয়ে দিয়ে আবার খুলে দেওয়া হলো দরজাটা। কিন্তু দরজা খোলা পেয়েও ওরা বড় খাঁচায় ঢুকলো না। মনে হলো ওখানে থাকতে ওরা হয়তো ভয় পাচ্ছে। হয়তো ভাবছে, আবার কোন নতুন ফাঁদে ওদের ঢোকাতে চেষ্টা করছি আমরা।

ওদের মনোভাব বুঝতে দেরি হলো না আমাদের। কিন্তু বুঝলেও তখুনি ওদের ছেড়ে দিতে পারি না। পুরো তিন-তিনটে দিন ওদের পেটে কিছু পড়েনি। খাঁচার মধ্যে যে মাংস দেওয়া হয়েছিলো তা ওরা ছোঁয়ওনি। আমাদের তাই মনে হলো, পেট ভরে না খাইয়ে ওদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই আজকের রাতটা ওদের বড় খাঁচায় রাখতেই হবে।

কিন্তু ওরা যে ঢুকতেই চাইছে না বড় খাঁচাটার মধ্যে! জর্জ তখন ছোট এল্‌সার খাঁচাটা আবার বন্ধ করে রেখে একটা ছাগল মেরে নিয়ে এসে বড় খাঁচার ভেতরে রেখে দিলো। এ ছাড়া তিন প্লেটে কডলিভার তেলের চাটনিও রাখা হলো খাঁচার মধ্যে।

খাবার জিনিসগুলোকে এইভাবে রেখে দিয়ে আবার খুলে দেওয়া হলো ছোট এল্‌সার খাঁচার দরজাটা। এবার কিন্তু বড় খাঁচায় ঢুকতে ভয় পেলো না ওরা। হয়তো বুঝতে পারলো, ওদের ভালোর জন্যেই এসব করা হচ্ছে খিদেও পেয়েছিলো ওদের খুবই। ওরা তাই একে একে ঢুকে পড়লো বড় খাঁচাটার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলো জর্জ। ছোট এল্‌সার খাঁচাটাও সরিয়ে নেওয়া হলো একটু পরেই।

আমরা তখন আমাদের ল্যাণ্ডরোভার দুটোকে নিয়ে এসে খাঁচার দু-দিকে রাখলাম। সহকারীদের বলে দিলাম, আজকের রাতটা আমরা গাড়িতেই থাকবো তারা যেন তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে থাকে।

রাত ন'টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো। আমরা তখন সামান্য কিছু শুকনো খাবার খেয়ে নিয়ে যে যার গাড়িতে উঠে শুয়ে পড়লাম। রাতের অন্ধকার তখন ঘন হয়ে এসেছে। গাড়ির হেড লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খাঁচার মধ্যে ওরা কি করছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে দেখতে না পেলেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিলো না যে ওরা অস্থিরভাবে খাঁচার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনদিনের পরিশ্রমে আমাদের শরীর তখন ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠেই এগিয়ে গেলাম খাঁচার সামনে। যেতেই দেখি, ছাগলের দেহের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শুধু পড়ে আছে কয়েকখানা

হাড়। কডলিভার তেলের চাটনিটাও খেয়ে নিয়েছে ওরা।
জর্জ তখন আর একটা ছাগল মেরে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে সহকারীদের বললে যে, তারা যেন কোন কারণেই খাঁচার কাছে না আসে। সহকারীদের এইভাবে নির্দেশ দিয়ে আমরাও সরে গেলাম ওখান থেকে।
দুপুরের দিকে আমরা যখন খেতে বসেছি সেই সময় পার্কের ওয়ার্ডেন সপরিবারে আমাদের কাছে এসে হাজির হলো। তার কাছে শুনলাম, ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তা নাকি তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে বাচ্চারা এখানে নিজেদের খাপ খাইয়ে না নেওয়া পর্যন্ত শুধু আমরা এখানে থাকতে পারবো। তার কাছ থেকে আরও শুনলাম, ন্যাশনাল পার্কের এলাকার মধ্যে পশু-হনন নিষিদ্ধ; তবে আমরা ইচ্ছে করলে পার্ক এলাকার বাইরে গিয়ে শিকার করতে পারি। এরপর আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে ওরা বিদায় নিলো আমাদের কাছে। তবে যাবার সময় ওয়ার্ডেন বলে গেলো যে, আমাদের সাহায্য করবার জন্যে সে সব সময়ই তৈরী থাকবে। দরকার হলেই আমরা যেন বিনা দ্বিধায় তাকে ডেকে পাঠাই।
ওরা চলে যাবার পর আমরা আবার গেলাম খাঁচার কাছে। কিন্তু আমাদের দেখে বাচ্চারা মোটেই খুশী হলো না। বুঝতে পারলাম, বন্দী অবস্থায় থাকতে ওরা রাজী নয়। খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে ওদের ভীষণ আপত্তি। এটা বুঝতে পারলেও আমরা ওদের তখুনি ছেড়ে দিতে রাজী নই। ওদের শরীরের অবস্থা যা হয়েছে তাতে ওরা নিজে নিজে শিকার করে খেতে পারবে না। সুতরাং আরও দু-একটা দিন ওদের রাখতেই হবে খাঁচার মধ্যে। খাইয়েদাইয়ে ওদের একটু তাজা না করা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া চলবে না।
এদিকে ওরা তখন রাগে গজগজ করছে। কিন্তু ওদের সে রাগকে উপেক্ষা করে আমরা আমাদের পরিকল্পনামতোই কাজ করতে লাগলাম।
সন্ধ্যা হতেই আমরা ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে খাঁচার দু-দিকে রেখে গত রাত্রির মতোই গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাত্রে সিংহের গর্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেলো আমার। আরও কিছুক্ষণ পরে মনে হলো যে, সিংহটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দুপ্ দুপ্ আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম, সিংহ মশাই একা আসেননি, সঙ্গে করে আরও দু-চারজনকে নিয়ে এসেছেন। হয়তো নতুন আগন্তুকদের সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছেন; কিংবা খাঁচার মধ্যে সিংহের বাচ্চা দেখে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছেন। আমি তখন টর্চলাইট জ্বেলে ওদের দিকে আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করলাম। হঠাৎ চোখের ওপর আলোক-রশ্মি পড়ায় সিংহগুলো ঘাবড়ে

গিয়ে পশ্চাদপসরণ করলো। এরপর আর কোনো জন্তু আমাদের বিরক্ত করতে এলো না।

সকালে ঘুম ভাঙতেই আমরা এগিয়ে গেলাম খাঁচার কাছে। দেখতে পেলাম, এবারেও বাচ্চারা পেট ভরে মাংস খেয়েছে। আমরা তখন প্রাতরাশের জন্যে তাঁবুর দিকে চলে গেলাম।

প্রাতরাশ শেষ হতেই জর্জ তার ল্যাণ্ডরোভার আর রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো শিকারের সন্ধানে। যেমন করেই হোক, দু-একটা পশু মেরে আনতেই হবে বাচ্চাদের জন্যে। ওয়ার্ডেন বলে দিয়েছিলো, পার্ক এলাকার মধ্যে শিকার করা চলবে না। জর্জকে তাই অনেক দূরে যেতে হবে আজ।

জর্জ চলে গেলে আমি আবার গেলাম বাচ্চাদের কাছে। আজ আর আমাকে দেখে ওরা রেগে গেলো না। তবে আগের মতো আমাকে দেখে খুশীও হলো না। এমনকি জেসপাও আমার দিকে তাকালো না। আমি তখন ওখানে আর দেরি না করে তাঁবুতে ফিরে এলাম।

বেলা প্রায় তিনটের সময় জর্জ ফিরে এলো। খালি হাতে ফেরেনি সে। বাচ্চাদের জন্যে একটা পশুকে সে মেরে এনেছে দেখলাম। এদিকে রান্নাবান্না তখন শেষ হয়ে গেছে। জর্জ আসতেই আমরা খেতে বসলাম। খেতে খেতে আলোচনা চললো বাচ্চাদের ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে। জর্জ বললে, আরও দু-একটা দিন ওদের রেখে দিলে ভালো হয়; কারণ ওদের শরীরের অবস্থা এখনও খুব ভালো নয়। কিন্তু পরে ঠিক হলো, এখুনি ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে। রাত্রে ছাড়লে এখানকার আদিবাসী সিংহরা ওদের আক্রমণ করতে পারে; তাই দিনের বেলাতেই ওদের ছেড়ে দেবো ঠিক করলাম দিনের বেলা ছেড়ে দিলে ওরা নিজেদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে নিতে পারবে।

যে কথা সেই কাজ। জর্জ তখন শিকার করা পশুটাকে নদীর ধারে একটা জায়গায় রেখে এসে খাঁচার দরজা খুলে দিলো। কিন্তু দরজা খোলা পেয়েও ওরা বাইরে এলো না। হয়তো ভাবলো, আমাদের মনে আরও কোনো কু-মতলব আছে। ওরা তাই সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলো।

এরপর আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর গোপাটা ধীরে ধীরে বাইরে এসে নদীর দিকে চলতে লাগলো।

জেসপা আর ছোট এল্‌সার মন থেকে তখনো সন্দেহ দূর হয়নি। তারা তখন একবার গোপার দিকে এবং একবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। গোপা কিন্তু দিব্যি নিশ্চিন্ত মনেই এগিয়ে চলেছে নদীর দিকে। তাকে ওইভাবে

এগিয়ে যেতে দেখে জেসপা আর ছোট এল্‌সাও বেরিয়ে এলো। তারপর আর একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দৌড়লো গোপার দিকে।
আজ ওরা খুশী। পাঁচদিন খাঁচায় বন্দী থাকার পর আজ ওরা মুক্ত। এরপর আর কোনদিন কেউ ওদের বন্দী করবে না। আজ থেকে ওরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে ওদের এই নতুন বাসভূমিতে।
আমরাও খুশী হলাম ওদের মুক্ত করে দিয়ে। কিন্তু সত্যিই কি খুশী হলাম? মনটা যে খচ্‌খচ্‌ করে উঠছে! এল্‌সার বাচ্চারা আমাদের কাছে থাকবে না—এই কথাটা ভাবতেই আমার মনটা ভারী হয়ে গেলো।
বাচ্চারা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

পশুকুলের বাস্তুত্যাগ

বাচ্চারা চলে যাবার পর আমাদের প্রধান চিন্তা হলো ওদের খাওয়ানোর ব্যাপারে। এখনও ওরা ভালোভাবে শিকার করতে শেখেনি। আগের ক্যাম্পে থাকার সময় যদিও ওরা কিছুদিন স্বাধীনভাবে বনে গিয়ে থেকেছিলো, কিন্তু তখনও ওরা নিজেদের খাবার নিজেরা যোগাড় করতে পারেনি। অবশেষে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আবার ওরা ফিরে এসেছিলো আমাদের কাছে।
এই সব কথা চিন্তা করে জর্জ বললে, এখনও কিছুদিন ওদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোথায় খাওয়ানো হবে। খাঁচার মধ্যে খাওয়াতে আমরা রাজী নই, কারণ ওরা তাহলে বাইরের খোলা জায়গায় খেতে শিখবে না। ওদের তাই বাইরের কোনো খোলা জায়গায় খাওয়াতে হবে। কিন্তু তাতেও অনেক রকম সমস্যা দেখা দেবে। সিংহ-অধ্যুষিত এই সংরক্ষিত এলাকায় আমরা যদি ওদের খাবার বাইরে কোথাও রেখে দিই তাহলে সে খাবার ওদের ভোগে লাগবে বলে মনে হয় না। বলবান সিংহরা এসে সে খাবার মেরে দেবে। এই সমস্যার সমাধান কি করে করা যায় এটাই হলো আমাদের প্রধান চিন্তা।
অনেক ভেবেচিন্তে জর্জ একটা সমাধান বের করলো। সে বললে, একটা ছাগল মেরে সেটাকে একগাছা লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে কোনো উঁচু গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। দড়িটার অপর প্রান্ত থাকবে আমাদের গাড়ির সঙ্গে বাঁধা। বাচ্চারা এলে দড়ি আলগা দিয়ে মৃত ছাগলটাকে নিচে নামিয়ে দিলেই ওরা খেতে পারবে।

সমাধানটা আমারও খুব মনঃপূত হলো। বললাম, এর চেয়ে ভালো সমাধান আর কিছু হতে পারে না।

সেই ব্যবস্থাই করা হলো অতঃপর। জর্জ যে ছাগলটাকে শিকার করে এনেছিলো, বাচ্চারা সেটাকে খাবার সময় পায়নি। সেই ছাগলটাকে টাঙিয়ে দেওয়া হলো একটা গাছে। আমরা গাড়ি নিয়ে বাচ্চাদের অপেক্ষায় বসে রইলাম।

রাত তখন প্রায় দশটা। হঠাৎ দেখি চারটে বিরাটাকার সিংহ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। গোটা কয়েক হায়েনাও আসছে তাদের পেছনে পেছনে। আরও একটু পরেই নদীর দিক থেকে হনুমানদের ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেলাম। সাধারণতঃ সিংহদের দেখতে পেলেই ওরা ভীত হয়ে ওইভাবে কিচিরমিচির শব্দ করতে থাকে। তবে কি বাচ্চারা নদী পার হতে চেষ্টা করছে! আমরা তাই টর্চলাইটের সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করলাম নদীর দিকে। আলোক-রশ্মি এদিক-ওদিক ঘোরাতেই নদীর ওপারে তিন জোড়া চোখ দেখতে পেলাম আমরা। আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় চোখ গুলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলে উঠলো। আমাদের মনে হলো, বাচ্চারা হয়তো সিংহদের দেখে এদিকে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

সারারাত ওদের জন্যে অপেক্ষা করলাম আমরা। কিন্তু কোনই ফল হলো না; শুধু রাত জাগাই সারা হলো. বাচ্চারা একবারও এলো না।

ভোর হতেই আমরা গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধারে গিয়ে ওদের খোঁজ করতে শুরু করলাম। চোখে দূরবীন লাগিয়ে এদিক ওদিক লক্ষ্য করতে লাগলাম। তখনো সূর্য ওঠেনি। একটু কুয়াশাও হয়েছে। তাই নদীর ওপারটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমরা তাই সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম ওখানে। সূর্য ওঠার পরেই কুয়াশা কেটে গেলো। তারপরেই দেখতে পেলাম বাচ্চারা তিন ভাইবোনে একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তখন ওদের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। আমার ডাক শুনে ওরা চোখ তুলে আমাদের একবার দেখে নিলো। তারপর আমাদের দিকে পেছন ফিরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে চলতে লাগলো।

আমার মনে হলো, ওরা হয়তো এখনও আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। হয়তো ভাবছে, আবার আমরা ওদের খাঁচায় বন্দী করবার মতলব করেছি।

ওরা চলে যাবার পর আমরা আবার ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। তারপর গাড়ি নিয়ে নদী পার হয়ে এগিয়ে চললাম পাহাড়ের দিকে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওদের দেখা পেলাম না। আমরা তাই ক্যাম্পের দিকে

ফিরলাম।

ফেরার পথে দেখতে পেলাম আর একখানা ল্যাণ্ডরোভার এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমাদের গাড়ির সামনে এসেই থেমে গেলো সে গাড়িটা। আমরাও থামিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাড়ি থেকে একটা লোক নেমে এসে আমার হাতে একখানা রেডিওগ্রাম দিলো। তাতে লেখা, 'আপনাদের বেডফোর্ড গাড়িটা নাইরোবিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখান থেকে গাড়িটা নিয়ে নিন।'

সংবাদ-বাহককে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ওখানে এসেই দেখি ইব্রাহিম আর নুরু আমাদের জন্যে চা তৈরি করে অপেক্ষা করছে। চা-বিস্কুট খেয়ে একটু চাঙ্গা হবার পর ইব্রাহিমকে বললাম—শোনো ইব্রাহিম, তুমি কার ডাউনিংয়ের লরীখানা নিয়ে এখুনি নাইরোবি রওনা হও। ওখানে গেলেই আমাদের নতুন বেডফোর্ড গাড়িটা পেয়ে যাবে। কার ডাউনিংয়ের লরীটা তাদের ফেরত দিয়ে নতুন লরীটা নিয়ে আসতে হবে তোমাকে।

বশংবদ ইব্রাহিম তখুনি রওনা হয়ে গেলো নাইরোবির দিকে।

সন্ধ্যার পরে আবার আমরা গেলাম সেই ঝোলানো মাংসের কাছে। আজও ঠিক গত রাত্রের মতোই গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাচ্চাদের জন্যে। রাত ন'টার সময় দেখতে পেলাম তিন ভাইবোনে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। বুঝতে দেরি হলো না, এখন পর্যন্ত ওদের পেটে কিছু পড়েনি।

আমরা তখন তাড়াতাড়ি দড়ি আলগা দিয়ে ছাগলের মৃতদেহটা নিচে নামিয়ে দিলাম। ছাগলটা দেখতে পেয়েই ওরা ছুটে গেলো সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলো গোগ্রাসে খাওয়া। জর্জ তখন তিন ডিস কডলিভার তেলের চাটনি দিয়ে এলো ওদের সামনে। এ জিনিসটা ওদের খুব প্রিয় খাদ্য। তিনজনেই চেটেপুটে খেয়ে নিলো চাটনিটা। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ওখানেই শুয়ে পডলো বাচ্চারা। সারারাত ওখানে কাটিয়ে ভোরের দিকে আবার ওরা চলে গেলো পাহাড়ের দিকে।

বাচ্চারা চলে যাবার একটু পরেই পাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে সিংহের গর্জন শোনা গেলো। সেদিকে তাকাতেই দেখি, বিরাট এক পশুরাজ হেলেদুলে এগিয়ে আসছেন। কিছুটা মাংস তখনও অবশিষ্ট ছিলো। সিংহটা যাতে সে মাংসটা খেয়ে ফেলতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আমি তাড়াতাড়ি দড়ি ধরে টেনে সেটাকে ওপরে তুলে ফেললাম। মাংসের নাগাল না পেয়ে পশুরাজ হাজির হলেন জর্জের গাড়ির পাশে। জর্জ তখন গাড়ির ভেতরে মশারী

খাটিয়ে ঘুমিয়ে ছিলো। সিংহমশাই বারকয়েক সেই আজব বস্তুটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর কি মনে করে ক্যাম্পের দিকে চলতে লাগলেন। ক্যাম্পের লোকেরা হৈ হৈ রবে চিৎকার করে উঠলো সিংহটাকে দেখতে পেয়ে। তাদের সেই কোরাস চিৎকার শুনে সিংহের পো ঘাবড়ে গেলো। সে তখন বারকয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। সে হয়তো ভাবলো, তার রাজ্যে এ আবার কারা এসে উৎপাত শুরু করেছে!

সেদিন বিকেল অবধি আমরা অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তারপর সন্ধ্যার একটু আগে আবার ফিরে এলাম বাচ্চাদের খাওয়ার জায়গায়। বছরের এই সময়টা ওখানকার পশুরা দল বেঁধে অন্যত্র চলে যায় বলে শুনেছি; কিন্তু জর্জের কাছে শুনলাম যে, এখনও পশুর দলকে ওখান থেকে সরে পড়তে দেখেনি সে।
বিকেলের দিকে আবার আমরা হাজির হলাম বাচ্চাদের খাওয়ার জায়গায়। জর্জ আগে থেকেই একটা ছাগল মেরে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিলো। সে তাই আর দেরি না করে সেটাকে যথারীতি দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে দিলো গাছের সঙ্গে। একটু পরেই গোপা এসে হাজির হলো সেখানে। কিন্তু ওখানে এলেও সে গাছের নিচে এলো না। এরপর অন্ধকার একটু ঘন হয়ে আসতেই জেসপা আর ছোট এল্‌সা এসে হাজির হলো। ওরা আসতেই জর্জ দড়ি আল্‌গা দিয়ে ছাগলের মৃতদেহটা নিচে নামিয়ে দিলো। বাচ্চারাও আর দেরি না করে ভোজনে লেগে গেলো।

৭ই মে। ভোর হতে না হতেই জর্জ বেরিয়ে পড়লো পশু শিকার করে আনতে। আমাদের সঙ্গে যে ক'টা ছাগল ছিলো সেগুলো সবই বাচ্চাদের ভোগে লেগে গেছে। এখন নতুন কোনো পশু হনন করে না আনলে ওদের অভুক্ত থাকতে হবে। এবং এই কারণেই জর্জ বেরিয়ে পড়লো তার গাড়ি আর রাইফেল নিয়ে।
সেরেঙ্গেটির সীমানার মধ্যে পশু শিকার করা নিষেধ। জর্জকে তাই যেতে হবে সেরেঙ্গেটি এলাকার বাইরে। আমার তাই মনে হলো, সন্ধ্যার আগে সে হয়তো ফিরে আসতে পারবে না।
দুপুরের দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। মনে হলো, এখুনি বৃষ্টি শুরু হবে। এই সময় একখানা ল্যাণ্ডরোভার এসে আমার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। গাড়িতে করে কে এলো দেখতে বাইরে আসতেই দেখি, ন্যাশনাল পার্কসের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নামছেন গাড়ি থেকে। আমি তাড়াতাড়ি

এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে তাঁবুতে নিয়ে এলাম। চেয়ারম্যানকে বেশ হাসিখুশী দেখলাম। তিনি বললেন, এল্‌সার বাচ্চারা ওখানে আসায় ন্যাশনাল পার্কসের নাম প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে স্থান পাচ্ছে। কিন্তু এর পরেই তিনি যে কথাটা বললেন তা শুনে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, মে মাসের মধ্যেই আমাদের সেরেঙ্গেটি থেকে চলে যেতে হবে, কারণ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই টুরিস্টরা আসতে থাকবে ওখানে। তিনি আরও বললেন, টুরিস্টরা এসে যদি আমাদের দেখতে পায় তাহলে নানা রকম সমালোচনা শুরু হবে. যা তিনি চান না।

তাঁর কথা শুনে আমি রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। ওখানে বাচ্চাদের নিয়ে আসবার সময় আমরা মনে করেছিলাম, তারা সাবালক না হওয়া অবধি আমরা তাদের কাছে থাকতে পারবো। আমি তাই চেয়ারম্যানকে বললাম, বাচ্চারা এখনও স্বাধীনভাবে শিকার করতে শেখেনি। এবং খাওয়ার ব্যাপারেও ওরা আমাদের ওপরে নির্ভরশীল। এ অবস্থায় আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে ওরা না খেয়েই মারা পড়বে। আমি আরও বললাম টুরিস্টদের যাতে কোনো রকম অসুবিধে না হয় তার জন্যে আমরা আমাদের ক্যাম্পটাকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নিতে রাজী আছি। বাচ্চাদের বয়স এখন সতের মাস, অর্থাৎ সাবালক হতে এখনও ওদের তিন মাস বাকি। এই তিনটে মাস তিনি যেন আমাদের ওখানে থাকতে অনুমতি দেন।

চেয়ারম্যান আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না।

আমার সঙ্গে যখন চেয়ারম্যানের আলোচনা হচ্ছে ঠিক সেই সময় জর্জ এসে হাজির হলো। সেও আমার কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললো, বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি বাচ্চাদের এখানে ছেড়ে রেখে সরে পড়ি তাহলে ওরা রীতিমতো বিপদে পড়ে যাবে।

চেয়ারম্যান কিন্তু তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। তিনি বললেন, আমরা চলে গেলেও বাচ্চাদের কোনো অসুবিধে হবে না। তিন মাস ওরা যেভাবেই হোক কাটিয়ে দিতে পারবে। এই কথা বলেই তিনি বিদায় নিলেন আমাদের কাছে।

চেয়ারম্যান চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আরও কয়েকজন লোক এসে হাজির হলেন আমাদের ক্যাম্পে। তাঁদের মধ্যে লী এবং মেরী ট্যালবট নামে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানীও ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার সময় চেয়ারম্যানের আদেশের কথাটাও উঠলো। আমাদের কথা শুনে ওঁরা দুজনেই স্বীকার করলেন যে, আমাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করাটা চেয়ারম্যানের পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি।

ওঁরা চলে গেলেন সন্ধ্যার সময়। আমাদের তখন সেই গাছতলায় যাবার সময় হয়ে গিয়েছিলো। আগেই যাওয়া উচিত ছিলো কিন্তু অতিথিদের ছেড়ে যাওয়াটা অভদ্রতা বলে তা পারিনি। তাই ওখানে যেতে একটু দেরিই হলো সেদিন।

ওখানে যেতেই দেখি যে, বাচ্চারা আগেই এসে অপেক্ষা করছে। জর্জ তখন তাড়াতাড়ি তার গাড়ি থেকে মৃত পশুটা টেনে বের করে ওদের সামনে ধরে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো ওদের ডিনার।

খাওয়া শেষ হলে জেসপা আমার কাছে এসে ঘুরঘুর করতে লাগলো। তার চাল-চলন দেখে আমার মনে হলো, এবার সে আমার কাছ থেকে আদর পেতে চাইছে। আমি তখন তার কাছে এগিয়ে এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে এবং ধীরে ধীরে তার গায়ে চাপড় মেরে তাকে আদর করতে শুরু করলাম।

আমার মনে পড়ে গেলো যে, ওকে আমি শেষবার গায়ে হাত দিয়ে আদর করেছিলাম এল্সার ক্যাম্পে। আমার আরও মনে হলো, ওদের আমরা খাঁচায় বন্দী করে এখানে নিয়ে এলেও 'ওরা আমাদের শত্রু বলে ভাবছে না।

সে রাতটা বাচ্চারা আমাদের কাছেই রয়ে গেলো। তবে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর ওরা থাকলো না। সূর্য উঠবার আগেই ওরা নদী পার হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো।

এরপর তুটো দিন ওদের আর দেখা মিললো না। এ তুদিন ওদের বদলে যারা এলো তারা হলো কয়েক জোড়া সিংহ-দম্পতি আর একদল হায়না। বুঝতে পারলাম, মাংসের লোভেই ওদের শুভাগমন হয়েছে ওখানে। ওরা হয়তো ভেবেছিলো যে, ওখানে এলেই মাংস মিলবে; কিন্তু তা যখন পেলো না, তখন ওরা মানে মানে সরে পড়লো ওখান থেকে।

পরদিন সকালে জর্জ আবার বের হলো বাচ্চাদের সন্ধানে। কিন্তু বহু খোঁজা-খুঁজি করেও তাদের দেখতে পেলো না কোথাও। তবে বাচ্চাদের দেখা না পেলেও ওদের পায়ের দাগ দেখতে পেলো সে। দাগ দেখে সে বুঝতে পারলো, ওরা সোজা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। জর্জ তখন সেই দাগ অনুসরণ করে পাহাড়ে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে গিয়েও ওদের খোঁজ পেলো না। এরপব আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বিকেলের দিকে ক্যাম্পে ফিরে এলো সে।

পরবর্তী তুদিনও বাচ্চাদের খোঁজ পাওয়া গেলো না। আমরা কিন্তু রোজই হাজিরা দিচ্ছি ওদের সেই খাবার জায়গায়। অবশেষে তৃতীয় রাত্রে ওদের

দেখা পাওয়া গেলো। রাত প্রায় আটটার সময় এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এলো ওরা। ওদের হাবভাব দেখে মনে হলো, কোনো কারণে ওরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। হয়তো এখানকার আদিবাসী সিংহরা ওদের তাড়া করেছিলো। অথবা এমনও হতে পারে যে, উগ্র স্বভাবের কোন সিংহী ওদের মারতে এসেছিলো। তবে কারণ যাই হোক, ওরা যে ভীষণ ভয় পেয়েছে তাতে কোনোই ভুল নেই।

ওদের শরীরও বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেছে দেখলাম। মনে হলো, এ ক'দিন ওদের পেটে কিছু পড়েনি। ওদের শীর্ণ চেহারা দেখে জর্জ তাড়াতাড়ি ওদের খেতে দিলো। তিন ডিস কডলিভার তেলের চাটনিও দেওয়া হলো ওদের। খাবার পেয়েই তিন ভাই-বোনে খেতে বসে গেলো। ঠিক সেই সময়টাতেই অদূরে হঠাৎ সিংহের গর্জন শোনা গেলো। গর্জনটা শুনে খাবার রেখেই ছুটে পালিয়ে গেলো ওরা। আমরা তখন নিঃসন্দেহ হলাম যে, গর্জনকারী ওই সিংহটাই ওদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। যাই হোক আমরা তখন মাংসটাকে আগের মতো গাছে ঝুলিয়ে রেখে গাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়েও শান্তি পাচ্ছিলাম না আমি। বাচ্চাদের জন্যে আমার মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিলো তখন। কেবলই মনে হচ্ছিলো, আহা রে! বেচারারা মুখের গ্রাস ফেলে গেলো! আর কি ফিরে আসবে ওরা!

শেষ রাত্রের দিকে কিসের একটা শব্দ শুনে জেগে উঠলাম আমি। বাইরের দিকে তাকাতেই দেখি, বাচ্চারা আবার ফিরে এসেছে। জর্জও জেগে উঠেছে তখন। বাচ্চাদের দেখতে পেয়ে সে তাড়াতাড়ি দড়ি আলগা দিয়ে মাংসটা নিচে নামিয়ে দিলো। চাটনির ডিসগুলোও এগিয়ে দিলো সে। বাচ্চারা তখন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সরে পড়লো ওখান থেকে। পরের রাত্রেও একই অবস্থা। সেদিনও ওরা এলো গভীর রাত্রে। এবং খাওয়াদাওয়া শেষ করেই চলে গেলো।

পরদিন সকালে আমাদের নতুন বেডফোর্ড লরীটা নিয়ে ইব্রাহিম এসে হাজির হলো। লরীটা পেয়ে খুশী হলাম আমি। কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, দরজার ওপরে বড় বড় অক্ষরে "এলসা লিমিটেড" (ELSA LTD.) কথাটা লেখা রয়েছে। আমিই বলেছিলাম এভাবে লিখতে।

ইব্রাহিম আসবার পর থেকেই শুরু হলো বৃষ্টি। তার পর থেকে সমানে চলতে লাগলো বর্ষণ। আমাদের মনে হলো, সন্ধ্যার পরেও যদি বৃষ্টি না থামে তাহলে বাচ্চারা হয়তো আসবে না। কিন্তু ওদের ভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার আগেই বৃষ্টিটা থেমে গেলো। আমরা তখন তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে সেই গাছের দিকে রওনা দিলাম। গাছে আগে থেকেই মাংস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো।

বৃষ্টির মধ্যেই এ কাজটা করে এসেছিলো জর্জ। ওখানে যেতেই দেখি জেসপা গাছে উঠে মাংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের না দেখে সে নিজেই মাংসটা নামিয়ে আনবার জন্যে গাছে উঠেছে এবং গোপা আর ছোট এল্সা নিচে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে লক্ষ্য করছে দাদার কেরামতি।

আমরা কিন্তু জানি যে, ওর কেরামতিতে কোনই ফল হবে না। শত চেষ্টা করলেও মাংসটাকে ও নামিয়ে আনতে পারবে না। তবুও আমরা ওর কেরামতিটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। অবশেষে ও যখন হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, তখন জর্জ এগিয়ে এসে মাংসটাকে নিচে নামিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে জেসপা এক লাফে নিচে নেমে এসে খেতে শুরু করলো। গোপা আর ছোট এল্সাও লেগে গেলো তার সঙ্গে। খাওয়া শেষ করে সে রাতটা ওখানেই রইলো ওরা। তারপর যথারীতি ভোরের দিকে বিদায় নিলো।

এদিকে ক্যাম্পে তখন আর কোনো ছাগল-ভেড়া নেই ওদের দেবার মতো। আমরা তাই সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লাম শিকারের সন্ধানে। এর আগে আমি কোনোদিন সেরেঙ্গেটি এলাকার বাইরে যাইনি। এই প্রথম আমি জর্জের সঙ্গে শিকার করতে যাচ্ছি। সেদিন আর আমার গাড়িটা নিলাম না। জর্জের গাড়িতেই চললাম দুজনে।

যতই এগোচ্ছি ততই ঘন হচ্ছে বনটা। অবশেষে আমরা যখন পাহাড়ের কাছে এলাম তখন দেখতে পেলাম যে, পালে পালে বন্য পশুরা ছুটে চলেছে। বুঝতে দেরি হলো না, এবার ওদের বাস্তুত্যাগ শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই এই সময়টায় পশুরা ওখান থেকে চলে যায়। ওদের এই স্থানান্তর যাত্রাটা যে এত বিরাট ব্যাপার তা আমি আগে জানতাম না। পশুর দলের যেন আর শেষ নেই। চলেছে তো চলেছেই! পশুই বা কত রকম! গেজেল, জেব্রা, বুনো মোষ, টোপি, এলাণ্ড, কঙ্গোলি, হাতী, গণ্ডার এবং আরও অনেক রকম। তবে ওই সব পশুর মধ্যে সিংহদের দেখা গেলো না। আমরা শুনে-ছিলাম, সেরেঙ্গেটি এলাকায় নাকি শ'চারেক সিংহ আছে। এই শ'চারেক সিংহের মধ্যে আবার নারীর সংখ্যাই নাকি বেশী। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কারণ এক-একটা পশুরাজ তিন-চারটে রানী নিয়ে ঘর করেন।

যাই হোক এসব দেখবার মতো সময় আমাদের ছিলো না। আমাদের তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বাচ্চাদের জন্যে দু-চারটে পশু শিকার করা। সুতরাং আমরা আর দেরি না করে সেরেঙ্গেটি এলাকার বাইরে চলে গেলাম।

আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কারণ সেরেঙ্গেটি এলাকার বাইরে আসতেই আমরা একটা মোষের বাচ্চা পেয়ে গেলাম। জর্জ এক গুলিতেই সাবাড় করে ফেললো তাকে। এরপর মৃতদেহটা গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার

আমরা ফিরে এলাম ক্যাম্পে। ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল্গো। আমরা তাই আর দেরি না করে ছুটলাম সেই গাছের দিকে। সেখানে যেতেই দেখি যে, বাচ্চারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদের দেরি দেখে জেসপা আর গোপা গাছে চড়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো ডালের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে ব্যালেন্স রাখতে রাখতে। ছোট এল্‌সা কিন্তু গাছে চড়েনি। সে নিচে দাঁড়িয়ে দাদাদের কেরামতি দেখছে।

আমরা ওদের খাবারটা গাড়ি থেকে নামিয়ে গাছতলায় নিয়ে যেতেই জেসপা আর গোপা গাছ থেকে নেমে এসে খেতে শুরু করলো। ছোট এল্‌সাও দাদাদের সঙ্গে ভোজনপর্বে যোগদান করলো। এই সময় আমি লক্ষ্য করলাম, জেসপার দেহের ক্ষতস্থান দিয়ে সামান্য সামান্য পুঁজ বের হচ্ছে।

পরদিন এই ব্যাপারটা নিয়ে লী ট্যালবটের সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, জেসপার দেহে এখুনি অস্ত্রোপচার করে তীরের ফলাটা বের করে ফেলা দরকার। মিঃ ট্যালবট কিন্তু আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন, ওর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হলে অবশ্যই অ্যানেস্থেশিয়া দিতে হবে। এবং তার জন্যে উগ্র ভেষজ প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর মতে উগ্র ধরনের কোনো ভেষজ ওর দেহে প্রয়োগ না করাই ভালো। তিনি আরও বললেন, স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষতস্থানটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে।

মিঃ ট্যালবটের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে আমি ক্যাম্পে আসতেই জর্জ বললে —চলো, আজ আমরা পশুদের বাস্তুত্যাগের দৃশ্যটা দেখে আসি গিয়ে। প্রস্তাবটা খুবই মনঃপূত হলো আমার। আমরা তাই তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পশুদের বাস্তুত্যাগ দেখতে।

আগের দিনের মতো সেদিনও একই দৃশ্য দেখতে পেলাম আমরা। পশুর দল যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। ওরা চলেছে ভিক্টোরিয়া হ্রদের দিকে। সে এক অচিন্ত্যনীয় দৃশ্য! আমরা যখন পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছলাম তখন বিরাট একদল জেব্রা চলেছিলো। সংখ্যায় ওরা হাজার কয়েক হবে। অতগুলো জেব্রাকে একসঙ্গে আর কোনোদিন দেখিনি আমরা। জেব্রার দল চলে যেতেই এলো গেজেলের দল। তাদের সংখ্যা আরও বেশী। এরপর একে একে আরও অনেক দল পশুকে দেখতে পেলাম আমরা। বুনো মোষের দলটাও ছোট নয়। সংখ্যায় বোধ হয় হাজারখানেক হবে। টোপিও দেখলাম হাজার দেড়েকের মতো।

পশুদের সেই বিরাট বাস্তুত্যাগ দেখে আমরা যখন ক্যাম্পে ফিরে এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্যাম্পে ফিরে আসতেই দেখতে পেলাম, ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। আমরা

আসতেই তিনি বললেন, বাচ্চাদের দুখানা ফটোগ্রাফ নেবার জন্যে তিনি এসেছেন। ফটো দুটোকে তিনি এনলার্জ করে তাঁর অফিসে টাঙিয়ে রাখবেন। তিনি আরও বললেন, পার্কের এলাকার মধ্যে আমরা যদি পশুদের ফটো নিতে চাই তাহলে আমাদের একশো পাউণ্ড ফীজ্ দিতে হবে। আমরা বললাম, দু-একদিনের মধ্যেই আমরা তাঁর কাছে ফীজের টাকাটা পাঠিয়ে দেবো।

সে রাত্রে বাচ্চারা খেতে এলো না। পরের দু রাতেও না। এদিকে চিতাবাঘের উৎপাতে ওদের মাংসটা গাছে ঝুলিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। রোজই একটা চিতা এসে গাছে চড়ে মাংস বাঁধা দড়িটা নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। একটা হায়েনা এবং গোটা কয়েক সিংহও রোজই ওখানে হানা দিচ্ছে ঝুলন্ত মাংসটার সদ্ব্যবহার করতে। ব্যাপার দেখে আমাদের মনে হলো, ওখানে আর বাচ্চাদের খাওয়ানো সম্ভব হবে না।
দেখতে দেখতে ছটা দিন পার হয়ে গেলো। ছদিন বাচ্চারা না আসায় সপ্তম দিনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ওদের সন্ধানে।
চলতে চলতে আমরা এসে হাজির হলাম ছোট একটা লেকের ধারে। ওখানে যেতেই দেখি হাতুরীর মতো মাথাওয়ালা একটা বকজাতীয় পাখি জলের ধারে বসে মাছ ধরতে চেষ্টা করছে এবং তার কাছ থেকে কিছুটা দূরে কয়েকটা ফ্লেমিংগো চুপচাপ বসে তার দিকে লক্ষ্য করছে। একটা বিশাল আকারের মনিটরও দেখতে পেলাম কিছু দূরে। মনিটরটা তখন ঘুমিয়ে ছিলো। ওটা এক ধরনের সরীসৃপ। ওর দেহটা প্রায় চার ফিট লম্বা। হঠাৎ দেখি একটা বুনো শেয়াল চুপিচুপি এগিয়ে আসছে মনিটরটার দিকে। আমরা শুনেছিলাম, বুনো শেয়ালেরা নাকি ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির হয়। কিন্তু তারা যে সরীসৃপ ভক্ষণ করে এ কথাটা আমরা জানতাম না। তাছাড়া অতো বড় একটা মনিটরকে মেরে ফেলার মতো শক্তি নিশ্চয়ই হবে না শেয়ালটার। কিন্তু আমাদের এ ধারণাটা যে ঠিক নয় তার প্রমাণ পেতে দেরি হলো না। একটু পরেই দেখি শেয়ালের পো এগিয়ে এসে মনিটারের ঘাড়টা কামড়ে ধরেছে। মনিটারটাও কম পাত্র নয়। সে তখন জেগে উঠে লেজ দিয়ে ভীষণভাবে এমন এক ঝাপটা মারলো শেয়াল পণ্ডিতের গায়ে যে, পণ্ডিতের পো ছিটকে পড়লো দু হাত দূরে। সে তখন ওখান থেকে সরে পড়লো জঙ্গলের দিকে। মনিটরটার সাহসেরও বলিহারি। শেয়ালটা চলে যেতেই আবার সে সটান শুয়ে পড়লো। শেয়ালের পো কিন্তু তখনো আশা ছাড়েনি। তাই আবার তাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। এবার সে লেজের দিকে না এসে মনিটরের

মুখের দিকে এসে হাজির হলো। মনিটর কিন্তু ঘুমোয়নি। শেয়ালকে দেখেই সে এমনভাবে মুখ দিয়ে হিসহিস শব্দ করতে লাগলো যে, শেয়ালটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো ওখান থেকে। আমরা যখন শেয়াল আর মনিটরের লড়াইয়ের খেলা দেখছি সেই সময় একটা সিংহী হেলতে-দুলতে এসে হাজির হলো সেখানে। তবে শেয়ালের মতো সে মনিটরকে আক্রমণ করলো না। সে সোজা জলের ধারে গিয়ে জলপান করে চলে গেলো। এই সব দৃশ্য দেখে বিকেলের দিকে ক্যাম্পে ফিরে এলাম আমরা। সেদিনও বাচ্চাদের দেখা পেলাম না।

সাতটা দিন ওদের না দেখে আমরা রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, ওরা আগের জায়গায় ফিরে যায়নি তো! আমরা জানি যে, বাসস্থানের ব্যাপারে সিংহদের ব্যবহার অনেকটা বেড়ালের মতো। বেড়ালদের যেমন দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও আবার তারা খুঁজে খুঁজে আগের বাসস্থানে ফিরে আসে, সিংহরাও অনেক সময় তাই করে। এই জন্যেই আমার মনে হলো, বাচ্চারা হয়তো আগের জায়গায়, অর্থাৎ এল্সার ক্যাম্পে চলে গেছে।

এই কথা মনে হতেই আমরা টাঙ্গানাইকার একখানা মানচিত্র নিয়ে বসলাম। আমাদের আগের ক্যাম্পটা যে জায়গায় ছিলো সে জায়গাটাও মানচিত্রে ছিলো। মানচিত্রখানা টেবিলের ওপরে বিছিয়ে নিয়ে আমরা আগের ক্যাম্পের অবস্থিতিটা ঠিক করে নিলাম। তারপর সেরেনেরা হতে আগের ক্যাম্পের অবস্থানটা পর্যন্ত একটা সরল রেখা টেনে ফেললাম। এই রেখাটি টানবার পরে আর এক বিপদ দেখা দিলো। বিপদটা হলো, সেরেঙ্গেটি এলাকার পরেই রেখাটি যে এলাকার ভেতর দিয়ে গেছে সেটি হলো মাশাই উপজাতি এলাকা। এই উপজাতির লোকেরা ভয়ানক শিকারী। একসময় ওদের মধ্যে একটা প্রথা ছিলো যে, যুবকেরা বয়োপ্রাপ্ত হবার পর তাদের প্রত্যেককে বীরত্বের পরীক্ষা দিতে হতো সিংহ শিকার করে। একটি মাত্র বল্লম হাতে দিয়ে একটি যুবককে পাঠানো হতো সিংহ-অধ্যুষিত বনের মধ্যে। যুবকটি যদি কোনো সিংহকে বল্লমের আঘাতে মেরে ফেলতে পারতো তাহলেই সে বীর হিসেবে গণ্য হতো।

বর্তমানে যদিও সরকার থেকে এ প্রথাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও চোরাগোপ্তাভাবে ওরা সিংহ নিধন করে বীরত্ব প্রকাশ করছে। সেরেঙ্গেটি হতে সোজা পথে আগের ক্যাম্পে যেতে হলে ওই এলাকার ভেতর দিয়েই যেতে হয়। আমাদের তাই আশংকা হলো, এল্সার বাচ্চারা যদি ওই পথে গিয়ে থাকে এবং যাবার সময় কোনো গ্রামে হানা দিয়ে থাকে,

তাহলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। গ্রামবাসীরা তাহলে তাদের হত্যা করতে পিছপা হবে না।

এই বিপদ থেকে ওদের কিভাবে রক্ষা করা যায় এটাই হলো আমাদের প্রধান চিন্তা। চিন্তা করে একটা সমাধানের পথও পাওয়া গেলো। পথটা জর্জই বাতলালো। সে বললে, মাকেদকে যদি মাশাই অঞ্চলে পাঠানো যায় এবং সে ওখানে গিয়ে কারো বাড়িতে কয়েকটা দিন থাকতে পারে তাহলে হয়তো বাচ্চাদের খবর সে যোগাড় করতে পারবে। মাকেদ নিজেও তুরকানা উপজাতির লোক। মাশাইদের ভাষাও সে জানে। আমাদের তাই মনে হলো, বাচ্চারা যদি ওই অঞ্চলে কোনো গ্রামে হানা দিয়েও থাকে, তাহলে মাকেদের মারফত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা দিলেই তারা খুশী হবে। নগদ টাকা হাতে পেলে ওরা বাচ্চাদের মেরে ফেলতে চাইবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, কে মাকেদকে নিয়ে যাবে। জর্জ বললে, তার পক্ষে যাওয়া ঠিক হবে না, কারণ, এখনও এ অঞ্চলটা ভালোভাবে তল্লাসী করা শেষ হয়নি। এমনও হতে পারে যে, বাচ্চারা হয়তো সেরেঙ্গেটিতেই রয়ে গেছে। অতএব, যে কটা দিন আমরা এখানে থাকতে পারছি তার প্রতিটি দিনই সে বাচ্চাদের সন্ধান করবে বলে স্থির করেছে।

কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হলো আমার কাছে। অবশেষে ঠিক হলো যে, মাকেদকে নিয়ে আমিই রওনা হবো এবং জর্জ এখানে থেকে যাবে। আমি তখন আর দেরি করা ঠিক হবে না মনে করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বো বলে স্থির করলাম। আমি আরও স্থির করলাম যে, মাকেদকে ওখানে কারো বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে আমি চলে যাবো আগের ক্যাম্পে।

মনে মনে এই রকম স্থির করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়লাম মাকেদকে নিয়ে। যাবার পথে ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তার সঙ্গেও দেখা করলাম আমি। তাঁকে এই সম্ভাব্য বিপদের কথা এবং আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানাতে তিনি বললেন, বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনিও খুব দুঃখ বোধ করেছেন। তবে মুখে দুঃখ প্রকাশ করলেও আসল কথাটা তিনি আবার শুনিয়ে দিলেন। তাঁর কথা হলো, বাচ্চাদের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, মে মাসের শেষ তারিখের আগেই আমাদের ওখান থেকে চলে যেতে হবে। পার্কের অধিকর্তার কাছ থেকে এই রকম কথা শুনে আমি দুঃখিত মনেই রওনা হলাম মাশাই অঞ্চলের দিকে।

মাশাই অঞ্চলে আমি যখন হাজির হলাম তখন সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে। মাকেদ বললো, রাতের বেলা এখানে বাসস্থান যোগাড় করা কোনোমতেই সম্ভব হবে

না। অতএব আমাকে তখন বাধ্য হয়ে আবার ফিরে যেতে হলো ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে গিয়ে দেখি জর্জ সেখানে নেই। সহকারীরা বললে, আমি বেরিয়ে যাবার পরেই সে বাচ্চাদের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে।

আমি যখন মাকেদকে নিয়ে রওনা হয়েছিলাম তখন তাড়াতাড়িতে অনেক জিনিস নেওয়া হয়নি। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আগের ক্যাম্পে কোনো তাঁবু বা খাবার-দাবার কিছুই নেই। তাছাড়া তাঁবু খাটাবার জন্যে এবং আমার ফাইফরমাস খাটার জন্যে একজন সহকারীও চাই। আমি তাই সহকারীদের সাহায্যে ছোট দুটো তাঁবু এবং কয়েকদিনের মতো খাবার-দাবার গাড়িতে তুলে ভোরবেলাতেই রওনা হবো বলে ঠিক করলাম। একজন সহকারীকেও বলে রাখলাম আমার সঙ্গে যেতে।

এই সব কাজ সারতে রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেলো। আমি তখন সবেমাত্র শোবার যোগাড় করছি, এই সময় জর্জ এসে হাজির হলো। তার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, বাচ্চাদের সন্ধান সে পেয়েছে।

জর্জও সেই কথাই বললো। অতএব, আগের ক্যাম্পে যাবার পরিকল্পনাটা ওখানেই পরিত্যক্ত হলো।

নতুন বাসস্থানে

রাত্রে আর বিশেষ কিছু কথা হলো না। ঘটনাটা শুনলাম পরদিন সকালে। চায়ের টেবিলে বসে জর্জ বলতে লাগলো বাচ্চাদের খুঁজে বের করার কাহিনী।

আমি রওনা হবার পরেই জর্জ বেরিয়ে পড়ে। উপত্যকার প্রায় সব জায়গাই ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গিয়েছিলো। সেদিন শুরু হলো পাহাড় অঞ্চলে অভিযান। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা ফালিমতো জায়গা দেখতে পায় জর্জ। দূর থেকে বুঝতেই পারা যায় না যে, ওখানে একটা সমতলভূমি আছে। এবং এটা বুঝতে না পারার জন্যেই ও জায়গাটা আগে দেখা হয়নি। এবার পাহাড়ের কাছে যেতেই ও দেখতে পায় জায়গাটা। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে ওখানে ঢুকে পড়ে। ওখানে যেতেই ওর মনে হয় যে, বাচ্চারা হয়তো ওখানেই আস্তানা গেড়েছে। জায়গাটা যেমন সুরক্ষিত তেমনি ছায়া-শীতল। ছোট-

বড় গাছ-গাছালি আর ঝোপ-ঝাড়ের প্রাচুর্য দেখে ওর মনে হয়, সিংহদের বাসভূমির পক্ষে জায়গাটা অতুলনীয়। ও তাই গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগোতে থাকে।

কিছুটা এগোতেই বাচ্চাদের পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। দাগগুলো অনুসরণ করে অবশেষে জর্জ হাজির হয় একটা বড় রকমের ঝোপের কাছে। সেখানে গিয়ে ও বাচ্চাদের নাম ধরে ডাকতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জেসপা বেরিয়ে আসে সেই ঝোপের ভেতর থেকে। গোপা আর ছোট এলসাও বেরিয়ে আসে একটু পরেই। জর্জ লক্ষ্য করে, ওদের শরীর বেশ ভালোই আছে। হয়তো এবার ওরা নিজেদের খাবার নিজেরাই সংগ্রহ করতে পারছে। কিন্তু তবুও সে ওদের খেতে দেয়। গাড়ি থেকে মাংস আর চাটনি এনে ওদের সামনে ধরে দেয়। চর্বচোষ্য খাবার পেয়ে খুশী মনে খেতে শুরু করে বাচ্চারা, তবে পেটে খিদে থাকলে যেভাবে কপ্‌কপ্‌ করে খায়, এবারে সে ভাবে খাচ্ছে না। এবার ওরা ধীরেসুস্থে রসিয়ে রসিয়ে খেতে শুরু করেছে।

বাচ্চাদের দেখতে পেয়ে জর্জ প্রথমে ভেবেছিলো, রাতের বেলাটা সে ওদের কাছেই থাকবে, কিন্তু আমার কথা মনে হতেই ক্যাম্পে ফিরে আসে। ফেরার পথে ও মনে মনে স্থির করে যে, রাত্রেই রওনা হবে আমার কাছে। আগের ক্যাম্পে গিয়ে যাতে অকারণে কষ্টভোগ না করতে হয় সেই জন্যেই রাত্রে রওনা হবে বলে স্থির করে। কিন্তু ক্যাম্পে এসে আমাকে দেখে ও রীতিমত অবাক হয়ে যায়। এরপর আমার কাছ থেকে সব কথা শুনে বলে, আমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, কারণ বাচ্চাদের সে খুঁজে পেয়েছে। আমাকে খবরটা জানিয়ে দিয়েই তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ে ও।

বাচ্চাদের পাওয়া গেছে শুনে এবং তাদের নতুন বাসস্থানের হদিস পেয়ে খুবই খুশী হই আমি। এর পরেই শুরু হয় আমাদের পরবর্তী আলোচনা; অর্থাৎ অতঃপর আমাদের করণীয় কি হবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসি আমরা। আলোচনায় স্থির হয়, এখন থেকে ওদের কাছে গিয়েই রাত্রিবাস করবো দুজনে।

সন্ধ্যার একটু আগেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। রাত্রে ওখানে থাকতে হবে বলে কিছু খাবারদাবার এবং বিছানাপত্রও সঙ্গে নিলাম। এ ছাড়া বাচ্চাদের জন্যে মাংস আর চাটনিও নেওয়া হলো।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা হাজির হলাম ওদের নতুন বাসভূমিতে। আমরা যেতেই বাচ্চারা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের কাছে হাজির হলো। ওদের দেখেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে জেসপা আমার কাছে এগিয়ে এলো। মনে হলো, ও বোধহয় আমার কাছ থেকে

আদর পেতে চাইছে। আমি তাই সাহস করে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম। গোপা আর ছোট এল্‌সা কিন্তু কাছে এলো না। ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

এদিকে জর্জ তখন তার গাড়ি থেকে মাংস আর চাটনি বের করে এনেছে। খাবারগুলো নামিয়ে দিতেই গোপা আর ছোট এল্‌সা খেতে শুরু করলো। জেসপাও তখন আমার কাছ থেকে চলে গেলো খাবারের কাছে। এ ব্যাপারে তার জ্ঞানের নাড়ী বেশ টনটনে। আদর খেলে পেট ভরবে না তা সে ভালো করেই জানে। ওরা যখন খানা খেতে ব্যস্ত সেই সুযোগে আমরাও খেয়ে নিলাম। তারপরেই শয়ন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাদের আর দেখতে পেলাম না। তবে না দেখলেও ওদের জন্যে আর কোনো চিন্তা হলো না আমাদের। আমরা তাই আর দেরি না করে সোজা ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

সন্ধ্যার সময় আবার গেলাম ওদের বাসস্থানে। যেতেই দেখি বাচ্চারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। খুবই পরিশ্রান্ত বলে মনে হলো ওদের। জেসপা আস্তে আস্তে আমার গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে দেখে আমি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তাকে আদর করলাম। এখন আর ও আমাকে আগের মতো থাবা মারে না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওর স্বভাবেরও পরিবর্তন হচ্ছে ধীরে ধীরে। বুদ্ধিও বাড়ছে ক্রমশঃ। গোপাটা কিন্তু এখনও প্রায় আগের মতোই রয়ে গেছে। তবে ছোট এল্‌সার স্বভাবে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। সে আর আগের মতো লাজুক নেই। আগে সে আমাদের দেখলেই লুকিয়ে পড়তো, এখন আর পালায় না।

সেদিনও জর্জ ওদের জন্যে মাংস আর চাটনি নিয়ে এসেছিলো। মাংসটা বের করে দিতেই ওরা খেতে শুরু করলো। আমি তখন গাড়িতে বসে ওদের খাওয়া দেখছি আর ভাবছি, আর কটা দিন পরেই ওদের কাছ থেকে চলে যেতে হবে আমাদের। আর হয়তো ওদের দেখতে পাবো না। কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো আমার।

এদিকে জর্জ তখন চাটনির ডিসগুলো বের করে দিয়েছে ওদের সামনে। জেসপা মাংস খাওয়া বাদ দিয়ে চাটনিটা খেতে শুরু করলো। ছোট এল্‌সাও তাই করলো। গোপা কিন্তু মাংস ছাড়তে রাজী নয়। দাদা আর বোন যখন চাটনি খাচ্ছে সেই সুযোগে সে কপ্‌কপ্‌ মাংস খেয়ে চলেছে।

সে রাতটাও আমাদের কাছেই থাকলো ওরা। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম গাড়ির মধ্যে।

পরদিন সকালে আমরা উপত্যকা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ি চালাবার মতো রাস্তা না থাকায় বাদাবন আর বাঁশরি কাঁটার (whistling thorn) ঝোপ ঠেলে ধীরে ধীরে যেতে হলো আমাদের। ফলে পঁয়ত্রিশ মাইল যেতেই পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। এই সময় হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে গেলো যে, বাচ্চাদের জন্যে মাংস যোগাড় করতে হবে। আমরা তাই উপত্যকা পর্যবেক্ষণের কাজ সেদিনের মতো বাদ দিয়ে সেরেঙ্গেটির বাইরে যাবার জন্যে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। যাবার পথে দেখতে পেলাম, বিরাট আকারের একটা সিংহী একটা মোষের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে। খাওয়ায় সে এতোই ব্যস্ত যে, আমাদের দেখেও সে গ্রাহ্য করলো না। একবার মাত্র আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিলো।

আমাদেরও তখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পে গিয়ে খাওয়ার মতো সময় কোথায়? আমরা খেতে গেলে বাচ্চাদের আর খাওয়া হবে না। তাই খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে শুরু করলাম আমরা।

সেরেঙ্গেটির সীমানা পার হলাম বেলা প্রায় তিনটের সময়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো ইমপালা মেরে গাড়িতে তুলে ফেললাম। বেলা তখন সাড়ে তিনটে, অর্থাৎ সন্ধ্যে হতে তখনও প্রায় তিন ঘণ্টা বাকি।

হাতে সময় থাকায় আমরা ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম ক্যাম্পে। ওখানে যেতেই নুরু আমাদের খেতে দিলো: খিদের চোটে তখন আমাদের নাড়ি জ্বলছিল, তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাচ্চাদের কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

এই সময় ইব্রাহিম একখানা চিঠি এনে আমার হাতে দিলো। খামটা দেখেই বুঝতে পারলাম, ওখানা ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তা লিখেছেন। আবার কি পত্রাঘাত এলো জানবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা খুলে পড়ে ফেললাম। যা ভেবেছি তাই। চিঠিতে লেখা হয়েছে যে, ৩১শে মের মধ্যেই আমাদের সেরেঙ্গেটি এলকা পরিত্যাগ করতে হবে। চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে যে, এখন থেকে বাচ্চাদের মাংস খাওয়ানোও চলবে না আমাদের। চিঠিখানা পড়ে খুবই দুঃখিত হলাম। কিন্তু দুঃখিত হলেও কিছু করবার নেই। যেতে আমাদের হবেই। আমারা তাই দুঃখিত মনেই রওনা হলাম বাচ্চাদের উদ্দেশে।

নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হতে সন্ধ্যা উতরে গেলো। যেতেই দেখি বাচ্চারা সেখানে অপেক্ষা করছে। জেসপাকে একটা গাছের তলায় শুয়ে থাকতে দেখলাম। জর্জ তাড়াতাড়ি ওদের খাবার বের করে দিলো। গোপা আর

ছোট এল্‌সা এগিয়ে এসে খেতে শুরু করলো। জেসপা কিন্তু উঠলো না। যেমন শুয়ে ছিলো তেমনি রইলো।
জেসপা খেতে আসছে না দেখে আমি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকলাম। ও শুধু একবার মুখ তুলে তাকালো, তারপর আবার শুয়ে পড়লো। ওর অবস্থা দেখে চিন্তিত হলাম। মনে হলো, নিশ্চয়ই ওর অসুখ করেছে। এল্‌সারও একবার এই রকম অবস্থা হয়েছিলো। তাকে নতুন এলাকায় নিয়ে ছেড়ে দেবার ক'দিন পরেই বিষাক্ত মাছির দংশনে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো।
জর্জও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো জেসপার অবস্থা দেখে। সে তাই এক ডিস কডলিভার তেলের চাটনি এনে তার মুখের সামনে ধরে দিলো। শুয়ে শুয়েই চাটনিটা খেয়ে নিলো জেসপা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে এলো খাবারের কাছে। কিন্তু সামান্য একটু খেয়েই সে ওখান থেকে চলে গেলো। গোপা আর ছোট এল্‌সাও চলে গেলো একটু পরেই। আমরা তখন বাকি মাংসটা গাছে ঝুলিয়ে রেখে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।
পরদিন সকালেই ওখানে গিয়ে হাজির হলাম আমরা। কিন্তু ধারে-কাছে বাচ্চাদের দেখতে পেলাম না। আমরা তখন গাড়ি নিয়ে ওদের খোঁজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু দুপুর অবধি খোঁজ করেও ওদের দেখা পেলাম না। তবে বাচ্চাদের দেখা না পেলেও একটা ভালো জিনিস পেয়ে গেলাম আমরা। জিনিসটা হলো একটা কালো পাথর। পাথরটার ওপরের দিকটা স্লেটের মতো সমতল আর মসৃণ। আমাদের মনে হলো যে, ওটাকে নিয়ে যেতে পারলে ওর ওপর এল্‌সার নাম ও তার মৃত্যুর তারিখ খোদাই করে তার কবরের ওপরে ফিট্ করে দিলে ভারী চমৎকার হবে। পাথরটা এল্‌সার বাচ্চাদের বাসভূমি থেকে সংগ্রহ করার ফলে ওটার একটা বিশেষ মূল্য হবে। আমরা অনেক চেষ্টার ফলে পাথরটা গাড়িতে তুলে ক্যাম্পে নিয়ে গেলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে আমরা যখন ওটাকে খোদাই করতে দিয়েছিলাম, তখন খোদাইয়ের কারিগর আমাদের জানিয়েছিলো পাথরটা খোদাই করতে তার পাঁচখানা বাটালি ভেঙে গিয়েছিলো। সে আরও বলেছিলো, পাথরটা মার্বেল এবং গ্রানাইটের চেয়েও শক্ত।
সন্ধ্যার পরে আবার আমরা হাজির হলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। সেদিন কিন্তু বাচ্চারা অনেক দেরি করে এলো। জেসপার শরীরটা সেদিনও ভালো দেখলাম না। জর্জ তাদের মাংস দিলেও জেসপা বিশেষ আগ্রহ দেখালো না। অথচ অন্য দুজন ঠিকমতোই খেতে শুরু করলো। জেসপা খাচ্ছে না দেখে আমি এক কাজ করলাম। জর্জের গাড়িতে কিছু বাড়তি মাংস ছিলো। এ ছাড়া

ছিলো কিছু মেটুলি। আমি সেই মাংস আর মেটুলির সঙ্গে টেরামাইসিন্ এবং কডলিভার তেল মিশিয়ে ভালো করে মেখে ফেললাম। তারপর সেই খাবারটা একটা ডিসে করে জেসপার কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু ডিসটা ওর মুখের কাছে নিয়ে যেতেই ও থাবা দিয়ে ডিসটাকে ফেলে দিতে গেলো আমার হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত টেনে নিলাম। জেসপাও আর কিছু করলো না। থাবাটা তুলেই সে কি মনে করে থেমে গেলো। মনে হলো, থাবার আঘাতে আমার হাত ছড়ে যেতে পারে ভেবেই সে এইভাবে থেমে গেলো। আমি তখন ফিরবো ফিরবো ভাবছি। হঠাৎ জেসপা এক-পা এগিয়ে এলো খাওয়ার জন্যে। তার আগ্রহ হয়েছে দেখে তখুনি আমি ডিসটা তার মুখের সামনে নামিয়ে দিলাম। সেও আর কোনো প্রতিবাদ না করে খেতে শুরু করলো।

খাওয়া শেষ হলেই গোপা আর ছোট এল্সা গড়াগড়ি দিয়ে খেলতে শুরু করলো। জেসপা ওদের খেলতে দেখেও চুপচাপ শুয়ে পড়লো একটু দূরে গিয়ে। আমরাও তখন শুয়ে পড়লাম যে যার গাড়িতে।

পরদিন ভোরে উঠেই চলে এলাম ক্যাম্পে। ফেরবার পথে আমার বারবার মনে হতে লাগলো যে, জেসপাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমাদের চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি তাই ক্যাম্পে গিয়েই অধিকর্তার কাছে একখানা চিঠি লিখে ইব্রাহিমকে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। চিঠিতে জেসপার অবস্থা জানিয়ে আরও কয়েকটা দিন ওদের কাছে থেকে যাবার অনুমতি চাইলাম।

এদিকে ক্যাম্পে আর কোনো মাংস না থাকায় জর্জ তখুনি বেরিয়ে পড়লো পশু শিকারে। পশু শিকার আমাদেব পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে সে এই নিষিদ্ধ কাজটি করতে গেলো।

জর্জ যখন একটা ইমপালা মেরে তাকে গাড়িতে তুলছে ঠিক সেই সময় সে একখানা এরোপ্লেন দেখতে পেলো মাথার ওপরে। এরোপ্লেনখানা খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। এবং সে প্লেনে ছিলো সেরেঙ্গেটির একজন ওয়ার্ডেন। লোকটা প্লেনে বসেই জর্জের অপকর্মটি দেখে ফেলেছিলো। কিন্তু সে যে জর্জের এই অপকর্মটি দেখতে পেয়েছে, জর্জ তা বুঝতে পারলো না।

জর্জ ক্যাম্পে আসার একটু পরেই পার্ক-ওয়ার্ডেন এসে হাজির হলো সেখানে। এসেই জর্জের কাছে কৈফিয়ত তলব করলো তার অন্যায় কাজের জন্যে। জর্জ তখন বাচ্চাদের অবস্থার কথা, বিশেষ করে জেসপার অসুখের কথা তাকে জানিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইলো তার কাছে। আমিও তাকে বুঝিয়ে

বললাম যে, নিতান্ত বাধ্য হয়েই এ কাজটা আমাদের করতে হয়েছে। আমি তাকে আরও বললাম, বর্তমান অবস্থায় সে যদি আরও দিন সাতেক আমাদের এখানে থাকতে অনুমতি দেয় এবং দরকারমতো পশু শিকার করতে দেয় তবে আমরা বিশেষ বাধিত হবো।

আমার কথা শুনে ওয়ার্ডেন বললে, অনুমতি দেবার ক্ষমতা তার নেই। এ ক্ষমতা আছে শুধু অধিকর্তার। সুতরাং আমাদের যদি অনুমতি নিতে হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে।

কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, তাঁর কাছে যেতে হলে আড়াইশো মাইল পাড়ি দিতে হবে আমাদের। এদিকে হাতে আর সময় নেই। ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে ৩১শে মের মধ্যেই আমাদের চলে যেতে হবে। আজ ৩০শে মে। সুতরাং সময় আছে আর মাত্র একটা দিন। ওয়ার্ডেনকে এই অসুবিধের কথা জানালে সে বললে, আমরা যদি চাই তাহলে সে রেডিও মারফত বার্তা পাঠিয়ে নাইরোবি থেকে একখানা প্লেন চার্টার করে দিতে পারে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। ওয়ার্ডেন তখন বলে গেলো, অফিসে গিয়েই সে প্লেন চার্টার করতে চেষ্টা করবে। এবং চার্টার করা সম্ভব হলে খবরটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

ওয়ার্ডেন চলে যাবার পর জর্জ বললে, সেদিন সে একাই যাবে বাচ্চাদের কাছে ; কারণ আমাকে ক্যাম্পে অপেক্ষা করতে হবে প্লেনের খবরের জন্যে। আমিও ভেবে দেখলাম, জর্জ ঠিক কথাই বলেছে। প্লেনের খবরের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমি তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হয়ে গেলাম। একটু পরেই জর্জ বেরিয়ে গেলো ক্যাম্প থেকে।

ঘণ্টা দুই বাদেই খবর এসে গেলো। আমাকে জানানো হলো যে, পরদিন সকালে একখানা প্লেন এসে সেরোনেরা বিমান-বন্দর থেকে আমাকে তুলে নেবে, অতএব আমি যেন ভোরবেলাতেই বিমান-বন্দরে হাজির হই।

শেষ রাত্রেই রওনা হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু সেরোনেরায় হাজির হয়েই লক্ষ্য করলাম, তাড়াতাড়িতে পোশাক বদল করতে ভুল হয়ে গেছে আমার। গতকাল আমি যে খাকী পোশাক পরে ছিলাম সেই পোশাকেই হাজির হয়েছি ওখানে। তখন আর ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে পোশাক বদলে আসবার সময় নেই। এই বিভ্রাটের কথা ওয়ার্ডেনকে জানাতে এ ব্যাপারে সে আমাকে সাহায্য করলো। সে তার স্ত্রীর এক সেট পোশাক এনে দিয়ে বললো— আপনি বরং এই পোশাক পরে যান। বাধ্য হয়ে তাই করতে হলো। তবে সুখের কথা এই যে, পোশাকটা আমার শরীরে বেমানান হলো না।

সকাল সাতটার মধ্যেই আমি আরুশা বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম। প্লেনের পাইলটকে যাতায়াতের ভাড়া দিয়ে বললাম, তিনি যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেন।

বিমান বন্দর থেকে আমি সোজা চলে গেলাম অধিকর্তার বাড়িতে। আমাকে তিনি সাদরেই অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে অনুরোধ করলেন।

লাঞ্চ টেবিলে বসে কথা শুরু হলো আমাদের। প্রথমেই তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমরা পশু শিকার করেছি শুনে তিনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। আমি তখন সব কথা তাঁর কাছে খুলে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। এর পরেই আসল কথাটা পাড়লাম। বললাম, জেসপার বর্তমান অবস্থায় তাকে ছেড়ে যাওয়াটা হৃদয়হীনের কাজ হবে। অতএব তিনি যদি দয়া করে আর কয়েকটা দিন বাচ্চাদের কাছে আমাদের থাকতে দেন এবং দরকারমতো পশু শিকারের অনুমতি দেন তাহলে আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার অনুরোধে তিনি ৮ই জুন অবধি থাকতে অনুমতি দিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনটে পশু মারবার অনুমতিও দিলেন। অনুমতি দেবার পর তিনি বললেন, আমরা যদি আরও বেশীদিন থাকতে চাই তাহলে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অবশেষে তিনি আরও একটা কথা বললেন, আমরা যদি বাচ্চাদের ওখানে ছেড়ে যেতে না চাই তাহলে আমরা তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তাঁর কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে, ৮ই জুনের পরে একটা দিনও আমাদের থাকা চলবে না। বাচ্চাদের সরিয়ে নেবার জন্যে যে কথাটা তিনি বললেন, সেটা যে সম্ভব নয় তা তিনি ভাল করেই জানতেন। এটা তাঁর রাগের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি তাই যেটুকু সুযোগ পেলাম তাতেই খুশী হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আমি ক্যাম্পে ফিরলাম সন্ধ্যার একটু আগে। প্রচণ্ডভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তখন। বৃষ্টিতে ভিজে আমার অবস্থা তখন রীতিমতো কাহিল। একটু জ্বর হয়েছে বলেও মনে হলো। এদিকে জর্জ তখন বাচ্চাদের কাছে চলে গেছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করে জর্জের কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। মুরু কিছু খাবার আর চা এনে দিলো। এই সময় এক কাপ গরম চা পেয়ে খুবই খুশী হলাম আমি।

চা আর খাবার খেয়ে তখুনি রওনা হলাম পাহাড়ের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখি জর্জ গোমড়া মুখে গাড়ির ভেতরে বসে আছে। ও হয়তো ভাবছে, 'অদ্যই শেষ রজনী'। এরপর আর ওখানে থাকা চলবে না। তার এই মনোভাবের কথা বুঝতে পেরে আগেই আমি সুখবরটা তাকে জানিয়ে দিলাম। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখের গোমড়া ভাবটা কেটে গেলো। খুশীও হলো খুব। বললে—যাক, আটটা দিন যে থাকতে পারবো এটাও কম কথা নয়।

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ, নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা আর কি!

হ্যাঁ, কানা-মামাই বটে। তবে বর্তমান অবস্থায় কানা-মামা পেয়েই খুশী থাকতে হবে আমাদের।

যাক গে, কানা-মামার কথা বাদ দিয়ে এবার বাচ্চাদের কথা বলো। ওরা কি খেয়েদেয়ে চলে গেছে নাকি?

না, ওরা এখনো আসেনি। কেন যে এলো না তাই ভাবছি।

ভেবে আর লাভ কি? তার চেয়ে শুয়ে পড়া যাক।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই গা-হাত-পায়ে খুব ব্যথা অনুভব করলাম। জ্বরটাও বেড়েছে বলে মনে হলো। জর্জকে সে কথা বলতেই সে বললে—তাহলে চলো, ক্যাম্পে গিয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট আর একটু ব্রাণ্ডি খেয়ে নেবে। আমরা তাই আর ওখানে দেরি না করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার আগে আবার বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমার টেম্পারেচার তখন প্রায় ১০২ ডিগ্রী। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি বের হলাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখি বাচ্চারা তখনো আসেনি। আমরা তখন গাড়িতে বসে ওদের জন্মে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু দু ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন ওদের দেখা পাওয়া গেলো না, তখন জর্জ তার গাড়ি থেকে মাংসটা নামিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে আগের মতো একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখলো।

অবশেষে রাত প্রায় দশটার সময় বাচ্চারা এলো। ওরা আসতেই জর্জ দড়ি আলগা দিয়ে মাংসটা নামিয়ে দিলো ওদের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করলো ওরা। আজ আর জেপসার অরুচি দেখলাম না। বরং সিংহ-ভাগ সেই-ই নিতে লাগলো। বুঝতে পারলাম টেরামাইসিনে কাজ হয়েছে।

পরদিন সকালে আমি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করবার জন্মে তাঁর খামারের উদ্দেশে রওনা হবার জন্মে প্রস্তুত হলাম। অধিকর্তার কাছে

শুনেছিলাম, এ সময়টা তিনি খামার বাড়িতেই থাকেন। খামারের অবস্থানটাও আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

ওখানে আমাদের থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। আজ, ৪ঠা জুন। আর চারদিন পরেই আমাদের বিদায় নিতে হবে। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। দেখি ওঁকে অনুরোধ করে আরও কিছুদিন থাকা যায় কিনা।

আমাদের ক্যাম্প থেকে চেয়ারম্যানের খামারের দূরত্ব একশো বিশ মাইল। অতটা রাস্তা যেতে সময় লাগলো প্রায় ছ ঘণ্টা। সকাল সাতটায় বেরিয়ে বেলা প্রায় একটার সময় হাজির হলাম ওখানে। চেয়ারম্যান তখন লাঞ্চে বসতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখে বললেন—আসুন মিসেস্ অ্যাডামসন। লাঞ্চ-টেবিলে বসেই কথা হবে আপনার সঙ্গে।

আমার তখন খুব খিদে পেয়েছে। জ্বরটাও তখন আর নেই। তাই কোনরকম দ্বিরুক্তি না করেই তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

খেতে খেতেই আমার আরজি পেশ করলাম তাঁর কাছে। জেসপার অপারেশনের কথাটাই বিশেষভাবে বললাম। আমার কথা শুনে চেয়ারম্যান বললেন, জেসপার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তীরের ফলাটা আপনা থেকেই খসে পড়বে একসময়। তিনি আরও বললেন যে, তাঁর একটা ঘোড়ার গায়েও তীর বিঁধেছিল একসময়। কিন্তু মাস পাঁচেক বাদে তীরের ফলাটা আপনা থেকেই খসে পড়েছিলো।

আমার বলতে ইচ্ছে হলো, ঘোড়া আর সিংহ এক নয়। সিংহদের শিকার করে খেতে হয় এবং শিকারের সময় ঝাপটাঝাপটিতে তীরের ফলাটা আরও গভীরে ঢুকে যেতে পারে; কিন্তু ভদ্রলোক রেগে যাবেন ভেবে সে কথা আর বললাম না। আমি শুধু বললাম, বাচ্চারা এখন পর্যন্ত নিজেদের খাবার নিজেরা যোগাড় করতে পারছে না; এ ব্যাপারে এখনো ওরা আমাদের ওপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং তিনি যদি অন্ততঃ মাসখানেক আমাদের থাকতে দেন তাহলে আর কোন অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

চেয়ারম্যান কিন্তু আমলই দিলেন না আমাকে। তিনি বললেন, ৮ই জুনের পরে আর একটা দিনও আমাদের থাকা চলবে না। তিনি আরও বললেন, ওদের যদি খেতে না দেওয়া হয় তাহলে বাধ্য হয়েই ওরা শিকার করতে শুরু করবে।

কোন রকমেই চেয়ারম্যানকে রাজী করাতে না পেরে আমি আর একটা নতুন প্রস্তাব রাখলাম ওঁর কাছে। বললাম—বেশ, আমাকে তাহলে টুরিস্ট হিসেবে থাকতে দিন।

আমার কথা শুনে চেয়ারম্যান হো হো করে হেসে উঠে বললেন— তাতে কি কোন সুবিধে হবে? টুরিস্ট হিসেবে থাকতে হলে আপনাকে সব সময় টুরিস্টদের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তাছাড়া, কোন পশু শিকার করতেও দেওয়া হয় না টুরিস্টদের। এ অবস্থায় আপনারা ওদের খাওয়াবেন কেমন করে? আর খাওয়াতেই যদি না পারেন, তাহলে থেকেই বা লাভ কি হবে?

তবুও তো ওদের দেখতে পাবো! আপনি তো জানেন, জন্মের পর থেকেই আমি ওদের নিজের ছেলে-মেয়ের মতো প্রতিপালন করছি। শুধু ওদের কেন, ওদের মাকেও আমি ছেলেবেলা থেকে লালন-পালন করেছি। এখন চিরদিনের মতো ওদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে আরও কটা দিন ওদের কাছাকাছি থাকতে চাই।

আমার এই করুণ আকুতি শুনে চেয়ারম্যান নরম হয়ে বললেন—বেশ আপনি তাহলে নিয়ম-মাফিক দরখাস্ত পেশ করুন ডিরেক্টরের কাছে। আপনার আবেদন যাতে মঞ্জুর হয় তা আমি দেখবো।

মন্দের ভাল হিসেবে এই ব্যবস্থাই মেনে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম আমি।

টুরিস্টের ভূমিকায় আমি

৮ই জুন সন্ধ্যার পর জর্জ রওনা হয়ে গেলো ইসিওলোর উদ্দেশে। ক্যাম্পের বেশির ভাগ জিনিসই সঙ্গে নিয়ে গেলো সে। কয়েকজন সহকারীকেও নিয়ে গেলো তার সঙ্গে। আমার কাছে রইলো শুধু নুরু আর একজন টোটো। এখন থেকে আমি পুরোদস্তুর টুরিস্ট। আমাকে এখন চলতে হবে টুরিস্টদের নিয়ম-কানুন অনুসারে। টুরিস্টরা ইচ্ছা করলে সেরোনেবার সরকারী লজেও থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে থাকার ইচ্ছে আমার নেই। সরকারী লজে থাকতে হলে আমাকে চলতে হবে বাঁধাধরা রুটিন অনুসারে। আমি তাই লজ থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানেই সাময়িক-ভাবে থাকার ব্যবস্থা করলাম। আমার জায়গা হলো ছোট একটা তাঁবুতে এবং নুরু আর ইব্রাহিম লরীতে থাকবে বলে ঠিক হলো। আমার ল্যাণ্ড-রোভারটা রইলো ঘোরাঘুরির জন্যে।

পরদিন সকালেই আমি নুরুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাচ্চাদের সন্ধানে। ওদের বাসভূমিতে যেতেই দেখি, তিন ভাই-বোনে একটা গাছের নিচে শুয়ে আছে। দিনের বেলায় ওদের ওইভাবে শুয়ে থাকতে আগে কোনোদিন

দেখিনি। ওরা কি তাহলে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো? যাই হোক, ওদের দেখতে পেয়ে আমি খুবই খুশী হলাম। আমি তখন ওদের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। ওরা কিন্তু ওঠবার নামও করলো না। যেমন শুয়ে ছিলো তেমনি রইলো। ওদের ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমি গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে পা বাড়ালাম। এবার আর ওরা শুয়ে থাকলো না। আমি ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দেখে ওরা উঠে দৌড়ে গিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়লো। আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। ওরা কোথায় যাচ্ছে দেখতে ইচ্ছে হলো আমার। আমি তখন গাড়িতে উঠে ওদের সেই ঝোপের পাশে হাজির হলাম। ওখানে যেতেই দেখি, গোপা আর জেসপা একটা গাছের নিচে শুয়ে পড়েছে। ছোট এল্‌সাকে দেখতে পেলাম না। তবে মনে হলো, সেও ধারে-কাছেই কোথাও আছে।

আমি তখন ওদের বিরক্ত না করে কাগজ-কলম নিয়ে কয়েকখানা দরকারী চিঠি লিখতে বসে গেলাম। চিঠি লেখা শেষ হতেই দেখি, গোপা নদীর দিকে চলেছে। একটু পরে জেসপাকেও যেতে দেখলাম তার পেছনে। আমি কিন্তু ওখানেই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘণ্টা দুই বাদে হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটা জেব্রা পড়ি-কি-মরি অবস্থায় ছুটে চলেছে। জেব্রাটার পেছনেই ছুটেছে একপাল ইমপালা। বুঝতে দেরি হলো না যে, ওদের কেউ তাড়া করেছে। আমার মনে হলো যে, গোপা আর জেসপাই হয়তো তাড়া করেছে ওদের। কিন্তু না; ওদের তাড়া করেছিলো বিশাল-দেহী এক পশুরাজ। একটু পরেই তিনি আবির্ভূত হলেন রঙ্গমঞ্চে। আমাদের দিকে, অর্থাৎ আমাদের গাড়ির দিকে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। বুঝতে পারলাম, প্রাণভয়ে পলায়মান ক্ষীণপ্রাণ পশুদের হনন করবার ইচ্ছে তাঁর নেই। সিংহ-চরিত্রের এটাই হলো বিশেষত্ব। এবং এই রাজকীয় ঔদার্য আছে বলেই সিংহকে বলা হয় পশুরাজ।

এদিকে গোপা আর জেসপা সেই যে গেছে আর তাদের ফিরে আসার নাম নেই। ছোট এল্‌সারও দেখা নেই। ওদের এইরকম চালচলন দেখে আমার মনে হলো, ওরা বোধ হয় খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। তা না হলে নিশ্চয়ই ওরা ফিরে আসতো আমার কাছে। যাই হোক, তা যদি হয় তো খুবই ভালো। আমার দুশ্চিন্তার বোঝাটাও তাহলে হাল্কা হয়।

বেলা পড়ে এসেছে তখন। নিয়ম অনুসারে সাতটার মধ্যেই আমাকে সেরোনেরায় ফিরে যেতে হবে। আমরা তাই আর দেরি না করে ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হলাম।

পরদিন আবার বের হলাম বাচ্চাদের দেখতে। সেদিন একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম যাবার পথে। পাহাড়ের কাছাকাছি যেতেই দেখি, বিশাল এক সিংহ একটা ইমপালার মৃতদেহের পাশে মহাসুখে নিদ্রা দিচ্ছেন আর গোটা কয়েক শেয়াল আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছে। ওরা হয়তো প্রসাদ পাবার আশায় এসেছে কিন্তু মহারাজকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

কিন্তু ওদের দিকে নজর দেবার মতো সময় আমাদের ছিলো না। আমরা তাই সোজা চললাম বাচ্চাদের বাসস্থানের দিকে। সেখানে গিয়ে কিন্তু বাচ্চাদের দেখতে পেলাম না। আমরা তখন বিভিন্ন ঝোপঝাড়ের কাছে গিয়ে ওদের খুঁজতে লাগলাম। নাম ধরে ডাকাও হলো অনেকবার। কিন্তু শত চেষ্টাতেও ওদের দেখা পাওয়া গেল না। অবশেষে কিছুটা হতাশ হয়েই আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

পরদিন আবার আমি রওনা হলাম বাচ্চাদের ডেরার দিকে। পাহাড়ের কাছাকাছি হাজির হতেই দেখি, ছটা বুনো কুকুর একযোগে একটা হায়েনার বাচ্চাকে আক্রমণ করেছে। বাচ্চাটার অবস্থা তখন রীতিমতো কাহিল। ছ-ছটা বলবান কুকুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই দেখে বেচারা প্রাণভয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কুকুরদের এই নিষ্ঠুরতা আমাকে বিচলিত করে তুললো! তাড়িয়ে দেবার জন্যে আমি সজোরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম তাদের দিকে। গাড়ি দেখে কুকুরগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো।

এইভাবে হায়েনার বাচ্চাটার প্রাণ রক্ষা করবার পর আমি সোজা গিয়ে হাজির হলাম এল্‌সার বাচ্চাদের ডেরায়। কিন্তু সেদিনও ওদের দেখা পেলাম না।

এই সময় আমি ড্রাইভারের অভাবে খুবই অসুবিধে ভোগ করছিলাম। আমি তাই পার্ক-ওয়ার্ডেনকে অনুরোধ করেছিলাম, সে যদি একজন ড্রাইভার যোগাড় করে দিতে পারে তাহলে খুবই ভালো হয়। সেও বলেছিল যে, ড্রাইভার পেলেই আমাকে খবর দেবে।

সেদিন ক্যাম্পে ফিরে আসতেই শুনলাম, পার্ক-ওয়ার্ডেন খবর পাঠিয়েছে যে, আমার জন্যে সে একজন ড্রাইভার যোগাড় করে রেখেছে। লোকটা নাকি সেরোনেরায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

পরদিন সকালেই আমি সেরোনেরায় গেলাম। ওখানে যেতেই পার্ক-ওয়ার্ডেন সেই ড্রাইভারকে খবর দিয়ে নিয়ে এলো। লোকটা দেখলাম বচনবাগীশ। যা বলি তাতেই রাজী। সে বললে হাল্কা এবং ভারী সব

রকম গাড়িই সে চালাতে পারে। তাছাড়া এখানকার পথ-ঘাটও নাকি তার নখদর্পণে। লোকটার বচনে মুগ্ধ হয়ে তখুনি তাকে নিযুক্ত করে ফেললাম। কথা হলো, আমার সঙ্গেই সে যাবে।

দুপুরের পরেই রওনা হলাম আমরা। সোজা চললাম বাচ্চাদের ডেরা অভিমুখে। রাস্তা ছেড়ে বনের ভেতরে যেতেই ড্রাইভারের কেরামতি মালুম হয়ে গেলো। দেখতে পেলাম, স্টিয়ারিং হুইল ঠিক রাখতে পারছে না সে। বললাম– কি হে ড্রাইভার! তুমি যে বললে, এখানকার পথঘাট তোমার নখদর্পণে ? এখন তো দেখছি বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাতে পারছো না!

লোকটা ভাঙবে তবু মচকাবে না। সে যে একেবারেই আনাড়ী এই কথাটা চাপতে চেষ্টা করলো বচন ঝেড়ে। বললে—বলেন কি মেমসাহেব! আমি গাড়ি চালাতে না পারলে আর কে পারবে? তবে কিনা, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই বলেই হাতটা একটু কাঁপছে। কাল থেকেই দেখতে পাবেন আমার এলেম।

কাল পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই তার এলেমটা জানা হয়ে গেলো আমার। সামনে একটা সিংহ দেখেই ড্রাইভার চিৎকার করে উঠলো—ওই দেখুন, ভীষণ একটা জানোয়ার আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওটা কী জানোয়ার বল দেখি?

ওটা? মানে, ওটা হলো এক ধরনের ভীষণ হিংস্র জানোয়ার। মানুষ দেখলেই ওরা তেড়ে এসে তাকে মেরে ফেলে।

লোকটার কথা শুনে বুঝতে পারলাম, এর আগে ও কোনদিন সিংহ দেখেনি। না দেখুক, সে কথা পরে; কিন্তু এখন দেখছি ও আর এগোতেই চায় না। বিপদ দেখে ওকে পেছনের সীটে সরিয়ে দিয়ে আমি নিজেই স্টিয়ারিং ধরতে বাধ্য হলাম।

বাচ্চাদের ডেরায় গিয়েও একই অবস্থা। ও তখন গাড়ি থেকে নামতেই চাইলো না। কেবলই বলতে লাগলো, ওর শরীরটা মোটেই ভালো নেই। শরীর ভালো আছে কিনা তা আমি বুঝে ফেলেছি আগেই। যাই হোক, আমি তখন নিজেই গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাদের দেখা পেলাম না। আমি তাই বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

ড্রাইভারকে বললাম, সে যদি ইচ্ছে করে তাহলে মুরুর সঙ্গে লরীতে শুতে পারে। তবে সে যদি ল্যাণ্ডরোভারে শুতে চায় তাতেও আমার আপত্তি

নেই। আমার কথার উত্তরে ও জানালো যে, ল্যাণ্ডরোভারেই ও শোবে। আমি তখন নুরুকে ডেকে বললাম, সে যেন ড্রাইভারকে কিছু খেতে দেয়! এবার কিন্তু এলেম দেখালো ড্রাইভার। এইসা খাওয়া শুরু করলো যে, দুজনের খাবার একাই সে সাবাড় করে ফেললো। তার খাওয়ার চোট দেখে আমার একটা প্রবাদবাক্য মনে পড়ে গেলো, 'কামে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে; বাকি্যতে খায় পুড়ে পুড়ে।' কিন্তু কি আর করা যায়; নিয়ে যখন ফেলেছি তখন তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া, লোকটাকে নিযুক্ত করার সময়ই সে এক মাসের বেতন আগাম হিসেবে নিয়েছিলো। টাকাটা অবিশ্যি নিয়েছিলো নানান অভাব-অভিযোগের কথা বলে। এখন বুঝতে পারছি, টাকাটা ও ইচ্ছে করেই আগাম নিয়েছে।

যাই হোক, ড্রাইভারের কথা বাদ দিয়ে এবার আসল কথা বলি। আসল কথা মানেই বাচ্চাদের কথা। আমি রোজই ওদের খোঁজে সকালে বের হই আর সন্ধ্যার সময় ফিরে আসি। বেরোবার সময় মনে আশা নিয়ে বের হই, কিন্তু ফিরে আসি একেবারেই হতাশ হয়ে। দিনের বেলা ওদের দেখাই পাইনে।

এই সময় একদিন ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি আসতেই আমি তাঁর কাছে আবেদন জানালাম যে, তিনি যদি দয়া করে অন্ততঃ সাতটা দিন আমাকে আর জর্জকে বাচ্চাদের ডেরায় রাত্রে থাকার অনুমতি দেন, তাহলে খুবই ভালো হয়। বাচ্চারা যে দিনের-বেলায় দেখা দিচ্ছে না এ কথাটাও তাঁকে জানাতে ভুললাম না।

আমার কথা শুনে অধিকর্তা বললেন, রাত্রে বাইরে থাকার অনুমতি তিনি দিতে পারেন না। এ অনুমতি দিতে পারেন একমাত্র চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্টি বোর্ড। তিনি আরো বললেন যে, এ ব্যাপারে আমি যদি বোর্ডের কাছে একটা দরখাস্ত করি তাহলে সে দরখাস্ত তিনি বোর্ডের আগামী মিটিংয়ে পেশ করবেন।

'গতিরন্যথা' দেখে আমি তখুনি একখানা দরখাস্ত নিয়ে তাঁর হাতে দিলাম।

কয়েকদিন পরেই একজন ওয়ার্ডেন এসে আমাকে বলে গেলো, আমার দরখাস্তের ব্যাপারে অধিকর্তা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। কথাটা শুনে আমার মনে হলো যে, ট্রাস্টি বোর্ড হয়তো কিছু শর্তসাপেক্ষে আমার প্রার্থনাটা মঞ্জুর করেছেন এবং সেই জন্যেই অধিকর্তা মশাই আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। এই কথা মনে হতেই আমি আর দেরি না করে পরদিন সকালেই আরুশা রওনা হয়ে গেলাম। যাবার পথে সেরোনেরায় গিয়ে সেখান

থেকে জর্জকে একটা টেলিগ্রাম করলাম অবিলম্বে চলে আসার জন্যে।
আরুশায় হাজির হতেই ড্রাইভার ভায়া কেটে পড়লো। আমি তাতে মোটেই দুঃখিত হলাম না। বরং ও যে আমার স্কন্ধ থেকে নেমেছে এতে আমি খুশীই হলাম।

সে রাতটা আরুশায় থেকে পরদিন বেলা এগারটায় অধিকর্তার অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে দেখে তিনি খুশী হয়ে বললেন, আসুন মিসেস্ অ্যাডামসন। আপনার দরখাস্তখানা বোর্ডের সভায় পেশ করেছিলাম।
আমার প্রার্থনাটা মঞ্জুর হয়েছে কি ?

তা হয়েছে, তবে বোর্ড এ ব্যাপারে কিছু কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। আপনি যদি ওই সব শর্ত মেনে নিতে রাজী থাকেন তাহলে সাতটা দিন আপনাকে বাচ্চাদের ডেরায় রাত্রিবাস করতে দেওয়া হবে।

বলে আমার দরখাস্তখানা বের করলেন তিনি। যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছিলো সেগুলো সবই লেখা হয়েছিলো দরখাস্তের ওপরে। অধিকর্তা তখন শর্তগুলো পড়ে শোনালেন আমাকে।

শর্তগুলো এই রকম ঃ

(১) যে অঞ্চলে আমরা বাচ্চাদের খোঁজ করতে চাই সেখানে খাঁচাগুলোকে নিয়ে যেতে হবে।

(২) বাচ্চাদের খোঁজ পাওয়া গেলে আমাদের স্থির করতে হবে যে, তাদের এখানে রাখা হবে, না অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে।

(৩) আমরা যদি তাদের সরিয়ে নিতে না চাই তাহলে অবিলম্বে আমাদের পার্ক থেকে চলে যেতে হবে।

(৪) আমরা যদি বাচ্চাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে চাই তাহলে পার্ক-ওয়ার্ডেনের মারফত সে কথা অবিলম্বে অধিকর্তাকে জানিয়ে দিতে হবে।

(৫) পার্ক-ওয়ার্ডেনের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমরা কোন পশু হনন করতে পারবো না।

(৬) যে সাতদিন আমরা সেরেঙ্গেটি অঞ্চলে থাকবো সে ক'দিন প্রত্যহ আমাদের গতিবিধি এবং কাজের অগ্রগতির কথা পার্ক-ওয়ার্ডেনকে জানিয়ে দিতে হবে। রোজ জানানো সম্ভব না হলে একদিন পর একদিন জানাতে হবে।

শর্তগুলো শোনবার পর আমি বললাম, আমার সঙ্গে জর্জ থাকলে ভাল হয়। তাকে আমার সঙ্গে থাকতে দেবেন কি ?

তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আপনি ইচ্ছে করলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে পারেন। যাই হোক, আপনারা কি আমাদের শর্তগুলো মেনে নিতে রাজী আছেন ? রাজী না থাকলে অনুমতি দেওয়া সম্ভব হবে না।

নিশ্চয়ই রাজী আছি। তবে একটা কথা।

কি ?

তল্লাসীর কাজ শুরু হবে জর্জ আসবার পরদিন থেকে। আমি আজই তাকে এখানে চলে আসবার জন্যে টেলিগ্রাম করছি। আমার মনে হয় চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই সে এসে পড়বে।

বেশ, তাই হবে। আপনি তাহলে শর্তগুলোর নিচে লিখে দিন যে শর্তগুলো মানতে আপনি রাজী আছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলাম সে কথা।

অধিকর্তা তখন দরখাস্তখানা তাঁর ড্রয়ারে রেখে বললেন, অনুমতিপত্র দু-এক-দিনের মধ্যেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনি ইতিমধ্যে যা যা করা দরকার, করবেন।

অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেলা প্রায় একটা হয়ে গেলো। তিনি তখন আমাকে তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমিও সানন্দে গ্রহণ করলাম তাঁর আমন্ত্রণ।

লাঞ্চের পরে আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে অবশেষে বেলা প্রায় তিনটের সময় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বিদায় তো নিলাম। এখন এতটা পথ যাই কি করে ? বচনবাগীশ ড্রাইভার আর যাই হোক সড়কপথে ভালোভাবেই গাড়ি চালাতে পারতো। কিন্তু সে সট্‌কে পড়ায় আমি খুবই অসুবিধেয় পড়ে গেলাম। আমার পায়ের অবস্থা-তখনও খুব ভালো নয়। গাড়ি চালাতে হলে ক্লাচ এবং ব্রেক চাপতে পা ব্যবহার না করলে চলে না। আমি তাই নতুন কোনো ড্রাইভার পাওয়া যেতে পারে কিনা তার খোঁজ নিতে ওখানকার একটা গ্যারাজে গিয়ে হাজির হলাম। গ্যারাজের মালিক বললে, আমি যদি তিন-চারদিন অপেক্ষা করতে পারি তাহলে সে হয়তো একজন ড্রাইভার সংগ্রহ করে দিতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে তখন একটা দিনও দেরি করা সম্ভব নয়। কারণ জর্জ এসে পড়লেই আমাকে বাচ্চাদের সন্ধানে বেরোতে হবে। আমি তাই ড্রাইভারের আশা ত্যাগ করে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে।

সেরোনেরায় পৌঁছে আর এগোনো সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। আমার বাঁ পা তখন ভীষণভাবে টনটন করছে। আমি তাই রাতটা ওখানকার টুরিস্ট লজে কাটিয়ে পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলাম। ক্যাম্পে যেতেই দেখি জর্জ এসে গেছে। ওকে পেয়ে খুবই খুশী হলাম আমি। জর্জও খুশী হয়েছে আমার এখানে আসতে পেরে। এরপর আমি যখন সব কথা খুলে বললাম তাকে, ও তখন আরও খুশী হলো। ও বললে যে আগামী

কাল সকালেই ক্যাম্প তুলে দিয়ে আমরা বাচ্চাদের বাসস্থানে চলে যাবো। আমিও সায় দিলাম তাতে।

রাত প্রায় তুটোর সময় প্রধান পার্ক-ওয়ার্ডেন এসে হাজির হলো আমাদের কাছে। সে যা বললে তার মর্মকথা হলো, রাত প্রায় এগারটার সময় একটি সিংহ টুরিস্টদের একটা তাঁবুতে ঢুকে একজন আদিবাসী সহকারীকে ভীষণভাবে জখম করেছে। লোকটাকে ভোর বেলায় প্লেনে করে নাইরোবিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যে। আমাদের কাছে আসার কারণ হলো আমাদের কাছে মরফিয়া আছে কিনা জানতে, এবং থাকলে একটা বা তুটো অ্যাম্পুল আমাদের কাছ থেকে নিতে।
ভাগ্যক্রমে জর্জ সেদিন মরফিয়ার কয়েকটা অ্যাম্পুল নিয়ে এসেছিলো। তা থেকে তুটো অ্যাম্পুল ওয়ার্ডেনকে দিয়ে দিলাম আমরা। এ ছাড়া কিছুটা সালফোনামাইডও দিলাম।
ওষুধগুলো পেয়ে ওয়ার্ডেন আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। তবে যাবার সময় আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলো যে, আমরা যেন চারদিকে আলো জ্বেলে রাখি।
ওয়ার্ডেন চলে যেতেই আমরা চারটি ল্যাম্প নিয়ে আমাদের চারপাশে রেখে দিলাম। বাকি রাতটা জেগেই কাটালাম আমরা।

ভোর হতেই আমরা অকুস্থলে গিয়ে হাজির হলাম। অকুস্থল মানে টুরিস্টদের সেই ক্যাম্পটা, যেখানে সিংহ ঢুকে একজন লোককে গতরাত্রে আহত করেছিলো। আমাদের তাঁবু থেকে টুরিস্টদের সেই ক্যাম্পটার দূরত্ব ছিলো তিনশো গজের মতো। ওখানে আমাদের যাবার উদ্দেশ্য হলো, আহত লোকটির বন্ধু-বান্ধবরা আরও কোনো রকম সাহায্য চান কিনা তা জানতে। ওখানে গিয়ে গতরাত্রের ঘটনা সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে আমরা আরও জানতে পারলাম, তুটো সিংহ নাকি আমাদের তাঁবুর দিক থেকে এসে আর একটা ক্যাম্পের দিকে চলে গিয়েছে। আরও শুনলাম, ওই সিংহ তুটির মধ্যে একটির আকার খুব বড়। বড় সিংহটা ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে একটা এনামেলের জগকে কামড়ে কামড়ে একেবারে তুবড়ে ফেলেছে। এ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওর চোয়ালের জোর অসাধারণ। ক্যাম্পে তখন শুধু পাঁচজন লোক ছিলো। ওই ক্যাম্পের কাছেই আর একটা ছোট আকারের তাঁবু ছিলো। সেখানে বাস করছিলেন এক দম্পতি। রাতের বেলায় তাঁবুর পর্দাগুলো ভালোভাবে এঁটে বেঁধে ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন। আশেপাশে কি হচ্ছে না

হচ্ছে তা তাঁরা জানতেই পারেননি। রাতের বেলায় বেশ গরম পড়েছিলো বলে ক্যাম্পের লোকেরা মশারী না খাটিয়েই শুয়ে পড়েছিলো। খাটিয়াগুলো সারিবদ্ধভাবে পেতে নিয়েছিলো। দরজার দিকে মাথা করে শুয়েছিলো ওরা। একজন আবার একটা বেসিন-সেট রেখেছিলো তার মাথার কাছে। ওর পরেই যে লোকটা শুয়েছিলো সে আত্মরক্ষার জন্যে খাটিয়ার পাশে রেখেছিলো একটি ডাণ্ডা। কিন্তু তৃতীয় লোকটির কাছে কিছুই ছিলো না।

গভীর রাত্রে মাঝের খাটিয়ার লোকটা কি একটা আওয়াজ শুনে জেগে ওঠে। উঠেই দেখতে পায়, তার পাশের খাটিয়াটা খালি পড়ে আছে। বিছানাপত্রও লণ্ডভণ্ড। সে তখন তার বালিশের নিচে থেকে টর্চলাইট বের করে জ্বেলে ফেলে। আলো জ্বলতেই সে দেখতে পায়, পনের গজ দূরে বিশাল এক সিংহ দাঁড়িয়ে আছে এবং তার বিরাট বদনের ভেতরে রয়েছে তার হতভাগ্য বন্ধুর মস্তকটি।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সে ভয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়। তার চিৎকার শুনে ক্যাম্পের লোকেরা জেগে ওঠে। ক্যাম্পের দুজন আফ্রিকান চাকর ছোরা হাতে করে সিংহটার দিকে তেড়ে যায়। একজন তার হাতের ছোরাটা সিংহকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। ছোরার আঘাতে সিংহটা হয়তো আহত হয়েছিলো। সে তাই মুখের শিকারকে ছেড়ে ওখান থেকে সরে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে আহত লোকটিকে সরিয়ে নেওয়া হলো। এদিকে সিংহমশাই কিন্তু তখনও ওখান থেকে বিদায় নেননি। শিকার মুখছাড়া হওয়ায় তিনি ক্যাম্পের চারপাশে চক্রাকারে টহল দিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা মোটর গাড়িকে ক্যাম্পের দিকে আসতে দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ওখান থেকে বিদায় নেন।

টুরিস্টদের ভেতরে একজন ইয়োরোপীয় ড্রেসার ছিলো। সে এসে আহত লোকটাকে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো। এরপর পার্ক-ওয়ার্ডেনরা ধরাধরি করে লোকটাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। শুনতে পেলাম, লোকটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাইরোবিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সেরেঙ্গেটি এলাকায় এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটলো।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কয়েকটা গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। ব্যাপার কি জানবার জন্যে আমরা প্রধান ওয়ার্ডেনের বাংলোয় গিয়ে হাজির হলাম। বাংলোর সামনে তখন তিন-চারজন লোক উত্তেজিতভাবে কথা বলছিলো। আমরা প্রধান ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করে উত্তেজনার কারণটা জানতে চাইলাম। সে বললে, কিছুক্ষণ আগে ওয়ার্ডেনরা দুটো সিংহকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। নিহত সিংহদের মধ্যে একটার দেহে ছোরার আঘাতের চিহ্ন

দেখে বুঝতে পারা গেছে ওই সিংহটাই গতরাত্রে টুরিস্টদের ক্যাম্পে ঢুকে সেখানকার একজন লোককে আক্রমণ করেছিলো। প্রধান ওয়ার্ডেন আরও বললো, সিংহটার ঘাড়ের পাশেও একটা গভীর ক্ষত দেখতে পাওয়া গেছে। ঘাটা বিষাক্ত হয়ে তা থেকে পুঁজ পড়তেও দেখা গেছে।
এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ঘাড়ের ক্ষতটার জন্যে শিকার করতে পারছিলো না বলেই সিংহটা ক্যাম্পে ঢুকে ঘুমন্ত মানুষকে আক্রমণ করেছিলো। পেটের দায়েই এ কাজটা সে করেছে। কিন্তু পেটের দায়েই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, সেরেঙ্গেটি এলাকায় এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটলো।

বাচ্চাদের দেখা মিললো

জর্জ এসেছে দশদিনের ছুটি নিয়ে। শুনলাম, ওর ইস্তফা-পত্র এখনও গৃহীত হয়নি। কর্তৃপক্ষ বলেছেন, নতুন লোক ঠিক না হওয়া অবধি ওকেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এতে অবিশ্যি সুবিধেই হয়েছে কিছুটা। কমপক্ষে আরও তিন মাসের বেতন ওর পাওনা হবে। কিন্তু এটা তো ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানের কথা হলো, দশদিন ছুটির মধ্যে একটা দিন কেটে গেছে এখানে আসতেই। আজকের দিনটাও তোড়জোড় করতেই কেটে যাবে। অর্থাৎ আগামীকাল সকাল থেকেই কাজ শুরু করতে হবে আমাদের।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই গোছগাছ করতে লেগে গেলাম। আমার ছোট তাঁবুটা গুটিয়ে ফেলা হলো। ওটাকে তুলে দেওয়া হলো আমার গাড়ির ছাদে। অন্যান্য জিনিসপত্রও বাঁধা-ছাঁদা করে গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো। কিছু রাখা হলো দুই গাড়ির ছাদে, আর কিছু রাখা হলো গাড়ির ভেতরে।
জিনিসপত্র গোছগাছ করতেই বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেলো। এরপর নুরুকে রান্না করতে বলে আমরা বসলাম পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। ঠিক এই সময়ই ন্যাশনাল পার্কের অধিকর্তা এসে হাজির হলেন আমাদের কাছে। তিনি এসেছিলেন গতরাত্রের সেই আহত লোকটার খবর নিতে। ফেরার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।
ওঁকে কাছে পেয়ে আবার আমি জেসপার অপারেশনের কথাটা তুললাম। বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম অপারেশনের সুযোগ দেবার জন্যে। কিন্তু

কিছুতেই কিছু হলো না। অপারেশনের সুযোগ দিতে রাজী হলেন না তিনি। তবে সরাসরি নাকচও করলেন না আমাদের প্রস্তাব। তিনি বললেন চেয়ারম্যানের অমতে ওবিষয়ে তিনি কিছু করতে পারেন না। তবে আমরা যদি ইচ্ছে করি তাহলে ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে আর একবার আবেদন করতে পারি।

অধিকর্তা বিদায় নিলেন প্রায় একটার সময়। ফলে আমাদের যাত্রা করতে একটু দেরি হয়ে গেলো। ভেবেছিলাম, দুপুরের আগেই রওনা হবো, কিন্তু তা আর হলো না। বেরোতে বেরোতে বিকেল হয়ে গেলো। এরপর বাচ্চাদের বাসভূমিতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আমরা তখন সুবিধেমতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে তাঁবুটা খাটিয়ে ফেললাম। কথা হলো আমি আর জর্জ আমাদের নিজ নিজ গাড়িতে থাকবো আর নুরু থাকবে তাঁবুতে।

অন্ধকার একটু ঘন হতেই গাড়ির হেড লাইট জ্বেলে দিলাম। হেড লাইটের আলো দেখে যাতে বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমরা ওখানে এসেছি, সেই উদ্দেশেই এটা করা হলো। কিন্তু বাচ্চাদের বদলে যিনি রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন তিনি হলেন সুবিশাল এক কেশরী। হেলতে-দুলতে এগিয়ে আসছিলেন তিনি। হঠাৎ দুখানা গাড়ির চার-চারটে হেড লাইট জ্বলে উঠতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবখানা এই যে, ও দুটো আবার কোন্ জানোয়ার।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে গাড়ি দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দাঁত বের করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন সিংহরাজ। তারপর যেদিক থেকে এসেছিলেন সেই দিকেই পশ্চাদপসরণ করলেন।

সিংহ মহারাজ প্রস্থান করতেই আমরা বাচ্চাদের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করলাম। কিন্তু অনেকবার ডেকেও তাদের সাড়াশব্দ পেলাম না। অবশেষে টিনের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমার গাড়িতেই রওনা হলাম দুজনে। পাহাড়ের ধার দিয়ে অনেকটা এগিয়ে যাবার পর অবশেষে আমরা একটা গিরিবর্ত্মের মুখে এসে হাজির হলাম। এর আগে আর কোনোদিন এখানে আসিনি। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে যে এই রকম একটা গিরিবর্ত্ম আছে তা আমরা জানতামই না। গিরিবর্ত্মটা দেখে আমার কেন যেন মনে হলো বাচ্চারা হয়তো ওখানেই ডেরা বেঁধেছে। জর্জও সেই কথাই বললো। আমরা তাই আর দেরি না করে ঢুকে পড়লাম সেই গিরিবর্ত্মের ভেতরে।

ওখানে গাড়ি চালাতে রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছিলো আমাদের। চারদিকেই কেবল লতাগুল্ম আর ঝোপঝাড়। কাঁটাগাছও অনেক। তবুও আমরা এগিয়ে চললাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হলো না গাড়ি চালানো। আমরা তখন গাড়ি থেকে নেমে পায়দলেই এগিয়ে চললাম সেই কাঁটা-বন ভেঙে। কাঁটার আঘাতে দুজনেরই হাত-পা ছড়ে যেতে লাগলো। তবুও আমরা এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে জর্জ বললো, জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে, বাচ্চারা এখানেই এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওধারের উপত্যকায় অচেনা সিংহদের আনাগোনা দেখেই হয়তো ওরা এই নিরাপদ জায়গাটি বেছে নিয়েছে।

তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। কিন্তু আমরা কি আরও এগোবো?

হ্যাঁ, সামনের ডানদিকের ওই ঘন জঙ্গলটা একবার দেখতে হবে।

বেশ, তাহলে চলো।

এই কথা বলেই এগিয়ে চললো সামনের দিকে। আমিও নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম তাকে।

ঝোপটার পাশে হাজির হতেই জর্জ আমার দিকে ফিরে নিঃশব্দে আমার কাঁধে হাত দিলো। তারপর আঙুল দিয়ে বাঁ দিকের পাহাড়ের চূড়াটা দেখিয়ে বললো, দেখো তো, ওরা কারা?

সেদিকে তাকাতেই খুশীতে মনটা ভরে উঠলো আমার। ওই তো আমার হারানিধিরা! তিন ভাই-বোনে দিব্যি আরামে শুয়ে আছে পাহাড়ের ওপরে। ওদের দেখতে পেয়েই আমি ওদের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। জেসপা! গোপা! ছোট!

আমার ডাক শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো ওরা। তারপর পায়ে পায়ে নেমে আসতে লাগলো নিচের দিকে। সবার আগে জেসপা তারপর গোপা এবং সবার পেছনে ছোট এল্‌সা।

জেসপা নেমে এসেই ছুটে এলো আমার কাছে। আমি ওকে আদর করলাম গায়ে হাত বুলিয়ে। আমার কাছ থেকে আদর পেয়ে মুখ দিয়ে গর্‌গর্‌ শব্দ করে আমাকে অভিনন্দন জানালো। এল্‌সাও ঠিক এইভাবেই আমাকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করতো। কিন্তু গোপা আর ছোটটা কোথায় গেলো! ওদের তো দেখতে পাচ্ছি না! এদিক ওদিক তাকাতেই দেখি ওরা দুটিতে পাশের ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁদার আদর খাওয়া লক্ষ্য করছে। ওদের ওইভাবে তাকাতে দেখে আমি ওদের ডাকলাম—গোপা, ছোট, বেরিয়ে এসো।

আমার ডাক শুনে বেরিয়ে এলো ওরা। কিন্তু বেরিয়ে এলেও কাছে এলো না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগলো। এই সময় আমি ওদের শরীরের দিকে লক্ষ্য করলাম। না, চিন্তার কিছু নেই। ওদের শরীর বেশ ভালই আছে দেখলাম। ওরা হয়তো স্বাধীনভাবে শিকার করতে শিখে গেছে ইতিমধ্যে। জেসপার গায়ে তীরের ফলাটা কিন্তু আগের মতোই বিঁধে আছে। আমি চেষ্টা করলাম ওটাকে তুলে ফেলতে। আমার মতলব বুঝতে পেরে জেসপা পেছিয়ে গেলো।

ওদের দেখে কী যে খুশী হলাম আমরা, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে একটু দুঃখও হলো ওদের খেতে দিতে না পেরে। অধিকর্তার নিষেধাজ্ঞার জন্যে মাংস আনতে পারিনি আমরা।

এই সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম জর্জ কডলিভার তেলের টিন আর তিনখানা ডিস হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম, আমি যখন জেসপাকে আদর করছিলাম সেই ফাঁকে ও চলে গিয়েছিলো গাড়ি থেকে খাবার আনতে। এ ব্যাপারে জর্জ খুবই বাস্তববাদী। সে জানে যে, শুকনো আদরে খুশী হবে না বাচ্চারা; সঙ্গে কিছু খাবারও দিতে হবে।

জর্জ ওদের সবাইকে কডলিভার তেল পরিবেশন করলো। ওরাও খুশী হয়ে খেতে লাগলো ওদের সেই প্রিয় খাবার।

খাওয়া শেষ হলে ওরা আবার সেই ঝোপটার ভেতরে ঢুকে গেলো। আমরাও ফিরে চললাম তাঁবুর দিকে।

সন্ধ্যার একটু পরেই বাচ্চারা হাজির হলো আমাদের কাছে। ওরা হয়তো ভেবেছে, আগের মতো এবারেও ওদের জন্যে মাংস নিয়ে এসেছি আমরা। কিন্তু ওরা যখন দেখলো যে মাংসের বদলে শুধু কডলিভার তেল খেতে দিলাম, তখন ওরা মনে মনে একটু দুঃখিতই হলো।

জেসপা একটা কাণ্ড করে বসলো এই সময়। হঠাৎ সে আমার গাড়িটার কাছে ছুটে গিয়ে এক লাফে ছাদে উঠে পড়লো। ওর হয়তো ধারণা হয়েছিলো যে, ওদের খাবার আমরা গাড়ির ছাদে লুকিয়ে রেখেছি। ছাদে উঠে তাই ও জিনিসপত্রগুলো লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করে দিলো। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে কয়েকটা খালি বোতল রাখা হয়েছিলো। বাক্সটাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিলো জেসপা। এর ফলে বোতলগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

ব্যাপার দেখে জর্জ তাড়াতাড়ি একটা ডিসে কডলিভার তেল ঢেলে আমার

হাতে দিয়ে বললো, তুমি ওকে ডেকে নিচে নামিয়ে কডলিভার তেলটা খেতে দাও, নইলে সব জিনিস ভেঙেচুরে নষ্ট করে ফেলবে ও।

আমি তখন ডিসটা হাতে নিয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে জেসপাকে ডাকতে লাগলাম। আমার হাতে কডলিভার তেলের ডিস দেখে জেসপা এক লাফে নিচে নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ডিসটা নামিয়ে দিলাম ওর মুখের সামনে। আধ মিনিটের মধ্যেই তেলটা সাবাড় করে ফেললো জেসপা।

ওদিকে গোপা আর ছোট এল্‌সা তখন খেলতে শুরু করেছে। খাওয়া শেষ হলে জেসপাও ওদের কাছে গিয়ে খেলায় যোগ দিলো।

সে রাতটা বাচ্চাবা আমাদের কাছেই থাকলো। কিন্তু ভোর হবার আগেই ওরা সরে পড়লো ওখান থেকে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জর্জ সেরোনেরার দিকে রওনা হলো। যাবার সময় বলে গেলো বাচ্চাদের জন্যে মাংসর যোগাড়ে যাচ্ছে সে।

জর্জ চলে যেতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম বাচ্চাদের খোঁজে। নুরুকেও সঙ্গে নিলাম। গতকাল যেখানে ওদের দেখা পেয়েছিলাম সেখানেই আগে গেলাম। কিন্তু আজ আর সেখানে ওদের দেখা পেলাম না। এরপর আরও অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু কোথাও ওদের দেখা মিললো না। আমরা তখন বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

বিকেলের দিকে আমি যখন চা খেতে বসেছি সেই সময় একপাল টমিকে ছুটে আসতে দেখলাম গিরিবর্ত্মের ভেতরে। মনে হলো কেউ ওদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই-ই। এল্‌সার বাচ্চারাই ওদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে দেখলাম। ওরা এমনভাবে টমিগুলোকে তাড়া করছে যে, বেচারারা প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে শুরু করেছে। কিন্তু বাচ্চাদের চালচলন দেখে মনে হলো, টমিদের সঙ্গে ওরা 'চোর-পুলিস' খেলছে। টমিরা চোর আর বাচ্চারা পুলিস। চোরেরা পালাবার চেষ্টা করছে আর পুলিসরা তাদের ধরতে চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে খেলা করার পরে চোর এবং পুলিস উভয় দলই বেরিয়ে গেলো গিরিবর্ত্ম থেকে।

জর্জ ফিরে এলো সন্ধ্যার দিকে। মাংস আনতে পারেনি সে। প্রধান ওয়ার্ডেন অফিসে না থাকাতেই মাংস যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। অধিকর্তা আমাদের পশু শিকার করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন

দরকার হলে পার্ক-ওয়ার্ডেনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে ছাগল বা ভেড়া কিনে আনতে হবে। নিজে থেকে কিছু করতে বিশেষভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন তিনি। পার্ক-ওয়ার্ডেন ফিরে আসে বিকেলের দিকে। তখন আর গ্রামে যাবার সময় ছিলো না। এবং এই কারণেই মাংস যোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

সন্ধ্যার একটু পরেই বাচ্চারা ফিরে এলো। মাংস পাবার আশাতেই ওরা সকাল সকাল এসেছে। কিন্তু আজও ওদের নিরাশ হতে হলো। মাংসের বদলে কডলিভার তেল পেয়ে ওরা মোটেই খুশী হতে পারলো না। কিন্তু কি আর করা যাবে! দেখা যাক, আগামীকাল কতটা কি করতে পারি।

রাতটা আমাদের কাছেই রইলো বাচ্চারা। তারপর যথারীতি ভোরের দিকে বেরিয়ে গেলো।

পরদিন সকালেই জর্জ আবার বেরিয়ে পড়লো মাংসের যোগাড়ে। যাবার সময় বলে গেলো, আজ যেমন করেই হোক মাংস নিয়ে আসবে সে। দরকার হলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই পশু শিকার করবে।

জর্জ চলে যাবার পর আমি চিঠি লিখতে বসলাম। অনেকগুলো দরকারী চিঠি লেখবার ছিলো। নুরু লেগে গেলো রান্নার কাজে। দুপুরের একটু পরেই লাঞ্চ খাওয়া শেষ করলাম। এবার কি করা যায়! আবার বের হবো কি ওদের খোঁজে? না, শুধ্ হাতে ওদের কাছে যাবো না। আমি তাই জর্জের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

জর্জ ফিরে এলো ছটার সময়। একটা ছাগল আর একটা ভেড়া নিয়ে এসেছে সে। ভেড়ার মাংসটা ছাদের ওপরে রেখে দিয়েছে আগামী-কালের জন্যে।

আজও সন্ধ্যার পরেই বাচ্চারা এলো। সঙ্গে সঙ্গে জর্জ ওদের সামনে ছাগলের মাংস ধরে দিলো। মাংস পেয়ে বাচ্চারা মহা খুশী। মনের আনন্দে ভোজন শুরু করলো তিন ভাই বোনে।

ওদের যখন খাওয়া চলেছে, আমরাও তখন খেতে বসেছি। জর্জের গাড়ির ভেতরেই খেতে বসেছি দুজনে। পরিবেশন করছে নুরু। হঠাৎ গাড়িটা ভীষণভাবে দুলে উঠলো। কি ব্যাপার দেখতে গাড়ি থেকে বাইরে আসতেই দেখি শ্রীমান জেসপা ছাদে উঠে ভেড়ার মাংসটা খেতে শুরু করেছে। তার দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বললাম, একি হচ্ছে জেসপা! ওটা যে আগামীকালের জন্যে রাখা হয়েছে! কিন্তু কে কার কথা শোনে। জেসপা তখন ভেড়ার দেহটা মুখে তুলে এক লাফে নিচে নেমে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে গোপা এগিয়ে গেলো তার কাছে। জেসপা রেগে গেলো তাকে দেখে। দাঁত বের করে গোঁ গোঁ করে উঠলো। ভাবখানা এই যে, এ মাংসের ভাগ তুমি পাবে না। এটা একান্তভাবেই আমার। গোপাও ছাড়ার পাত্র নয়। সেও দাঁত বের করে মৃদু গর্জনে বুঝিয়ে দিলো যে, একা খাওয়া চলবে না।

প্রায় মিনিট দশেক ধরে দুই ভাইয়ের রেষারেষি চললো। জেসপা মাংসে মুখ দিলে গোপা তেড়ে ওঠে, আবার গোপা এগোলে জেসপা তেড়ে ওঠে। ছোট এল্‌সা কিন্তু এ সব ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে নেই। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাদাদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছে তখন।

ঝগড়াটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। দুজনেই হয়তো বুঝতে পারলো, ঝগড়া করলে কারোরই কোন লাভ হবে না। তাই ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে দুজনেই ভক্ষণে লেগে গেলো।

ছোট এল্‌সা এতক্ষণ এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। সে তাই আর দেরি না করে এগিয়ে এলো তার ভাগ বুঝে নিতে।

সবটা মাংস খেতে পারলো না ওরা। কিংবা এমনও হতে পারে যে বাকি মাংসটা ওরা পরের দিনের জন্যে রেখে দিলো।

মাংসের কাছ থেকে ওরা সবে যেতেই জর্জ দড়ি দিয়ে মাংসটা বেঁধে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলো। পেট ভরতি থাকায় বাচ্চারাও বিশেষ আপত্তি জানালো না এতে।

এরপর বাকি রাতটা খেলাধুলো করে ভোর হবার আগেই চলে গেলো ওরা।

দুপুরের দিকে হঠাৎ শকুন উড়তে দেখলাম আকাশে। শকুনগুলো যে জায়গাটার ওপরে উড়ছিলো সেখানটা আমাদের ক্যাম্প থেকে বেশী দূরে ছিলো না; তাই ব্যাপার কি দেখবার জন্যে আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম সেই জায়গাটা লক্ষ্য করতে করতে। বেশিদূর যেতে হলো না। সিকি মাইলটা যেতেই দেখলাম একটা অর্ধভুক্ত হরিণের মৃতদেহের পাশে বাচ্চারা মনের আনন্দে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে। হরিণটাকে কে শিকার করেছে তা বোঝা গেলো না। তবে বাচ্চারা যে ওটাকে শিকার করেনি এতে কোনই ভুল নেই। ওরা যদি হরিণটাকে শিকার করতো তাহলে আমরা তা নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। আমার তাই মনে হলো, ওরা হয়তো চোরের ওপর বাটপারি করে নিয়ে এসেছে হরিণটাকে। হয়তো ওটাকে শিকার করেছে আমাদের পূর্বদৃষ্ট সেই সিংহটা এবং তার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে তিন ভাই বোনে এই অপকর্মটি করেছে।

যাই হোক, আমরা আর ওদের ঘুমের ব্যাঘাত করলাম না। যেমন এসেছিলাম তেমনি চুপিচুপি সরে গেলাম ওখান থেকে।

সন্ধ্যার দিকে আবার আমরা বাচ্চাদের কাছে গেলাম। আসতেই দেখি, ওখানে সামান্য কিছু হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু নেই। এর মানে হলো, বাচ্চারা ইতিমধ্যেই হরিণটাকে সাবড়ে দিয়েছে। তা না হয় হলো, কিন্তু ওরা গেলো কোথায়?

হঠাৎ শুনি, পাশের ঝোপের ভেতরে কারা যেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। শব্দ শুনেই বুঝতে পারলাম, বাচ্চারা ওই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, আমরা ওদের টিকিটিও দেখতে পাচ্ছি না। অত ছোট একটা ঝোপের মধ্যে ওরা কিভাবে বেপাত্তা হয়ে আছে তা আমরা বুঝতেই পারলাম না। যাই হোক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো যে, ওদের পেটে আর খিদে নেই। আমরা তাই আর দেরি না করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

অন্ধকার একটু ঘন হয়ে এলে বাচ্চারা এসে হাজির হলো আমাদের কাছে। এসেই ওরা এগিয়ে চললো জলের বালতির দিকে। ওরা জানে যে ওদের জন্যে আমরা জল সংগ্রহ করে রাখি। কোথায় এবং কিসে রাখি তাও ওরা জানে। জল পান করার পরেই জেসপা হঠাৎ আমার গাড়ির ছাদে লাফিয়ে উঠে পড়লো। ও হয়তো ভেবেছে ওখানে মাংস আছে। ওকে ছাদে উঠতে দেখে জর্জ এগিয়ে এসে গাছে ঝোলানো মাংসটা নিচে নামিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে গোপা আর ছোট এলসা এগিয়ে এসে খেতে শুরু করলো সেই মাংস। জেসপা কিন্তু তখনও গাড়ির ছাদে। সে তখন ছাদের ওপরের জিনিসপত্রগুলো তছনছ করতে শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ তার নজর পড়লো, গোপা আর ছোট এলসা গাছের নিচে মাংস খেতে শুরু করেছে। ওদের খেতে দেখে সে এক লাফে নিচে নেমে এসে ওদের সঙ্গে ডিনারে যোগ দিল। মিনিট পনেরর মধ্যেই মাংসটাকে শেষ করে ফেললো ওরা। এরপর ঘণ্টা তিনেক খেলাধুলো করে রাত প্রায় এগারটার সময় ওরা সরে পড়লো ওখান থেকে। ওদের সঙ্গে সেই আমাদের শেষ দেখা। এর পর থেকেই আর ওদের খোঁজ পেলাম না আমরা।

সাতদিন শেষ হয়ে গেছে। আগামীকালই বাচ্চাদের কাছে থাকার শেষ দিন। কিন্তু সেদিন বাচ্চাদের দেখাই পাওয়া গেলো না। সন্ধ্যার পরেও ওরা এলো না। ওদের না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেলো আবার। কালই আমরা চলে যাবো। তবে কি যাবার আগে আর আমরা ওদের দেখতে পাবো না! এখন তাহলে কি করা যায়! ওরা যদি নিজেরা না আসে তাহলে কোথায় ওদের

খোঁজ করবো ? দিনের বেলা হলে হয়তো ওদের খোঁজ করা সম্ভব হতো, কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওদের খোঁজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা তাই বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়লাম শেষ পর্যন্ত।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ওদের খোঁজ করতে বের হলাম। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও ওদের দেখা পেলাম না। এদিকে আর আমাদের দেরি করার উপায় নেই। আজ দুপুরেই সেরোনেরায় ফিরে যেতে হবে আমাদের। আমরা তাই ক্যাম্পে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি তাঁবু গুটিয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শুরু করে দিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই বাঁধাছাঁদার কাজ শেষ হয়ে গেলো। তারপর জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে তুলে ওখান থেকে বিদায় নিলাম আমরা। সেরোনেরায় পৌঁছে পার্ক-ওয়ার্ডেনের কাছে খবর পেলাম, অধিকর্তা নাকি আমাদের খোঁজ করছিলেন। আমরা তাই দেরি না করে রওনা হলাম আরুশা অভিমুখে।

ওখানে পৌঁছেই অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে বাচ্চাদের অবস্থার কথা জানিয়ে দিলাম তাঁকে। জেসপার দেহের সেই তীরের ফলার কথা বলে আর একবার তাঁর কাছে অনুমতি চাইলাম অপারেশনের জন্যে। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হলেন না। আমরা তাই বেশ কিছুটা হতাশা নিয়েই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

চলে যাবার সময় বার বার মনে হতে লাগলো বাচ্চাগুলোর কথা। জেসপার কথাই মনে হতে লাগলো বেশী করে। আর কি ওদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের !

দীর্ঘ অনুসন্ধান

আরুশা থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম নাইরোবিতে। ওখানে যেতেই খবর পেলাম, জর্জের পরিবর্তে লোক ঠিক হয়ে গেছে। এবার থেকে তার জায়গায় কাজ করবে কেন্ স্মিথ। এতে আমাদের কাজের পক্ষে সুবিধেই হলো ; কারণ এখন থেকে জর্জ তার পুরো সময়টাই বাচ্চাদের খেদমতে ব্যয় করতে পারবে।

আমরা তখন টাঙ্গানাইকার ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তার কাছে আর একবার লিখিতভাবে আবেদন করলাম জেসপার দেহে অপারেশন করার অনুমতি চেয়ে। দরখাস্তর সঙ্গে একখানা চিঠিও পাঠালাম তাঁর কাছে। তাতে লিখলাম, আমাদের দরখাস্তটা যেন ট্রাস্টি বোর্ডের পরবর্তী মীটিঙে পেশ করেন তিনি।

নাইরোবি থেকে আমি চলে গেলাম ইসিওলোয়। সরকারি আবাস থেকে আমাদের জিনিসপত্র সরিয়ে নেবার জন্যেই যেতে হলো আমাকে। জর্জও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় তার পক্ষে নাইরোবি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হলো না। এই বিশেষ কাজটি হলো শ'তিনেক টমাস হরিণকে পাচার করা।

ইসিওলোর কাজ শেষ করতে দেরি হলো না, কারণ আগে থেকেই আমরা একটা বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলাম। সেই বাড়িতেই আমাদের জিনিসপত্র-গুলো নিয়ে যাওয়া হলো। দিন তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো ওখানকার কাজ। আমি তখন আবার চলে এলাম নাইরোবিতে।

আগস্ট মাসের শেষ দিকে বিলি কলিন্স হঠাৎ এসে হাজির হলো নাইরোবিতে। সে এসেছে ছুটো উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাচ্চাদের শেষবারের মতো দেখা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো আরুশা সম্মেলনে যোগদান করা। এটি একটি বিশেষ সম্মেলন। বন্যজন্তুদের কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং কোথায় কোথায় তাদের পূর্ণবসতির ব্যবস্থা করা যায় সেই সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার জন্যেই আহূত হয়েছে এই সম্মেলন। সারা পৃথিবী থেকে খ্যাতনামা পশুপ্রেমীরা এসেছেন ওই সম্মেলনে যোগ দিতে। বিলি কলিন্সও তাঁদেরই একজন।

বিলি আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অধিকর্তার কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামটা হতাশাব্যঞ্জক। অধিকর্তা জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়েছে। জেসপার দেহে অপারেশন করার মতো কোনো কারণ আছে বলে মনে করেন না ট্রাস্টিরা।

আমরা এদিকে আফ্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পশু-চিকিৎসক ডাঃ হার্থুর্নের (Dr. Harthoorn) সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। টেলিগ্রামটা পাবার পর ট্রাস্টি বোর্ডের আপত্তির কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন, জেসপাকে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে অপারেশন করা ছাড়া তীরের ফলাটা বের করা যাবে না, তাহলে নিশ্চয়ই অপারেশন করতে হবে। ডাঃ হার্থুর্নের অভিমত জানবার পর আমরা নোয়েল সাইমনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। ইনি হলেন ইস্ট আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। মেজর গ্রিমউডের সঙ্গেও এ ব্যাপারে পরামর্শ করলাম আমরা।

এরপর বিলির সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হলো যে, আমি আর বিলি সেরেঙ্গেটিতে গিয়ে এক সপ্তাহ বাচ্চাদের খোঁজ করবো। আরও কথা হলো ওখানে যাবার পর বিলি চেয়ারম্যানের সঙ্গেও দেখা করবে।

হার্থুর্নের অভিমত জানিয়ে তাঁর মত পরিবর্তনের চেষ্টা করবে।

পরামর্শে এই রকম স্থির হবার পরেই আমি আর বিলি আরুশা অভিমুখে রওনা হলাম। যাবার পথে অ্যামবোসেলের ন্যাশনাল পার্কটাও একবার দেখে গেলাম। এই পার্কটা টাঙ্গানাইকার সীমান্তে কিলিমিঞ্জারো পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। পার্কের প্রবেশপথে হাজির হতেই দেখি চার-চারটে বিশালকায় হাতী একটা পাম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কুতকুত করে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফেরাতেই দেখি, পাশের একটা ঝোপের মধ্যে দিব্যি পুরুষ্টু একটি গণ্ডার সগর্বে বিরাজ করছেন। ওদের দেখে বিলি বললো, বুনো হাতী আর বুনো গণ্ডার সে এই প্রথম দেখলো।

হাতী আর গণ্ডার ছাড়া আরও অনেক রকম পশু দেখতে পেলাম আমরা। কিছুক্ষণ বাদে একপাল বুনো মোষকেও দেখতে পাওয়া গেলো। মোষগুলো বিস্মিত দৃষ্টিতে আমাদের গাড়ি দুটোকে লক্ষ্য করছে দেখলাম।

ওখান থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম আরুশায়। সেখানে গিয়েই বিলি ন্যাশনাল পার্কসের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে জেসপার দেহে অপারেশনের জন্যে তাঁর অনুমতি চাইলো। ডাঃ হার্থুর্নের অভিমতটা তাঁকে জানিয়ে দিয়ে আমাদের বক্তব্যটা আর একবার নিবেদন করলো সে। কিন্তু বিলির অনুরোধেও কাজ হলো না। তবে একেবারেই যে হলো না, তা নয়; অধিকর্তা তাকে বললেন, বাচ্চাদের খুঁজে বের করবার পর সে যদি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে নতুন করে আলোচনা করতে চায় তাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। যাক, এটাও অন্ততঃ মন্দের ভাল। আমরা যে বাচ্চাদের খুঁজে বের করবার অনুমতি পেলাম এটাকেই আমরা ভাগ্য বলে মনে করলাম।

অধিকর্তার অনুমতি পাবার পরেই তল্লাসীর কাজে লেগে গেলাম আমরা। প্রথমেই আমরা হাজির হলাম ম্যানিয়ারা হ্রদের তীরে। ওখানে দুটো উটপাখিকে জলের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে দেখলাম। চোখ ফেরাতেই দেখি গোটা কুড়িক বুনো মোষ এসে হাজির হয়েছে জলের ধারে। এ ছাড়া একদল ফ্লেমিংগো, একঝাঁক ইজিপসিয়ান রাজহাঁস এবং আরও কয়েকরকম জলচর পাখি দেখতে পেলাম ওখানে।

পরদিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখা গেলো। আমরা তখন আর দেরি না করে সেরোনেরা অভিমুখে রওনা হলাম।

সেরোনেরায় হাজির হবার পরদিন থেকেই কাজে লেগে গেলাম। প্রথমেই আমরা হাজির হলাম বাচ্চাদের বাসভূমিতে। তারপর বিভিন্ন ঝোপঝাড়ের

কাছে গিয়ে ওদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম। কিন্তু বহু ডাকাডাকিতেও ওদের কোনো সাড়া-শব্দ পেলাম না।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমরা তাই বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম টুরিস্ট লজে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসবার আগেই টুরিস্টদের সরকারি আবাসে ফিরে আসার নিয়ম। এবং আমরাও যেহেতু টুরিস্ট হিসেবেই ওখানে থাকার অনুমতি পেয়েছি, সেইহেতু টুরিস্টদের নিয়মকানুন আমাদেরও মেনে চলতে হবে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা যেতেই দুটো সিংহকে দেখতে পেলাম আমরা। ওদের মধ্যে একটিকে বেশ অসুস্থ বলে মনে হলো। আরও মনে হলো যে, অপর সিংহটি বোধ হয় রুগ্ণ বন্ধুর সাহায্যের জন্যেই তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।

আমাদের দেখেই সরে পড়লো সিংহ দুটি। আমরা তখন নদীর দিকে রওনা হলাম। নদীর কাছে যেতেই দেখি বন্য জন্তুরা পালে পালে চরে বেড়াচ্ছে নদীর তীরে। কিন্তু ওদের দিকে লক্ষ্য করার সময় নেই আমাদের। আমরা তাই রওনা দিলাম বাচ্চাদের বাসস্থানের উদ্দেশে।

সেদিনও আমাদের হতাশ হতে হলো। সারাদিন খোঁজ করেও বাচ্চাদের দেখা পেলাম না।

চতুর্থ দিনে বিলি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। টুরিস্ট লজে একজন ডাক্তার ছিলেন তখন। তিনিই ওর চিকিৎসার ভার নিলেন। তিনি বললেন, বিলির অ্যালার্জি হয়েছে।

তিনদিন বিশ্রাম আর চিকিৎসার পরে অনেকটা ভাল হয়ে উঠলো বিলি। তখনও সে পুরোপুরি নিরাময় হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা লেগে গেলাম অনুসন্ধানের কাজে। কিন্তু পর পর চারদিন সমানে অনুসন্ধান করেও বাচ্চাদের সন্ধান পেলাম না।

কয়েকদিন পরে অধিকর্তা এলেন সেরোনেরায়। তিনি এসেছেন একটা গণ্ডারের মুক্তি দেখতে। গণ্ডারটাকে লোহার খাঁচায় করে নিয়ে আসা হয়েছে। এই প্রথম ওখানে একটা গণ্ডারকে আনা হয়েছে ছেড়ে দেবার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও অনেকে এসে হাজির হলেন ওখানে। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সভ্যরাও এলেন। আরুশা সম্মেলনে যোগদান করার জন্যে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি আরুশায় এসেছিলেন, তাঁরাও এসে গেলেন একটু বাদে। দেখতে দেখতে মোটর গাড়িতে ভরতি হয়ে গেলো জায়গাটা।

ঘণ্টাখানেক পরেই রিলিজ পয়েণ্টে হাজির হলাম আমরা। সবারই দৃষ্টি তখন গণ্ডারের খাঁচাটার দিকে। একটু পরেই খাঁচার দরজাটা খুলে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো গণ্ডারটা। কিন্তু ওখানে অত লোকের সমাগম দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলো সে। বারকয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ সে এগিয়ে আসতে লাগলো চেয়ারম্যানের গাড়ির দিকে। ব্যাপার দেখে হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠলো সবাই। চিৎকার শুনে গণ্ডারের পো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সোজা রওনা হলো নদীর দিকে। এর পরেই দর্শকরা ফিরে চললেন আরুশায়। আমি এবং বিলিও চললাম তাঁদের সঙ্গে।

পরদিন সকালেই সম্মেলন শুরু হলো। বিলি কলিন্স যোগ দিলো সম্মেলনে। ওখানে জেসপার অপারেশনের সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হলো না। সে তাই সম্মেলনের পরে চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্টিদের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করে আমাদের বক্তব্যটা নিবেদন করলো তাঁদের কাছে। ট্রাস্টিরা কিন্তু রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন, অপারেশন করার দরকার হবে না। তীরের ফলাটা নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে একসময়।

ট্রাস্টিদের মতামত শুনে হতাশ হলো বিলি। সে তখন নোয়েল সাইমনের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে আলোচনা করলো। বিলির কাছ থেকে সব শুনে মিঃ সাইমন সেই দিনই চেয়ারম্যানের কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন যে, ডাঃ হার্থর্নকে দিয়ে জেসপাকে পরীক্ষা করানো হোক। এবং পরীক্ষা করার পরে তিনি যদি মনে করেন, অপারেশন করা দরকার তাহলে অবশ্যই তা করতে হবে। তিনি আরও লিখলেন, ডাঃ হার্থর্ন যাতে জেসপাকে খুঁজে বের করতে পারেন তার জন্যে কমপক্ষে দশদিন সময় দিতে হবে তাঁকে। এবং এই দশদিন জর্জকেও তাঁর সঙ্গে থাকতে দিতে হবে।

চেয়ারম্যান মিঃ সাইমনকে জানালেন, ট্রাস্টিদের সঙ্গে আলোচনা করে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর চিঠির উত্তর দেওয়া হবে।

বাচ্চাদের খুঁজে বের করার জন্যে আমাদের যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা অতিক্রম হয়ে যাওয়ায় আমরা তখন আবার ফিরে গেলাম নাইরোবিতে। ওখানে যেতেই শুনতে পেলাম যে জর্জ ইসিওলোয় চলে গেছে। বিলি আর দেরি করতে পারছিলো না। তাই সে-ও রওনা হলো ইয়োরোপ অভিমুখে। বিলি চলে যাবার পর আমিও চলে গেলাম। জর্জ বললো-ইতিমধ্যে সে একবার এল্‌সার কবরটা দেখে এসেছে। সে আরও বললে যে, কবরটা মেরামত করার দরকার হয়ে পড়েছে, কারণ বুনো হাতীরা কবরটাকে তছনছ করে ফেলেছে। সুতরাং এখনি সেখানে যাওয়ার দরকার।

পরদিনই আমরা রওনা হলাম কবরের অবস্থা দেখতে। গিয়ে দেখলাম, জর্জের কথাই ঠিক। সত্যিই কবরটাকে মেরামত না করলে চলবে না। আমরা তখন লরীতে করে বড় বড় পাথরের চাঁই নিয়ে এসে জড়ো করতে লাগলাম ওখানে। একজন খোদাইকারককে দিয়ে একটা পাথরের ওপরে এল্‌সার নাম, জন্ম-তারিখ এবং মৃত্যু-তারিখ খোদাই করে নেওয়া হলো। এরপর রাজমিস্ত্রি আনিয়ে ভালভাবে সিমেন্ট দিয়ে কবরটা বাঁধাই করে দেওয়া হলো।

কবরটা ঠিকঠাক করবার পর আবার আমরা ফিরে গেলাম ইসিওলোয়। ওখানে যেতেই খবর পেলাম, ট্রাস্টি বোর্ডের পরবর্তী মিটিংয়ের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিটিং হবে অক্টোবরের শেষ দিকে। খবরটা হতাশাব্যঞ্জক, কারণ নভেম্বর থেকেই সেরেঙ্গেটি এলাকায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এমনভাবে একনাগাড়ে বৃষ্টি হতে থাকে যে, তখন বাচ্চাদের খোঁজ করা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যে জেসপার অপারেশনের ব্যাপারে ট্রাস্টিদের অভিমত জানতে চেয়ে বিলি কলিন্স লণ্ডন থেকে একখানা টেলিগ্রাম করেছে চেয়ারম্যানের কাছে। চেয়ারম্যান তার উত্তরও দিয়েছেন। তাঁর সেই উত্তরের একটা কপি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বিলি। বলা বাহুল্য, চেয়ারম্যান বিলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে যে কারণে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সেগুলোও জানিয়ে দিয়েছেন চেয়ারম্যান। কারণগুলো হলো ঃ

১। গত ১২ই জুলাই যখন জেসপাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিলো তখন তার শারীরিক অবস্থা খুবই ভালো ছিলো।

২। ট্রাস্টি বোর্ডের নিযুক্ত পশু-চিকিৎসক বলেছেন, তীরের ফলাটা আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে একসময়।

৩। অপারেশনের ফলে জেসপার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে পারে।

৪। বাচ্চারা হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে ; সুতরাং তাদের জন্যে খোঁজা-খুঁজি শুরু হলে অন্যান্য পশুদের চলাফেরার স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

বিলির কাছ থেকে চেয়ারম্যানের চিঠির নকলটা পাবার পরেই আমরা সেরেঙ্গেটি অভিমুখে রওনা হলাম। বলা বাহুল্য, এবারেও আমরা সেরোনেরাতেই ক্যাম্প করলাম।

ওখানে এসেই শুনলাম, নোয়েল সাইমন বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন জেসপার অপারেশনের জন্যে। তাঁর চেষ্টার ফলে আবার আমরা বাচ্চাদের খোঁজ করার জন্যে অনুমতি পেলাম। এর পরেই আবার শুরু হলো তল্লাসীর কাজ।

সেরেঙ্গেটির আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। যে কোনদিন বর্ষণ শুরু হতে পারে।

আমরা তাই পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে গেলাম। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সমানে চলতে লাগলো তল্লাসী। কিন্তু শত তল্লাসীতেও বাচ্চাদের খোঁজ পেলাম না।

৯ই নভেম্বর অধিকর্তা আর তাঁর স্ত্রী সেরোনেরায় এলেন। আমি আর জর্জ তাঁদের সঙ্গে ডিনার খেলাম সেদিন। খানার টেবিলে বসে অধিকর্তা বললেন যে জেসপার অপারেশনের ব্যাপারে ট্রাস্টি বোর্ড আর আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধ চলছে তা হয়তো শীগগিরই মিটে যাবে।

পরদিন সকাল থেকেই বর্ষণ শুরু হলো। বর্ষণের আর বিরাম নেই। চলছে তো চলছেই। আমরা কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যেও তল্লাসী চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু দিন তিনেকের মধ্যেই গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়লো। আমরা তখন উপত্যকা থেকে বেরিয়ে সেরোনেরায় ফিরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু নদীর কাছাকাছি আসতেই আমাদের গাড়ি অচল হয়ে পড়লো। গাড়ির সামনের চাকা দুটো তখন কাদায় ঢুকে গেছে।

ব্যাপার গুরুতর দেখে আমরা জঙ্গল থেকে গাছের ডাল কেটে এনে চাকার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়িটাকে তুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শত চেষ্টা করেও গাড়িটাকে ওপরে তুলতে পারলাম না।

আমাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। গাড়ির ভেতরে আমরা দুটি প্রাণী। দুজনেই ভিজে একেবারে একসা। খাবারদাবার যা নিয়ে এসেছিলাম তা আগেই শেষ হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা বন্দী হয়ে রইলাম গাড়ির ভেতরে।

সারারাত ওইভাবে বন্দী হয়ে থাকার পর অবশেষে ভোর হলো। খিদের চোটে তখন আমাদের নাড়ী জ্বলছে। হঠাৎ দেখি গাড়ির ভেতরের এক পাশ থেকে জর্জ একটা স্টোভ, কেটলি আর চা-দুধ-চিনি বের করে ফেলেছে। এই সময় ওই জিনিসগুলো দেখতে পেয়ে আমি যে কী খুশী হলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তা সম্ভবও নয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা তৈরী হয়ে গেলো। আমরা তখন প্রত্যেকে দু কাপ করে চা খেয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর করলাম। কিন্তু চা খেয়ে চাঙ্গা হলেও বন্দিদশা থেকে আমরা মুক্তি পেলাম না।

বিকেল পর্যন্ত হতাশ হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ দেখি, তিনখানা ল্যাণ্ডরোভার এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। গাড়িগুলো আমাদের কাছে এসে থামতেই কয়েকজন আমেরিকান টুরিস্ট নেমে এলেন। বললেন, ওঁরা আমাদের খোঁজেই এসেছেন।

ওঁরা এসেই আমাদের গাড়িটাকে ওপরে তুলে ফেললেন। এরপর আমরা সদলবলে রওনা হলাম সেরোনেরার দিকে।

দিন তিনেক পরে বৃষ্টি থামলো। কিন্তু বৃষ্টি থামলেও পথঘাটের অবস্থা গাড়ি চালাবার মতো ছিলো না। তাই আরও কয়েকটা দিন আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হলো ওখানে। অবশেষে পথ-ঘাটের অবস্থা একটু ভাল হতেই আবার আমরা চলে গেলাম বাচ্চাদের বাসভূমিতে। এবার ওখানে গিয়ে একটা সিংহী আর দুটো বাচ্চাকে দেখতে পেলাম। একটা বাচ্চা ঠিক জেসপার মতো দেখতে। তিন-চার মাস বয়সে জেসপা যেমনটি দেখতে ছিলো এ বাচ্চাটাকেও ঠিক তেমনি দেখতে।
সেদিনও বাচ্চাদের দেখা পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে সন্ধ্যার পরে ফিরে এলাম লজে। এসেই শুনলাম, আগামী ১১ই এবং ১২ই ডিসেম্বর প্রিন্স ফিলিপ আসছেন সেরেঙ্গেটিতে। আরও শুনলাম, ওই সময় কোনো টুরিস্টকে ওখানে থাকতে দেওয়া হবে না।
এদিকে আমি তখন দাঁতের ব্যথায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। ব্যথাটা এত বেড়েছে যে, ডেন্টিস্টকে না দেখালে আর চলছে না। আমি তাই জর্জকে ওখানে রেখে একটা প্লেনে করে নাইরোবিতে চলে গেলাম দাঁতের চিকিৎসার জন্যে।

নাইরোবিতে পাঁচদিন থেকে ৫ই ডিসেম্বর আবার আমি ফিরে এলাম সেরোনেরায়। কিন্তু ওখানে আসার পরদিনই একজন পার্ক-ওয়ার্ডেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে বললো, প্রিন্স ফিলিপের আগমন উপলক্ষে আগামী ৮ই থেকে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো টুরিস্টকে ওখানে থাকতে দেওয়া হবে না। সে আরও বললো, এই সময়টা আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ওখান থেকে এগার মাইল দূরে বানাগি নামক একটা জায়গায়।
সেরোনেরা তৈরী হবার আগে বানাগিই ছিলো সেরেঙ্গেটির হেড কোয়ার্টার। বর্তমানে ও জায়গাটা গবেষকদের বসবাসের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওখানকার যে বাড়িটাতে সেরেঙ্গেটির প্রধান ওয়ার্ডেন বাস করতো. সেখানে এখন গবেষণাগার হয়েছে। একটা ল্যাবরেটারীও স্থাপিত হয়েছে ওখানে। আর একটা বাড়িকে টুরিস্ট লজে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ওখানেই করা হয়েছে সাময়িকভাবে।
১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ওখানেই থাকতে বাধ্য হলাম আমরা। ওই দিনই প্রিন্স ফিলিপ সেরেঙ্গেটি থেকে বিদায় নিলেন। তিনি চলে যাবার পরেই আমরা একজন সংবাদবাহককে সেরোনেরার [illegible]

চিঠিপত্রগুলো নিয়ে আসার জন্যে। লোকটা ফিরে এলো একগাদা চিঠি এবং অনেকগুলো বড় আকারের পার্শেল নিয়ে। পার্শেলগুলো এসেছে বড়দিনের উপহার হিসেবে। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা ওগুলো পাঠিয়েছে। অনেকগুলো দামী উপহারও ছিলো সেগুলোর মধ্যে।

আর একটা দিন ওখানে থেকে ১৫ই তারিখে আবার আমরা ফিরে গেলাম সেরোনেরায়। টুরিস্ট লজে না উঠে আমরা আমাদের পুরনো জায়গাতেই তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করলাম। এরপর জিনিসপত্র গোছগাছ করেই আমরা রওনা হলাম উপত্যকার দিকে। ওখানে যেতেই দেখি আমার গাড়িটাকে যেমনভাবে রেখে গিয়েছিলাম তেমনিই রয়েছে। গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখলাম, ওটা চালুই আছে।

একটু পরে একটা কানা সিংহী এসে হাজির হলো ওখানে। আমাদের দেখতে পেয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর কি মনে করে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করলো।

আমার শরীরটা ভালো ছিলো না। সকাল থেকেই হাত-পায়ে ব্যথা অনুভব করছিলাম। বিকেলের দিকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো হঠাৎ। বুঝতে পারলাম, আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি। আমার অবস্থা দেখে জর্জ তখুনি আমাকে নিয়ে ক্যাম্প অভিমুখে রওনা হলো। ওখানে পৌঁছেই আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আবার আমরা রওনা হলাম উপত্যকার দিকে। আমার তখনও বেশ জ্বর। কিন্তু জ্বর গায়েই রওনা হলাম আমি। সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেও বাচ্চাদের খোঁজ পেলাম না। অবশেষে আবার আমরা ফিরে এলাম টুরিস্ট লজে।

এরপর প্রতিদিনই আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাচ্চাদের খোঁজ করতে লাগলাম। সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে আর মাত্র দুটো সপ্তাহ ওখানে আমরা থাকতে পারবো। তারপরেই আমাদের বিদায় নিতে হবে সেরেঙ্গেটি থেকে। তাই বৃষ্টি-বাদল, জল-কাদা অগ্রাহ্য করেই অনুসন্ধানের কাজ চালাতে লাগলাম আমরা।

এই সময়টাতে কত রকম পশু যে আমরা দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। পশুরা তখন আবার ফিরে আসছে। তবে স্থানত্যাগের সময় যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল, ফেরবার সময় সেভাবে আসছে না।

সিংহও দেখতে পেলাম অনেকগুলো। কিন্তু আমরা যাদের জন্যে প্রাণপাত করছি তাদের দেখা পাচ্ছি না।

এদিকে বৃষ্টির তখনও বিরাম নেই। অবিরাম, অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এবং সেই বৃষ্টির মধ্যেই চলছে আমাদের অনুসন্ধানের কাজ। জর্জের গাড়িটার তখন প্রায় অচল অবস্থা। ওটাকে কারখানায় পাঠাতে হবে মেরামতের জন্যে। আমার গাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। মাঝের বল্টু খুলে গেছে। ব্রেক পাইপ স্টার্টার এবং একজস্ট পাইপ ভেঙে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা গাড়িটাকে রেহাই দিচ্ছি না। এইভাবে কয়েকদিন পরিশ্রম করে একদিন সন্ধ্যার পরে ক্যাম্পে ফিরে এসে সেই যে গাড়িটা জমি নিলো, তারপর আর 'নট নড়ন চড়ন'।

আমার তাঁবুটা তখন একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ওর মধ্যে আর থাকা সম্ভব নয় দেখে গাড়িটাকেই শয়ন-ঘর করে নিলাম। জর্জও আশ্রয় নিলো তার ভাঙা গাড়িতে।

বাইরে বেরোবার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে আমরা তাই বন্দীজীবন যাপন করতে লাগলাম যে যার গাড়ির মধ্যে।

বিদায়ের আগে

বন্দী অবস্থায় যে কদিন গাড়িতে ছিলাম সেই সময় একদিন একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আমার গাড়ির পাশে। ভাঙা বাসাটার মধ্যে দুটো বাচ্চা ছিল। আমি তখন বাচ্চা দুটোকে তুলে এনে গাড়ির ভেতরে স্থান দিলাম। একটু পরেই ওদের মা এলো। কিন্তু এসেই সে ভীত হয়ে পড়লো বাসাটার অবস্থা দেখে। সে তখন বাসাটার চারপাশে উড়তে শুরু করলো। আমি বুঝতে পারলাম যে, উড়ে উড়ে বাচ্চাদের খোঁজ করছে পাখিটা।

পাখিটার উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্যে আমি বাচ্চা দুটোকে হাতে করে বাইরে এনে তাকে দেখালাম। কিন্তু বাচ্চাদের দেখতে পেয়েও পাখিটা আমার কাছে এলো না। আমাকে দেখে ভয় পেয়েই এলো না হয়তো।

পাখিটার ভয় দেখে ও যাতে গাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমি গাড়ির একটা জানলা একটু ফাঁক করে রাখলাম। পাখিটা তখন ভয়ে ভয়ে সেই জানলাটার কাছে উড়ে উড়ে বাচ্চাদের ডাকতে লাগলো। বাচ্চারাও সাড়া দিলো তার ডাকে। হয়তো ওরা বললো, 'এখানে কোনো ভয় নেই, তুমিও এখানে আসতে পারো।'

একটু পরেই পাখিটা ঢুকে পড়লো গাড়ির ভেতরে।

সাত দিন সাত রাত আমরা বন্দী হয়ে রইলাম গাড়ির ভেতরে। এই কদিন আমার একমাত্র সঙ্গী ছিলো পাখির সেই বাচ্চা দুটো। ওদের মা বৃষ্টি-বাদল মাথায় নিয়েই বেরিয়ে যেতো খাবার যোগাড় করতে। বাচ্চারা তখন আমার কাছেই থাকতো। ওদের মা তখন আর আমাকে ভয় করতো না। সে বুঝতে পেরেছিলো, আমি তার উপকারী বন্ধু।

বাচ্চা দুটোকে কিন্তু বাঁচানো গেলো না। নিদারুণ ঠাণ্ডায় এবং সময়মতো খেতে না পেয়ে ওরা মরে গেলো শেষ পর্যন্ত। পাখিটার তখন সে কি কান্না! পাখির কান্না আমি আগে কখনও শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম সন্তানহারা বিহঙ্গীর করুণ কান্না। আমার মনটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিলো বাচ্চা দুটোর জন্যে।

* * *

কয়েকদিন বন্দী থাকার পর বৃষ্টি থামলো। আমি তখন অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আরুশা রওনা দিলাম। জর্জ রয়ে গেলো ক্যাম্পেই। বললে, আবার ও শুরু করবে অনুসন্ধান।

আরুশায় উপস্থিত হতেই শুনতে পেলাম কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিং হবে। আমি সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবার জন্যে অধিকর্তার অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা না বলে তিনি আমাকে অনুমতি দিতে পারেন না। তবে তিনি ভরসা দিলেন যে চেয়ারম্যান হয়তো আপত্তি করবেন না।

তাঁর কথাই সত্যি হলো। কয়েকদিন পরেই আমাকে তিনি জানিয়ে দিলেন, চেয়ারম্যান আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন।

নির্দিষ্ট দিনে মিটিং বসলো। আমি সেদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করলাম ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে। কিন্তু তাঁরা আমার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন।

আমি তখন হতাশ হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে জর্জকে জানিয়ে দিলাম দুঃসংবাদটা। সব কথা শুনে জর্জ বললো, এরপর বন-বিভাগের মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

পরদিনই মন্ত্রীর কাছে আবেদন পাঠানো হলো। কিন্তু সে আবেদনও মঞ্জুর হলো না। মন্ত্রীমশাই আমাদের দয়া করে জানিয়ে দিলেন যে, ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবার মতো কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

মন্ত্রীর চিঠি পাবার পরেই আমাদের সব আশা শেষ হয়ে গেলো। এবার আমাদের সেরেঙ্গেটি থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

[illegible] থেকে তীরের ফলাটা বের করে

দিতে পারবো। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। আরও একটা দুঃখ রয়ে গেলো যে, চলে যাবার আগে বাচ্চাদের একবার চোখের দেখাটাও দেখতে পেলাম না।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। এবার আমরা চলে যাচ্ছি সেরেঙ্গেটি ছেড়ে। কিন্তু চলে যেতে মনটা চাইছে না। বারবার মনে হচ্ছে জেসপা, গোপা আর ছোট এল্‌সার কথা। আর কোনদিন আমরা ওদের দেখতে পাবো না। জেসপা তার থাবা উঁচিয়ে আমার সঙ্গে খেলা করতে আসবে না। গোপা আর ছোট এল্‌সা আর কোনদিন আমার দিকে দূর থেকে তাকাবে না। আমার আদরের এল্‌সার আদরের ছেলেমেয়ে ওরা। এল্‌সা আজ নেই। যাবার আগে সে তার ছেলেমেয়েদের ভার আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলো। আজ আমি ভগবানের হাতে ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। ভগবান ওদের রক্ষা করুন।

—*—